কথায় কথায় রাত হয়ে যায়

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল ১৯৫৬

প্রকাশক :
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

শিল্পী :
শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত
পরিবেশক :
ইণ্ডিয়ান বুক ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং
৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯

যাঁদের ভালবাসায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি
আমার গীতিকার জীবনের সেই দুটি স্তম্ভ
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে-কে
এবং
যার পাগল করা উৎসাহে এ-লেখার জন্ম
সেই
দুলেন্দ্র ভৌমিক-কে
তুলে দিলাম
এই
কথায় কথায় রাত হয়ে যায়।

১

মাত্র তিন মিনিট দশ সেকেন্ড। হ্যাঁ। এই ছিল একটি ডিস্ক রেকর্ডের সময়সীমা। আমাদের তখন বলা হত, গান এর বেশি বড় করবেন না। বড় করলে রেকর্ড-ছাপার 'থ্রেড' বেশি হয়ে যাবে। রেকর্ডের গান সুস্পষ্ট হবে না। অর্থাৎ আর পি এম মানে রোটেশন পার মিনিট যত কম হবে ততই ডিসকের পক্ষে মঙ্গল। গীতিকারকে গান লেখবার সময় সুরকারকে সুর করবার সময় এবং কণ্ঠশিল্পীকে গাইবার সময় সর্বদা এই নির্দেশের কথা মনে রাখতে হত এবং ঘড়ির কাঁটার অনুশাসন মেলে চলতে হত। তখন এল পি ছিল না, সি ডি মানে কমপ্যাক্ট ডিস্কও ছিল না। ক্যাসেট তো কেউ ভাবতেই পারত না। আজকের খোলামেলা অনুশাসন মুক্ত সময়ে নয়, তখনকার সেই বিধিবদ্ধ সময়েই আমার সংগীতজগতে প্রবেশ।

আমি আধুনিক গানই লিখতাম। আধুনিক গানই লিখছি আর যতদিন বাঁচব ততদিন এই আধুনিক গানই লিখে যাব। বাংলা গানের এই গীতিকবিতার ওপর কে যে কবে এই আধুনিক লেবেলটি এঁটে দিয়ে গেছেন তার হদিশ আমি কেন, অনেক গবেষকও খুঁজে পাবেন না। রবীন্দ্রনাথের গানকেও সেই যুগের এক ধরনের আধুনিক গানই বলা হত। পরে রেকর্ড কোম্পানিতে নিধুবাবুর গানের মতো গুরুদেবের গানকেও শুধু একটু বিশেষিত করা হয়েছিল রবিবাবুর গান বলে।

যাই হোক, আমি যে সময়ে গান লিখতে এলাম তখন রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রসংগীত হয়ে গেছে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের গানও তখন সবার কাছে দ্বিজেন্দ্রগীতি ও নজরুলগীতি হয়ে গেছে। আমি কবি ছিলাম কি না জানি না, তবে কৈশোর থেকে বুঝে নিয়েছিলাম, গান লেখা কবিতা লেখারই একটা অঙ্গ। এখনকার কবিরা আমাদের 'গীতিকার' আখ্যা দিয়েছেন। যার ফলে আমরা গীতিকার হয়ে গেছি কবি হতে পারিনি। আমাদের বাংলা সাহিত্যে যে বইটি নোবেল প্রাইজ পেয়েছে সেটি কিন্তু গীতাঞ্জলি। আমি জানি না, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র আর গীতিকার প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে এঁদের কী ধারণা? আমি যখন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি তখন থেকেই কবিতা লেখার চর্চা শুরু করেছিলাম। সেগুলি আদৌ কবিতা হচ্ছে কি না সেই বোধ তখনও আমার আসেনি। তবু লিখতাম। বিশেষ করে ছোটদের কবিতা। ক্লাস ফাইভ কিংবা সিক্সে পড়ার সময়ে আমার লেখা একটি কবিতা আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আনন্দবাজারের আনন্দমেলায়। সেটি প্রকাশিত হয়। সেই দিনটি আমার কাছে চিরস্মরণীয়। পাঁচটি আনন্দবাজার কিনে ফেলেছিলাম। তখন জেরক্স ছিল না তাই বন্ধুবান্ধবদের ওই কাগজগুলি দেখিয়েছিলাম। শুধু তাই নয় কিছুদিন পরে মানিঅর্ডারে পেলাম পাঁচ-পাঁচটি টাকা। তখন আর আমায় পায় কে? আনন্দের আতিশয্যে সদ্য কেনা নতুন জুতোটা পরে সারা বাড়ি মসমস করে বারকতক

ঘুরে বেরিয়েছিলাম। আজ পর্যন্ত জীবনে গান লেখার সুবাদে অনেক টাকাই হয়তো রোজগার করেছি। কিন্তু ওই পাঁচটি টাকা আজও আমার কাছে মহার্ঘ হয়ে আছে।

আমার পিতৃদেব কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নির্বাকযুগের চিত্রনায়ক। তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের এই শ্রীকান্ত দিয়েই চিত্রা সিনেমার দ্বারোদঘাটন হয়। বাবা ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। তারই সূত্রে অনেক শিল্পী, অনেক জ্ঞানী ও গুণীজন আমাদের বাড়ি 'সালকিয়া হাউসে' আসতেন। বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার, সাংবাদিক মনুজেন্দ্র ভঞ্জ এবং গীতিকার ও সুরকার হীরেন বসু। ওঁরা যখন আসতেন তখন গান-বাজনা-সিনেমা নিয়ে অনেকরকম আলোচনা হত। কিন্তু বড়দের আসরে আমাদের মতো ছোটদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই ওঁদের আলোচনা শোনার সুযোগ আমি সেই সময় পাইনি। বাবার বৈঠকখানায় একখানা ভাল পিয়ানো ছিল। বাবা বেশ ভালই বাজাতেন। একদিন সন্ধ্যায় শুনলাম, বাবা পিয়ানো বাজিয়ে আমার দিদিকে গান শোনাচ্ছেন, 'শেফালী তোমার আঁচলখালি বিছাও শারদপ্রাতে'। বাবার কাছ থেকে দিদি গানটা তুলছেন। আমি পায়ে পায়ে ঢুকে পড়েছিলাম সেখানে। গান তো আমরা খুবই শুনতাম। কিন্তু এ গানের যেন একটা কোথায় বিশেষত্ব ছিল। গান শেষ হতেই বাবা বললেন, এটা কার সুর কার লেখা জানো? দিদি উত্তর দিল, জানি। হীরেনবাবুর। আর গেয়েছেন মিস লাইট। এর রেকর্ড আমি শুনেছি।

আমার কানে তখন কিন্তু বাজছিল একটাই কথা, তা হল, হীরেনবাবুর লেখা। তা হলে গানও লেখা যায়। বোধ হয় তখনই নিজেকে বোঝাতে পেরেছিলাম। তাই তো, মাসে মাসে এত যে নতুন গান বের হচ্ছে সেগুলি কেউ না কেউ নিশ্চয়ই লিখছে। গানও লেখা যায়, গানও মানুষ লেখে। সম্ভবত ক্লাস নাইন থেকেই আমার গান লেখা শুরু হল। বাবার একটা সুন্দর চার্চ অর্গান ছিল। বাবা সেটিও বাজাতেন। পিতৃস্মৃতি হিসেবে আজও আমি অর্গানটি সযত্নে রেখে দিয়েছি। তখন আমিও অর্গান বাজাতে শিখেছিলাম। ফাঁক পেলেই আমি অর্গান বাজাতাম আর লিখতাম গান। ক্লাস নাইনের ছেলে লিখছে প্রেম-বিরহের গান। সে সময় এটাকে অকালপক্কতা ছাড়া অভিভাবকরা আর কিছু ভাবতেন না। আমার লেখা গান শুনে বন্ধুবান্ধবরা খুবই বাহবা দিত। কিন্তু সেই গান কাউকে দেখানো বা শোনানোর সাহস আমার ছিল না। আমার জামাইবাবু সরোজ মুখার্জি তখন চিত্র প্রযোজক হয়ে অনেক ছবি করছেন। উনি আমার সঙ্গে খোলামেলা ব্যবহার করতেন। ওঁর সঙ্গে ওই বয়সেই আমি ক্লাবেট্রাবে যাতায়াতের সৌভাগ্য অর্জন করতে শুরু করেছি। একদিন সাহস করে ওঁকে দেখালাম কিছু গান। ওঁর প্রযোজনায় তখন 'অলকানন্দা', 'মনে ছিল আশা', ইত্যাদি ছবি রিলিজ করে গেছে। 'শ্যামলের স্বপ্ন'-র কাজ শেষ করেছেন। এবার যে ছবিটা করতে চলেছেন তার নাম 'অভিমান'। ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রে আছেন পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারানি ও স্মৃতিরেখা বিশ্বাস।

আমার গান দেখে উনি নিজেই আমায় উৎসাহ দিলেন। আমায় বললেন, তুমি তো ভালই গান লেখ দেখছি। আমাদের চিত্রনাট্য শেষ হতে চলেছে। একদিন অফিসে এসো। তোমায় কয়েকটা সিচুয়েশন দেব। যদি ভাল লিখতে পারো তা হলে তোমার গান আমি

রাখব। তবে এবার আমার মিউজিক ডিরেক্টর বোম্বের। বোম্বে টকিজের বিখ্যাত আর সি পাল (রামচন্দ্র পাল)। ওঁর সিদ্ধান্তই কিন্তু চরম। আমাদের অ্যাপ্রুভালের পর উনি যদি তোমার গান অ্যাপ্রুভ করেন তবেই তোমার গান থাকবে।' আমি তো আবেগে সরোজদাকে প্রণাম করে ফেললাম। সরোজদা বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও। আরও শর্ত আছে। গান রামবাবুকে তুমি পোস্টে পাঠিয়ে দেবে। তবে একবারের জন্যও জানাবে না তুমি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। যদি জানতে পাবি তুমি ওঁকে কিছু বলেছ তা হলে গান রিজেক্ট করে দেব।

আমি বললাম, আমি রাজি। সেদিনই শুধু বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আচ্ছা বাবা রামচন্দ্র পাল কেমন সুর করেন? বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, দারুণ। 'বন্ধন', 'কঙ্কন' 'পুনর্মিলন' সবই তো ওঁর সুর করা। উনি আমার একমাত্র টকি কল্পনার মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন। ওই যে পুনর্মিলন-এ স্নেহপ্রভার গান 'নাচো নাচো প্যায়ারি...' ওই সুরটা কাফি ঠাটের। এখনও সেটা সব বাঙালির ঘরে ঘরে। সেই 'ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়...', মনটা চলে গেল স্বপ্নের রাজ্যে। কাফি, বেহাগ, ইমন, জয়জয়ন্তী, মল্লার, বাহার, সব যেন একসঙ্গে বেজে উঠতে লাগল আমার বুকের মধ্যে। পরে একদিন সরোজদার কাছ থেকে 'অভিমান' ছবির গানের সিচুয়েশনগুলি নিয়ে এলাম। রাত জেগে জেগে লিখে ফেললাম গান। ওঁদের ভাল লাগল।

মনে আছে এক নভেম্বর মাসে বোম্বাইতে পোস্ট করে গানগুলি পাঠিয়ে দিলাম। কয়েকদিন কেটে গেল। কিন্তু কোনও উত্তর এল না। আমার স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষা। পরীক্ষার ছ'দিন আগে ফোন পেলাম। রামবাবু কলকাতায় এসেছেন। এবং কালই শ্যামবাজারের নলিনী সরকার স্ট্রিটের কলম্বিয়ায় গিয়ে আমাকে দেখা করতে বলেছেন। তখন এইচ. এম. ভি. আর কলম্বিয়া পাশাপাশি দুটি বাড়িতে ছিল। টেস্ট পরীক্ষার পাঁচদিন আগে মাকে মাস্টারমশাই-এর বাড়ি পড়তে যাচ্ছি বলে যথাসময়ে হাজির হলাম কলম্বিয়ায়। রামবাবু একটা ঘরে লাল বুশ শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? কাকে চাও? তখন আমার সবে গোঁফ ওঠার বয়স। যথাসম্ভব স্মার্ট হয়ে বললাম, আপনি আমাকে ডেকেছেন তাই এসেছি। উনি বললেন, আমি ডেকেছি? কী নাম তোমার? নাম বললাম।

নাম শুনেই রামবাবুর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অস্ফুট স্বগতোক্তি করে বলে ফেললেন, কী হবে! আমি যে গানগুলো সুর করে ফেলেছি। সবাই খুব তারিফ করছে। আমি বিনীত কণ্ঠে বললাম আমি শুনব না? রামবাবু আর কথা বাড়ালেন না। পর পর শুনিয়ে গেলেন গানগুলো। তারপরেই বললেন, একটা গান আমি বদলাব। গানটা সবাই ভাল বললে কী হবে, আমার ভাল লাগছে না। আমি সুর দিচ্ছি, তুমি সুরের ওপর লেখো।

কথা শেষ করেই সামনে রাখা মেট্রোনাম যন্ত্রটি দম দিয়ে বাজিয়ে দিলেন। মেট্রোনাম এখন উঠে গেছে। এটি হল ঘড়ির কাঁটার মতো একটা যন্ত্র। যা দিয়ে ইচ্ছে মতো মিউজিকের তালগুলো টকটক করে বাঁধা গতে বাজানো যায়। কাহারবা, দাদরা, তেওড়া,

প্রায় সব তালগুলিই শোনানো যায়। এতে তবলা ছাড়াই সুরশিল্পীরা কাজ করতে পারেন। আজকের দিনের রিদম বক্সের মতো এত শোরগোল হয় না। আমি আগেই বলেছি অর্গানের সুরে গান লেখা আমার অভ্যাস ছিল। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে আরও একটা ঘটনা ঘটে ছিল কুমার শচীনদেব বর্মণের সঙ্গে। সেটা পরে যথাসময়ে বলব। আমি তো রামবাবুর সুরের ওপর লিখে ফেললাম গান। আমার গান দেখে উনি খুশিই হলেন। 'অভিমান' মুক্তিলাভের পর আমায় বলেছিলেন, প্রথমদিন এই বয়স্ক গীতিকারকে দেখে উনি নাকি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ওঁর মনে হয়েছিল গানগুলো অন্য কারও লেখা। আর আমি সেইগুলি চুরি করে আমার নামে চালাতে এসেছি। সেজন্যই আমাকে উনি হাতেনাতে পরীক্ষা নিয়েছিলেন। যাই হোক, আসবার আগে রামবাবু বললেন, তুমি বাড়ি গিয়ে আবার ভাববে। যদি আরও কিছু বেটার হয় তবে তোমারই নাম হবে। পরশু এই সময়ে এসো।

পরশু? তার মানে আমার টেস্টের তিনদিন আগে। কিন্তু আমি দমে যাইনি। গানের পরীক্ষা আর স্কুলের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল ছবির গানগুলো। তবে এই গান রেকর্ডিং-এর সময়ে আমাকে আবার ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। এখন যেমন টেপ-এর ওপর সিনেমার গান রেকর্ডিং এবং ফাইনাল মিক্সিং হয়ে গেলেই সে গান সিনেমায় এবং ক্যাসেটে বা ডিস্কে পরিবেশন করা যায় তখন তা হত না। সিনেমার প্রতিটা গানই একবার সিনেমার জন্য ফিল্মি স্টুডিয়োতে আর একবার রেকর্ডে প্রকাশের জন্য গ্রামোফোন স্টুডিওতে রেকর্ড করা হত। প্রতিটি গানই কণ্ঠশিল্পীকে দুবার দু জায়গাতে গাইতে হত। যন্ত্রশিল্পীদেরও দুবার দু জায়গাতে বাজাতে হত। কিন্তু এই দুবার কাজটা করার জন্য কেউই কিন্তু দুবার পয়সা পেত না। 'অভিমান' ছবির গান রেকর্ডিংয়ের সময়ে আমি দমদমের এইচ. এম. ভি. স্টুডিয়োতে হাজির ছিলাম। এইচ-এম.ভি.-র তদানীন্তন অধিকর্তাও এই অল্পবয়সি গীতিকারকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেছিলেন গান আপনার লেখা তো? গানের কথা কিন্তু কপিরাইট অ্যাক্টের আওতায় পড়ে। মামলা হলে মুশকিলে পড়ে যাবেন। আমি বলেছিলাম, রামবাবুকে জিজ্ঞেস করুন। রামবাবুর সুরের ওপর লিখেছি। এই রামচন্দ্র পাল সম্ভবত প্রথম বাঙালি সুরকার যিনি স্যুট-টাই পরে কলকাতায় বাংলা গান রেকর্ড করেছিলেন। এবং সম্ভবত তিনিই প্রথম কলকাতায় বাংলা গানে 'ঢোল' এবং পরবর্তীকালে 'নাল' ব্যবহার করেছিলেন। 'অভিমান' ছবি এবং গান দুই হিট করেছিল। তারপর ওঁরাই করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী রমলাদেবীকে নিয়ে 'জিপসি মেয়ে'। রামবাবুই ছিলেন সুরকার। তখন আমি স্কটিশ চার্চ কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। 'জিপসি মেয়ে' কলকাতার চাইতে ঢাকাতে বেশি হিট করেছিল। পরবর্তীকালে ওই ঢাকাতে গিয়ে আমি বহু পুরনো লোকের কাছে আমার লেখা ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রভা সরকারের গাওয়া 'ওই প্রীতম এল তোর প্রেমের মায়ায়'—গানের সুখ্যাতি শুনেছি।

ইতিমধ্যে কলকাতায় বেতারে আমি গীতিকারদের তালিকায় তালিকাবদ্ধ হয়ে গেছি। কেন জানি না, বেতারের বিমান ঘোষ আমায় খুবই ভালবাসতেন। একদিন কলেজের

ছুটির পর গার্স্টিন প্লেসে গেছি। আমাকে দেখে বিমানদা বললেন, পুলক এসো। আমাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে স্টুডিয়োর একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি লাকি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন সাহেবের বাজনা শোনো। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে বিমানদা চলে গেলেন। আলো জ্বলে উঠল। শুরু হল বাজনা। আমি দমবন্ধ করে বসে রইলাম। ভয় হচ্ছিল উনি কতক্ষণ বাজাবেন জানি না। যদি কথা বলে ফেলি, যদি নিশ্বাসের শব্দ করে ফেলি তবে আমার থেকেও বেশি বদনাম হবে বিমানদার। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কোথায় যেন তলিয়ে গেলাম জানি না। ওই অপূর্ব সুরতরঙ্গ ছাড়া কিছুই মনে এল না। সংবিৎ ফিরল আলো নেভার পর। কিন্তু বেতারে আমার গান চললে কী হবে? রেকর্ড কোম্পানি বা অন্য ফিল্ম কোম্পানি কেউই আমার প্রতি আগ্রহী নয়। শুধু সরোজদার ছবিতেই গান লিখছি। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আমি ছটফট করতে থাকলাম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে একটা কথা আমাকে প্রায়ই বলতেন, কথাটা হল, এই লাইনে থাকতে গেলে দুটি জিনিসের খুব দরকার। তা হল, যোগ্যতা আর যোগাযোগ। তাঁর এই উক্তিটির কথা আমি এখনও উপলব্ধি করি।

ফিরে আসি আগের প্রসঙ্গে। সরোজদার 'অলকানন্দা' ছবিতে সুদর্শন প্রদীপকুমার প্রথম অভিনয় করেন। উনি পরে সরোজদার 'অপবাদ' ছবিতে বোম্বের নায়িকা সুলোচনা চ্যাটার্জির বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন। ওই ছবিতেই হেমন্তদা প্রথম আমার লেখা গান করেন। তখনই প্রদীপকুমারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন আমি এলিট সিনেমায় কী একটা ছবি দেখতে গেছি। ছবি ভাঙার পর বাইরে এসে দেখি প্রদীপকুমার ওঁর গাড়িতে বসে আমায় চিৎকার করে ডাকছেন। তখনও প্রদীপকুমার মেগা হিট নাগিনের প্রদীপকুমার হননি। তাই ততটা ভিড় জমেনি। তবুও কিছু কৌতূহলী জনতা ওঁকে দাঁড়িয়ে দেখছে। আমি দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সোজা নিয়ে গেলেন ওঁদের বাড়িতে। যেতে যেতে বললেন, ফোন করে শুনলাম, এলিটে সিনেমা দেখছ। তাই এখানে এসে অপেক্ষা করছিলাম। গাড়িতে ছিলেন ওঁর দাদা কালিদাস বটব্যাল। উনি বললেন, তোমার লেখা গান আমার ভাল লেগেছে। আমি ছবি করছি 'পলাতকা'। বুবু (প্রদীপকুমার ওরফে শীতল বটব্যালের ডাকনাম) হিরো আর মঞ্জু দে, লীলা দাশগুপ্তা দুজনেই হিরোইন। তোমায় গান লিখতে হবে। দক্ষিণামোহন ঠাকুর সুর করবেন। সেই মুহূর্তে মনে হল এটা কলকাতা নয় যেন স্বর্গধাম। আমি যেন হাওয়ায় ভাসছি।

অতি সুদর্শন বিখ্যাত যন্ত্রসংগীত শিল্পী দক্ষিণামোহন ঠাকুরের সঙ্গে আমি সিটিং করতাম ওঁর সহকারী নির্মলেন্দু বিশ্বাসের এলগিন রোডের বাড়িতে। তিনিও কিন্তু খুব নামকরা যন্ত্রসংগীত শিল্পী ছিলেন। এই দক্ষিণাবাবুর (মুম্বই-এর জনপ্রিয় দুখিবাবুর) ছেলে অভি ঠাকুর আজ শব্দযন্ত্রী হিসেবে এ দেশের গর্ব। আর ওই যে কালিদাসবাবুর 'পলাতকা' পরে সেটা ওঁরই নির্দেশনায় হিন্দিতে তৈরি হল 'এক ঝলক' নাম দিয়ে। খুবই হিট ছবি। সুরকার ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকা প্রদীপকুমার আর বৈজয়ন্তীমালা।

এই ঘটনার কিছুদিন পর যোগাযোগ হল দেবনারায়ণ গুপ্তর সঙ্গে। দেবুদা ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় কাজ করতেন। কলেজ জীবনের শুরুতেই আমার লেখা ছোট গল্প

দেবতা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। 'পলাতকা'-র গান লেখার সময়েই একদিন রঙমহলে ডাকলেন দেবুদা। বললেন, বিখ্যাত গায়িকা এবং অভিনেত্রী রানিবালাকে দিয়ে তোমার গান থিয়েটারে গাওয়াব। তুমি এসো। বাবার মুখে সে যুগের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম শুনতাম। প্রায়ই শুনতাম রানিবালা আর দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। এখনও ছোটবেলাকার কথা মনে পড়ে, দুর্গাবাবু আমাদের বাড়িতে রাতদুপুরে প্রায়ই আসতেন। সেই আশ্চর্য অভিনেতা দুর্গাবাবুর একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা এবার বলি।

২

বাবার কাছে গল্প শুনতাম কিংবদন্তি শিল্পী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাবাকে উনি খুবই ভালবাসতেন, বাবা ওঁকে ডাকতেন 'দুর্গাদা' বলে। বাবার কাছেই শুনেছি একবার কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের নাট্যভারতী থিয়েটারে সম্ভবত দুইপুরুষ নাটকের 'সুশোভন' (দুর্গাদাস) অনুপস্থিত হন। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন অনিবার্য কারণে শিল্পী অনুপস্থিত। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের প্রায় সব দর্শকই হল থেকে বেরিয়ে টিকিট কাউন্টারের সামনে টিকিটের দাম ফেরত নিতে ভিড় করেন। হঠাৎ একটা খোলা ফিটন গাড়ির ওপর কোচম্যানের জায়গায় বসে দুর্গাদাস প্রেক্ষাগৃহের সামনে এসে বলে ওঠেন—শুনুন সবাই, আমি এখানে হাজির, কিন্তু থিয়েটারে ঢুকিনি। কারণ মালিক আমায় এখনও আমার আগের পাওনা মেটায়নি।

এই হলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হুড খোলা টুরার মটোর-এ নাকি চাঁদনি রাতে চন্দননগর যাবার পথে আমাদের বাড়িতে যখন খুশি আসতেন বাবাকে তুলতে। নিজে গাড়ি চালাতেন। বাবা তো ভয়ে জড়সড় হয়ে গাড়িতে বসে 'দুর্গানাম' জপ করতেন। আমরাও দু-একবার সে-গাড়িতে খুব ছোটবেলায় উঠেছি। খুব ভাল ছবি আঁকতেন তিনি। আমার বাবাও শান্তিনিকেতন থেকে ছবি আঁকা শিখেছিলেন।

দুর্গাদাসের উপহার দেওয়া কিছু 'রং' এবং 'তুলি' বাবা আজীবন সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

যা হোক, এই দেবনারায়ণ গুপ্তর নাটক 'জিজাবাঈ'-এ রানিবালার মুখে কলেজ ছাত্র আমার গান খুবই সাড়া তুলেছিল। তারপরই দেবুদা সিনেমায় যোগ দেন এবং ওঁর পরিচালিত প্রায় প্রতিটি ছবিতেই আমাকে দিয়ে গান লেখাতেন। শুধু তাই নয়, রঙমহল ছেড়ে যখন তিনি এদেশে প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থিয়েটার স্টার-এ যোগদান করেন তখনও আমায় ভোলেননি। শৈলেন রায়ের মৃত্যুর পর স্টার-এ তাঁর পরিচালিত সব শেষ নাটকেরও গীতিকার ছিলাম আমি। দেবুদার মিনার্ভা থিয়েটারের কাছের বাড়িতে ওইসময়েই কী একটা ছবির গান লিখতে এসে মাস্টার সুখেনের দেখা পাই। সুখেন তখন 'আশ্রম' থেকে পালিয়ে এসে দেবুদার কাছে বাড়ির ছেলের মতো থাকে। দেবুদা বললেন, অপূর্ব 'ট্যালেন্টেড' কিশোর শিল্পী। যেমন অভিনয় তেমন গানের গলা এবং তেমনই দ্রুত সংলাপ মুখস্থ করার ভগবানদত্ত ক্ষমতা। দেখো পুলক, এ খুব বড় হবে। দেবুদা ওঁর

ছবিতে সুখেনকে দিয়ে গান-ও গাইয়েছিলেন। সেই ওর জন্য প্রথম গান লিখেছিলাম—'ওরে মুটি গয়লানীরে কবে তুই মরবি রে—'

কলেজের ওই থার্ড ইয়ার আমার সংগীতজীবনে খুবই স্মরণীয়। সরোজদার 'কামনা' ছবিতে উত্তমকুমার নায়কের ভূমিকায় ছিল। ছবি চলেনি। 'ওরে যাত্রী'-তেও ছিল তা-ও চলেনি। উত্তম আর আমার ছোট ভাগ্নে আমার বড়দির ছোটছেলে ভবানীপুরের (অধুনা দেনা ব্যাঙ্কের বাড়ির) সুনীল চক্রবর্তী ছিল হরিহর আত্মা। আর হেমন্তদা ছিলেন আমার বড় ভাগ্নে প্রয়াত সুশীল চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ। ওঁরা আমাদের হাওড়ার বাড়িতেও প্রায়ই আসতেন। একদিন ভবানীপুরে বড়দির বাড়িতে গিয়ে দেখি উত্তম বিরস বদনে বসে আছে। আমায় আগে যে-উচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করত তা তো করলই না উপরন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—এই যে মামা, (উত্তম আজীবন আমায় ওই 'মামা' বলেই ডেকেছে) এসো।

বুঝলাম, কিছু একটা হয়েছে। সুনীল বললে, ওর খুবই মন খারাপ। একটা ছবিও চলল না। ও নাকি 'অপয়া'। প্রতিবাদ করলাম, কে বললে? নিউ থিয়েটার্সের 'দৃষ্টিদান' ছবির 'বর' উত্তমকুমার যদি অপয়া হত তা হলে 'দৃষ্টিদান' ফ্লপ করত!

সুনীল হঠাৎ বললে—চলো মামা, মেসোর (সরোজ মুখার্জি) কাছে যাই। ওর নতুন ছবিতে যাতে উত্তম হিরো হয় তুমি আমি দুজনে অনুরোধ করি। তৎক্ষণাৎ আমি উত্তম আর সুনীল তিনজনে চলে গেলাম সরোজদার কাছে। নাছোড় আমাদের অনুরোধে সরোজদা উত্তমকে ওঁর নির্মীয়মাণ 'মর্যাদা' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় স্মৃতিরেখা বিশ্বাসের বিপরীতে নিতে রাজি হল, কিন্তু একটা শর্তে। শর্তটা ছিল উত্তমকুমার স্বনামে অভিনয় করতে পারবে না। নামটা বদলে দিলেন সরোজদাই। করে দিলেন—অরূপকুমার। 'এনি পোর্ট ইন দ্য স্টর্ম'। উত্তম রাজি হল সেই শর্ত মেনে নিতে। সরোজদা গম্ভীর গলায় বললেন, কী করব? আমি সিনেমা হাউস থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে ছবি করি। তারা উত্তম আছে শুনলে কেউ-ই টাকা অগ্রিম দেবে না।

এই 'মর্যাদা'-তে আমার লেখা একটা কোরাস গানে কণ্ঠ দিয়েছিল সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। জিপসি মেয়ে ছবি থেকেই সতীনাথ রামচন্দ্র পালের সহকারী হিসাবে কাজ করছিল। রামবাবু 'মর্যাদা'-তে ওকে গান গাইবার সুযোগ দিলেন। 'মর্যাদা' ছবিতে নায়কের গান ছিল। নায়ক উত্তম-এর গানে কণ্ঠ দিয়েছিল তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই উত্তমকুমারের প্রথম প্লে-ব্যাক শিল্পী। তারপর এম. পি. প্রোডাকসন্সের 'সহযাত্রী' ছবি থেকেই উত্তমের ঠোঁটে কণ্ঠ দিতে শুরু করেন হেমন্তদা।

এরপর আমার স্মরণীয় ছবি 'অনুরাগ'। 'অনুরাগ' স্মরণীয় এই কারণে যে এই ছবিতেই সতীনাথ প্রথম 'ফ্রিলান্স' সংগীত পরিচালনার সুযোগ পায়। কিন্তু নায়কের গান ও নিজে গায়নি। গাইয়েছিল তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েই।

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই সময়েই মুক্তিলাভ করে আমার গানলেখা ছবি তারাশঙ্করের 'না'। এই 'না' ছবিতে প্রথম সুর করেন তখনকার বিখ্যাত গায়ক শচীন গুপ্ত। 'না'র গান খুবই হিট করেছিল। এখনও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ছবির 'তারার চোখে তন্দ্রা এলো চাঁদ ঘুমালো ওই' গেয়ে শোনায় বিভিন্ন স্থানে।

শচীন গুপ্ত সংগীত জগতে এসেছিলেন প্রায় ঝড়ের মতো, চলেও গেলেন সেই ভাবেই। মানুষ বড় নির্মম। কেউ আর মনে করে না ওঁকে। ওঁর গানের কোনও একটা সংকলনও আজ পর্যন্ত বের করেনি রেকর্ড কোম্পানি। অথচ ওঁর গাওয়া 'এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে', 'বন হরিণীর চকিত চপল আঁখি', 'সারারাত জ্বলে সন্ধ্যাপ্রদীপ' প্রভৃতি বহু গান একদিন লোকের মুখে মুখে ফিরত। আমার গান লেখা এরপরের আরও দুটি ছবি 'ঘুম' আর 'প্রশ্ন'-তেও চমৎকার সুর দিয়েছিলেন শচীন গুপ্ত।

চরম নিঃসঙ্গতায় কারও প্রতি কোনও অনুযোগ না রেখে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন শচীন গুপ্ত। আমার কানে আজও বাজে ওঁর আর একটি ভাল গান—'খেলাঘরখানি ভেঙে দিয়ে গেল ঝড়!' আগেই রেডিয়োর বিমান ঘোষের প্রসঙ্গ বলেছি। এই বিমান ঘোষ-ই আমায় সেসময় হঠাৎ ডেকে বললেন তুমি এবারের রেডিয়োর 'দোলের' প্রোগ্রামটা করো। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। বিমানদা আরও বললেন, জানো তো রেডিয়োতে এই সংগীতানুষ্ঠানের মর্যাদা 'মহালয়া'র পরেই। তোমাকে চান্স দিলাম সদ্ব্যবহার করো। আর সুর কে করবে জানো তো? অনুপম ঘটক।

অস্ফুটভাবে বলে ফেললাম—অনুপম ঘটক? যাঁর সুর করা, খুব ছোটবেলায় শোনা—প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি 'শাপমুক্তি'র 'একটি পয়সা দাও গো বাবু'?

বিমানদা উত্তর করলেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ যাঁর সুরে 'তুলসী দাস' ছবি।

তখনও আমার ঘোর কাটেনি। বলে চলেছি—আমি যাঁর 'একলব্য' শিষ্য সেই অজয় ভট্টাচার্যের লেখা—'বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা', যাঁর সুরে সুপারহিট? যাঁর সুরে বড়ুয়া সাহেবের 'উত্তরায়ণ'-এর আমার স্কুল জীবনের সযত্নে রক্ষিত রেকর্ড— 'চৈতালী বনে মহুয়া কাঁদিছে।'

বিমানদাকে বললাম, আপনার মুখ রাখব বিমানদা।

বাড়ি এসেই 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়ে পড়ে লিখে ফেললাম একটা সংগীতালেখ্য। ভুল ত্রুটি আছে কিনা পরখ করার জন্য আমার কলেজের বাংলার প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হাজির হয়ে গেলাম। কনকবাবু মন দিয়ে আমার স্ক্রিপ্টটা পড়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আমায় খুবই উৎসাহ দিলেন।

বিমানদার কাছে এলাম স্ক্রিপ্টটি নিয়ে। বিমানদা একপলক দেখেই বললেন—অ্যাতো বড়? তোমায় তো বললাম আধঘণ্টা সময়।

আমি সবিনয়ে বললাম—পড়ে দেখুন, ধরে ধরে আধঘণ্টা লাগবে।

হেসে উঠলেন বিমানদা: 'রিডিং টাইম' আর 'ব্রডকাস্টিং টাইম' সমান হয় নাকি? এমনভাবে করো যাতে গাওয়া গান আর ন্যারেশ্যান-এর টাইম হয় আধঘণ্টার মধ্যে। এরপর আবার বাকি রাখতে হবে ক্রেডিট টাইটেল অর্থাৎ তোমাদের নাম শোনানোর জন্য চল্লিশ সেকেন্ড সময়।

বিমানদা তাঁর কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও আমায় সময় দিয়েছিলেন। ওঁর টেবিলে বসেই শুরু করলাম এডিটিং-এর কাজ।

রেডিয়োর ওই অনুষ্ঠানেই কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয় অনুপমদার সঙ্গে। তখন অনুপমদার পরপর আধুনিক গান হিট করছে। নন-ফিল্ম অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিক গানের বুভুক্ষু

আমি। কিছু আধুনিক গান ওঁকে দিয়ে রেকর্ড করাবার অনুরোধ জানালাম।

অনুপমদা খুবই গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

আমার দিকে একটু তাকিয়ে উত্তর করলেন, লাফ দিয়ে যখন পড়েছেন, দেখবেন, তখন অবস্থিতির জায়গা একটা মিলবেই।

কিছুদিন পরেই শচীন গুপ্তের ছাত্র ও সহকারী নিখিল চট্টোপাধ্যায় (চিত্র পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের দাদা) আমায় ডাকলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলের বিখ্যাত হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানিতে। ওখানে গিয়ে দেখি যামিনীদা (হিন্দুস্থানের সর্বাধ্যক্ষ যামিনী মতিলাল) আমার জন্য অপেক্ষমাণ। আমায় দেখেই বললেন—যাও, যাও স্টুডিয়োতে যাও। অনুপম তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। গানের কী কী সব কথা বদলাতে হবে।

সুরকার ও শিল্পী নিখিল চট্টোপাধ্যায়কে আমি তখন প্রায়ই গান দিতাম। বিভিন্ন বেতার শিল্পীরা নিখিলবাবুর কাছ থেকে সে-সব গান তুলে রেডিয়োতে নিয়মিত গাইত। ওঁকে আমার কিছু শ্যামা সংগীতও দেওয়া ছিল। তার থেকেই দুটো গান পছন্দ হয়েছে অনুপমদার, গাইছেন নিখিল চট্টোপাধ্যায়। সুরের সাবলীল ছন্দের খাতিরে দুটো কথার পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল, করে দিলাম। ওই হিন্দুস্থান স্টুডিয়োতেই রেকর্ড হল আমার প্রথম নন-ফিল্মি দুটো গান, অনুপম ঘটকের সুরে—প্রথমটি 'এবার আমি মা চিনেছি', অন্যটি 'মন্ত্রতন্ত্র নেই মা জানা/নেই মা জানা আচার বিচার।' আমার সংগীত জগতের এই বিশেষ বিভাগে প্রবেশ ঘটল মায়ের গান দিয়ে মাকে প্রণাম করে—মায়ের আশিস নিয়ে। তার জন্যই হয়তো পরবর্তীকালে মান্না দে-র জন্য মাকে নিয়ে এত গান লিখতে পেরেছি।

আমার গান দিয়ে অনেক শিল্পী, অনেক সুরকারই সংগীত জগতে প্রথম পদক্ষেপ করেছে। এটা আমি বারবার বিস্ময়করভাবে উপলব্ধি করেছি। ভি. বালসারার সুরের প্রথম বাংলা ছবি 'রাতের অন্ধকারে'। এতে গান লিখেছিলাম আমি। এই ছবিতে মুম্বই-এর হেলেনের একটা অপূর্ব নাচের আইটেম ছিল।

গানটির মূল 'বেস'টাকে বাংলায় লিখে বিভিন্ন অংশ লিখেছিলাম বিভিন্ন ভাষায়। হেলেন বিভিন্ন সাজে সেজে গানের বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে নেচে-নেচে হাজির হয়েছিলেন। এটাও আমার একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে চিনের জুতোর দোকানের এক দোকানদারকে বললাম—সাহেব, বলো তো 'আই লভ ইউ'টা চিনে ভাষায় কী হবে? সাহেব সোনা বাঁধানো একটা দাঁত দেখিয়ে ঝিলিক দিয়ে হেসে উত্তর করলেন—সিন আই দ উ আই নি।

চমৎকার ছন্দ পেলাম। স্থির করে ফেললাম গানটি চিনে ভাষা দিয়েই প্রথমে শুরু করব। লিখলাম 'সিন্ আই দ্যা/উ আই নি/চিনে ভাষা জানো কী?/শোনো তবে ইংরাজিতে তোমায় বলেছি/ও মাই ডার্লিং আই লভ দি।'

চমৎকার সুর করে ফেললেন বালসারা। সবাই শুনে বলল, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু গাইবে কে?

বালসারা সাহেব তাঁর স্বভাবপ্রসিদ্ধ ভঙ্গিতে দাঁত দিয়ে হাতের নোখ কাটতে কাটতে বললেন—'আশা ভোঁসলে হলে চলবে? আমি ওঁকে কলকাতায় নিয়ে আসতে পারি, ওঁর

সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভাল।' তা-ই ঠিক হল। এই 'আইটেম' সংগীতটি এবং আর একটি রোমান্টিক গান গাওয়ার জন্য বালসারা সাহেব রাজি করিয়ে ফেললেন আশা ভোঁসলেকে কলকাতায় এসে গেয়ে যাবার জন্য।

তক্ষুনি আমার মাথায় হঠাৎ ঝলসে উঠল একটা দুর্ভাবনা। বন্ধুবর প্রয়াত মানিক দত্ত (জীবানন্দ দত্ত, চিত্রাভিনেত্রী অনীতা গুহের স্বামী) আমাকে একবার দারুণ ঠকিয়ে ছিল। ওর এক আত্মীয়ের বাড়িতে একবার আমায় ডেকেছিল। ওখানে ওই আত্মীয়টির শ্বেতাঙ্গি বিদেশিনী পত্নীকে 'হ্যালো, হাউ ডু ইয়ু ডু'র মানে বলে, একটা চলতি অশ্লীল বাংলা কথা মুখস্থ করিয়েছিল।

ভদ্রমহিলা তো বাংলা জানেন না। মনে করেছিলেন এই বাংলা কথাটাই বাঙালিরা প্রথম আলাপে বলে। বাংলা বলে, আমাকে চমকে দেবার জন্য যেই আমার সঙ্গে আলাপ করলেন, প্রয়োগ করে ফেললেন সেই কথাগুলো। এক বিদেশিনীর মুখে পরিষ্কার বাংলায় সেকথা শুনে আমি দরদর করে ঘামতে লাগলাম। আর ঘরের বাঙালি মেয়েরা কানে আঙুল দিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। হেসে লুটিয়ে পড়ল মানিক দত্ত আর অন্য পুরুষেরা।

ভয় হল। চিনে সাহেব-ও যদি সেরকম কিছু করেন? আমি তো চিনা ভাষার কিছুই জানি না।

আবার বেন্টিক স্ট্রিট। আবার জুতোর দোকান। এবার অবশ্যই অন্য দোকান। দোকানদার এক চিনা সাহেবকে সরাসরি বললাম—বলো তো সাহেব, 'সিন আই দ্য উ আই নি'র মানে কী?

সাহেব পাশে উপবিষ্টা এক যুবতী চিনা মহিলার দিকে তাকালেন। মহিলাও তাঁর ছোট ছোট চোখ দুটি কুঁচকে ফর্সা গালে একটু টোল ফেলবার চেষ্টা করে এক চিলতে হাসলেন। বুঝলাম গানটায় ভুল নেই। তবু সাহেবকে আমার গানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বললাম—আপনি ইংরেজিতে বলুন এই কথাটা।

চিনা সাহেব এবার রীতিমতো চিনাবাজারি ইংরেজিতেই সেটা অনুবাদ করে শোনালেন। যাক, নিশ্চিন্তমনে বাড়ি ফিরলাম। আশা ভোঁসলে কলকাতায় প্রথম এলেন সঙ্গে তাঁর প্রথম স্বামী মিস্টার ভোঁসলেকে নিয়ে। ভদ্রলোক সদালাপী মিশুকে ছিলেন। ওঁরা দুজনেই মারাঠি। বম্বে থেকেই জানতেন কলকাতার 'মহারাষ্ট্র নিবাস'-এর নাম। ওঁদের কথামতোই ওঁদের নিয়ে যাওয়া হল হাজরা রোডের ওই নিবাসে। কিন্তু আশাজির ওটা পছন্দ হল না। ওঁদের তোলা হল সম্ভবত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে।

পরদিন দুপুরে বালসারাজির কাছে গান শিখলেন আশাজি। আমাকে বাংলা উচ্চারণ শেখাতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হল। তখন মোটেই বাংলা জানতেন না আশা। ভরসন্ধেয় পরিশ্রান্ত আমরা আশাজিরই কথামতো চৌরঙ্গিতে হেঁটে বেড়ালাম। তখন পত্র-পত্রিকায় প্লে-ব্যাক আর্টিস্টের এত ছবি বের হত না। টিভির নাম তো কেউ শোনেইনি। তাই কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। আমরা স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। সুধীন দাশগুপ্ত তখন গুরু দত্তের ছবি করার জন্য দীর্ঘদিন মুম্বইতে রয়েছেন। আশা ভোঁসলে হোটেলে ফিরেই আমায় বললেন—সুধীন দাশগুপ্ত কেমন সুর

করেন?

বললাম, চমৎকার! আমার খুবই পরিচিত বন্ধু।

উনি বললেন—সুধীনবাবু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ওঁর সুরে বোধহয় আমি বম্বেতে ফিরে গিয়েই এবার বাংলা আধুনিক গান গাইব।

সুতরাং আশা ভোঁসলের জীবনে প্রথম বাংলা গান, ছবিতে। যার সৌভাগ্যবান গীতিকার আমি। সুরকার ভি. বালসারা। এবং আধুনিক গান সুধীন দাশগুপ্তের কথায় ও সুরে। 'নাচ ময়ুরী নাচ রে' ও 'আকাশে আজ রঙের মেলা'। আশাজির প্রথম বাংলা গান আর. ডি. বর্মণের বলে আজকালকার পত্রপত্রিকায় যেসব লেখা বের হচ্ছে, সে-তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। এরপর আশাজি এইচ. এম. ভি-তেই বিনোদ চট্টোপাধ্যায়ের সুরে পবিত্র মিত্রের কথায় পর পর দুটি আধুনিক গানের রেকর্ড করেন। মান্না দের সুরে আমার লেখা দুটি গান (১) 'যখন আকাশটা কালো হয় বাতাস নীরব থাকে' (২) 'আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম একটি তোমার সই গো'। তারপর করেন পঞ্চমের সুরে বাংলা আধুনিক গান।

একটা কথা উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন। আশা ভোঁসলের 'রাতের অন্ধকারে'র প্রথম বাংলা গান রেকর্ড করেন সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর ভ্যান গাড়িতে বসে রেকর্ড করা সে গান কত সুন্দর হয়েছিল। ওই ছবিতেই হেমন্তদারও গান ছিল। কী চমৎকার হেমন্তদার গলা এনেছিলেন সত্যেনবাবু। আর আজকের টেকনিসিয়ান্স স্টুডিয়ো? থাক সে-কথা।

ভি. বালসারার মতো এত রকম বাদ্যযন্ত্রের এত পারদর্শী বাজনদার বোধহয় এদেশে আসেননি। বালসারা মুম্বাই-এর একজন ডাকসাইটে বাজিয়ে ছিলেন। হঠাৎ অনিবার্য কারণে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তাঁর বাজানো 'আওয়ারা হুঁ'র পর ওই বাদ্যযন্ত্রের 'ওঁয়া' আওয়াজটি তখনও 'আওয়ারা হুঁ'র সঙ্গে জোড় বেঁধে পথে ঘাটে ঘুরত। আমরা জানলাম এটি ওঁরই আঙুলের অপূর্ব কৃতিত্বের সুফল।

বালসারাজি কলকাতায় এসেই রবীন্দ্রসংগীতের সুরে ওঁর ঝুলি ভরে নিলেন। অসাধারণ মেধায় পরিষ্কার বাংলা বলতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, পরিষ্কার হাতের লেখায় আমাকে বাংলায় চিঠিও লিখে ফেলেছিলেন।

ওঁর সুরে পরে অনেক বাংলা ছবিতেই আমি গান লিখেছি। লিখেছি অনেক সুপারহিট গানও। বাংলায় প্রথম 'পপ' গান ওঁরই সুর আর আমার লেখা। গেয়েছিল রানু। (রানু মুখোপাধ্যায়) কনি ফ্র্যান্সিসের তখনকার গান ও খুবই ভাল গাইত। একদিন হেমন্তদার বাড়িতে শুনে আমরা দুজনেই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

যখন এইচ. এম. ভি-র তখনকার অধিকর্তা এ. সি. সেন আমাদের বাংলা 'পপ' গান বানানোর আহ্বান জানালেন, বালসারাজি তখনই বললেন রানুর নাম। আমি সর্বান্তঃকরণে সে প্রস্তাব সমর্থন করলাম। এই এ. সি. সেনের কাছেই আমি শুনেছিলাম পার্ক স্ট্রিটের ট্রিংকাজ রেস্টুরেন্টের সিঙ্গার উষা উত্থুপের ইংরিজি গান। এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে সে গান ইন্টারন্যাশনাল হিটও হয়েছিল। ওর গান শুনলেও ওকে দিয়ে বাংলা গান গাওয়ানোর সদিচ্ছা তখনও আমার আসেনি। অবশ্য পরে এই উষাই প্রথম বাংলা গানের

রেকর্ড করেছিল আমারই কথায়, এই এইচ. এম. ভি-তেই। সেই গানের শুরু 'মন কৃষ্ণ বলে' নিয়ে পরের বছর ক্যালেন্ডার-ও বেরিয়েছিল।

সেদিন এ. সি. সেনের কাছ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেই চিন্তা হল কী নিয়ে লিখব? আমার গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমিই। বাড়ির গেটের কাছেই প্রাণপণে ব্রেক কষতে হল। একটা কুকুর বাচ্চা! আর একটু হলেই চাপা দিতাম। গ্যারেজে গাড়িটা তুলে রেখে ওপরে উঠতে উঠতে মনে পড়ল আমাদের একটা পোষা কুকুর হঠাৎ বাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় বেরুতেই গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। সারারাত তার দুঃখে আমি জেগে কাটিয়েছিলাম।

পরদিন বালসারাজি ফোন করে আমায় বললেন—আমার একটা আইডিয়া মাথায় আসছে। জুনিয়ার স্টেটসম্যানে প্রকাশিত একটা ঘটনা উনি শোনালেন। ওটা আমারও পড়া ছিল।

উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেছিলাম—এ একদম টেলিপ্যাথি। এ বিষয়টা আমিও ভাবছিলাম।

লিখে ফেললাম—'বুসি বল্ বুসি বল্ তুমি যে আমার' ওর অপর পিঠে লিখলাম আমার এক আত্মীয়র সঙ্গে পর পর দু বছর পুরী বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা। ওর মেয়ের সঙ্গে তার মায়ের দু বছরের বিভিন্ন আচরণ! একটি বছর কাটলো/সমুদ্র ফের ডাকলো/আমি আবার এলাম পুরীর সী বিচে।

এইচ. এম. ভি. কর্তৃপক্ষ গান দুটো শুনলেন। পরের গানটির খুবই তারিফ করলেন কিন্তু প্রথম গানটিতে ভুরু কুঁচকোলেন। পোষা কুকুর চাপা পড়া নিয়ে এ আবার কী গান?

কিন্তু আমরা অনড় ছিলাম।

অগত্যা ওই দুটি গানই প্রকাশিত হয়ে সুপারহিট হয়ে গেল।

পরের বছর রানুই বললে—আমি 'জর্জি গার্ল' আর কনি ফ্র্যান্সিসের 'সামার ওয়াইনের' বাংলা গাইব। আপনি সোজাসুজি 'ভার্সান' বানিয়ে দিন।

বললাম—ও গান দুটো আমি শুনেছি। ওর পুরো ভার্সান বানালে সেটা রক্ষণশীল বাঙালির মনঃপূত হবে না। আমি ওই গানদুটো হুবহু সুরের 'মিটারে' আমার মৌলিক চিন্তায় দুটো নতুন বাংলা গান লিখে দিই।

সেইমতো দুটো গান রেকর্ড করল রানু। (১) 'একা আমি যাই', (২) 'যখনি বেড়াই আমি পাইন বনে।' রানু অপূর্ব গাইল গানদুটো। হেমন্তদা পর্যন্ত প্রশংসা করে ফেললেন। আমরা তো মুগ্ধ।

রেকর্ডিং-এর পরই বালসারাজি এইচ. এম. ভি-কে বললেন—রেকর্ডে কিন্তু সুরকার হিসেবে আমার নাম দেবেন না। আমার যখন সুর-ই নয় তখন আমার নাম কেন দেবেন?

এইচ. এম. ভি. বলল—তা হলে হেমন্তদার নাম থাক!

রাজি হলেন না হেমন্তদাও। যথাসময়ে রেকর্ডটা বের হল সুরশিল্পীর নামহীন হয়ে শুধু গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বুকে করেই। আমার অন্য সব রেকর্ডের মতোই এটাই একটা এদেশে সর্বকালীন রেকর্ড।

কিন্তু ভাবতে পারিনি সেই রেকর্ডের কী সাংঘাতিক পরিণাম।

৩

একদিন দুপুরে বাড়িতে বসে লেখার কাজ করছি টেলিফোন বাজল। এইচ. এম. ভি.-র এ. সি. সেনের গলা: তুমি আজ এখনি আমাদের ডালহৌসির অফিসে এসো। খুব দরকার। টেলিফোনটা কেটে দিলেন এ. সি. সেন। এ ধরনের কণ্ঠস্বর কখনও শুনিনি। যথাসময়ে গেলাম। আমায় দেখেই মিস্টার সেন ফাইল থেকে মুখ তুলে বললেন, তুমি তো আইন পড়েছ, এটুকু জানতে না?

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে।

উনি বললেন, যে-সব গান—ই. এম. আই. গ্রুপের নয় তা ব্যবহারের এক্তিয়ার এইচ. এম. ভি.-র নেই। তুমি অপরের সম্পদ পুরোপুরি নিয়ে নিলে?

আমতা আমতা করে বললাম—কিছুই বুঝছি না।

উনি বলে চললেন—নাও ঠ্যালা সামলাও। রানুর যে রেকর্ড করেছ তা হুবহু কপি করলে কেন? তালের চারটে 'বারের' পর সুরটা একটু বদলে দিতে পারলে না?

এবার পরিষ্কার হল ব্যাপারটা। বুক ফুলিয়ে বললাম—শুনে দেখুন। ওদের গানের কথা আর আমার গানের কথায় একবর্ণও মিল নেই। সম্পূর্ণ 'ওরিজিন্যাল'। আমি ট্র্যানস্লেট করিনি।

এবার ধমক দিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ সেন সাহেব: তুমি থামো। রেকর্ডে শুধু তোমার নাম আছে। অর্থাৎ 'কম্পোজার' তুমিই, আর কেউ নয়। ওদের কপিরাইট অ্যাক্টে কথা ব্যবহার করা যেমন অপরাধ, সুর ব্যবহার করাও তাই। 'কম্পোজিশন' মানে কথা ও সুর দুই-ই! সুরটা যদি একটু বদলে দিতে কোনও ঝামেলাই থাকত না। এবার কষো ওদের দাবি করা ডলারের হিসেব।

শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে গদি-মোড়া চেয়ারে বসে দর দর করে ঘামতে লাগলাম। মুখে কোনও কথাই এল না।

এবার একটু হেসে আমার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন। সই করো।

পড়তে যাচ্ছিলাম কাগজটা। আবার ধমক খেলাম। শুনলাম: আর বিদ্যে জাহির করতে পড়ে দেখতে হবে না—সই করে দাও।

সই করে দিলাম কাগজটায়।

উনি বললেন—আমি 'করেসপন্ডেন্স' করে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমার রয়্যালটির ফিফ্‌টি পার্সেন্ট ওদের দিয়ে দিতে হবে। তা হলেই তুমি ফ্রি।

মুক্তির যে কী আনন্দ সেদিন ওখানে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করেছিলাম। যাকগে, ফিফটি পার্সেন্ট রয়্যালটি দিয়ে আমি তো স্বাধীন—আমি তো মুক্ত!

ওই রেকর্ডটি প্রচুর বিক্রি হয়েছিল। তখনই একদিন মাথায় এল এরপরে রানু আর হেমন্তদাকে নিয়ে গান বানাব। আমার সারাজীবনই যেই কথা সেই কাজ। লিখে ফেললাম, 'বাবা-মেয়ের গান'। 'আয় খুকু আয়!' বাংলা গানে একটা সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন।

হেমন্তদাকে দেখালাম গানটি। উনি বললেন—অপূর্ব লিখেছ। কিন্তু রানু এ গান

গাইবে না। আমায় ও ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে ও নাকি স্ট্যাম্পড হয়ে যাচ্ছে 'পপ সিঙ্গার' বলে। ও তাই ক্ল্যাসিকাল গান শিখছে। এবার অন্য ধরনের গান গাইবে ও। তবে আমার নিজের দারুণ ভাল লেগেছে গানটা, তুমি যার সঙ্গে বলবে, আমি তার সঙ্গেই গাইব।

বললাম—বাবা-মেয়ের গান—আপনি রানু গাইলে ব্যাপারটা আপনা থেকেই যতটা এগিয়ে থাকবে অন্য কেউ গাইলে ততটা হবে কী?

হেমন্তদা উত্তর করলেন: সে তোমার ব্যাপার। যা ভাল বোঝো, করো।

গানটা বালসারাজিকে দেওয়া ছিল। চমৎকার সুর করে রেখেছিলেন উনি। কিন্তু পড়েই রইল গানটা।

অনেক পরে যখন শ্রাবন্তী মজুমদারের এ ধরনের গানে একটু নাম হয়েছে, তখন বালসারাজি বললেন—পুলকদা, (উনি বয়সে আমার থেকে বড় হলেও চিরদিন দাদা বলেই ডেকেছেন বলেছেন, এ এক ধরনের আদর) হেমন্তদা আর শ্রাবন্তীকে দিয়ে গানটা করাই।

গানটার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বালসারাজি মনে করিয়ে দিতেই বললাম—খুব ভাল হবে।

সময়ের সঙ্গে ঠিক পরম্পরা রাখতে পারছি না। এগিয়ে এসেছি অনেকটা। এবার ফিরে যাই।

আগেই বলেছি আধুনিক গানের জগতে ঢুকতে আমাকে যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা বলে বোঝানো যাবে না।

আমি যখন সেই বন্ধ দরজায় করাঘাত করছি তখন এইচ. এম. ভি.-র প্রায় সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন পি. কে. সেন আর তাঁকে বাংলা গানের সব কিছু পরিচালনা করতে সাহায্য করতেন গীতিকার পবিত্র মিত্র—উনি এইচ. এম. ভি.-তেই শেষজীবন পর্যন্ত চাকরি করে গেছেন।

চিত্রজগতে তখন আমার অনেক গান চালু। প্রায় প্রতিটি কণ্ঠশিল্পী প্রতিটি সুরশিল্পী-ই আমাকে চেনেন। কিন্তু কেউই কিছু তখন আমার জন্য করেননি।

পবিত্র মিত্র-র কাছে প্রায়ই যেতাম। উনি পাত্তাই দিতেন না। তবু হাল ছাড়িনি। আবার গেছি। একদিন বললেন, আমাদের শনিবারের দুপুরের আড্ডায় আসবেন।

আড্ডার এই টিকিট প্রাপ্তিটা কাজে লাগল।

আমার সহপাঠী অজয়ের বড়দা অনল চট্টোপাধ্যায়। উনি আমাদের বাড়ির পাশেই থাকেন। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ হত। উনি তখন গান লিখতেন, সুর-ও করতেন। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই—ওঁর গান লেখা আমার তেমন ভাল লাগত না।

সুরগুলো লাগত দারুণ। প্রায়ই বলতাম—অনলদা, আপনি গান লেখা ছেড়ে দিন। সুর করা নিয়েই থাকুন।

অনলদা বলতেন, কিন্তু এইচ. এম. ভি. যে আমার লেখাই রেকর্ড করে, সুর তো রেকর্ড করতেই চায় না।

তখন অনলদা আমার অনেক গান সুর করেছিলেন। কিন্তু বেতারে ছাড়া একটা গানও

কোথাও কাজে লাগাতে পারেননি। আমার অবস্থা বুঝে হঠাৎ একদিন বললেন—পুলক, আমি পারব না। তবে অভিজিৎকে বলেছি। ও চেষ্টা করবে বলেছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে চিনতাম কিন্তু তখনও কোনও গান লিখিনি।

অনলদা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন অভিজিতের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে।

কথায় কথায় অভিজিতের সঙ্গে আত্মীয়তাও বেরিয়ে গেল। বয়সেও জানলাম আমরা প্রায় সমান-সমান। যা হোক, অভিজিৎই পবিত্রদাকে শোনালেন আমার লেখা রেকর্ড হতে যাওয়া প্রথম আধুনিক গান। অভিজিৎবাবু পবিত্রদাকে জোর গলায় বলেছিলেন—আপনি বলুন পবিত্রদা, এ গানটা কীসে খারাপ? কেন আপনি রেকর্ড করবেন না?

এবার বোধহয় আমার প্রতি একরকম করুণা করেই পবিত্রদা গ্রহণ করলেন সেটা।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেন সে গান—'তোমার দু' চোখে আমার স্বপ্ন আঁকা'। দারুণ হিট।

এ-ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে আমাদের পাড়ার পারিজাত সিনেমার মালিক মুণ্ডিভাই ছবি করতে এলেন। ছবির নাম অসমাপ্ত। অসমাপ্তে পাঁচজন গীতিকার, পাঁচজন মিউজিক ডিরেক্টর। শেষজনটি অর্থাৎ ভূপেন হাজারিকার নামের প্রস্তাব করলাম আমি-ই। ভূপেনবাবুর গান তখন কোথায় যেন শুনেছিলাম। দারুণ নতুনত্ব লেগেছিল। অলকা সিনেমার রমেন মুখার্জি (রামু) তৎক্ষণাৎ তাকে সমর্থন করল।

গৌহাটিতে খবর পাঠানো হল ভূপেন হাজারিকাকে। ভূপেনবাবু তখন পত্নী প্রিয়ম হাজারিকাকে নিয়ে এলেন। ওঁর তখন কলকাতায় কোনও আস্তানা নেই। ওঁরা রইলেন পারিজাত সিনেমার-ই লিলুয়ার চমৎকার বাগানবাড়িতে। প্রায়ই দেখাশোনা হত। শুনতাম না-শোনা অনেক অসমিয়া গান।

ভূপেনবাবুর সুরে অসমাপ্ত ছবিতে সতীনাথের গাওয়া আমার লেখা যে গানটি বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেটি ছিল—'কন্যা তোমার কাজল ধুলো কী সে?/কোন্ বেহায়া খোঁপা খুলে/কুসুম দিল এলো চুলে/লাল হলো গাল ছাঁচি পানের কোন রাঙা রস মিশে?'

মনে আছে 'অসমাপ্ত'-এর কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য আমায় সিচুয়েশন বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন—লেখো, 'অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে'—এই ভাবটা নিয়ে। পল্লীগীতির স্টাইলে সেই ভাবটা প্রকাশ করেছিলাম অসমাপ্তের ওই গানটিতে।

৪

তখন বাংলা আধুনিক গান খুবই জনপ্রিয় ছিল। টিভি তো আসেনি। রেডিয়োই ছিল বাংলা গান শোনার একমাত্র মাধ্যম। কণ্ঠশিল্পীরা কেউ কেউ রেডিয়োতে মাসে দুবার করেও প্রোগ্রাম করতেন। বেতারে যে গানটা বোঝা যেত শ্রোতারা খুবই পছন্দ করলেন সেই গানটাই সাধারণত রেকর্ড করা হত।

আর ছিল শনিবার আর রবিবারের দুপুরের রেকর্ড শোনার অনুরোধের আসর। বাছাই করা জনপ্রিয় গানই ওখানে নিয়মিত বাজানো হত। কালক্রমে এই বিখ্যাত আসরটাই

রেডিয়ো কর্তৃপক্ষ নষ্ট করে ফেললেন। বিভাগীয় অধিকর্তাদের কাছের মানুষ অর্থাৎ স্বজন পোষণে। প্রকৃত সুরসমৃদ্ধ শিল্পী ছাড়া কারও গানই যে আসরে পরিবেশন করা হত না—সে আসরে ঢুকে পড়ল বেনোজল। এই সব তথাকথিত গলা কাঁপানো নিজের টাকায় রেকর্ড করা শিল্পীরা মুঠো মুঠো বেনামি চিঠি ছাড়তে লাগলেন—ওঁদের নিচুমানের গান পরিবেশন করার অনুরোধ জানিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে তাই বাধ্য হয়েও ওঁদের গান বাজানো হতে লাগল। শ্রোতারা কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। আরও কিছু রেকর্ড কোম্পানি থাকলেও প্রায় মনোপলিই ছিল এইচ. এম. ভি.-র কারণ রেকর্ড ছাপাবার মেশিন আর কারও ছিল না। ওঁদের এইচ. এম. ভি.-কে তুষ্ট করেই চলতে হত।

এই এইচ. এম. ভি-র পি সি সেন আর পবিত্র মিত্রর অঙ্গুলি হেলনেই নির্ভর করত প্রায় সমস্ত কণ্ঠশিল্পীর ভাগ্য। ওঁরা সুরকারদের কাছে গান শুনতেন। যে-গানটা ওঁদের পছন্দ হত সেই গানটাই ওঁদের পছন্দমতো শিল্পীকে দিয়েই রেকর্ড করাতেন। নবাগত বা নবাগতা শিল্পীদেরও ওঁরাই নির্বাচন করতেন।

কড়ি ও কোমলের গান শুনে ভূপেন হাজারিকাকে পি. কে. সেন, এইচ. এম. ভি.-তে আহ্বান জানালেন। তখন বাংলা গানে অনেক অনেক গীতিকারের নক্ষত্রের মেলা। ভূপেনবাবু কিন্তু আমাকে ডাকলেন এবং আমায় শোনালেন ওঁর একটি অসমিয়া গান—'ভাঙ ভাঙ ভাঙ ঘটা ভাঙ'। আমি ওই সুরের ওপর লিখলাম—শ্যামল মিত্রের জন্য 'চৈতালী চাঁদ যাক্ যাক্ ডুবে যাক্।' এর পরই করলাম আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারাদের চুম্‌কি জ্বলে আকাশে।' এমনি অনেক গান।

তখনই ভূপেনবাবু হেমন্তদার ছবি 'নীল আকাশের নীচে' চিত্রপরিচালনা করার ভার নিয়েছিলেন। ছবির নায়ক তখন নির্বাচিত ছিল উত্তমকুমার। যদিও পরে পরিচালনা করেছিলেন মৃণাল সেন ও নায়ক ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। মহরত হয়েছিল। মহরতে ক্ল্যাপস্টিক দিতে লতাজি কলকাতায় এলেন। আমরা দমদমে ওঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হলাম। পি কে সেন পবিত্র মিত্রও ছিলেন।

এয়ারপোর্টেই লতাজি আমাকে এক ফাঁকে বললেন—আমি আমার জীবনের পুজোর প্রথম বাংলা গান রেকর্ড করে যাব। আপনার 'কড়ি ও কোমল' আমার খুবই ভাল লেগেছে। ভূপেনদাকে দুটো গান দিন। লতাজির সঙ্গে অনেকেই আলাপচারী করছিলেন। উনি প্রত্যেককেই বলছিলেন কাল মহরত, পরশু সকালেই ফিরে যাব বোম্বাই। আমায় বললেন বাংলা গান রেকর্ড করে যাবেন। তা হলে রেকর্ড করবেন কবে? মনকে বোঝালাম বিখ্যাতরা এমন অনেক কথাই বলেন, এ হল কথার কথা।

পর দিন মহরতের এক ফাঁকে লতাজি বললেন, সবাই জানে আমি গ্র্যান্ডে আছি, কিন্তু আছি, ভূপেনদার টালিগঞ্জের গলফ ক্লাবের ফ্ল্যাটে। ওখানে কাল সকালেই চলে আসুন।

ডুবে যাওয়া চাঁদটা আবার হাতের মুঠোয় পেলাম। টালিগঞ্জে আসতেই লতাজি হাসতে হাসতে বলে ফেললেন—পি. কে. সেন ওঁর সাকরেদ পবিত্রবাবুর গান চাইছিলেন। আমি আর ভূপেনদা দুজনেই বলেছি আপনার নাম।

বললাম—কিন্তু রেকর্ড করবেন কবে? আজই তো ফিরে যাবেন। উনি বললেন—

না, না সবাইকে বলেছি আজকে ফিরে যাবার কথা। আসলে আমি যাচ্ছি না। অমুক তারিখে রেকর্ডটা করে ফিরব। আমি থাকছি জানলে এখানের সব মিউজিক ডিরেক্টর, সব রাইটার-ই আমায় গান করার জন্য ধরবেন, আমি কাকে ফেরাব বলুন তো?

এবার মুখোমুখি হলাম আর একটা সঙ্কটের। ভূপেনবাবু আমায় বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললেন—কিন্তু রেডি গান কোথায়? নতুন গান সুর করার আমার সময় নেই এখন।

বললাম—একটা গান তো আমাদের আছে। 'মনে রেখো ওগো আধো চাঁদ।'

বললেন—ওটা আপনার লেখার ওপর সুর করেছিলাম। একটুও মনে নেই। এখনই একটু যে বসব তারও উপায় নেই। হারমোনিয়ামটা সারাতে দিয়েছি এখনও দিয়ে গেল না।

ভূপেনবাবুকে ধরে নিয়ে গেলাম আমার বড়দির ভবানীপুরের বাড়িতে। ও বাড়িরই উঠোনে উত্তম ব্যাডমিন্টন খেলত। আমরা ক্লাব করেছিলাম মরশুমী ক্লাব। ভূপেনবাবুও এখানে যোগ দিয়েছিলেন। আমার বড় ভাগ্নে—আমার থেকে বয়সে বেশ বড়—সুশীল চক্রবর্তীর বন্ধু ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হেমন্তদা, সুধীরলাল চক্রবর্তী প্রমুখ। ওর একটা চমৎকার হারমোনিয়াম ছিল। হেমন্তদা এই হারমোনিয়ম বাজিয়ে বহু জনপ্রিয় গান ওই বাড়িতে বসে সৃষ্টি করে গেছেন।

ভূপেনবাবু 'মনে রেখো ওগো আধো চাঁদ' গানটা আবার নতুন করে সুর করে ফেলেই বললেন, অসম্ভব। আর সময় নেই। রেকর্ডিং ক্যানসেল করে দিতে হবে। আমার জনতা পিকচার্সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ওখান থেকে বেরিয়ে চাংওয়া রেস্টুরেন্টে খেয়ে আমি আর একটা কাজে যাব।

বাধা দিলাম না ওঁকে। দুজনে একসঙ্গে চৌরঙ্গিতে নামলাম। উনি চলে গেলেন জনতায়। আমি কিছুক্ষণ চৌরঙ্গি অঞ্চলে ঘুরে ফিরে পায়ে পায়ে হাজির হলাম চাংওয়াতেই। ধরে ফেললাম ভূপেনবাবুকে একটা কেবিনে। ভূপেনবাবু প্রথমটা চমকে গেলেও আমাকে হাসিমুখে ওখানে বসালেন। আমার জন্য খাবারও বললেন।

আমার উদ্দেশ্য কিন্তু খাওয়া নয়—আমার উদ্দেশ্য আর একটা গান লেখা। ভূপেনবাবুর আর একটা গান ওঁর মুখে প্রায়ই শুনতাম। ভারী ভাল লাগত। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল গানটা। 'পরহু পুয়াতে তুলো না'। মনে হল, এই সুরের ওপর আমি এখনি একটা গান লিখতে পারব, লতাজি গাইলে দুর্দান্ত হবে।

কলম সঙ্গে ছিল, কিন্তু কাগজ কোথায়? খাবার বিলের ওপরই লিখে ফেললাম—রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে। এবার ভূপেনবাবু অন্য সত্তায় চলে গেলেন। কেবিনের মধ্যেই গাইতে লাগলেন। ওই চাংওয়াতেই জন্ম হল লতা মঙ্গেশকরের পুজোর প্রথম বাংলা গান।

স্বভাবতই পর পর কিছু গান 'হিট' হওয়াতে আধুনিক গানের বন্ধ দরজাটা হাট করে খুলে গেল।

পূর্ণ সিনেমার পাশে সান্তুদার বাড়িতে একদিন হেমন্তদাকে নিরিবিলিতে পেয়ে বলে ফেললাম—লতাজি আমার গান করলেন অথচ আপনি আজ পর্যন্ত আমার একটাও নন্-ফিল্ম গান করলেন না?

হেমন্তদা বললেন—গান কই? দেখাও?

জামার পকেটে তখন সব সময়েই দু-চারটে গান থাকতই। বার করলাম। উনি বললেন—পড়ে শোনাও।

প্রথম গানটিই পড়লাম—'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না/ও বাতাস আঁখি মেলো না/আমার প্রিয়া লজ্জা পেতে পারে/আহা, কাছে এসেও ফিরে যেতে পারে।'

হেমন্তদার তখন প্রতিটি মুহূর্ত দামি। ওইটুকু শুনেই বলে উঠলেন—ব্যস, ব্যস, আর শোনাতে হবে না। এই গানটা আর তোমার পছন্দমতো আর একটা গান আমাকে পোস্টে মুম্বইতে পাঠিয়ে দাও। আমি পরের বারই কলকাতায় এসে রেকর্ড করব। মুশকিলে পড়লাম। আমার পছন্দ মতো গান? যদি হেমন্তদার পছন্দ না হয়, তা হলে তো রেকর্ডিংটা পেছিয়ে যাবে। হয়তো হবেই না। যা হোক, অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক বেছেবুছে উল্টোপিঠের গানটা কপাল ঠুকে পাঠিয়ে দিলাম হেমন্তদাকে। উনি আজীবন এক কথার মানুষ। জীবনে কোনও কথা ওঁকে নড়চড় করতে দেখিনি। পরের বার এসেই রেকর্ড করলেন—'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না' আর 'কতো রাগিণীর ভুল ভাঙাতে।' সেই কবেকার গান। কিন্তু আজও লোকে শুনছে। এবারেও তার রয়্যালটি পেয়েছি। এই হেমন্তদার কথা বলে শেষ করতে পারব না। পরে আবার বলব।

আমার সঙ্গে এবার যোগাযোগ হল নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে। গানের জগতে দুজন ডাক্তার নাম করেছিলেন। একজন হাসির গানের শিল্পী যশোদাদুলাল মণ্ডল আর একজন সুরকার নচিকেতা ঘোষ। নচিকেতা ঘোষের সুরের মেলোডি চিরদিন বাংলা গান মনে রাখতে বাধ্য হবে।

দারুণ মজার মজার কথা বলতেন নচিবাবু। আমি কতদিন সকালে কত নতুন নতুন গান ওঁর সঙ্গে করেছি তার শেষ নেই। দ্বিজেন মুখার্জিও প্রায়ই ওই গানের আড্ডাতে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে ওঁর বাড়ির ছাদের ঘরে জমায়েত হতেন। বেশ ছিল দিনগুলো। রবীন মজুমদার যখন দারুণ অসুস্থ তখন এই নচিবাবুই ওঁকে রেখেছিলেন ওই বাড়ির ছাদের ঘরে। ওঁরই জন্য রবিদা নতুন জীবন ফিরে পান।

নচিবাবু ওখানেই হঠাৎ বললেন—জানো পুলক, পুলিশ ফোর্স উঠে গেছে। হান্ড্রেড ফরটি ফোর আর নেই।

বললাম—কোথায়? হা হা করে হাসলেন নচিবাবু: কোথায় আবার, শ্যামবাজারেই এইচ. এম. ভি.-তে। পি. কে. সেন তোমার গান নিতে বলছেন।

তার আগের দিন রাতেই আমাদের বাড়ির বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম জ্যোৎনা রাতের চন্দ্রমল্লিকাকে। বাগানের সেই মনোমুগ্ধ পরিবেশ দেখে লিখেছিলাম—'ও আমার চন্দ্রমল্লিকা বুঝি চন্দ্র দেখেছে।' গানটা ওঁকে দিতেই তৎক্ষণাৎ সুর করে ফেললেন উনি। রেকর্ড করেছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এই নচিকেতাই একদিন সিরিয়াসভাবে বললেন—জানো? যে-সব ফিল্মে শ্যামল সতীনাথ উৎপলা আলপনা গেয়েছে, এইচ. এম. ভি. আর সে সব রেকর্ড প্রকাশ করবে না। ওরা চারজন আউট! কিন্তু কেন?

৫

সতীনাথ-শ্যামল-উৎপলা-আলপনা এই চারজনের সঙ্গে নেহাতই নগণ্য কারণে হঠাৎ সম্পর্ক ছেদ করছিল এইচ এম ভি। তখন ফিল্ম থেকে সরাসরি গ্রামোফোনের ডিস্ক রেকর্ডে ফিল্মের গান পরিবেশন করার মেশিন এসে গেছে। সে ভাবেই কাজ হচ্ছে। তবু এইচ. এম. ভি. ওদের গান বাদ দেবার জন্য প্রযোজকদের আলাদা খরচা জুগিয়ে অন্য শিল্পীদের দিয়ে গান রেকর্ড করতে লাগলেন। সতীনাথ-উৎপলা ছবিতে খুবই কম গাইত। বেশি গাইত শ্যামল আর আলপনা। শ্যামলের গানগুলো গাওয়ানো হতে লাগল মানবেন্দ্রকে দিয়ে, আর আলপনার গানগুলো ইলা বসুকে। নচিকেতা ঘোষের মতো সুরকারও ছবির গানের গ্রামোফোন রেকর্ড বার করার জন্য ছবিতে শ্যামল মিত্রের গাওয়া বিখ্যাত গান 'পুতুল নেবে গো পুতুল' গ্রামোফোন রেকর্ডে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে মানবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাওয়াতে বাধ্য হলেন। ওদের গান বন্ধ। রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। ইতিমধ্যে পুজোর গানের সময় এসে গেল। তখন পুজোর গান একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। শেষে সদালাপী পরোপকারী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মধ্যস্থতায় একটা মিটমাটের মধ্যে এসে গেল বিবাদী শিল্পীরা।

সবাই আবার এইচ. এম. ভি-তে ফিরে এল। ফিরল না শুধু একজন। সে আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানের জগৎ ছেড়ে দিয়ে পদ্মপুকুরের শ্রীধর মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সাংসারিক জগতে দিন কাটাতে লাগল। এতে সাহেব এইচ. এম. ভি. কোম্পানির কী ক্ষতি হল জানি না, কিন্তু বাংলা গান হারাল একজন সত্যিকারের সুকণ্ঠী এবং সাবলীল ভঙ্গিমার গায়িকা অনবদ্য এক কণ্ঠশিল্পীকে।

কাজী নজরুল ইসলামের পর যদি বাংলা গানের বাণিজ্যিক সাফল্যের খতিয়ান নেওয়া হয় তা হলে সর্বাগ্রে আসা উচিত কমল দাশগুপ্তের নাম। সে যুগে হিট আধুনিক গানের সুরকার বললেই বোঝাত কমল দাশগুপ্ত। উনি যে এইচ. এম. ভি-কে কত ব্যবসা দিয়েছেন তার হিসাব করা দুঃসাধ্য।

কিন্তু তখনকার বিদেশি সাহেব মালিকানার এই এইচ. এম. ভি-ই কমলদা যখন অসুস্থ হয়ে তেমন কাজ করতে পারছিলেন না তখন নির্মমভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি। ওখানেই একদিন শুনলাম, কমলদা নাকি এইচ. এম. ভি.-কে গানের জন্য অনুরোধ করেছেন। ওঁরা অনুগ্রহ করে শিল্পী দিয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর গায়ত্রী বসুকে—গীতিকার দিয়েছেন আমাকে।

'শেষ উত্তর', 'যোগাযোগ' 'গরমিল' 'নন্দিতা' 'জবার'-এর কমল দাশগুপ্ত আমার কাছে ছিল স্বপ্ন। আমি আনন্দে তুলে নিলাম কলম। তখন কমলদা আর্থিক দুরবস্থায়। গানের 'সিটিং' করার তেমন জায়গা নেই। আগের দিনের প্রকৃত স্রষ্টা শিল্পী কমলদা চিরদিনই এইচ. এম. ভি.-তে ওঁর নির্দিষ্ট ঘরে সুরসাধনা নিয়ে থাকতেন। এবারেও তাই চাইলেন। তাই ব্যবস্থাও হল। কিন্তু কমলদা কিছুতেই বিকেল চারটে-সাড়ে চারটের আগে ওখানে আসতে পারতেন না। তখন ঠিক পাঁচটায়, সাহেবি কায়দায় তখনকার এইচ এম ভি.-র দরজা বন্ধ হত। হয়তো ওঁদের স্বর্ণসময়ে ওঁর জন্য কোনও সময়ের

বিধিনিষেধ থাকত না। সেই অভ্যাসেই কমলদা দেরি করে এসে গান নিয়ে বসতেন। ঘড়ির কাঁটায় হারমোনিয়াম ছেড়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এসে বসতেন, এইচ. এম. ভি.-র অফিসের সদর দরজার সিঁড়ির পাশের রকে। হারমোনিয়াম নেই। সন্ধ্যা হয়ে আসত তেমন আলোও পেতেন না। শুধু আমার গানের কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরে মনে মনে সুর করতেন আর গানের পঙ্‌ক্তির মাথায় মাথায় লিখে রাখতেন শর্টহ্যান্ড স্বরলিপি। (ওঁদের সময় টেপরেকর্ডার তো ছিল না।) আমার চোখ ফেটে জল আসত। জগন্ময় মিত্র, গৌরী, কেদার, ধনঞ্জয়, হেমন্তকুমার, যূথিকা রায়, সত্য চৌধুরীর অজস্র গান হিট করানো কমল দাশগুপ্ত ভাগ্যের পরিহাসে এইচ. এম. ভি.-র 'রকে'। যতক্ষণ না উনি বলতেন—চলরে পুলক—ততক্ষণ আমি বসে থাকতাম।

তখন কমলদা বিয়ে করেছেন। ফিরোজা বউদিকে (বিখ্যাত শিল্পী ফিরোজা বেগম) নিয়ে থাকতেন হেদুয়া অঞ্চলে। ওখানেই একদিন দুঃখ করে আমায় বলেলেন—রেকর্ড দুটো তেমন চলল না রে।

বললাম—কী করে চলবে বলুন? ওইভাবে কী গান হয়?

বললেন—তুই আসিস। তোর গান সুর করে রাখব। মাঝে মাঝে যেতাম। রেকর্ড না হওয়া সে সব অনেক গানেরই উল্লেখ করছিলেন সেদিন ফিরোজা ভাবী।

কমলদাকে এরপর পেয়েছিলাম মেগাফোন রেকর্ডে। তখন অনেকটা সুস্থ। বেচু দত্তকে দিয়ে আমার একটা গান রেকর্ডে গাইয়েছিলেন। রেডিয়োতে খুব শুনতাম সে গানটা। 'দুজনের কূজনের ছন্দে'।

এরপর কমলদা দুটো বাংলা ছবি করেছিলেন। 'জংলী মেয়ে' আর 'আধুনিকা'। দুটো ছবিতেই গান লেখার জন্য ডেকেছিলেন আমাকে। আমার সৌভাগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার দুটো ছবিই সমাপ্ত হয়েও মুক্তিলাভ করেনি।

'আধুনিকা' ছবির সময়কার একটা ঘটনায় শ্রদ্ধেয় কমলদার উপদেশ আমি আজও মেনে চলি! ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োর মালিকপক্ষ ছবিটা প্রযোজনা করেছিলেন। অসীমকুমার আর অনিতা গুহ ছিলেন নায়ক-নায়িকা। বিনয় ব্যানার্জি ছিলেন পরিচালক—আর বিধায়ক ভট্টাচার্য কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার। যেদিন গেলাম সেদিন ওঁরা প্রত্যেকেই ওখানে অফিসে উপস্থিত ছিলেন। একটা কনট্র্যাক্ট ফর্ম দিয়ে এক অবাঙালি ভদ্রলোক বললেন—সই করুন। লাম্প সাম্ টাকার কনট্র্যাক্ট, পার সঙ কনট্র্যাক্ট নয়।

এ ধরনের চুক্তিপত্রে আগেও সই করেছি। কিন্তু এ চুক্তিপত্রে লেখা আছে 'অ্যাজ মেনি সঙস আর রিকোয়ার্ড'। অর্থাৎ ওঁদের যতখুশি গান আমায় ওই সর্বসাকুল্য অর্থে রচনা করে দিতে হবে! স্বভাবতই বললাম—এ চুক্তিপত্রে আমি সই করব না। ওই পঙ্‌ক্তিটি বাদ দিন।

ওঁরা রাজি হলেন না। ওঁদের ছবিতে কাজ করতে গেলে ওই চুক্তিতেই সই করতে হবে নইলে ওঁরা আমায় নেবেন না।

বিধায়কদা আমায় পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন—চিত্রনাট্য তো আমার, যে ক'টা গান তোকে বলা হয়েছে তার বেশি একটাও গান থাকবে না। পরিচালক বিনয়দাও সায় দিলেন। আর গান বাড়াবার জায়গা কোথায়? কমলদা খালি ধীরকণ্ঠে বললেন—

তুই থাকলে আমার খুব সুবিধে হয়। ছবিটা নে!

বিধায়কদা আবার বললেন—নে, সই করে অ্যাডভান্স টাকা নিয়ে বউমার জন্য মিষ্টি কিনে একটু সকাল-সকাল বাড়ি চলে যাস। রাত করিসনি। অগত্যা সই করে দিলাম।

'আধুনিকা' ছবির গান রেকর্ড হয়ে গেল। সন্ধ্যা, শ্যামল এরা গান গাইল। সুন্দর সুর করলেন কমলদা। সুটিং প্রায় শেষ! একদিন শুনলাম মুম্বই-এর রূপ কে শোরী ('এক থি লেড়কী'র পরিচালক। যাঁর ছবির গান 'লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা' সারা ভারত তোলপাড় করেছিল) এ ছবির ফাইনাল সুপারভিশন করছেন। হঠাৎ একদিন শোরী সাহেব আমায় লোক মারফত ডাকলেন। নির্দিষ্ট সময়ে গেলাম। আলাপ হল মুম্বই-এর একজন বিখ্যাত বাণিজ্যিক পরিচালকের সঙ্গে। কিন্তু দেখলাম বিনয়দাও নেই। শুধু বসে আছেন কমলদা। খুব আনন্দ হল এই ভেবে যে রূপ কে শোরী সাহেব নতুন আর একটা বাংলা ছবি করছেন।

কিন্তু মুহূর্তেই ভুল ভাঙল। তা নয় এই 'আধুনিকা'-তেই মুম্বইতে ভাষায় উনি কিছু 'মশালা' ঢোকাচ্ছেন। দুটো টিপিক্যাল হিন্দি মার্কা ছবির সিচুয়েশন আমায় দিলেন। নোট করলাম। এবার প্রযোজককে বললাম—আমার পেমেন্টের কী হবে?

অবাঙালি ভদ্রলোক ড্রয়ার খুলে আমার কনট্র্যাক্টটি বের করে আমায় দেখালেন অ্যাজ মেনি সঙস আর রিকোয়ার্ড! ভীষণ রাগ হল!

কোথায় বিধায়কদা? কোথায় বিনয়দা?

শুনলাম ওঁরা দুজনেই ছবির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে চলে গেছেন।

নেমে এলাম ওঁদের চৌরঙ্গির দোতলার অফিস থেকে।

কমলদাকে শুধু বলে আসতে হল অমুক তারিখে অমুক সময়ে আসব।

বাড়ি এসে হঠাৎ দুর্বুদ্ধি এল। চুক্তি অনুযায়ী গান আমি লিখতে বাধ্য—কিন্তু কেমন গান লিখব তা তো লেখা নেই।

তৎক্ষণাৎ যা মাথায় এল তা-ই নিয়েই লিখে ফেললাম আজে বাজে দুটো গান। নির্দিষ্ট সময় আবার ওঁদের অফিসে উপস্থিত হলাম।

পঞ্জাবি পরিচালক। ওঁর সহকারিও তাই। দুজনে কেউ-ই বাংলা বোঝেন না। প্রযোজক অল্পবিস্তর বাংলা বুঝলেও সাহিত্য মোটেই বোঝেন না।

পড়ে শোনালাম গান। ওঁরা 'ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে' করে মাথা নাড়তে লাগলেন। গান অ্যাপ্রুভড! যাক, বাঁচা গেল!

কমলদাও রেকর্ডিং ডেট মোটামুটি স্থির করে নিয়ে আমায় বললেন—চল, আমরা বসি।

মনে আছে, কমলদা আমায় নিয়ে এলেন উত্তর কলকাতার হর্তুকী বাগানে ওঁর বোনের বাড়ি। জানতেন কচুরি খেতে ভালবাসি। খাওয়ালেন, নিজেও খেলেন।

তারপর হেসে বললেন—পুলক, একী লিখেছিস? একি তোর লেখা? এ গান যখন রেকর্ড হয়ে বেরুবে তখন কেউ কি জানবে 'আধুনিকা'র প্রযোজক তোকে ঠকিয়েছে? বাড়তি পয়সা না দিয়ে কাজ করিয়েছে? সবাই বলবে যা-তা লিখেছে পুলক। এমন ধরনের কনট্র্যাক্ট আর কখনও সই করিসনি। কিন্তু এবার যখন করেছিস তোকে যারা

ভালবাসে তাদের ঠকাসনি। এ জগতে ভাল কাজটাই সব, পয়সা পাওয়াটা সব নয়।

এক আলো ঝলমল নতুন দিগন্ত দেখতে পেলাম। এ কথা শোনার পর ওঁকে আর প্রণাম না করে থাকতে পারিনি। বুঝলাম এই নিষ্ঠার জন্যই উনি সেই 'দম্পতি' 'আলেয়া' 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি দিয়ে পরের পর ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন।

কমলদা বললেন—জানিস, আমরা যখন রেকর্ডে ঢুকেছি তখন প্রতি টাইটেল পিছু সাহেব কোম্পানি আমাদের পাঁচ টাকা করে দিত। আমার ঘাড়ে বিরাট সংসারের দায়িত্ব। সারাদিন অন্তত চারটে টাইটেল না-করে বাড়ি ফিরতে পারতাম না। সংসার চালাতে হবে তো? এইচ. এম. ভি. কলম্বিয়া তো ছিলই—ওদের 'টুইন' লেবেলেও দিনের পর দিন কাজ করে গেছি। কিন্তু বিশ্বাস কর কোনও দিনও কাজে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে ঠকাইনি। আবার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও গান দুটো ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লিখলাম দুজনার মনের মতো দুটো গান।

সে দুটোই রেকর্ড হল 'আধুনিকা' ছবিতে। আলপনা গাইল গান দুটো!

পরপর ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় সর্বস্ব খুইয়ে যখন এ হেন মানুষ দিন কাটাচ্ছেন কেউ এগিয়ে আসেননি ওঁর কাছে। হিন্দি 'জবাব' 'চন্দ্রশেখর' 'কৃষ্ণলীলা'র পর শুনেছি মুম্বই-তে গিয়ে হিন্দি ছবি করার জন্য এক প্রযোজক 'ব্ল্যাঙ্ক চেক'-ও ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

কমলদা সেই বিনীত হাসি হেসে বলেছিলেন—

কলকাতায় রেকর্ড করলে করব, বিদেশে যেতে পারব না। কেন, এখান থেকে কি নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি গান হিট হয়নি?

কলকাতা ছাড়েননি কমলদা।

সেই কমল দাশগুপ্তই শুধুমাত্র জীবন ধারণের জন্য চলে গেলেন বাংলাদেশ ঢাকায়। পতিব্রতা স্ত্রী ফিরোজা বেগম ওখানে নিয়ে গিয়ে পরম যত্নে সেবায় ওঁর পাশে ছিলেন ওঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

এত বড় সুরকারের এই নিঃশব্দে ওপার বাংলায় চলে যাওয়া কোনও বিখ্যাত পত্রিকায় এক পঙ্‌ক্তিও সংবাদ হল না।

৬

একটা গান আমাদেব ছোট বেলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। আজও সে গানের আকর্ষণ এতটুকুও কমেনি। গানটি রবীন মজুমদারের গাওয়া—'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাইবা জ্বলে'। এই গানটির সুরকার ছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন উনি। আমার সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলার আগে এই 'আঁধার ঘরের প্রদীপের' একটা নিদারুণ ঘটনার কথা না-বলে থাকতে পারছি না।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই সুকণ্ঠ রোমান্টিক নায়ক-গায়ক রবীন মজুমদার খুবই আর্থিক দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। সেইসময় একটি সংস্থা কলামন্দিরে একটি সংগীতানুষ্ঠানে রবিদাকে সংবর্ধনা ও কিছু অর্থ উপহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওঁকে নিয়ে

গিয়েছিলেন ওখানে। আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর আমরা মঞ্চ থেকে নেমে সামনের সারিতে কিছুক্ষণের জন্য বসে ছিলাম। রবিদার পাশের সিটেই বসেছিলাম আমি। এক গায়িকা গাইতে বসে রবিদার সামনেই রবিদার ওই বিখ্যাত গান 'আঁধার ঘরের প্রদীপ' গাইতে লাগলেন। সুরে ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্তিতে সে গান রবিদার গাওয়া আসল গানটির ধারে কাছে পৌঁছতে পারছিল না। আড়চোখে দেখছিলাম রবিদাকে। কী এক অস্থিরতায় ছটফট করে উঠছিলেন উনি। এক-এক বার আমার হাতটা চেপেও ধরছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল—রবিদার যদি যৌবনকালের সেই অপূর্ব কণ্ঠ থাকত তা হলে রবিদা-ই ওঁর অভিনীত নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর দেওয়া বিখ্যাত 'নিরুদ্দেশ' ছবির সিকোয়েন্সের মতো এখন-ই মঞ্চে লাফিয়ে উঠে গায়িকার কাছ থেকে মাইকটা ছিনিয়ে নিয়ে গেয়ে উঠতেন—'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাইবা জ্বলে'। গানটা শেষ হতেই আর এক মুহূর্ত বসেননি রবিদা। সোজা বেরিয়ে গিয়েছিলেন 'অডিটোরিয়াম' থেকে।

রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর আমার ছেলেবেলা থেকেই অদ্ভুত ভাল লাগত। বাংলা গানে সার্থক মেলোডির বেশ একটা নতুন জোয়ার এনেছিলেন। ওঁর সুরের 'সাতনম্বর বাড়ি,' 'সমাপিকা' 'লালুভুলু' 'বিদুষী ভার্যা' 'সাগরিকা' 'স্বপ্ন সাধনা' 'অগ্নিশিখা' 'জয়া' ইত্যাদি ছবির গান সব সংগীত প্রেমিক প্রেমিকাদেরই মনে আছে।

কমার্শিয়াল আর্টিস্ট সত্যজিৎ রায়ের পথেই কমার্শিয়াল আর্টিস্ট রাজেন তরফদার এলেন ছবি করতে। করলেন অসাধারণ ছবি 'গঙ্গা'। তারপরের ছবি ওঁর 'অগ্নিশিখা'। সুরকার নিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়—আর গীতিকার আমাকে।

সদাহাস্যময় সহৃদয় মানুষ ছিলেন এই রাজেনদা। ওঁর প্রায় প্রতিটি ছবিতেই আমাকে নিয়েছিলেন। সম্ভবত 'আকাশছোঁয়া' ছবিতে শুধু রবীন্দ্রনাথের গান ছিল। আমায় হাসতে হাসতে বলতেন যে—লিখে দেব—রবীন্দ্রনাথের গান নিলাম বলেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান রাখা গেল না।

এই 'অগ্নিশিখা' ছবিতেই রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ। তখন 'হিন্দ' সিনেমার কাছের ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা নেই। রবিদা তখন ধর্মতলার সুরশ্রী অর্কেস্ট্রায় চারতলায় উঠে রোজ সন্ধ্যাবেলায় গান নিয়ে বসতেন। এখন যেমন অর্কেস্ট্রা রেকর্ড করা থাকে তারপর কণ্ঠশিল্পীরা দু লাইন করে গান শিখে কোনওমতে গলা থেকে গান উদ্‌গীরণ করে মোটা টাকা পকেটে পুরে গাড়িতে উঠেই ভুলে যান—কী গাইলেন! তখন তা ছিল না। গভীর মনোযোগে এক একটা গান দুদিন-তিনদিন ধরে ওঁরা রিহার্সাল করে রেকর্ড করতেন। ওই সুরশ্রী 'অর্কেস্ট্রা'তে বাজনাদাররাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজানোর রিহার্সাল করে তবে স্টুডিয়ো যেতেন।

রবিদা পাখি পড়ানোর মতো গান তোলাতেন—শেখাতেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে। মনের মতো গাইতে পারলে সন্ধ্যার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন—সন্ধ্যা, তুমি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় গায়িকা। আমার নিজের ধারণা, রবীন চট্টোপাধ্যায় না থাকলে সন্ধ্যার বিকাশ এতটা হত না। 'পথে হল দেরী' 'সবাই উপরে'র সন্ধ্যার গানগুলো এত ভাল হয়েছিল শুধু রবিদার সুরে নয়—আশ্চর্য শেখানোর গুণেও। কিন্তু একটা অদ্ভুত

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ওঁর। উনি কাউকে হয়তো পাঁচটার সময় ডাকলেন—কিন্তু নিজে ও সময়ে উপস্থিত না-ও থাকতে পারতেন। কিন্তু যাঁকে ডেকেছেন তাঁকে ঠিক সময়ে উপস্থিত হতেই হবে। নিজে দেরি করে এসে যদি শুনতেন তিনি ঠিক সময়ে আসেননি তা হলে অগ্নিশর্মা হয়ে যেতেন।

হেমন্তদা আমাদের প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতেন—রবিদার রেকর্ডিং যদি দুটোয় থাকে আমি দেড়টায় হাজির হয়ে যাই—যদিও জানি অন্য কারও গানে না হলেও আমার গানে রবিদা দুটোর জায়গায় ঠিক তিনটেয় আসবেন!

আর একটা জিনিস রবিদার ছিল—সেটা হচ্ছে গান উনি গীতিকারকে কাছে বসিয়ে নিজের চাহিদামতো লিখিয়ে নিতেন। ছবির পরিচালক হয়তো নিজের চাহিদামতো কোনও গান গীতিকারকে দিয়ে লেখালেন—কিন্তু খুব কমক্ষেত্রেই সে গানটি সুর করতেন উনি। ওই গানের ভাবধারাটি বজায় রেখে ওঁর সামনে গীতিকারকে আবার লিখতে হত। প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন, আমি সবাই দিনের পর দিন তা-ই করেছি। এর জন্য আমাদের কোনও কুঁড়েমি বা বিরক্তি হত না। আমরা জানতাম ওটাই রবিদার কাজের স্বভাব।

'জয়া' ছবির স্ক্রিপ্ট, পরিচালক চিত্ত বসু আমাকে আর রবিদাকে একসঙ্গে শুনিয়েছিলেন। স্টুডিয়োতে স্ক্রিপ্ট শুনিয়ে চিত্তদা আমায় বললেন—তুমি ভবানীপুরে (ওঁর বাড়ি) এসো। আমার সামনে গান লিখবে।

রবিদা বললেন—পুলক, তা-ই কর। ওঁর মনের মতো করে লিখে দে। তারপর আমরা বসব।

আমি জানতাম, একবার চিত্তদার কাছে লিখে ওই গান-ই আবার রবিদার কাছে লিখতে হবে। এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে গেলাম ভবানীপুরে। একসময়ে লেখা শেষ হল জয়ার বিখ্যাত গানগুলো। চিত্তদা খুব খুশি।

চিত্তদা আমায় বললেন—এই গানগুলোই রাখতে বোলো রবিকে। কিছু অদল-বদল কোরো না। হুবহু এই গানগুলোই আমার চাই।

আঁতকে উঠলাম! আমি বলতে পারব না। আপনি গানগুলো কাউকে দিয়ে রবিদার কাছে পাঠিয়ে দিন।

আমি পড়লাম মহা বিপদে। জানতাম, রবিদা সে গানগুলো নিয়ে আবার আমাকে দিয়ে নতুন করে লেখাবেন।

সারারাত অস্বস্তিতে ঘুমাতে পারলাম না। রবিদা ডাকলে আমি ওখানে গিয়ে কী বলব? আবার লিখলে চিত্তদা অসন্তুষ্ট হবেন, না-লিখলে ক্ষেপে যাবেন রবিদা। ওই সময়েই হয়তো মান্না দের গাওয়া অনেক পরের একটি গানের আইডিয়া আমার মাথায় এসেছিল—'আমি কাকে খুশি করি বলো?' মনে মনে ইষ্টদেবতাকে ডাকতে লাগলাম।

পরের দিন, মুম্বই থেকে মান্না দের ফোন এল—আপনার কথামতো লতাজির ডেট নিয়েছি অমুক তারিখে। আপনারা পারলে আজকেই না-হলে কাল-ই বম্বেতে চলে আসুন। বন্ধুবর শৈলেন মুখার্জির সুরে 'দোলনা' ছবির আমার লেখা—'আমার কথা শিশির ধোয়া হাস্নুহানার কলি' গানটির জন্য লতাজির কাছ থেকে ডেট নিতে মান্নাদাকে

আমি-ই অনুরোধ করেছিলাম। উনি 'ডেট' পেয়ে আমাদের ডাকলেন।

পরের দিনই আমরা মুম্বই চলে গেলাম। বেঁচে গেলাম রবিদার বকুনির হাত থেকে। যাবার সময় শুধু চিত্তদাকে বলে গেলাম আপনি তো বলেছেন—একটা গানও অ্যাতোটুকু বদলাবার প্রয়োজন নেই, তা হলে আপনি আমায় বম্বে যাবার ছুটি দিন আমি যাই! আপনার কাছ থেকে গান নিয়ে রবিদা সুরে বসে যান।

চিত্তদা বললেন—হ্যাঁ। তা-ই হবে তুমি যাও। ফিরে এসেই কিন্তু আমায় ফোন কোরো।

বুকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না' শুনতে শুনতে মুম্বই-এর কাজ সারছি। ওখানেও আর একটা অভিজ্ঞতা আমার জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। সেটা পরে বলব—এখন বলি ফিরে এসে চিত্তদাকে ফোন করার ঘটনা।

মুম্বই থেকে ফিরতেই বাড়িতে শুনলাম রবিদা যথারীতি আমায় ডেকেছেন 'জয়া'র গান এদিক-ওদিক করার জন্য। শুনেছেন আমি মুম্বইতে। আশঙ্কায় দুরুদুরু বক্ষে চিত্তদাকে ফোন করতেই বললেন—তুমি আজকেই রবির সঙ্গে দেখা করো, পরশুই গান রেকর্ডিং। রবি 'ফায়ার' হয়েছিল—আমি ম্যানেজ করেছি। তুমি আরও ম্যানেজ করো।

তৎক্ষণাৎ রবিদার বাড়ি গেলাম। রবিদা পাশের জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—এখন-ই হেমন্তকে গান তোলাতে টোপাবাবুর বাড়ি যাচ্ছি হরিশ মুখার্জি রোডে। তুমি ইচ্ছে করলে আমার গাড়িতে উঠতে পারো—গাড়িতে জায়গা আছে।

হেমন্তদাকে প্রথমেই তোলালেন জয়ার, আমার অত্যন্ত প্রিয় গানটি—'নবমী নিশিরে-তোর দয়া নাইরে।' তারপর তোলালেন—'কেন যেতে গেলে যাওয়া যায় না?' হেমন্তদা গান তুলে চলে গেলেন অন্য কী কাজে। রবিদা কিন্তু উঠলেন না। গাড়িতে বা এখানে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। আমি কিন্তু বসে আছি। আমার মুখে কোনও আওয়াজ নেই।

রবিদা আর এক কাপ চা চাইলেন। চুমুক দিয়ে বললেন—টোপাবাবু, বাকি গান দুটো শুনুন।

টোপাদা বললেন—কাল-ই তো চারটে গান-ই শুনেছি সুরশ্রীতে। সুন্দর সুর হয়েছে।

—তবুও আর একবার শুনুন-ই না।

বুঝলাম রবিদার রাগ পড়ে এসেছে। আমার গান লেখায় সন্তুষ্ট হয়েই আমাকেই গানগুলো শোনাতে চাইছেন—টোপাদাকে নয়।

রবিদা প্রথমে শোনালেন—'পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় এসো না।'

মুগ্ধ হলাম। তারপরই কী এক ভাবে রূপান্তরিত হয়ে শোনালেন—'হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম—অষ্টোত্তর শতনাম পেল নারায়ণ।'

এ গানের প্রশংসা জানাবার ভাষা আমার এল না। আমি তখনও নিশ্চুপ।

টোপাদা বললেন—পুলক, চমৎকার 'রিফ্রেন লাইনটা' ওই 'অষ্টোত্তর শত নাম পেল নারায়ণ'টা লিখেছে—দারুণ দাঁড় করিয়েছে!

রবিদা প্রতিবাদ করলেন—ও কথাটা কালই সুরশ্রীতে আপনাদের আমিই তো বললাম।

আবার নতুন করে বলছেন কেন?

রবিদা হঠাৎ হাত জোড় করে আমার দিকে ফিরে বলে উঠলেন—ও ভাই বোম্বাইবাসী, সুর পছন্দ হয়েছে তো? আমার চাকরিটা থাকবে তো?

৭

আমার চোখে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এক স্বতন্ত্র সত্তা। এমন একজন পরোপকারী ও হৃদয়বান শিল্পী আমি সংগীত জগতে খুব একটা দেখিনি। কত মানুষকে যে উনি হাতে ধরে এখানে নিয়ে এসেছেন, বলে শেষ করা যায় না।

ওঁর কলেজ স্ট্রিটের হোটেল বাড়িতে অনেকেরই একটা সুন্দর আড্ডার জায়গা ছিল। আমার আত্মীয় ও বন্ধু রতু মুখোপাধ্যায় ওখানের ওই আড্ডার নিয়মিত মেম্বার ছিল। আমিও অবশ্য মাঝেমধ্যে ওখানে যেতাম। একদিন রতু বললে, ধনঞ্জয়দা আমার সুরে এবারে পুজোর গান করবেন বলেছেন। তুমি গান নিয়ে চলো।

রতু তখন সম্পূর্ণ নবাগত। ও কারও সহকারীও ছিল না—সাংগীতিক পরিচয়ও কিছু নেই। সুর করাটা ছিল ওর নেশা। নিশ্চিত হলাম আমি—যখন ধনঞ্জয় বাবু বলেছেন তখন রতুর জন্য এইচ এম ভি-র দরজা খুলে যাবেই। উনি না থাকলে সনৎ সিংহ, পান্নালাল, মৃণাল চক্রবর্তী এমনকী ওঁর দাদা সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্যও সুযোগ পেতেন না। ধনঞ্জয়বাবু পান মুখে পুরে লাল ঠোঁট একটু খুলে আমায় বললেন—জানি, অবাক হবেন। হ্যাঁ পুজোর গান-ই করব আপনার বন্ধুর সুরে। সুযোগ যদি দিতেই হয় ভালভাবেই দেওয়া দরকার। প্রথমেই বেছে নিলেন উনি আমার খাতা থেকে 'চামেলি মেলো না আঁখি', কেদারা রাগে সুর করতে বললেন রতুকে। খুব একরোখা লোক ছিলেন ধনঞ্জয়বাবু। সামান্য কারণে এক কথায় রেডিয়োর প্রোগ্রাম বর্জন করে দিয়েছিলেন বছরের পর বছর ধরে। তখনকার দিনে রেডিয়ো বর্জন করা একটা দুঃসাহসিক কাজ। সতীনাথ-শ্যামল উৎপলা-আলপনার রেকর্ডের ঝগড়া উনিই মিটিয়ে ছিলেন। অন্য কোনও নামী শিল্পী নয়। এতে ওঁর ব্যক্তিগত লাভ ছিল না কিছুই শুধু পরোপকারের আনন্দটুকু ছাড়া।

সংগীতমহলে তখন প্রায়-ই আলোচনা হত—কে বেশি বড়—হেমন্ত না ধনঞ্জয়। কিছু কিছু আলোচনা ওঁর কানেও পৌঁছুত। উনি কিন্তু মনে মনে হেমন্তদারই ফ্যান ছিলেন। যদি কেউ চাটুকারি প্রবৃত্তিতে ওঁকে বলতেন—আপনার 'যদি ভুলে যাও মোরে জানাব না অভিমান', কিংবা 'রাধে ভুল করে তুই' গানটা কি হেমন্তদা গাইতে পারতেন? ভীষণ রেগে যেতেন। চেঁচিয়ে বলতেন—'কথা কোয়োনাকো শুধু শোনো' 'কিতনা দুখ ভুলায়ে'ও আমি গাইতে পারব না। হেমন্তবাবু হেমন্তবাবু-ই।

একবার অনেক ভেবে চিন্তে রেকর্ড করলেন—'দুটো মিষ্টি কথা শুনতে এলাম'। রেডিয়োতে গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও গান সুপার হিট হয়ে গেল। রেকর্ড বেরুবার বেশ কিছু দিন বাদে ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে আমার দেখা। বললাম আপনার এবারের গান তো সুপার হিট।

ধনঞ্জয়বাবু হেসে ঘাড় নামিয়ে বললেন—সুপারহিট কোথায়। এক লম্বু দুর্দান্ত গাইয়ে 'হুম্ হুম্ না-হুম্ হুম না' করে সবাইকে কাত করে দিয়ে গেল। ধনঞ্জয়বাবুর 'রাণী রাসমণি'তে গাওয়া 'গয়া গঙ্গা' ইত্যাদি শ্যামাসংগীত জনপ্রিয় হয়েছিল। রেকর্ড কোম্পানি বারবার ওঁকে অনুরোধ করেছিল শ্যামাসংগীত গাইবার জন্য। উনি করেননি। বলতেন—ওটা তো পান্না গাইছেই। আবার আমায় কেন? পাছে ভাইয়ের কোনও ক্ষতি হয় তাই নিস্পৃহ থাকতেন ধনঞ্জয়বাবু।

'সাগরে উঠল কী ঢেউ' গান গেয়ে নচিকেতা ঘোষের এ জগতে প্রবেশ। তারপর গান গাওয়া ছেড়ে হয়ে গেলেন সুরকার। আগেই বলেছি ওঁর সুরে আমার লেখা প্রথম গানটির কথা-ও আমার 'চন্দ্রমল্লিকা বুঝি চন্দ্র দেখেছে।'

এই নচিকেতার সুরে আমি অজস্র গান লিখেছি। তার পঁচানব্বই ভাগ কিন্তু কথার ওপর সুর বসানো। সুধীন দাশগুপ্তের ঠিক উল্টো।

সপ্তাহে দু-তিন দিন সকালে আমরা গান নিয়ে বসতাম। সে গান কোন ছবিতে হবে কোন শিল্পী গাইবে কিছুই ভাবতাম না। শুধু সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর থাকতাম আমরা দুজন। যখন কোনও শিল্পীর তাগিদ আসত আমরা ওর মধ্যে থেকে বেছে দিতাম গান। সন্ধ্যা মুখার্জির 'নেব না সোনার চাঁপা কনক চাঁপা ফেলে' 'দিন নেই ক্ষণ নেই', প্রতিমা ব্যানার্জির—'মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে', সতীনাথের—'সূর্যমুখী আর সূর্য দেখবে না', ইলা বসুর 'ওই কোকিল শোনায়।' 'অ্যাতো কাছে পেয়েছি তোমায়'। শ্যামল মিত্রের—'ওই রাত পোহালো', উৎপলা সেনের 'কিংশুক ভারী হিংসুক', ললিতা ধর চৌধুরীর প্রথম রেকর্ড 'ওই লাল গোলাপটা দাওনা আমায় দাও না', দ্বিজেন মুখার্জির 'আবার দুজনে দেখা—কুতুবের মিনারে।' সবিতা চৌধুরীর প্রথম রেকর্ড 'ডাগর ডাগর নয়ন মেলে টগর মনি' প্রভৃতি বহু গান এভাবেই রেকর্ড হয়েছিল।

সুরসৃষ্টির একটা নেশা ছিল নচিকেতা ঘোষের। আর ছিল গীতিকারের কাছ থেকে ভাল গান আদায় করার বুদ্ধি। গৌরীপ্রসন্ন ওঁর খুবই প্রিয় গীতিকার ছিলেন। কিন্তু আমাকেও দারুণ পছন্দ করতেন। অনেক পরে বুঝেছিলাম দুজনকে লড়িয়ে দিয়ে দুজনের কাছ থেকে সত্যিকারের ভাল গান আদায় করে নেবার এ একটা অভিনব টেকনিক। একদিন দশ-পনেরো বার আমাকে গেয়ে শোনালেন গৌরীবাবুর লেখা 'মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি।' পরদিন-ই সকালে আমি লিখে ফেললাম—'বেঁধোনা ফুল মালা ডোরে/ কানু প্রেম গেঁথে নিও মালা করে।' একদিন আমাকে বার তিনেক গেয়ে শোনালেন গৌরীবাবুর রোমান্টিক লেখা—'সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক, বেশ তো।' তখন-ই আমি লিখে ফেললাম—'এক বৈশাখে দেখা হল দুজনার'। আমার জীবনের একটা সেরা রোমান্টিক গান। আজকে উনি শোনালেন ওঁর ভিন্নধর্মী গান 'মানুষ খুন হলে পরে'—পরদিন আমি লিখে দিলাম—'এমন একটা ঝিনুক খুঁজে পেলাম না যাতে মুক্তো আছে।' গৌরীবাবু বলতেন, জানেন, নচিকেতার হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা আছে ও তার একদিকে একবার আমায় চাপায় আর একবার অন্যদিকে আপনাকে।

গৌরীবাবু ছিলেন আমার মামার সহপাঠী। স্বভাবতই আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। যখনই আমাদের দুজনার তুলনামূলক কোনও আলোচনা কোথাও শুনতেন—অমনি

হাসতে হাসতে বলতেন—আমি পুলকের আগে জন্মেছি আগে গান লিখেছি আগে স্বীকৃতি পেয়েছি। তা ছাড়া দ্যাখো ইংরিজিতে আগে 'জি' পরে 'পি', বাংলাতেও আগে 'গ' পরে 'প' সুতরাং পুলক আমাকে টপকে যেতে পারবে না কিছুতেই।

এ কথাটার জের টেনেই সেবার ওঁর স্মৃতিসভায় বলেছিলাম—উনি শুধু আগে আসেননি স্নাতক হয়েছেন আমার আগে। আমি পরে। গাড়ি কিনেছেন আমার আগে—আমি পরে। বিয়ে করেছেন আমার আগে—আমি পরে। পৃথিবী থেকে চলেও গেলেন আমার আগে, আমি ওঁকে কিছুতেই হারাতে পারলাম না।

আবার নচিকেতা ঘোষের কথায় আসি। গান সৃষ্টির একটা আশ্চর্য 'প্যাশান' ছিল ওঁর। নিজেই বলতেন—রোজ সকালে তোমাদের যেমন গরম তাজা টাটকা চা না হলে চলে না—আমারও তেমনি একটা টাটকা তাজা গানে চুমুক না দিতে পারলে মনটা ছটফট করে।

একদিন সকালে ফোন করলেন—ও পুলক, কোনও গান নেই। আমি হারমোনিয়াম নিয়ে বসে আছি। শ্যাম (ওঁর তবলচি) শুধু শুধু তবলা পেটাচ্ছে। হয় এখনি এসো—না হয় টেলিফোনেই একটা গানের 'মুখড়া' দাও।

আমার কাছেও কোনও গান ছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম—কী ধরনের গান তৈরির মুড এখন?

তখন সবে ওঁর প্রথমা স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে।

উনি নিজেই আমাকে বলে ফেলেছেন ওঁর মনের অনেক গভীর নিবিড় কথা। অকপটে স্বীকারও করেছেন ওঁদের সম্পর্কের অনেক কিছু।

হঠাৎ মাথায় এল ওই ব্যাপারটাই! টেলিফোনেই বললাম—লিখে নিন, দুটো লাইন। কাল-পরশু একদিন গিয়ে গানটা শেষ করব। লিখুন 'ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলেছ যে তুমি ভালবাসবে/পথের কাঁটায় পায়ে রক্ত না ঝরালে কী করে এখানে তুমি আসবে?'

নচিবাবু আমার 'এক্সটেম্পোর' বলা কথাগুলোর জবাব দিলেন প্রায় এক মিনিট পরে। শুধু বললেন—আবার বলো। আবার বললাম। শুনে টেলিফোন লাইনটা কেটে দিলেন। কী একটা কাজ নিয়ে সবে তখন বসেছি। আবার টেলিফোন। এবার অন্য ধরনের কণ্ঠস্বর! এক্ষুনি চলে এসো। আমি তোমার গাড়ির পেট্রোলের দাম দেব। ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি।

অগত্যা তখনই সালকিয়া থেকে ছুটতে হল পাইকপাড়ায়। ওঁর তখনকার বাড়িতে। শুনলাম মুখড়ার সুর। লিখলাম অন্তরা। বেলা দুটোয় শেষ হল গানটা। অনেক পরে মান্নাদা ওটা রেকর্ড করেছিলেন। ঠিক এইভাবেই নচিবাবু তখন ভবানীপুরে, তখন একদিন সকালে ছুটতে হয়েছিল আমাকে। মুখড়া দিয়ে বিপদে পড়েছিলাম—'আমার ভালবাসার রাজপ্রাসাদে/নিশুতি রাত গুমরে কাঁদে'। এ গানটাও পড়ন্ত দুপুরে শেষ হয়েছিল। এবং এটাও রেকর্ড করেন মান্নাদা। অবশ্য পরবর্তীকালে। আগেই বলেছি আমাদের গান তৈরি থাকত। সময়মতো সেগুলো দেওয়া হত—ঠিক ওই বিশেষ গানটির উপযোগী বিশেষ শিল্পীকে।

সেবার নির্মলা মিশ্রের পুজোর গান করার ভার এল আমাদের ওপর। নির্মলাকে দেওয়া ঠিক করা হল—'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না' এবং উল্টো পিঠে আরও

একটি—খুব-ই গভীর ভাবের 'স্লো রিদমের' (বড় তালের) গান! নির্মলা এল গান তুলতে। শুনে বিরস মুখে বললে—দেখুন, আপনারা তো ফাংশানে যান না—আমরা ফাংশানে গান করি। রিদম না হলে আজকাল কোনও গান-ই হিট করে না। দুটো গানের একটাও জমবে না। গান দুটো চেঞ্জ করে দিন!

তর্কে না-গিয়ে আমরা বললাম—ঠিক আছে—নতুন গান তৈরি করে আমরা খবর দেব।

চলে গেল নির্মলা। বললাম—নচিবাবু, আমি কিন্তু নতুন গান লিখছি না। আপনি অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিন।

নচিবাবুও বললেন—পাগল নাকি? এ গান ও যদি না গায়, তা হলে আমি ওর ট্রেনিং-ই করব না।

সপ্তাহ দুয়েক কেটে গেছে। আবার নচিবাবুর টেলিফোন: পুলক, নির্মলা আমার মা-কে ধরেছে। মা আমায় ওর গান করতে বলছে। মাকে ফেরাই কী করে? তুমি যা হোক কিছু একটা করো। অগত্যা আমাকেও রাজি হতে হল। তবে শর্ত দিলাম—'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না—' গাইতেই হবে—উল্টো পিঠের গানটা বদলে দেব।

আরও বললাম—নির্মলাকে ডাকুন, ওর সামনে—ও যেমন রিদম-এ বলবে—তেমন গান বানানো হবে।

'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না'-টা বাধ্য হয়ে তুলল নির্মলা। উল্টো পিঠের গানটা ঠিক ও যেমন বলল—তেমনিভাবে বানালাম আমরা। ও গানটা শিখে আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ি চলে গেল। বলে গেল—একদম মনের মতো গান পেয়েছি!

দুঃখের বিষয়, 'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না'-টাই জমল অর্থাৎ হিট করল—উল্টো পিঠের গানটা কেউই জানে না—আমার মনে হয়, নির্মলারও মনে নেই।

নচিবাবুর সুরে 'ছুটির ফাঁদে' ছবির কাহিনীকার সমরেশ বসুর ইচ্ছে হল উনিই 'ছুটির ফাঁদে'র গানগুলোও লিখবেন। নচিবাবু আমায় জানালেন—আমি তো মুশকিলে পড়ে গেলাম। উনি হয়তো গীতিকবিতা লিখে দেবেন। কিন্তু ফিল্মের গান—সিচুয়েশনের গান—সুরের সঙ্গে না-লিখতে পারলে গান জমাব কী করে? সিটিঙে তুমি একটু এসো—সমরেশবাবুকে হেল্প কোরো। গেলাম—দুদিন সকালে। সমরেশবাবু ওঁর উপন্যাস লেখার সময় নষ্ট করে গান নিয়ে বসলেন। কিন্তু সুরের ওপর লেখার ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। অনেক চেষ্টায় কোনও রকমে খাড়া করা হল—'আমি এখন সিক' গানটি। তারপরে সমরেশবাবু হাসতে হাসতে আমায় বললেন—আমার শখ মিটেছে। বাকি গানগুলো আপনি লিখুন। আমার লেখা 'ছুটির ফাঁদে'-র 'নদীর যেমন ঝর্না আছে', 'এখানে তীর ছোঁড়ে তীরন্দাজ', 'মুশকিল আসান' গানগুলো দারুণ পছন্দ হয়েছিল সমরেশবাবুর। উনি এখন নেই, কিন্তু ওঁর সেই ভাললাগাটুকু আজও আমার সঙ্গে আছে।

'স্ত্রী' ছবির সময় বেশ একটা ঘটনা ঘটেছিল। এক সন্ধ্যায় আমরা গান বানিয়ে পরিচালক সলিল দত্তের বাড়ি গেলাম। সবাই গান শুনলেন। গান 'অ্যাপ্রুভ' হয়ে গেল। আমরা রাতের খাওয়া শেষে 'একটু বেশি রাতেই' সলিলের বাড়ি থেকে বেরুলাম। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। গভীর রাতের রেড রোড ধরে আসতে আসতে বার বার

অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। সেদিন গাড়িতে যদি কেউ থাকত হয়তো ভয় পেয়ে যেত। মনে হচ্ছিল—একটা গান আর সকলের ভাল লাগলেও আমার ভাল লাগছে না। আমি ও গানটা হয়তো আরও ভাল লিখতে পারব। আমি বোধহয় নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি!

বাড়িতে এসে আমাদের সাবেকি বসতবাড়ি 'সালকিয়া হাউস'-কে গভীর রাতে ভিন্ন চোখে দেখলাম। মনে হল, এ বাড়ির ঝাড়লণ্ঠনেও দুঃখের দীর্ঘশ্বাস। কেমন যেন করুণা এল ইঁট-মার্বেলে বন্দি এ বাড়ির বাসিন্দাদের প্রতিও। অত রাতেই আমার শোবার ঘরের টেবিলে বসে লিখে ফেললাম—'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার এই তোমাদের পৃথিবী।'

৮

সেদিন রাতে ঘুমোতে পারিনি। ওই গানটা নিয়ে মনের মধ্যে যে খুঁতখুঁত ভাব ছিল সেটা কিছুতেই যাচ্ছে না। অতএব, সাত সকালে হাজির হয়ে গেলাম সলিলের কাঁকুলিয়ার বাড়িতে। ও ঘুম চোখে দরজা খুলল। আমাকে দেখে চমকে গেল।

সরাসরি বললাম—কালকের ও গানটা দারুণ সুর হলেও আমার ঠিক পছন্দ হয়নি। ওটা আরও ভাল করা যায়। লিখে এনেছি। তুমি শোনো।

সলিল গরম চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল—বেশ তো, শোনাও।

পড়ে শোনালাম—'খিড়কি থেকে' গানটা।

সলিল মানল এটা ও গানটার থেকে অনেক ভাল। পরেই একটু স্তিমিতভাবে বলল—কিন্তু আগের গানের ওই সুরে এই কথাগুলো বসানো যাবে তো? এবার অসহায় হয়ে গেলাম আমি! না, তা যাবে না। নতুন করে সুর করতে হবে। তবে আমি নচিবাবুকে জানি—উনি সাদরে গ্রহণ করবেন এ গান।

সলিল বললে—তা হলে আর ভাবনা নেই। তুমি ওকে দিয়ে এসো গানটা।

বললাম—অসম্ভব। অত খেটে ও সুর করেছে। কাল সবাই শুনে খুশি হয়েছে। এখন যদি বদলাতে বলি—তা হলে প্রথম রাগের ধাক্কাটা পড়বে আমার ওপর। আমি দিতে যেতে পারব না। তুমি, তোমার এই গানটাই বেশি পছন্দ হয়েছে—এ কথাটা চিঠিতে লিখে প্রোডাকশানের লোক দিয়ে নচিবাবুর কাছে পাঠিয়ে দাও।

ঠিক আমি যা আশা করেছিলাম তা-ই হল। নচিবাবু টেলিফোনে আমায় ওঁর ভঙ্গিতে বললেন—অ্যাতোদিন এ লেখাটা কোন খড়ের গাদায় পুরে রেখেছিলে? একটা ধেড়ে ইঁদুর বুঝি খড়ের গাদা থেকে এ কাগজটা মুখে করে নিয়ে এল।

মনে আছে 'ধন্যি মেয়ে'র 'যা যা বেহায়া পাখি যা না' গানটা সুরের সঙ্গে লেখা শেষ হতেই ইমোশানে আমার গালে একটা চুমু খেয়েছিলেন নচিবাবু। যখন মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম রেকর্ড করার জন্য 'অলি অমন করে নয়' আর 'তোমায় আমায় প্রথম দেখা গানের প্রথম কলিতে' ওঁকে পড়ে শোনালাম—তখন গান দুটো শুনেই বললেন—পুলক, নিশ্চই এখন তোমার ক্ষিধে পেয়েছে, তোমাকে আমি খাওয়াব। তাই তো কী খাওয়াই বলো তো? আমিও ইমোশানে উৎসুক হয়ে ভাবছি—কী খাবার আসে?

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের পাঞ্জাবির দোকানের 'ডেভিল'—না 'কাটলেট?'

নচিবাবু কাজের লোককে চেঁচিয়ে বললেন—এই—পুলকের জন্য ছ'টা সরের নাড়ু এনে দে তো?

যেদিন 'ফরিয়াদ' ছবির 'নাচ আছে গান আছে/রূপের তুফান আছে' আর 'এ আমার বুক ভরানো ছোট্ট একটা চিঠি' শেষ হল লেখা—আমায় নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন উজ্জ্বলা সিনেমার ডালমুট—নিজে খেলেন মুঠো মুঠো, পাগলের মতো। যেদিন 'ছিন্নপত্র' ছবির 'তোমাকে স্বপ্নে দেখেও সুখ/তোমাকে সামনে দেখেও সুখ' লিখলাম বললেন—চলো—আমারা দুজনে কোথাও 'অসভ্য' করে আসি। বলেই হা-হা করে হাসতে লাগলেন!

আর একবার উনি তখন দীর্ঘ কয়েক বছর নিষ্ফল মুম্বই-এ বাস করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন—আরতি মুখার্জির পুজোর গান নিয়ে আমরা বসেছি—শোনালেন মুম্বইতে বানানো একটা হিন্দি গান—'আজা—ও মেরি' ইত্যাদি। সুরটা দারুণ ভাল লাগল। লিখে ফেললাম—'লজ্জা—মরি মরি এ কী লজ্জা'। দারুণ জমে গেল গানটা। উল্টো পিঠটা কী করি? বললাম—কাল সকালে গান লিখে নিয়ে আসব। সারাদিন ভাবি।

আমাদের বাড়ি গঙ্গার ধারে আহিরিটোলা ঘাটের ঠিক অপর পাড়ে বাঁধাঘাটের কাছেই। মধ্যে ফেরি-স্টিমার চলে। সেদিন গাড়ি ছিল না। স্টিমার পেরিয়ে বাড়ি আসব ঠিক করে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়ালাম। আহিরিটোলায় স্টিমার ঘাটের পাশেই স্নানের ঘাট। হঠাৎ নজরে পড়ল—একটা লেখা—সাবধান, গভীর জল।

স্টিমারে এ পারে আসতে পাঁচ মিনিট লাগে। ওরই মধ্যে মনে মনে আমার লেখা হয়ে গেল—'জলে নেবো না—আর থৈ পাবে না/থৈ থৈ করে নদী এখন যে বরষা' পরদিন সকালে ও গানটা পেয়েই তৎক্ষণাৎ অপূর্ব সুর করে ফেললেন নচিবাবু। করেই বললেন—চলো, এখন পার্ক স্ট্রিটে যাই। ওখানে খাওয়া দাওয়া করব। যা-খুশি খাব, তুমি বাধা দেবে না। এমন সব অজস্র ঘটনা রয়েছে আমার সঙ্গে ওঁর আমার কাজের। এইসব আশ্চর্য লোক এখন এ জগতে নেই, বুকটা খাঁ খাঁ করে। সত্যি, এখন কাজের সে আনন্দই নেই—সব-ই মেকানিক্যাল—সব-ই ফর্মাল।

আর একজন গায়ক-সুরকারের প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হয়নি। তিনি অখিলবন্ধু ঘোষ। সেবার এক বড় কম্পিটিশানে মেয়েদের মধ্যে প্রথমা হয়েছিল আরতি মুখার্জি আর পুরুষ বিভাগে গানে প্রথম হয়েছিলেন নির্মলকুমার। স্কটিশ চার্চ কলেজে আমার থেকে দু ইয়ারের সিনিয়র ছিলেন নির্মলদা। নির্মলদা অখিলবন্ধুর কাছে গান শিখতেন। একদিন সন্ধ্যায় আমায় নিয়ে গেলেন ওখানে। (এই নির্মলদাই আমাকে দিয়ে জীবনে একটা দুঃসাহসিক কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। 'কোহিনুর' রেকর্ডে আমার শুধু কথায় নয় সুরেও গেয়েছিলেন দুটো গান।) সেদিন যখন ভবানীপুরের টার্ফ রোডে অখিলবন্ধুর বাড়ি পৌছুলুম তখন আলো ঝলমল করছে গোটা ভবানীপুর। একালের সহজলভ্য লোডশেডিং তখন কারও কষ্টকল্পনাতেও আসত না। কিন্তু অখিলবন্ধুর বাড়ি অন্ধকার। ঢুকতে ঢুকতে নির্মলদা বিড়বিড় করে বললেন—আজও অখিলদার ইলেকট্রিকের বিলটা দিয়ে আসার সময় হল না। একটা ঘরে ঢুকে মাদুরে বসলাম আমরা। ঘরটা ধূপের গন্ধে

আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ভর্তি। একটা মোটা মোমবাতি জ্বলছে। কেদারা রাগে একটা উচ্চাঙ্গ গীতি গাইছেন শিল্পী। একজন তবলা বাজাচ্ছেন। শুনছেন অনেক ছাত্র এবং অন্যান্য শ্রোতা।

গান শেষ হতেই উপস্থিত সবাই 'সাধু সাধু' বলে উঠলেন। হেসে প্রত্যেককে প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে শিল্পী বললেন—এই যে নির্মল, কখন এলে?

নির্মলদা বললেন অনেকক্ষণ। এ হচ্ছে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব ভাল গান লিখছে। অখিলবন্ধু তৎক্ষণাৎ হারমোনিয়মটায় আবার ওই কেদারা-রাগ বাজিয়ে বললেন—লিখুন তো একটা গান। 'কেদারা' দিয়ে শুরু করব পরে আনব 'বসন্ত' বা 'বাহার'। আইডিয়াটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। লিখুন—লিখুন— চুপ করে বসে আছেন কেন? কাল বালিগঞ্জে মুম্বই থেকে অশোককুমার ফাংশান করতে আসবেন। উনি নিজে আমায় ডেকেছেন ওখানে। এ গানটা গাইব। এক ঘর ভর্তি লোক। ধোঁয়ায় ভর্তি ঘর। টিমটিমে আলো। লিখে ফেললাম—'আজি চাঁদিনী রাতি গো/মালাখানি গাঁথি গো/ফিরে যেও না/যেও না—'

বালিগঞ্জের অনুষ্ঠানে ও গানটা গাইলেন অখিলবন্ধু। গান শেষে মঞ্চে উঠে এক বাঙালি গায়ক-শিল্পীকে গোলাপফুল দিয়ে অভিবাদন জানালেন আর এক বাঙালি নায়ক-শিল্পী অশোককুমার।

আগেই বলেছি 'লাক' বা যোগাযোগ বা আমাদের সাংগীতিক পরিভাষায় 'টিউনিঙ'। ওই রাতের ঘটনা থেকেই আমার সঙ্গে সেই 'টিউনিঙ'টি হয়ে গেল অখিলবন্ধু ঘোষের। এই টিউনিঙের ফলেই প্রথম গান থেকেই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভূপেন হাজারিকা—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—মান্না দে—রতু মুখোপাধ্যায়—নচিকেতা ঘোষ—সুধীন দাশগুপ্ত—গোপেন মল্লিক—রাজেন সরকার—অরূপ—প্রণয়—বাবুল বোস—মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়—অজয় দাশ এবং আজকের বিখ্যাত বাপি লাহিড়ি ইত্যাদি অনেক সুরকারের সঙ্গেই আমি বহু জনপ্রিয় সুপারহিট গান বাঁধতে পেরেছি।

যতদূর স্মরণে আসছে অখিলবন্ধু ঘোষ প্রথম আমার গান রেকর্ড করেন মুম্বাই থেকে লেখা পোস্টকার্ডে পাঠানো একটি গান। গানটি লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম শচীন দেব বর্মণের জন্য। শচীনদা অনিবার্য কারণবশত সে গানটি রেকর্ড করতে পারেননি (এই অনিবার্য কারণটা ভারী মজার ব্যাপার—পরে শোনাব) কিন্তু গানটি আমার কাছে শুনেছিলেন। শুনেই বাঙাল ভাষায় বলেছিলেন—দারুণ গান। যে গাইবে 'সুপার হিট' করবে। তখনই উদ্দীপনায় হাতের কাছে একটা পোস্টকার্ড পেয়ে মুম্বই থেকে গানটি লিখে পাঠিয়ে ছিলাম অখিলবন্ধুর কলকাতার ঠিকানায়। গানটি—'ও দয়াল বিচার করো—দাও না তারে ফাঁসি/আমায় গুণ করেছে/আমায় খুন করেছে ও বাঁশি।'

এই গানটিরই আর এক রূপান্তর নির্বিবাদে আমায় হজম করতে হয়েছিল বাংলাদেশে—ঢাকায়। বাংলাদেশের অভিনেত্রী রোজিনার প্রযোজক স্বামী ঢালী সাহেব চমৎকার মানুষ। আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু। ওঁর বাংলা দেশের ছবি 'কুঁচবরণ কন্যা' এখানেও নতুন করে তৈরি করেছিল আমার নিজের ছোট ভাইয়ের থেকেও কাছের স্বজন 'টোটন' (গৌতম সিংহ রায়) আর 'টনি'। টোটন এখানে নতুন সুরে 'মিউজিক ট্রাক করা'

'কুঁচবরণ কন্যা'র গানগুলো ঢাকার দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন আর এন্ড্রুকিশোর-কে দিয়ে প্লে-ব্যাক করানোর জন্য আমায় নিয়ে গেল ঢাকায়। বলাবাহুল্য, গান লিখেছিলাম আমি। ঢাকার 'এলভিস স্টুডিয়ো'তে গান ডাবিং করার সময় সাবিনা আর এন্ড্রুর গান গাওয়ার যে পরিচয় পেয়েছিলাম—তা আজও ভুলিনি। দুজনেরই গলার অসাধারণ রেঞ্জ, চমৎকার গায়কী। আমায় মুগ্ধ করে দিয়েছিল ও দুজন শিল্পী।

স্বভাবতই সেবার আমরা ঢালী সাহেবের আতিথ্য নিয়েছিলাম। ওখানেই এক দিন ঢালী সাহেব আমাদের বাজিয়ে শোনাল ওর আগেকার এক সুপারহিট ছবি 'রাধাকৃষ্ণ'র কয়েকটি সুপারহিট গান। শুনে দেখি আমার 'ও দয়াল বিচার করো' গানটির কথাগুলো দিব্যি না-বলে ব্যবহার করা হয়েছে একটি গানে। ব্যাপারটা হাসতে হাসতে জানালাম ঢালী সাহেবকে। ও সহজ সরল মানুষ। এ সবের কিছুই জানত না। আমায় শুধু বলল—যাঃ! তা হলে কী হবে?

বললাম—কী আর হবে? অঢেল খাবার তো খাওয়াচ্ছ—ওই গানটার 'অনারে' আমি আর টোটন না হয় এখানকার খাঁটি ঘিয়ের দু প্লেট করে 'চিকেন বিরিয়ানি' বেশি করে খাব। মনে আসছে আমার লেখা অখিলবন্ধু ঘোষের দরদী কণ্ঠে গাওয়া বহু বহু গানের কথা। 'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা আমি কাঁদি সাহারায়'। 'ঐ যাঃ আমি বলতে ভুলে গেছি/ও যেন বাঁশি না বাজায়/' 'না হয় মন দিতেই তুমি পারো না/তাই বলে যে মন পাবে না/কেন এমন ধারণা?' 'আমি কথা দিলে কথা রাখি' 'সেদিন চাঁদের আলো চেয়েছিল জানতে ওর চেয়ে সুন্দর কেউ আছে কি/আমি তোমার কথা বলেছি।' 'কবে আছি কবে নেই।' 'সারাটি জীবন কী যে পেলাম' 'কেন তুমি বদলে গেছো' 'যে তোমায় সাধু সাজায়' 'যেন কিছু মনে কোরো না/কেউ যদি কিছু বলে' ইত্যাদি।

সন্ধ্যা মুখার্জির বড়দাকে অনুরোধ করাতে আমার কথায় সন্ধ্যা গেয়েছিল—অখিলবন্ধুর সুরে দুটো গান—'যমুনা কিনারে রাত আঁধারে' 'আমার মনে নেই মন কী হবে আমার'। শেষের গানটি আমার খুবই প্রিয়।

এইচ. এম. ভি. আমার স্মরণীয় আধুনিক গান নিয়ে যে ক্যাসেটটি বার করেছে—তাতে দিয়েছি গানটি। এই অখিলবন্ধুরই একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি লক্ষ করেছিলাম। সেটাই এবার বলি। মেগাফোনের কর্ণধার কমল ঘোষ আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন আমায় বলল—পুলক, এবার একটু চেঞ্জ করো, অখিল তো বরাবরই নিজের সুরে গাইছে, এবার অন্য কোনও সুরকারের সঙ্গে লেখো। প্রস্তাবটা মনে হল সুফল দেবে। কিন্তু অখিলবন্ধুর একটা বিশেষ ধারা বা 'টাইপ' আছে। ওর গান বানাবে কে? কিছুকাল আগে সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের দুটো পুজোর গান লিখেছিলাম—'রিম্ ঝিম্ ধ্বনি শুনি কার পায়' এবং 'এ কী কথা আমি লাজে মরি'। মাথায় এল সন্তোষদার নাম।

কমল বলল—খুব ভাল ভেবেছিস—তুই সন্তোষদার সঙ্গে বসে যা, আমি অখিলকে বলে রাখছি।

গান তৈরি হল। গান তুলতে এলেন অখিলবন্ধু। আশ্চর্য কিছুতেই গান তুলতে পারলেন না। দুদিন-তিনদিন ধরে রীতিমতো কসরত করে রেকর্ড করলেন সে গান। অন্যের সুরে বাঁধা পড়ে হারিয়ে গেল শিল্পীর দরদী কণ্ঠের মুক্ত আবেগের ওঠানামা।

স্বভাবতই 'ফ্লপ' করল রেকর্ডটা।

একদিন রাতে বাড়িতে বেশ আরামে ঘুমোচ্ছি। শোবার ঘরের দরজায় মৃদু মৃদু ধাক্কা শুনতে পেলাম। চমকে উঠে দেখি ঘড়িতে রাত তিনটে।

দরজা খুলতেই আমাদের পুরানো দারোয়ান গলা নামিয়ে হিন্দিতে বলল—দুজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এত রাত্রে দুজন বাবু? পাশের ঘরে বাবা ঘুমোচ্ছেন। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

চোখে পড়ল দু জন বাবু—বাবলি সরকার আর শ্যামল মিত্র।

৯

হেমন্তদা যে কথাটা বারবার বলতেন—আমিও চিরদিন তারই প্রতিধ্বনি করে গেছি। কথাটা হচ্ছে 'ভাগ্য' অর্থাৎ 'লাক'। শ্যামল মিত্রর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল খুবই অন্তরঙ্গ। আমার লেখা ওর গাওয়া অজস্র সুপারহিট গান আছে—কিন্তু ওর সুরে আমার একটাও গান হিট করেনি। অথচ আমরা দুজনে কাজ করেছি প্রচুর ছবিতে—প্রচুর রেকর্ডে।

বন্ধুত্ব কেমন ধরনের ছিল সেটারই একটা ঘটনার আগে উল্লেখ করি। সেদিন রাত তিনটেতে শ্যামল আর বাবলি সরকারকে আমার সালকিয়ার বাড়িতে দেখে মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই ওরা কারও মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছে। তখন এখনকার মতো 'সারা রাত্রব্যাপী বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠানে' রাত বারোটা অবধি কোনওরকমে দু-তিনজন শিল্পীকে দিয়ে বাংলা গান গাইয়েই অমুক কণ্ঠ অমুক কণ্ঠীরা বেসুরো ব্যান্ডপার্টির সঙ্গে 'রিভার্ব মাইক' দিয়ে বেসুরো গান নৃত্যসহযোগে শোনাবার সাহস পেত না। বা একটা গান শেষ হতেই হাততালি পেয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে 'থ্যাঙ্ক ইয়ু' 'থ্যাঙ্ক ইয়ু' বলে নিজেদের বিদেশি বিদেশিনী জাহির করার উৎসাহই পেত না বা শ্রোতারাও প্যান্টের সঙ্গে হাওয়াই চপ্পল পরে এভাবে গানের সঙ্গে শিস দিয়ে নাচত না। তখন সারা রাত্রই হত বাংলা গান। হেমন্তদা অনুষ্ঠানে থাকলে রাত ভোরে দরাজ গলায় গাইতেন—

'যখন ভাঙল মিলন মেলা'। মান্নাদা থাকলে সদ্য ওঠা ভোরের আলোয় 'লাগা চুনুরি মে দাগ' গেয়ে আসর মাত করে অনুষ্ঠান শেষ করতেন।

সেই সময়েই সম্ভবত বালি বা উত্তরপাড়ার কোনও এক বিচিত্রানুষ্ঠানে রাত আড়াইটেতে গান শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমার বাড়ির কাছে এসেই শ্যামলের মনে হয়েছে আমার কথা। ঢুকে পড়েছে বাড়িতে। বাবলিদাকে বলেছে রাত জেগে আসরে পুলকের গান গাইছি আর পুলক বেশ আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ডাকো পুলককে?

বৈঠকখানায় বসালুম দুজনকে। শ্যামল জানত উত্তমকুমার বিশ্বজিৎ আর শ্যামলকে আমার বাবা ভীষণ ভাল বাসতেন। কোনওরকমে যদি শোনেন শ্যামল এসেছে এখনি হাজির হয়ে যাবেন বাবা।

শ্যামল গলা নামিয়ে বললে—মেসোমশাই আসবেন না তো?

বললাম—না। আমাদের দারোয়ান বুদ্ধিমান। তাই রাত্রিতে 'বেল' বাজায়নি। নিজে

ওপরে এসে দরজায় টোকা দিয়েছে।

শ্যামল নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, প্রোগ্রাম হয়ে গেল। এক্ষুনি বাড়ি যেতে মন চাইল না। তা-ই তোর কাছে এলাম। আলো ফুটলে তোদের পাড়ার গরম জিলিপি আর চা খেয়ে বাড়ি যাব। এই ছিল তখনকার কণ্ঠশিল্পী আর গীতিকারের সম্পর্ক। আজকের শিল্পীরা হয়তো এটা কল্পনাই করতে পারবে না।

মনে আছে, উত্তমের 'ভ্রান্তিবিলাস' ছবি হচ্ছে। পুজোর কয়েকদিন পরেই গান রেকর্ডিং। মহাসপ্তমীর রাতেই শ্যামল বাংলার বাইরে তিন-চার দিন ফাংশান করতে চলে যাবে। এসেই রেকর্ড করবে সন্ধ্যা মুখার্জির দুটো গান। সেইমতো রেকর্ডিং ডেটও নেওয়া হয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার জন্য 'তুমি কি সে তুমি নও' আর 'এতো ভোরে যেওনা গো জাগেনি সজনী' গান দুটি লিখে উত্তমকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে নিয়েছি। শ্যামলেরও খুব পছন্দ হয়েছে। শ্যামল বলেছে চমৎকার ছন্দ আছে, ভাল সুর হবে।

মহাষষ্ঠীর দুপুর নাগাদ শ্যামলের ফোন এল। আজকে গান দুটো নিয়ে বসেছি। গানের কথা সুরের খাতিরে একটু অদল বদল করতে হবে। তুই কাল সকালে একটু কষ্ট করে আয়। বলতে হল—কাল মহাসপ্তমী, আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো। কী করে যাব? তা ছাড়া, উত্তম আসবে, তুই-ও চলে আয় না।

শ্যামল অনুরোধ করলে—প্লিজ একটু আয়। কাল রাতেই যে আমি বাইরে চলে যাব। নোটেশ্যান দিয়ে যেতে চাই। আধঘণ্টায় তোকে ছেড়ে দেব।

শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলাম: পুজোর ভিড়ে আমি গাড়িই চালাতে পারব না। ও শুনে বললে—ট্যাক্সি করে চলে আয়। একটু সকাল সকাল আয়। আমরা গান দুটো শেষ করে আমার গাড়িতে উত্তম আর গৌরীকে ভবানীপুর থেকে তুলে নিয়ে একসঙ্গে সবাই তোর সালকিয়ার বাড়িতে অঞ্জলি দেব। মহাসপ্তমীর প্রসাদ খেয়ে আসব।

ঠিক হেমন্তদার মতো, শ্যামলও কখনও কোনওদিন পরচর্চা করত না। কথার দামও ছিল ওর অসাধারণ। পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তী উত্তমকে নিয়ে 'সখের চোর' ছবি তৈরি করছে। একদিন শ্যামল আর আমি একসঙ্গে উত্তমের বাড়ি এসে পড়েছি। উত্তম আমাকে দেখেই বললে—মামা, (আমায় চিরকাল 'মামা' বলেই ডাকত।) তোমার কথাই ভাবছিলাম। প্রফুল্লদাকে বলেছি, সখের চোর-এ তুমি গান লিখবে আর শ্যামল সুর করবে। কী শ্যামল ভাল হল না ব্যাপারটা? শ্যামল বললে—নিশ্চয়ই। সিচুয়েশন পেলেই আমি পুলকের সঙ্গে বসে যাব।

প্রফুল্লদার বাড়িতে টেলিফোন ছিল না। এক দিন শ্যামল ফোন করল, অমুক দিন বিকেল পাঁচটায় প্রফুল্লদা সিচুয়েশন বোঝাবেন। প্রফুল্লদার বাড়ি ছিল বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে। নির্দিষ্ট দিনে ওঁর বাড়ির কাছে এসে দেখি তখন মাত্র চারটে বাজে, পাঁচটা বাজতে এখনও পাক্কা একঘণ্টা বাকি।

আমাদের বন্ধু স্থানীয় রমেন ঘোষের গড়িয়াহাটের 'নিরালা' রেস্টুরেন্টে একঘণ্টা সময় কাটিয়ে ঠিক পাঁচটায় ওখানে যাবার মনস্থ করলাম।

নিরালায় ঢুকে দেখি 'বড়দা' (সন্ধ্যা মুখার্জির বড় ভাই রবীন মুখোপাধ্যায়) আর এক গীতিকার বসে আছেন। বড়দা উচ্ছ্বসিত হয়ে আমায় ডাকলেন: আরে, পুলকবাবু যে! এ

সময়ে এ পাড়ায় কোথায় চললেন? গানের জগতের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের খোঁজ নেওয়া ছিল বড়দার বহুদিনের অভ্যাস।

বললাম—এই এ পাড়ায় একটু কাজ আছে। তা-ই এসেছি। একটু চা-টা খেয়ে তারপর যাব।

বড়দা তক্ষুনি বললেন—আমি খাওয়াচ্ছি। সঙ্গে একটা চিকেন কাটলেট অর্ডার দিয়ে ডাকলেন ওঁদের টেবিলে। বসালেন ওঁর-ই পাশে।

অদ্ভুত স্পষ্ট বক্তা মানুষ ছিলেন এই বড়দা। প্রচুর কথা বলতেন। আগেই বলেছি উনি না-থাকলে সবসময় সকলের সঙ্গে ওভাবে নিবিড় যোগাযোগ না-রাখলে সন্ধ্যা মুখার্জি হয়তো এত বড় হওয়ার সুযোগই পেতেন না।

বড়দা নিয়মিত সপ্তাহে একদিন রাত এগারোটা নাগাদ আমায় ফোন করতেন। টেলিফোনে জমাতেন আড্ডা। অক্লান্তভাবে কথা বলে যেতেন। তখন টেলিফোন ইলেকট্রনিক্স হয়নি। ঘনঘন শুনতে হত না এই 'বিপ' 'বিপ' (লাইন কেটে দিন—লাইন কেটে দিন)। এক-একদিন কথা ফুরিয়ে গেলে রাত বারোটার পরে বলতেন আচ্ছা গুড নাইট। এক-একদিন কিছুতেই কথা শেষ করতে চাইতেন না। বলেই যেতেন। ঘুমে আমার চোখ জুড়িয়ে আসত। আমি আবিষ্কার করেছিলাম একটা মহান অস্ত্র। ঘড়িতে যখন দেখতাম রাত সাড়ে বারোটা তখন সেটা প্রয়োগ করতাম। হঠাৎ বলতাম, ওহো! এতক্ষণ কথা বলছি, অথচ একটা জরুরি কথা বলতেই ভুলে গেছি।

বড়দা হয়তো ভাবতেন—সন্ধ্যার কোনও জরুরি প্লে-ব্যাকের কথা। উপদেশ দিতেন, বলছি না সব সময় পকেটে একটা ছোট ডায়রি রাখবেন। এই তো ভুলে যাচ্ছিলেন। যা হোক, বলুন কী ব্যাপার?

বলতাম: আজই সকালে আমার দুজন আত্মীয় চুঁচুড়া কলেজের দুজন ছাত্র এসেছিল। ওরা সন্ধ্যার ডেট চায়। সন্ধ্যাকে দিয়ে ফাংশন করবে।

মন্ত্রের মতো কাজ হত। ফাংশান শুনলেই ও বড়দা হয়ে যেতেন অন্য বড়দা। সঙ্গে সঙ্গে বলতেন—কাল সকালে ফোন করবেন। আজ গুড নাইট। কেটে দিতেন টেলিফোনটা।

আমি নিশ্বাস ফেলে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল ঢকঢক করে খেয়ে শুয়ে পড়তাম।

যা হোক, আবার 'নিরালা' রেস্টুরেন্টে ফিরে আসি। বড়দা আর ওই গীতিকারও আমার সঙ্গে কাটলেট আর চা খেলেন। অনেক গল্প হল। হাত ঘড়িতে দেখলাম প্রায় পৌনে পাঁচটা। এবার উঠতে হয়।

বড়দা আর ওই গীতিকারকে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লাম।

গীতিকার বললেন—আমি একটু থাকি, ছটায় প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বাড়িতে যেতে হবে 'সখের চোর'-এর গানের সিচুয়েশন বুঝতে। শ্যামল ওখানে থাকবে।

'নিরালা' থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে মনে হল পৃথিবীটা দুলছে। শ্যামল তা হলে স্রেফ একটা আইওয়াশ করাবার জন্য আমায় প্রফুল্লদার বাড়িতে ডাকল। পাঁচটার সময় প্রফুল্লদার কাছ থেকে সিচুয়েশন বুঝে নিয়ে ছটায় অন্য গীতিকারকে দিয়ে গান লেখাবে? উত্তমকে বলবে—পুলক ঠিক সিচুয়েশন মতো লিখতে পারল না তাই বাধ্য

হয়ে অন্য গীতিকারকে নিতে হল?

জানতাম, বুঝতাম, আমাদের গানের জগৎ নানা নোংরা রাজনীতিতে ভর্তি। এ-ও একটা তার-ই নতুন চাল। ঠিক করলাম, শুধু শুধু অপমানিত হতে প্রফুল্লদার বাড়িতে যাব না। বাড়ি ফিরে যাই। পর মুহূর্তেই মনের জোর করলাম— দেখাই যাক না খেলাটা। না হয় এখান থেকে সোজা চলে যাব উত্তমের বাড়ি। আগে থেকেই উত্তমকে ঘটনাটা কোন দিকে গড়াতে পারে জানিয়ে রাখব। বুকে সাহস সঞ্চয় করে এলাম প্রফুল্লদার বাড়ি। প্রফুল্লদা ঘড়ি দেখলেন পাঁচটা পাঁচ।

বললেন—শ্যামল এখনও আসেনি। এলে জমিয়ে চা খেয়ে কাজ শুরু করব।

শ্যামল এসে গেল। চা খাওয়া হল। প্রফুল্লদা স্ক্রিপ্টের ফাইলটা খুলতে গেলেন।

তখনই মরিয়া হয়ে বললাম: দাঁড়ান! শ্যামল কি অমুক গীতিকারকে 'সখের চোর'-এর গান লিখতে ছ'টার সময় ডেকেছে?

শ্যামল আকাশ থেকে পড়ল—কী আবোল তাবোল বকছিস?

বললাম—মোটেই আবোল তাবোল নয়, এইমাত্র নিরালায় ওই গীতিকারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি বললেন।

শ্যামল আশ্বস্ত করল আমাকে। ও চিরদিনই সব জায়গায় যখন-তখন কারণে-অকারণে এই রাজনীতি করে থাকে। তোর সঙ্গেও করেছে। আমি উত্তমের সামনে তোকে কথা দিয়েছি। তুই-ই গান লিখবি। আর কেউ নয়। দরকার হলে ছবিটাই ছেড়ে দেব আমি। জীবনে কথা দিয়ে কোনও কথার নড়চড় আমি কখনও করিনি, করবও না। তুই ঠাণ্ডা মাথায় গান লেখ। এমন লেখ যাতে উত্তম আমার আর প্রফুল্লদার মুখ থাকে। ওসব বাজে কথায় কান দিয়ে একদম মনোযোগ নষ্ট করিস না।

'সখের চোর'-এ আমিই গান লিখেছিলাম।

শ্যামলের কণ্ঠে উত্তমের ঠোঁটে আমার লেখা 'আমার ছন্দে ভরা ছোট্ট তরী যায় ভেসে'—অনেকেরই প্রশংসা কুড়িয়েছিল।

এ রকম ঘটনা শ্যামলের গান নিয়ে আমার জীবনে আবার ঘটেছিল। ছবির নাম— 'অন্য মাটি অন্য রং'।

পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভোরবেলায় হাওড়া স্টেশনে নামতেই দেখি প্ল্যাটফর্মে বাংলা ছবির একজন বিশিষ্ট প্রোডাকশান ম্যানেজার। ভাবলাম, উনি হয়তো কাউকে নিতে এসেছেন। লোকের ভিড়ে আমাকে দেখেননি। আমিই সৌজন্যমূলক আচরণ করলাম—এই যে কেমন আছেন? কে নামছে ট্রেন থেকে?

ভদ্রলোক আমার কাছে দৌড়ে এসে বললেন—আপনার জন্যই স্টেশনে এসেছি। কাল রাতে বাড়িতে ফোন করেছিলাম। মা বললেন—আজই পুরী থেকে ফিরছেন। চলুন চলুন—আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। খুব দরকার।

অবাক হলাম—কোথায় যাব?

উনি বললেন—স্টুডিয়োতে। গান রেকর্ডিং। ন'টায় মিউজিশিয়ান আসছে। দশটায় আসবেন শ্যামল মিত্র। সুরের নোটেশ্যান দেওয়া হয়ে গেছে, শুধু গান লেখা হয়নি। চলুন চলুন।

বললাম, আগে খুলে বলুন ব্যাপারটা। শুনলাম, এক গীতিকারের গানে সুর দিয়ে আজকে রেকর্ড করতে যাচ্ছিলেন সুরকার হৃদয় কুশারি। কাল সন্ধ্যায় কী কারণে সুরকারের সঙ্গে গণ্ডগোল বেঁধে যায় ওই গীতিকারের। ওঁকে ওঁর প্রাপ্য অর্থ পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়ে আমাকে দিয়ে গান লেখানোর সম্মতি পত্রে সই করিয়ে নেন প্রযোজক। সুতরাং এখনই স্টুডিয়োতে পৌঁছে ওই সুরের ওপর আমায় গান লিখে দিতে হবে।

আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। আজকে গান রেকর্ডিং না হলে ওঁদের খুবই লোকসান হবে। সেট লেগে গেছে। বাধ্য হয়ে বাড়িতে লাগেজগুলো রেখে স্নানটা সেরে জামা কাপড় বদলে তখনই ছুটতে হল টালিগঞ্জ।

হৃদয় কুশারি মিউজিশিয়ানদের নিয়ে সুরের রিহার্সাল করতে লাগলেন। শুনতে শুনতে ওঁদের ছবির সিচুয়েশন মতো লিখে ফেললাম গান। শ্যামল সুন্দর গাইল—'তুমি মানুষকে দিয়েছিলে প্রেম/বিনিময়ে সে দিল হেলা/শুধু স্বার্থের এই সংসার/প্রভু এ কী তোমার খেলা'। গানটি রীতিমতো হিট করেছিল।

অকালে অনেক দুঃখ—অনেক নৈরাশ্য নিয়ে চলে গেল এই শ্যামল। রবীন্দ্রসদনে ওকে শেষ দেখতে দেখতে মনে হল—ও যেন আমাকে শুনিয়েই আমার একটা গান গাইছে—'আমি তোমার কাছেই ফিরে আসব/তোমায় আবার ভালবাসব/ তুমি কি ডাকবে মোরে/চেনা সে নামটি ধরে?'

জানি না, শ্যামল আবার কবে ফিরে আসবে? কোথায় আবার আমাদের দেখা হবে!

১০

অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি। তবু থেমে থাকতে পারিনি। শুধু চলেছি আর চলেছি। মাঝে মাঝে স্মৃতির আয়নায় মুখ দেখি। কত মুখ—কত সুন্দর—কত কুৎসিত। সবাইকে সুন্দর দেখতে চেষ্টা করি। চোখের দেখায় কত রূপ বদলে যায়। মনে পড়ছে গোপেন মল্লিকের কথা। গোপেনদা প্রথম জীবনে ছিলেন বিখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্তের সহকারী। তারপর ওই সাহেবি গ্রামোফোন কোম্পানিতেই ফ্রিলান্স সুরকার হন। বহু গান ওঁর হিট। সতীনাথ মুখার্জি ওঁর গান রেকর্ড করেই সংগীতজগতে প্রবেশ করেন। এই গোপেনদারও কোনওদিন সঠিক মূল্যায়ন হল না। কিছুদিন গোপেনদা চিত্র প্রযোজকও হয়েছিলেন। বিখ্যাত পরিচালক সুশীল মজুমদারও আর এক অংশীদার যাঁর পদবিটা ইংরেজি এম অক্ষর দিয়ে শুরু ছিল। এই তিনজনে অর্থাৎ এঁর 'এম' মল্লিকের 'এম', মজুমদারের 'এম' নিয়ে ওঁদের ব্যানার ছিল—'থ্রি এম্ প্রোডাকশান্স'। যা হোক, আমার সঙ্গে গোপেনদার প্রথম যোগাযোগ পাঁচু বসাকের (জয়দ্রথের) 'অগ্নি বন্যা' ছবি থেকে।

গোপেনদার সঙ্গে কাজ করে দেখলাম উনি আগে থেকে গানের সুর দেওয়ার রীতিমতো বিরোধী। উনি চান লেখা। ওঁর কাছে গান লেখা সত্যিই এক প্রাণান্তকর পরিশ্রম ছিল। মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরত। মনে হত, দূর, ইনি অবুঝ। কী যে চান নিজেই জানেন না। ছেড়ে দিই ওঁর কাজ। কিন্তু অ্যাতো সুন্দর আন্তরিক ব্যবহার ছিল ওঁর, পরমুহূর্তে সব বিরক্তি জুড়িয়ে যেত। কিন্তু আমার আজকের মতোই তখনও বিশ্বাস ছিল

গান আবেগের সৃষ্টি, অত আচার বিচার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে গান লেখা উচিত নয়। তাই উত্তমকুমারের মতো শিল্পী অভিনীত হিট ছবি 'জীবনমৃত্যু'-তে গোপেনদা আর আমার গান তেমন জমেনি সন্ধ্যা মুখার্জি আর মান্না দে গাওয়া সত্ত্বেও। গানটি ছিল—'কোনও কথা না বলে/গান গাওয়ার ছলে।'

'অগ্নি বন্যার' গানগুলোও তেমন জমল না। এরপর আমরা মিলিত হলাম মঙ্গল চক্রবর্তীর 'দিনান্তের আলো' ছবিতে। এ ছবিতেই লক্ষ করলাম গতানুগতিক বাংলা গানের চেয়ে একটু এদিক ওদিক করে লেখা গানেই ওঁর সুর করার আগ্রহ বেশি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই লিখে ফেললাম—'সাবাস আমার হাওয়াই গাড়ি'। 'বাংলায় যাকে বলে ভালবাসা হিন্দিতে তার-ই নাম মোহব্বৎ।'

চমৎকার সুর করলেন গোপেনদা। মান্নাদা দারুণ গাইলেন। সুপার হিট! মান্নাদা মুম্বই-তেও এ গানটা অনেককেই গেয়ে শুনিয়েছিলেন। শুনিয়ে ছিলেন অনেক নামী সংগীত পরিচালকের বাঙালি পত্নীকেও।

হয়তো তাই কিছুদিন বাদেই মুম্বই-এর এক গানে শুনতে পেলাম—সে গানের অনুলিপি—"আংরেজী মে কহ্‌তে হ্যায় আই লাভ ইয়্যু/গুজরাটি মে কহতে হ্যায় প্রেম করো ছু।"

গোপেনদার সঙ্গে এরপর আমার উল্লেখযোগ্য ছবি 'আশিতে আসিও না'। ছবিতে ঘটনা ছিল দৈবযোগে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স কমে গেছে। উত্তমকুমারের ভঙ্গিতে ভানুদা পত্নী রুমা গুহঠাকুরতাকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে দ্বৈত সংগীত গাইছেন। দৈব শক্তিতে স্বামীরই বয়স কমেছে স্ত্রীর নয়। ভানুদার গলায় লিখেছিলাম—'তুমি আকাশ এখনি যদি হতে/আমি বলাকার মতো পাখা মেলতাম।' রুমা গুহঠাকুরতার মুখে এর উত্তরে লিখেছিলাম—'ময়দা যদি হতে তুমি/জলখাবারের লুচি বেলতাম।'

গানটি পেয়ে পরিচালক পাঁচু বসাক আর গোপেনদা একরকম লাফিয়ে উঠেছিলেন। গোপেনদা বললেন পুরুষ অংশটা একটু রোমান্টিক আধুনিক স্টাইলে করব। তবে স্ত্রীর অংশটায় লাগিয়ে দেব 'কে বিদেশী মন উদাসী/বাঁশের বাঁশী বাজাও বসি' সুরটা। দারুণ জমে যাবে গান। সত্যিই দারুণ জমে গেল। ছবিটায় প্রথমে ঠিক ছিল রুমা গুহঠাকুরতার ভূমিকাটি সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় করবেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে সাবিত্রী দেবী কাজটা নিলেন না। তার আগেই মান্না দে আর নির্মলা মিশ্রকে দিয়ে গানটা রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছিল। সাবিত্রীর জায়গায় যখন রুমা এলেন, তখন রুমা দেবী বললেন আমি নিজে গান করি, অন্যের গাওয়া গানে 'লিপ' দেব না। তখন এখনকার মতো 'ট্রাক সিস্টেম' হয়নি। তাই গানটা মান্না দে আর রুমা দেবীকে দিয়ে আবার টেক করতে হয়েছিল। ছবিতে ছিল রুমার গাওয়া গানটাই। গ্রামোফোন রেকর্ডে ছিল নির্মলার গাওয়া গানটা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—রুমা দেবীর সঙ্গে মান্না দের গানটি রিটেকের সময় স্টুডিয়ো, প্রতিটি বাজনদার—প্রত্যেকেই আবার পয়সা নিয়েছিলেন—কিন্তু মান্না দে পেমেন্ট নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

আগেই বলেছি এই ধরনের গানে গোপেনদার 'ন্যাক্‌টা' আমি ধরে ফেলেছি। তাই ডি. এম. পালের উত্তমকুমার অভিনীত ছবি 'তিন অধ্যায়'-তে গোপেনদার সুরে আর মান্নাদার

গাওয়ার জন্য লিখেছিলাম 'দাদা লড়ে যাও/ঝোপ ঝাড় বুঝে/ঠিক তাল খুঁজে...কোপ দাও।' আর 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু প্লিজ ডোন্ট টাচ্।' তিন অধ্যায়ে অবশ্য আমার আর একটি গানও খুব ভাল সুর করেছিলেন গোপেনদা। সেটা 'তোমার ভুবনে তুমি আলোর প্রভাত দিয়েছো।' গেয়েছিল প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রচুর ছবিতে সুর দিয়েছিলেন গোপেনদা। গোপেনদার হাতে থাকত চামড়ার একটা ব্যাগ। সেটাই ছিল ওঁর মোবাইল অফিস। ওখানেই থাকত ট্যাক্সের নোটিস। আমাদের গান। অনেক দরকারি চিঠিপত্র, আবার বউদির হাতে তৈরি ঘরে কাটানো ছানার ছোট বাক্সটাও। বলতাম—ওটা এবার একটু খালি করুন না। উত্তর করতেন দাঁড়াও সবে ন'মাস হয়েছে, দশ মাসে পৌঁছোক।

এই গোপেনদাও কয়েক বছর আগে চলে গেলেন। আশ্চর্য আমাদের সংগীতজগৎ। মিউজিশিয়ানরা রেট বাড়াবার জন্য ঘন ঘন অ্যাতো মিটিং করেন। কিন্তু গোপেনদার একটা স্মরণসভা করারও প্রয়োজন মনে করলেন না কেউ-ই!

মুকেশ আর মান্না দে ছিলেন খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঠিক 'গানের জগতে'ই নয় 'প্রাণের জগতে'ও! মুকেশের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন মান্নাদা মুম্বইতেই। দুজনেই রাজকাপুরের 'লিপে' গান গাইতেন। আর কে ফিল্মস্-এর 'বরসাত' থেকে শুরু করে 'মেরা নাম জোকার' পর্যন্ত এ ধারাটা বহমান।

খুব সাদাসিধে সরল হাসিখুশি আর মিশুকে মানুষ ছিলেন মুকেশ। রেকর্ডিং-এর আগে এক গেলাস গরম জলে নুন মিশিয়ে দিয়ে সবায়ের সামনেই গলায় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে গলা পরিষ্কার করে নিতেন। কখনও কখনও রেকর্ডিং বুথেই নতুন শিক্ষার্থীর মতো হারমোনিয়াম বাজিয়ে 'সা' 'রে' 'গা' 'মা' বলে গলা ছেড়ে গলা সেধে গান রেকর্ডিং করতেন।

কেন জানি না প্রথম দিন থেকেই আমাকে 'দাদা' বলে ডাকতে শুরু করেন মুকেশ। প্রায়ই বলতেন দাদা, আমার 'বাঙ্গালি গানা' ভীষণ পছন্দ, আমিও বাংলা গান গাইব। একটু চেষ্টা করুন না?

ওর অনুরোধে ওর দাদা হয়ে 'দাদাগিরি' ফলাতে গিয়ে হোঁচট খেলাম এইচ. এম. ভি-তে। তখনকার অধিকর্তা পি. কে. সেন আমার প্রস্তাবটা শুনে চিন্তিত মুখে বললেন : আপনার কি ধারণা মুকেশের বাংলা গান চলবে?

প্রশ্নটার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কেমন চলবে জানি না, তবে একটা 'স্টান্ট' তো হবেই।

সেন সাহেব মুচকি হাসলেন ; স্টান্ট? শুধু স্টান্টের জন্য আমরা কারও রেকর্ড করি না। সরি।

সেন সাহেবের ওই 'সরি' কথাটাই ভাবিনি কিছুদিন পরে অ্যাতো কাজে লাগবে।

তখন প্রাণপণে চেষ্টা করছি প্রথম সুযোগেই মুকেশকে দিয়ে অন্তত বাংলা ছবিতে একটা বাংলা গান গাওয়াবই। অতবড় জনপ্রিয় শিল্পীর ওইটুকু অনুরোধ আমি যে-করে হোক রাখবই। কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ পেয়ে গেলাম সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ। পরিচালক দিলীপ বসু, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়কে নিয়ে 'সরি ম্যাডাম' ছবিতে গান

লেখার জন্য আমায় ডাকলেন।

প্রথম সিচুয়েশনটাই ছিল 'টাইটেল সঙ'। বিশ্বজিতের মুখে গান। প্রথম সুযোগটাই কাজে লাগালাম। সেন সাহেবের ওই 'সরি' কথাটার রেশ তুলেই লিখে ফেললাম সরি ম্যাডাম সরি/সরি মিস্টার সরি।

দিল্লির মানুষ ভেদ পাল ছিলেন 'সরি ম্যাডামের' সুরকার। সুর করা শেষ হতেই কাউকে কিছু বলার অপেক্ষা না রেখে বলে উঠলাম—ভেদ পালজি, গানটা মুকেশজিকে দিয়ে গাওয়ান না?

ভেদ পাল সঙ্গে সঙ্গে বললেন—দারুণ আইডিয়া! মুকেশ তো দিল্লিরই লোক। আমার বিশেষ বন্ধু। তা-ই হবে।

'সরি ম্যাডাম সরি' রেকর্ডটা ভীষণ বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করল। তখন এইচ. এম. ভি বিক্রির খতিয়ান দেখিয়ে প্রতি মাসে 'ভয়েস' নামে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করত। তাতে 'বেস্ট সেলার' হিসাবে প্রথমেই জ্বল জ্বল করতে লাগল আমার লেখা মুকেশের প্রথম বাংলা গান ওই 'সরি ম্যাডাম সরি'।

এর কিছুকাল পরেই রিটায়ার করে গেলেন পি. কে. সেন। ওঁর জায়গায় এলেন এ. সি. সেন। পবিত্রদাকে অন্য চেয়ারে বসানো হল—পবিত্রদার চেয়ারে বসলেন সন্তোষ সেনগুপ্ত। এ. সি. সেন আমার এইচ. এম. ভি. স্টুডিয়োতে 'অভিমান' ছবির গান রেকর্ড করার সময় থেকেই চেনা। তখন অবশ্য উনি অন্য চেয়ারে। মুকেশকে দিয়ে বাংলা আধুনিক গান রেকর্ড করার জেদ আমার থেকেই গিয়েছিল। একবার কী একটা জলসায় মুকেশ এখানে গাইতে আসছেন শুনলাম। শুনেই সেন সাহেবকে রেকর্ডের প্রস্তাব করলাম। উনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। ফোন করলাম মুকেশকে মুম্বই-তে। উনিও তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন।

রতু মুখোপাধ্যায়ের সুরে আমার দুটো গান—'ওগো আবার নতুন করে/ভুলে যাওয়া নাম ধরে ডেকো না' এবং 'দেহেরি পিঞ্জরে প্রাণ পাখি কাঁদে' নির্দিষ্ট তারিখে দমদমে রেকর্ড করতে এলেন মুকেশ। আজও ভুলিনি, সেদিন আমাদের একেবারে ভি. আই. পি. ট্রিট্‌মেন্ট দিয়েছিল এইচ. এম. ভি।

কিন্তু মুকেশ কিছুতেই শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ করতে পারলেন না। সারাদিন চেষ্টা করে বিকেলে হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন শিল্পী। নৈরাশ্যে মুখ শুকিয়ে গেল রতুর। হঠাৎ একজনের নাম মনে এল। তিনি মান্না দে।

মুকেশকে বললাম—আপনি বম্বের এইচ. এম. ভি. স্টুডিয়োতে 'ডেট' নিন। আমি মান্নাদাকে অনুরোধ করব। মান্নাদা আপনাকে দু-চার দিন রিহার্সাল করিয়ে বাংলা রপ্ত করিয়ে রেকর্ড করাবেন। সেন সাহেব বম্বে অফিসে 'ইনস্ট্রাকশন' পাঠিয়ে দেবেন।

হাসি ফুটল সবাইয়ের মুখে।

সত্যিকারের শিল্পী মন মান্নাদার। শুনেই বললেন—মুকেশ আমার বন্ধু, আপনিইও তাই। রতুবাবুও প্রায় বন্ধু হয়েই গেছেন। আপনাদের জন্য এটুকু করতে পারব না? বিনা পারিশ্রমিকে দামি সময় নষ্ট করে—নিজের গাড়ির পেট্রল পুড়িয়ে ওঁর বাসস্থান থেকে অত দূরে মুম্বই-এর এইচ. এম. ভি-র স্টুডিয়োতে গিয়ে শুধু বন্ধুদের ভালবেসে গান দুটো

রেকর্ড করিয়ে দিলেন মান্নাদা।

সেবার আমি বা রতু কেউ-ই মুম্বই যাইনি।

শুধু মুকেশই নয় মুকেশের ছেলে নীতীন মুকেশও ভাল গান গায়। ও আবার ঋষি মুখার্জির ইউনিটে কাজও করেছে। চমৎকার বাংলা বলে। ওর বাবার মতো বাংলা কথা আটকায় না একটুও। গলাটাও হুবহু মুকেশের মতো।

মুম্বই-এর এইচ. এম. ভি-র দুবে সাহেব সেবার মুম্বই-তে আমায় বললেন নীতীনকে দিয়ে মুকেশের রাজকাপুরের লিপের কিছু 'সুপারহিট' গান বাংলা ভার্সান করলে কেমন হয়? ভাল লাগল প্রোজেক্টটা। 'আমার নাম রাজু' ক্যাসেটটা তারই স্বর্ণ ফসল। এর পরেই হালফিল করেছি ওকে দিয়ে আরও একটা ওই ধরনের অ্যালবাম—'আওয়ারা হুঁ'। খুবই ভাল গেয়েছে নীতীন।

মুম্বই চলে গিয়েছিলাম—

আবার ফিরে আসি কলকাতায়।

ফিরে যাই বেশ কয়েক বছর আগে। চলে যাই—উত্তমের ময়রা স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে।

সেদিন ওখানে গিয়ে দেখি বসে আছে বন্ধুবর প্রযোজক দেবেশ ঘোষ। জমে উঠেছে সন্ধ্যার আসর। উত্তম হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শুরু করল। চমৎকার গাইত উত্তম। বহু চেষ্টা করেও ওকে দিয়ে একটাও গানের রেকর্ড করাতে পারলাম না। এটা আমার একরকম 'ডিফিট'। কেন যে ও রেকর্ডে গান গাইল না আজও তার কারণ খুঁজে পাইনি। সেদিন রাতে একটা গান গাওয়া শেষ করে উত্তম যখন টয়লেটে; তখন হঠাৎ দেবেশকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নতুন ছবি 'কাল তুমি আলেয়া'র গান আমাকে দিয়ে লেখাবে বললে, কিন্তু ছবির মিউজিক ডিরেক্টর কে?

দেবেশ বললে—মিউজিক ডিরেক্টর? তাই তো!... বলেই দেবেশ দৌড়ে চলে গেল উত্তমের বন্ধ টয়লেটের দরজার সামনে। রীতিমতো দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চ্যাঁচাতে লাগল এই উত্তম, তুই আমার 'কাল তুমি আলেয়া'র মিউজিক ডিরেক্টর—তুই আমার 'কাল তুমি আলেয়া'র মিউজিক ডিরেক্টর। যতক্ষণ না 'হ্যাঁ' বলবি ততক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিয়ে যাব।

ভেতর থেকে কী উত্তর এল আমি শুনতে পেলাম না। কিন্তু দেখলাম, যেন এক সময় আশ্বস্ত হয়েই দেবেশ আমার পাশের সোফাটায় ধপ্ করে বসে পড়ল।

১১

'কাল তুমি আলেয়া'য় মহানায়ক উত্তমকুমার হল সংগীত পরিচালক। ইতিমধ্যে জীবনে বহু ভূমিকায় ও এসেছে—কিন্তু এই ওর প্রথম সংগীত পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। সেদিন রাতে দেবেশ ঘোষের আর্জিতে সম্মতি দিলেও চট করে সে ভূমিকাটি মেনে নেয়নি উত্তম। ওখান থেকে ফেরার সময় তাই যখন জিজ্ঞাসা করলাম—তা হলে কবে 'মিউজিক সিটিং' করবে? উত্তম সেই অসাধারণ হাসিটি হেসে বললে—আমি তোমায় খবর দেব।

তৎক্ষণাৎ দেবেশ বললে—খবর আবার কী দিবি? পরশু রবিবার। সকালে এখানে 'স্ক্রিপ্ট' নিয়ে আসছি। তুই তো স্ক্রিপ্ট শুনেছিস—মামাকে সিচুয়েশনগুলো বুঝিয়ে দিবি। ব্যস।

এবারও সেই অসাধারণ হাসিটি হাসল উত্তম। তবে মুখে কিছু বলল না। রবিবার হাজির হলাম ওখানে। দেখলাম আমার আগেই এসে গেছে দেবেশ। গানের সিচুয়েশন নিয়ে আলোচনা হল। শুনলাম, গোটা ছবিতে তিনটি মাত্র গান। একটা বাইজির। আর একটা নিচু ধরনের কলগার্লের। আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সঙ্।

চমৎকার সিচুয়েশন সেটার তবে সেটা নাকি প্রচলিত সুরে ও কথায় হবে। অর্থাৎ তৃতীয় লোভনীয় গানটিতে আমার আর উত্তমের কারও কিছু করার নেই।

উত্তমকে জিজ্ঞাসা করলাম—কী ভাবে সুর করবে তুমি? সুরের ওপর লেখাবে না কথার ওপর সুর করবে?

উত্তম একেবারে প্রফেশনাল সুরকারের ভঙ্গিতে জবাব দিলে—দুটোই। দুরকম ভাবেই করে দেখব—যেটা ভাল দাঁড়ায়। যা হোক পরের সিটিঙের সময় ঠিক করে চলে এলাম ওখান থেকে। একটা নির্ধারিত তারিখে দুটো গান লিখে নিয়ে আবার হাজির হলাম উত্তমের ফ্ল্যাটে। দেখা যাক ও কোনটা আগে করে—সুরের ওপর লেখা, না কথার ওপর সুর?

উত্তম আমায় একটু অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে গেল। তিনি কাজ শেষ করে চলে গেলেন—আবার আর একজন এলেন। আমি বসে বসে ঘড়ি দেখছি। সে ভদ্রলোক চলে যেতে নড়েচড়ে বসলাম। কিন্তু বৃথাই। আর দুজন ভদ্রলোক এলেন। ওঁরাও চলে গেলেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে উত্তম এ ঘরে এসে বললে—মামা, বলো কী ব্যাপার? বললাম—'কাল তুমি আলেয়া'র গান লিখে নিয়ে এসেছি দেখবে? কথার ওপর সুর করবে—না, সুর দেবে আমি লিখব? আবার হাসল উত্তম : তোমার কি মাথা খারাপ? আমি মিউজিক ডিরেক্টর হব? দেবেশকে অনেক সময় অনেক কিছুই বলতে হয়। আমার 'ছোটি সি মুলাকাত'-এর আবার ডেট পড়েছে বম্বেতে। আমি এখন আমার প্রোডাকশান ভাবছি। তুমি শুধু শুধু কষ্ট করে এলে, সরি। চলে এলাম বাড়ি। পরের দিনই দেবেশের ফোন : উত্তম গান নিয়ে বসেছিল? খুলে বললাম সব কিছু।

দেবেশ বললে—আচ্ছা ঘণ্টাখানেক বাদে আমি তোমায় আবার ফোন করছি।

আবার দেবেশের ফোন : কাল সকালেই সিটিং। একটুও দেরি না করে চলে যাবে।

পরের দিন আবার এতটা পথ ড্রাইভ করে গেলাম। আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। উত্তম সোজাসুজি বললে ও মিউজিক ডিরেক্টর হতে পারবে না।

দু দিন বাদেই আবার দেবেশ ফোন করতেই বললাম—এবার যে দিনটা ঠিক করবে সেদিন তুমি-ও উপস্থিত থাকবে।

নির্ধারিত তারিখে আবার ফিরে আসতে হবে জেনেও ওখানে গেলাম।

দেখলাম দেবেশ হাজির। উত্তম আমার দিকে চেয়ে সেই অপূর্ব হাসিটি চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলল।

দেবেশ বললে—কই, গান পড়ো।

বললাম—দাঁড়াও। হারমোনিয়ামটা বার করুক। উত্তমের স্কেল-চেঞ্জ হারমোনিয়ামটা এনে দিল কাজের লোক।

দেবেশ বললে—এই, মাদুর পাত। মাদুরে না বসে গান গাওয়ার মেজাজই পায় না উত্তম।

তাই হল। মেঝেতে মাদুর পাতা হল। মাদুরে রাখা হল হারমোনিয়াম।

না-ছেড়ে দেবেশের দিকে একবার তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই উত্তম সোফা থেকে নেমে বসল ঘরের মেঝেতে মাদুরে হারমোনিয়ামের সামনে।

জয় দুর্গা বলে দেবেশ আর আমিও সোফা ছেড়ে মেঝেতে বসলাম।

উত্তম গান চাইল। ওকে প্রথম দিয়েছিলাম—'একটু বেশি রাতে/মনের মানুষ ফিরল ঘরে'।

গানটা বারকতক পড়ে নিয়ে উত্তম সুর করল 'একটু বেশি রাতে'।

মুগ্ধ হয়ে গেলাম গানের সুরের অ্যাপ্রোচ দেখে। ছবির সিচুয়েশনটা পুরোপুরি সার্থক হয়ে উঠল ওর সুর সংযোজনায়। উত্তম গাইতে লাগল। বিভোর হয়ে গাইতে লাগল।

ও যে কত বড় 'অল রাউন্ডার' শিল্পী সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলাম।

টেপরেকর্ডারে টেপ করে নিতে বললাম গানটা। নইলে পরে সুরটা ভুলে যেতে পারে উত্তম।

টেপ হয়ে গেল। শুনলাম। নতুন করে ভাল লাগল।

দেবেশ একগাল হেসে বলে উঠল দেখলে তো আমি আসতেই কাজ হয়ে গেল। তোরা কেউ-ই কর্মের নোস। ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম—সত্যিই আমরা অকর্মণ্য। পরের গানটার জন্য পরে আবার একটা তারিখ নিজের থেকেই বলল উত্তম।

বুঝলাম, ও বেশ একটা আত্মবিশ্বাস আর মেজাজ পেয়ে গেছে।

সেদিন উত্তম সুর করলে আমার বহু যত্নে লেখা—'পাতা কেটে চুল বেঁধে কে টায়রা পরেছে/কে খোঁপার পাশে পাশ চিরুনি বাহার করেছে'। দেবেশ দারুণ খুশি। বললে—মামা দারুণ লিখেছে। আজ আমি তোদের খাওয়াব।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম—খাওয়াবে তো বলছ। কিন্তু উত্তমকে ওই ব্যাকগ্রাউন্ড সিচুয়েশনটা দাও। নইলে সুরশিল্পী উত্তমকে লোকে ঠিকমতো বুঝবে কেন?

উত্তম বললে—না, না, ওটা প্রচলিত গান-ই থাক। আমার সুরে এ-দুটো গান-ই ভাল।

ব্যাকগ্রাউন্ড সিচুয়েশনের গানটা আমি লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ওর দিকে বাড়িয়ে বললাম—দারুণ মুডে রয়েছ তুমি। কতক্ষণই বা লাগবে তোমার সুর করতে। চেষ্টা করো না একটু।

এ গানটাও হারমোনিয়ামের সামনে রেখে যথারীতি বারকতক মনে মনে পড়তে লাগল উত্তম। হারমোনিয়ামে একটা কর্ড' চেপে ধরে বারকতক 'বেলো' করল ওটা। তারপর বলল—শোনো তো মামা—সলিলদার 'আজারে আজা নিদিয়া তু আজা' গানটার সুরের একটু স্টাইল নিয়ে গানটা করলে দারুণ জমে যাবে মনে হচ্ছে। উত্তম গাইতে লাগল—'যাই চলে যাই—আমায় খুঁজো না তুমি/বন্ধু বুঝো না ভুল/কাল সে

আলেয়া শুধু/আমি সে-আলোর ঝরা ফুল/আমি যাই চলে যাই/যাই চলে যাই।'

চমৎকার দাঁড়িয়ে গেল গানটা।

এবার আমার বলার পালা। উত্তমকে বলেছিলাম—দেখলে তো কেমন অপূর্ব একটা গান করে ফেললে। তোমার দ্বারা অসম্ভব কী? তুমি ইচ্ছে করলে কী না করতে পার?

গান তো তৈরি হল। কিন্তু রেকর্ডিং হবে কোথায়? গাইবেই বা কারা?

উত্তম বলল—'ছোটি সি মুলাকাত'-এর শুটিংয়ের জন্য আমি তো বম্বে যাচ্ছিই। দেবেশ, তুইও তো বম্বেতে আসছিস। সব ঠিকঠাক করে পুলকমামা আর শৈলেশদাকে (অ্যারেঞ্জার শৈলেশ রায়) বম্বেতে পাঠিয়ে দে। বম্বেতেই গান রেকর্ডিং করব।

কিন্তু গাইবে কে কে?

উত্তমই বললে—লতাজি দারুণ গান করেন। কিন্তু 'কাল তুমি আলেয়া'র এই ধরনের 'টিপিক্যাল' মেয়ের গান দুটো আশা ভোসলে ছাড়া আর কাউকে আমি ভাবতে পারছি না। আর ছেলের গানটি গাইবেন হেমন্তদা।

'কাল তুমি আলেয়া'র পরিবেশক নারায়ণবাবুদের কিন্তু এটা পছন্দ হল না। নারায়ণবাবু হাতের মুঠিতে সিগারেট ধরে একটু টান দিয়েই বললেন—না, না। একটা গান লতাজিকে দিয়ে গাওয়ান। লতাজির একটা গান চাই-ই।

উত্তম মুম্বই চলে গেল। দেবেশ আমায় বললে—একটা গান লতাজিকে দিয়ে গাওয়াবার চেষ্টা করবি মুম্বই-তে।

দেবেশও একদিন চলে গেল মুম্বই-তে।

আমরা যেদিন যাব সেদিনও নারায়ণবাবুদের ফোন এল—যাতে একটা গান লতাজি গান।

আমরা মুম্বই-তে পৌঁছে উত্তমের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। উত্তম তখন 'ছোটি সি মুলাকাত পেয়ার হো গায়ি' গানটি রিহার্সাল করছে। বলছে—আমার ধ্যান-জ্ঞান এখন গান নয়, নাচ। বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে আমায় নাচতে হবে। উনি একজন বিখ্যাত নাচিয়ে, আমি ওঁর সঙ্গে নাচে পারব কেন? তাই আমায় প্রচণ্ড পরিশ্রম করে নাচ রপ্ত করতে হচ্ছে।

দেবেশ চুপি চুপি বললে—লতাজির সঙ্গে কথা হয়েছে?

আমি কিছু বলার আগেই উত্তম বললে—মামা, আশাজিকে একটু বুঝিয়ে বলো। সারাদিন আমি নাচ আর ফিল্ম নিয়ে ব্যস্ত। একদিন রাতের দিকে যেন গান শেখাবার সময় দেন।

ওখান থেকে চলে আসার সময় আড়ালে ডেকে দেবেশ আমায় আবার লতাজির কথা মনে করিয়ে দিল।

পরদিন সকালে গেলাম পেডার রোডের 'প্রভুকুঞ্জে'। লতাজি আর আশাজি দু বোন পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকেন। ও দিকের বারান্দায় একটা দরজা আছে—যা দিয়ে দুজনেই যখন খুশি যাওয়া-আসা করতে পারেন।

আশাজিকে বললাম—উত্তমের সুরে গান। উত্তমের খুবই ভক্ত আশাজি, তৎক্ষণাৎ গাইতে রাজি হয়ে গেলেন। বললাম রাতে গান তোলাতে আসবে, রাতে রেকর্ডিং।

তাতেও রাজি হলেন আশাজি।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে লতাজির কাছে গেলাম। মাথায় বুদ্ধি এল—'রাতে গান তোলাবে, রাতে রেকর্ডিং হবে—তা ছাড়া একটা 'কলগার্ল' আর একটা 'বাইজি'র গান লতাজি গাইতে রাজি-ই হবেন না। স্বাভাবিকভাবেই আশাজিরই দুটি গান থাকবে। আমার সাপ-ও মরবে লাঠি-ও ভাঙবে না।

লতাজিকে বললাম আমার বক্তব্য। রাতে রেকর্ডিং, বাইজির গান। শুনেই লতাজি বললেন, কে গাইবে?

বললাম—আশাজির নাম।

উত্তরে কিছু বললেন না লতাজি। শুধু একটু হেসে বললেন—উত্তমকুমার সুর করেছেন? নিশ্চয়ই ভাল করেছেন।

বললাম—খুব-ই ভাল করেছে। কিন্তু ও ধরনের গান তো আপনি গাইবেন না। আপনি তো একদিন আমায় বলেছিলেন—রাজকাপুর সাহেব 'সঙ্গম' ছবিতে 'কা করো রাম মুঝে বুঢডা মিল্ গয়া' গানটি একটি অল্পবয়সি মেয়ের মুখে দেবেন বলে আপনাকে গাইয়েছিলেন। আপনিও তাই গেয়েছিলেন এক সরলা কিশোরীর অভিব্যক্তিতে। পরে সিচুয়েশন বদলে যখন ওটা ক্যাবারে নর্তকীর সাজে বৈজয়ন্তীমালার মুখে দিলেন—আপনি তাই শুনে অভিমান করে 'সঙ্গম'-এর প্রিমিয়ারে যাননি।

লতাজি শুধু বললেন—আপনার দেখছি সব মনে আছে?

১২

যা হোক সময়মতো একদিন রাতের দিকে উত্তমের নাচের মহড়া শেষ হতে উত্তম আর আমরা এলাম আশাজির বাড়ি। দুজনেই দুজনের পরিচিত। উত্তম আশাজিকে বললে—এইমাত্র আপনার আর রফি সাহেবের গাওয়া আমার ছবির 'ছোটি সি মুলাকাত পেয়ার হো গায়ি' গানটির নাচের রিহার্সাল করে এলাম। আপনি দারুণ গেয়েছেন গানটা। আশাজি ফ্যালফ্যাল করে উত্তমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুতেই মনে করতে পারলেন না গানটা। (এ ব্যাপারটা আমি অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্না একমাত্র লতা মঙ্গেশকর ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি নামী শিল্পীর-ই ক্ষেত্রে দেখেছি। ওঁরা গান রেকর্ডিং-এর পর প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ভুলে যান গান। যে গানটি হিট হয়, সেটি রেকর্ড বা ক্যাসেট থেকে আবার নতুন করে শিখে পরিবেশন করেন জলসায়।) যা হোক, আশাজি প্রথমে শিখলেন—'পাতা কেটে চুল বেঁধেছে' গানটি—পরে তুললেন 'একটু বেশি রাতে'। উত্তম বললে—রেকর্ডিং-এর দিন আমার শুটিং। শুটিং শেষ করে দাদারে 'বম্বে ল্যাব'-এ আসতে কিন্তু আমার দশটা বেজে যাবে।

আশাজি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—বেশ তো 'একটু বেশি রাতে' না হয় আমি 'একটু বেশি রাতেই' গাইব।

এ সব কথার মাঝেই ওদিকের বারান্দা থেকে একজন আমায় ডেকে বললেন—দিদি আপনাকে ডাকছেন।

দিদি মানে লতাজি। বাইরের দরজা দিয়ে গেলাম ওঁর কাছে। লতাজি বললেন—আমি একবার বারান্দায় গিয়েছিলাম—শুনতে পেলাম উত্তমের শেষ গানটা। চমৎকার করেছে কিন্তু।

দেঁতো হাসি হাসলাম—আপনার ভাল লেগেছে?

লতাজি উত্তর করলেন—নিশ্চয়ই! ভালকে ভাল বলব না কেন? সত্যি ট্যালেন্ট আছে উত্তমের। গানের কথাটা কী?

বললাম—'একটু বেশি রাতে।'

সুরটা একবার শুনেই সংগীত সম্রাজ্ঞী তুলে নিয়ে ছিলেন। কথাটা পেয়েই গেয়ে উঠলেন 'সাইন্ লাইনটা অর্থাৎ 'মুখড়া'টা। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। এবার যদি লতাজি বলেন গানটা আমি গাই—তা হলে কী উপায় হবে? তবুও বিনয় গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললাম—চমৎকার লাগছে আপনার গলায়। এবার ছুড়ে দিলাম আমার ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু রাত বারোটায় তো রেকর্ডিং। তার আগে উত্তমের ফিল্মের শুটিং। শুটিং শেষ না করে তো ও আসতেই পারবে না। আপনার বাড়ির কফিটা দারুণ হয়, একটু কফি খাওয়ান।

লতাজি আমায় কফি দিতে বলে অন্য কথায় চলে গেলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। 'কাল তুমি আলেয়া'য় শুধু গানের সুর নয় গানের পিক্‌চারাইজেশানটা করে ছিল উত্তম। এখন যেমন ডান্স ডিরেক্টররা গান পিক্‌চারাইজ করেন—ফাইট কম্পোজাররা মারামারির ছবি তোলান—ছবির পরিচালক সিগারেট খেতে খেতে আরাম কেদারায় বসে তা শুধু অবলোকন করেন। আমার মনে হয় বাংলা ছবিতে উত্তম-ই প্রথম সেটা চালু করে। ছবির পরিচালককে দর্শকের ভূমিকায় রেখে আশা ভোঁসলের রাত বারোটায় গাওয়া 'একটু বেশি রাতে' চিত্রায়িত করেছিল উত্তম নিজেই। কাজটা কেমন হয়েছিল—যাঁরা ও ছবি দেখেছেন নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন। উত্তম জীবনে মাত্র আর একটি ছবির সংগীত পরিচালক হয়েছিল। সে ছবির নাম 'সব্যসাচী'। তাতেও আমাকে দিয়ে গান লিখিয়েছিল। কিন্তু উত্তম কত বড় গায়ক ছিল—তার যেমন কোনও রেকর্ড রাখা যায়নি—তেমনি উত্তম কত বড় অঙ্কনশিল্পী ছিল তারও কোনও রেকর্ড নেই। সরস্বতী পুজোর সময় ভবানীপুরে আমাদের মরশুমী ক্লাবে বা লক্ষ্মীপুজোর সময় ওর বাড়িতে ওর দেওয়া আলপনা যাঁরা দেখেছেন—নিশ্চয়ই তাঁদের তা মনে আছে।

উত্তমের আর একটা দিকও কেউ জানল না। ও কত চমৎকার সাঁতার কাটত। ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় উত্তমকুমার, টেনিস খেলোয়াড় উত্তমকুমার—টেবিল টেনিস খেলোয়াড় উত্তমকুমারকে অনেকেই দেখেছেন কিন্তু সাঁতারু উত্তমকে আমাদের মতো ঘনিষ্ঠ ছাড়া খুব কম জন-ই দেখেছেন। উত্তম একদিন হঠাৎ বললে—আমাদের 'মরশুমী ক্লাব' ভার্সেস 'টেকনিসিয়ান্স স্টুডিয়ো' একটা ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করছি। মরশুমীতে সেদিন আমি ছাড়া শ্যামল মিত্র, সুরকার রতু মুখোপাধ্যায় আর সম্ভবত ভূপেন হাজারিকাও উপস্থিত ছিল। সবাই হই হই করে উঠল। অর্থাৎ সংসদে প্রস্তাব বিনা বাধায় গৃহীত হল।

উত্তম বলল—আমরা সবাই খেলব। আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল—মামা, তোমাকেও খেলতে হবে।

মুখ শুকিয়ে গেল আমার। অস্ফুট স্বর বের হল—অ্যাঁ, আমি?

খেলার ব্যাপারে সব সময়ই সিরিয়াস শ্যামল।

কানে কানে ফিসফিস করে বললে—ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ফ্রেন্ডলি ম্যাচ তো। যতক্ষণ পারবি খেলবি। তারপর উঠে আসবি।

সম্ভবত মহমেডান স্পোর্টিং গ্রাউন্ডে এক রবিবার সকালে খেলা হয়েছিল। সবাই শর্টস অর্থাৎ হাফপ্যান্ট পরে মাঠে নামলাম—আমিও তাই।

আমাদের উত্তম, শ্যামল, ভূপেন হাজারিকা মাথায় রুমাল বেঁধে রতু, সুনীল চক্রবর্তী, সুধীর মুখার্জী (মাস্তুদা) এবং আমি ইত্যাদি সবাই তখন ফুটবল প্লেয়ার। ওদিকে দেবেশ ঘোষ, সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, টেকনিসিয়ান্স স্টুডিয়োর আরও অনেকে।

উত্তম আমাদের ক্যাপ্টেন। খেলা আরম্ভ হল। শ্যামল, উত্তম, রতু সুনীল বেশ ভালই খেলা জানত। চমৎকার খেলে চলল। আমিও ওদের সঙ্গে অহেতুক দৌড়োদৌড়ি করতে লাগলাম। একবার আমার কাছে বল এল। মেরে দিলাম একটা শট। বল কোথায় দেখতে পাচ্ছি না। উত্তম পাশেই ছিল। বুঝতে পেরে হো-হো করে হেসে আমায় বললে—মামা, ওই যে বল। স্কাইং হয়ে গেছে।

আমার ফুটবল খেলায় এ ঘটনাটা বহুদিন ধরে বহু জায়গায় বলেছে উত্তম, আর হেসে লুটিয়ে পড়েছে।

সেদিন কিন্তু আমরা এক গোলে জিতেছিলাম। উত্তমের একটা 'থ্রু' শ্যামল চমৎকারভাবে এগিয়ে দিল মাথায় রুমাল বাঁধা রতু মুখোপাধ্যায়কে। রতু বলটা ঢুকিয়ে দিল জালে। রবিবার সকালে ময়দানের খেলার মাঠের পথচলতি মানুষেরা উত্তমকে দেখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল খেলা। এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল ক্যামেরা—শুটিংয়ের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম। কারণ, ওই দর্শকরা ভেবেছিল বুঝি শুটিং হচ্ছে। কিছুই খুঁজে না পেয়ে অবাক হল শুধু। সেদিন আমরা গঙ্গার ধার থেকে ইলিশ মাছ কিনে ভবানীপুরে 'মরশুমী' ক্লাবে ফিরলাম।

তখনই বোধহয় মনে মনে লিখে ফেলেছিলাম—'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল।' যে গানটা পরে সবাই শুনেছিল নচিকেতা ঘোষের সুরে মান্না দের কণ্ঠে উত্তমেরই 'ধন্যি মেয়ে' ছবিতে।

এ সব দিনগুলো কোথায় গেল? আজও তো রয়েছে অনেক নায়ক, অনেক কণ্ঠশিল্পী, অনেক গীতিকার—কিন্তু কোথায় সেই প্রাণপ্রাচুর্য? শুধু এইখানেই শেষ নয়। তখন ময়দানে মোহনবাগান মাঠে মোহনবাগান সাপোর্টার আমি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, পরিচালক ও অভিনেতা দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অভিনেত্রী অনুভা গুপ্তা প্রতিটি বড় খেলায় নিয়মিত হাজির থাকতাম। মাঝে মাঝে নচিকেতা ঘোষ, 'উল্টোরথ' পত্রিকার প্রসাদ সিংহ, গিরিন সিংহ-ও আসতেন। মোহনবাগান গোল করলে আনন্দে আমি কী করতাম জানি না, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য দু হাত তুলে লাফাতেন, নচিকেতা ঘোষ একসঙ্গে দুটো সিগারেট ধরিয়ে ফেলতেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ওই লম্বা শরীর নিয়ে পেছনের বেঞ্চির সারিতে চিতপাত হয়ে পড়ে যেতেন। আর প্রসাদদা এলোপাতাড়ি ওঁর পাশের অচেনা-অজানা লোকের পিঠে কিল মেরে যেতেন।

মনে আছে, একবার মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের একটা গোল কী কারণে যেন রেফারি বাতিল করে দিয়েছিলেন। খেলার শেষে আমি আর দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় পাশাপাশি আসছি গাড়িতে উঠব বলে—ওদিকের ইস্টবেঙ্গল ব্লক থেকে তখনই বের হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মানবকে দেখে আমরা দুজনেই এগিয়ে গেলাম (সেবার মোহনবাগান-ই জিতে ছিল)। ভুরু কুঁচকে মানব কট্টর বাঙাল ভাষায় বলে উঠল—কে ডা তোমরা? তোমাদের চিনি না!

শুধু কলকাতাতেই নয় রোভার্স খেলার সময় মুম্বইতে থাকলে মোহনবাগানের খেলার দিনে ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'ডে স্লিপ' নিয়ে উপস্থিত হতাম 'কুপারেজ'-এ। দেখতাম—আমার আগেই হাজির হয়ে গেছেন—আর এক মোহনবাগান সাপোর্টার মান্না দে। ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার হলেও বাংলার টিমকে সমর্থন করবার জন্য আসতেন শচীন দেববর্মণ আর রাহুল দেববর্মণ। মোহনবাগান জিতলে প্লেয়ারদের গেস্ট হাউসে গিয়ে উৎফুল্ল মান্না দে গান শুনিয়ে আসতেন। সে সব দিন নেই। আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস। জানি না, এ দীর্ঘশ্বাসের মূল্য কতটা?

একদিন সকালে কলকাতার বাড়িতে চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছি, টেলিফোন এল বন্ধু মেগাফোনের কমল ঘোষের। কমল বললেন—এই বেগম আখতার কলকাতায় এসেছেন, উঠেছেন ব্রডওয়ে হোটেলে। তুই যে বলেছিলি বেগম আখতারকে দিয়ে বাংলা গান করলে দারুণ হবে—ওঁকে বাংলা গান গাওয়ানোর চেষ্টা করবি? যাবি ওঁর কাছে?

কমল ঘোষ—অপুত্রক দৃষ্টিহীন বিখ্যাত মেগা ঘোষের ভাইপো। তাঁর মেগাফোন রেকর্ডের বাঁধা আর্টিস্টদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাননদেবী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার ও আখতারী বাই। পরবর্তীকালেও তিনি প্রথম রেকর্ডের সুযোগ দেন—অপরেশ লাহিড়ি, বাঁশরী লাহিড়ি, সনৎ সিংহ, নচিকেতা ঘোষ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাতদের। যাঁরা প্রথমে 'এরিয়ান্সে' খেলে পরে 'মোহনবাগানে' (এইচ এম ভি) যোগ দেন। বন্ধু কমলের কাছে গল্প শুনেছি—একদিন কাননদেবীর রিহার্সালে কমল কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে গায়ে একটু সুগন্ধি ছড়িয়ে মেগাফোনের হ্যারিসন রোডের রিহার্সাল রুমে গাজির হয়। জ্যাঠামশাই চোখে না দেখতে পেলেও বুঝতে পারলেন কমল এসেছে।

শুধু বললেন—

'কমল, আয়, বোস।'

তারপর রিহার্সাল ব্রেকে যখন চা এল তখন কমলকে হুকুম করলেন—'না, বেয়ারা নয়, কমল তুই সব্বাইকে চা-টা দিয়ে আয়।' ওই ফ্যান্সিবাবু সাজের কমল ঘরভর্তি বাজনদার, তাদের খিদমতগার সবাইকে নিজের হাতে চা পরিবেশন করে কাননদেবীকেও চা দিয়ে প্রণাম করে ঘরের এককোণে বসে ছিল। যা হোক, ব্রডওয়ে হোটেলে নির্দিষ্ট সময়ে মুখোমুখি হলাম এক কিংবদন্তি শিল্পী, সংগীত সম্রাজ্ঞী বেগম আখতারের সঙ্গে।

ভগবানের আশীর্বাদে জীবনে প্রথম আমার লেখা গান গেয়ে যত শিল্পী সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, মনে হয়, বিগত দিনের প্রণব রায়ের লেখা গান ছাড়া আর কোনও গীতিকারের গান গেয়ে কেউ তা পারেননি।

আজকের নামী শিল্পী অলকা ইয়াগনিক যখন কলকাতায় নিউ আলিপুরে থাকত—তখন কিশোরী ফ্রকপরা অলকা জীবনে প্রথম গেয়েছিল আমার লেখা বাংলা গান—কনক মুখার্জির ছবি—'এই তো সংসার' গানটি ছিল 'নয়ন তারার ঘুগনী দানা।'

কবিতা কৃষ্ণমূর্তিও জীবনে প্রথম এইচ. এম. ভি.-র একটি ই. পি. ডিস্কে গাইল আমার লেখা চারটি বাংলা গান মান্না দের সুরে। তারমধ্যে একটি গান—'পলাশের দেশে/একা একা এসে' আমি এখনও মাঝে মাঝে বাজিয়ে শুনি।

লতা মঙ্গেশকরের কনিষ্ঠা ভগিনী উষা মঙ্গেশকরেরও প্রথম বাংলা গান আমি লিখি স্বয়ং লতাজির অনুরোধমতো, সুর করেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর। 'আমায় বাহারী সেই ঝুমকো এনে দেরে' এবং 'বুঝি না এ ভালবাসায়'। প্রখ্যাত শিল্পী সুমন কল্যাণপুরের প্রথম বাংলা গান আমারই রচনা। মণিহার ছবিতে হেমন্তদার সুরে—'দূরে থেকো না এসো কাছে এসো।'

সুমন কল্যাণপুরের প্রথম দুটি বাংলা আধুনিক গানেরও গীতিকার আমি। এইচ. এম. ভি.-র একটি সেভেন্টি এইট রেকর্ডে গান দুটি ছিল। এক পিঠে ছিল—'দুরাশার বালুচরে একা একা'। অপর পিঠে ছিল—'মনে করো আমি নেই বসন্ত এসে গেছে।' রতু মুখোপাধ্যায়ের সুরের এই গান দুটিও মান্নাদা মুম্বই-এর এক স্টুডিয়োতে সুমন কল্যাণপুরকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে দিয়েছিলেন শুধু মাত্র আমাদের নিবিড় বন্ধুত্বের খাতিরে।

অনিল বাগচীর পুত্র অধীর বাগচী নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি। স্বয়ং অনিলদা যেটা করেননি, আমি অধীরের জন্য সেটা করিয়ে দিয়েছিলাম। এইচ. এম. ভি.-কে রাজি করিয়েছিলাম অধীরের গানের রেকর্ডিং-এ। ওঁদের শর্ত আমার কথা আর মান্নাদার সুর। রীতিমতো চোর পুলিশ খেলে মান্নাদাকে দিয়ে সুর করিয়েছিলাম—'চাঁদ বিনা সারা রাত বেশতো গো কেটে যায়' এবং 'যখনি গানের মুখ মনে আসে না'। অধীর জীবনে প্রথম সে গান দুটি রেকর্ডে গেয়েছিল।

বোধহয় আগেই বলেছি উষা উত্থুপের প্রথম বাংলা গানও আমার রচনা। সুর করেছিল অজিত ঘোষ। এইচ. এম. ভি.-তে প্রকাশিত ওর একটি গান 'মন কৃষ্ণ বলে' ক্যালেন্ডারের ছবিতে পর্যন্ত স্থান পেয়েছিল। চিত্রা সিং-জগজিৎ সিং-এর প্রথম বাংলা গানের রচয়িতাও আমি। অনুপ জালোটারও তাই। ও প্রথম বাংলা গান গায় 'সন্ধ্যা প্রদীপ' ছবিতে মৃণাল ব্যানার্জির সুরে—'হে মহাদ্যুতিং দিবাকর সর্বপাপ তাপ হরো।' উদিত নারায়ণ জীবনে প্রথম বাংলা গান গায় আমার লেখা 'মনে মনে' ছবিতে কানু ভট্টাচার্যের সুরে। দীপা নারায়ণ গায় বাবুল বসুর সুরে। বাণী জয়রামও প্রথম বাংলা গান গায় আমার লেখা। ওয়াই. এস. মুলকির সুরে। শ্রাবন্তী মজুমদার গায় ভি. বালসারার

সুরে। কুমার শানুরও প্রথম বাংলা গান আমার, তার সুরকার দিলীপ রায়। অধুনা রোজা খ্যাত মাদ্রাজের 'চিত্রা', সেই বিখ্যাত গায়িকাও প্রথম বাংলা গান গায় আমারই রচনা— 'নাগ পঞ্চমী' ছবিতে, সুরকার প্রফুল্ল করের সুরে। এই প্রথম রেকর্ড করার নেশাতেই সেবার মেগাফোনের কমল ঘোষের সঙ্গে বেগম আখতারের হোটেলের ঘরে ঢুকলাম আমি। সেদিনই প্রথম ওঁকে দেখলাম। প্রথম আলাপ হল ওই কিংবদন্তি শিল্পীর সঙ্গে। তখন যৌবন প্রায় পেরিয়ে গেছে ওঁর, কিন্তু সুর্মাপরা ডাগর চোখের চাউনি—আর জর্দা কিমাম খাওয়া ঠোঁটের হাসিটি দেখে বুঝলাম ওঁর অন্তরের যৌবন তখনও পর্যাপ্ত। তাই অত সুন্দর গান ওই বয়সেও গেয়ে চলেছেন।

কমল বলল ওদের মেগাফোনের গাওয়া অনেক হিট গান থেকে দুটো হিট গান বাংলা ভার্সান করতে। বেগম কিন্তু বললেন ওঁর এইচ. এম. ভি.-র 'কোই না মানে গুলশান্ গুলশান্' গানটির সুরেই প্রথম বাংলা গান গাইবেন।

শিল্পী ঘরের মেঝেতে পাতা কার্পেটে হারমোনিয়ামের সামনে বসলেন। ওঁর সঙ্গে ছিলেন এক অল্পবয়সি গায়িকা (নাম মনে নেই)।

বেগম হারমোনিয়ামটির একটা দিক কোলের ওপরে রাখলেন অন্য দিকটা রইল মাটিতে। সেই অপূর্ব কণ্ঠে একটু আলাপ করলেন। প্রথমেই আমার সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। সামনা সামনি ওঁর গান শুনতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম সেদিন।

এবার গাইলেন—'গুল শান্ গুল শান্।' আমার চোখ পড়ল ওঁর হাতের আঙুলে ঝলমল করছে একখণ্ড বহুমূল্যবান হিরে। তার দ্যুতি ছিটকে পড়ছে ওঁর হারমোনিয়াম বাজানো হাতের আঙুলের নড়াচড়ায়।

বুঝতে পেরে উনি হাসলেন—বললেন—নিজাম সাহেবের উপহার।

কমল আমার কানে কানে বাংলায় বললে—নিজাম সাহেব ওঁর গানের আত্মহারা ভক্ত ছিলেন।

বারকতক 'গুল্‌শান গুল্‌শান' শুনিয়ে একটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট প্যাকেট কমল আর আমার দিকে এগিয়ে দিলেন বেগম। আমি কমল দুজনেই সিগারেট খাই না। ধন্যবাদ জানালাম শুধু।

বেগম নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সঙ্গিনীকে বললেন—গাও গুল্‌শান গুল্‌শান। সঙ্গিনী গেয়ে চলল। উর্দু জানি না আমি, যত দূর মনে হচ্ছে গানটা ছিল—'কোই না মানে গুল্‌শান গুলশান' (কথা ভুল হলে ক্ষমা করবেন)। আমি মিটার মিলিয়ে লিখলাম 'একী আনন্দে দোলে এ-জীবন'।

উনি কথাটার মানে জানতে চাইলেন। আমার হিন্দিতে বুঝিয়ে দিলাম আমি। খুশি হয়ে গাইতে লাগলেন সুর মিলিয়ে।

অনেক প্রচেষ্টায় গোটা পঙ্‌ক্তিটি বাংলায় প্রায় সঠিক উচ্চারণ করে গেয়ে চললেন। কিন্তু আটকে গেলেন ওই 'দোলে' কথাটায়। যতবারই 'দোলে' বলতে বলি ততবারই উনি বলেন 'ডোলে'। 'দোলে' বলতে পারেন না। এই 'দোলে' আর 'ডোলে' নিয়ে যখন 'ডামাডোল' চলছে ঘরে ঢুকলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। জ্ঞানদা আর আমরা দুপক্ষই খুশি হয়ে অভিবাদন প্রত্যাভিবাদন জানালাম।

জ্ঞানদাকে হঠাৎ ওখানে পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। আমি লিখতে লাগলাম—আর উনিই শেখাতে লাগলেন বেগমকে। সেই সুরের মিড়-গমকে মূর্ছনা এখনও আমার রক্তে বাজে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আইনগত কারণে বেগম আখতার মেগাফোনে বাংলা গান রেকর্ড করতে পারলেন না। এমনকী আমার ওই 'একী আনন্দে দোলে এ-জীবন' গানটাও নয়। ওই সময়কার লেখা ওই গানটা এবং অন্যান্য কয়েকটি গান জ্ঞানদা মেগাফোনেই রেকর্ড করালেন ওঁর সুগায়িকা পত্নী ললিতা ঘোষকে দিয়ে। চমৎকার গেয়েছিলেন উনি। অবশ্য বেগম আখতারকে আমার লেখা গান জ্ঞানদাই করালেন এইচ. এম. ভি.-তে। অপূর্ব সুর, অপূর্ব গাওয়া সেই গানটি হল 'ফিরায়ে দিওনা মোরে শূন্য হাতে/কুঞ্জে এখনও কুহু কূজনে মাতে'।

আমার স্মৃতির সমুদ্রের ঢেউগুলো বড় এলোমেলো। কে কখন আসে ঠিক করা যায় না। একের পর এক শুধু আসে শুধু আসে। কিন্তু ওদের সঠিক পরম্পরা নির্ধারণ করতে পারি না।

রাজেন সরকার ছিলেন এক দক্ষ ক্ল্যারিওনেট শিল্পী। তখন যে কোনও অর্কেস্ট্রায় ক্ল্যারিওনেট থাকতই। রাজেনদা, টোপাদা (অমর দত্ত) কয়েকজন মিলে গড়ে তুলেছিলেন সুরশ্রী অর্কেস্ট্রা। এখন যেমন একজন সংগীত পরিচালক তাঁর অ্যারেঞ্জারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে সাধারণত ওই অ্যারেঞ্জারের গোষ্ঠীর যন্ত্রশিল্পীদের দিয়ে গান রেকর্ড করেন এবং ইচ্ছেমতো ওই গোষ্ঠীর বাইরেও যে কোনও স্বতন্ত্র যন্ত্রসংগীত শিল্পীকে নিতে পারেন তখন এ-নিয়ম ছিল না। একজন চিত্র প্রযোজক সংগীত পরিচালকদের সঙ্গে পরামর্শ করে চুক্তি করতেন একটা 'অর্কেস্ট্রা' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। ওঁদের দলে যে সব যন্ত্রশিল্পী থাকতেন ওঁদের দিয়েই গান রেকর্ড হত। আমার মনে হয় তখনকার নিয়মটাই ভাল ছিল। বিভিন্ন অর্কেস্ট্রার মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকত। তার ফলে যন্ত্রসংগীত শিল্পীরা দক্ষতার লড়াই করতে করতে অনেক উঁচুতে উঠে যেতেন।

যা হোক, রাজেনদা হঠাৎ সংগীত পরিচালক হয়ে গেলেন। যদিও তিনি জীবনে কোনও দিনই ওই ক্ল্যারিওনেটটাকে পরিত্যাগ করেননি। রাজেনদা 'ঢুলি' ছবিতে সুর দিয়ে একটা আলোড়ন তুলে ফেলেছিলেন সংগীত জগতে। ঢুলি ছবিতেই উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় রাতারাতি সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে গেলেন। আর এক লহমায় জনপ্রিয়তার শিখরে উঠে গেলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজন সেই অনন্যা শিল্পী যূথিকা রায় যাঁকে কেউ কোনও দিন প্লে-ব্যাকে গান গাওয়াতে পারেননি—রাজেনদা সেই অসাধ্য সাধনটি করে ফেললেন। প্রথম প্লে-ব্যাকে গাইলেন কমল দাশগুপ্ত ও প্রণব রায়ের গানের সেই বিখ্যাত 'ভোরের যূথিকা'—যূথিকা রায়। ঢুলির পর পরপর অনেক ছবি করে গেলেন রাজেনদা। কিন্তু পরের ছবিগুলোতে ক্রমশ ওঁর সেই 'ঢুলি'র খ্যাতিটা কিছুটা কমে এল।

সেই সময়েই পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ পানুদার সঙ্গে আমার শুভযোগ। পানুদা হেন্‌রি ফন্ডা অভিনীত আলফ্রেড হিচককের সম্ভবত 'রঙ্‌-ম্যান' ছবিটি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বানাতে এলেন 'অশান্ত ঘূর্ণি'। প্রথম দিনের আলাপ থেকে আজ অবধি

পানুদা আমায় এইভাবে কাছে রেখেছেন। অনেক আলোচনা করেছেন—অনেক তর্ক ঝগড়া করেছেন—অনেক অনেক ভালবেসেছেন। ওঁর বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন সংগীত পরিচালক নিয়েছেন কিন্তু গীতিকার আমাকে আজ অবধি বদল করেননি। পানুদার ছবিতে গান মানেই আমার রচিত গান। নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাতে গোনা দু-একটা ক্ষেত্রে হয়তো এর ব্যতিক্রম হয়েছে।

পানুদা শোনালেন অশান্ত ঘূর্ণির চিত্রনাট্য। বললেন সংগীত পরিচালক রাজেন সরকার। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এ ধরনের ওয়েস্টার্ন স্টাইলের ভিন্নধর্মী ছবিতে রাজেনদার মিউজিক?

পানুদা বললেন—তুমি তো এ ধরনের গান কেমন হওয়া উচিত ভালই জানো—দরকার হলে রাজেনদাকে একটু সাহায্য কোরো।

সিটিং করতে গেলাম রাজেনদার তখনকার হেদুয়া অঞ্চলের বাড়িতে। ওখানেই পেয়ে গেলাম রাজেনদার বড় ছেলে রীতেশকে যে এখন অধ্যাপক। দেখলাম মডার্ন মিউজিক সম্বন্ধে ওর ধারণা খুবই স্পষ্ট। ও হল রাজেনদার সুযোগ্য সহকারী।

আমাদের প্রথম গান তৈরি হল—'আমার নতুন গানের জন্মতিথি এল—বাঁশি বাজো বীণা বাজো'। পানুদা শুনতে এসে বলেছিলেন—ভাবিনি এমন 'ভাল' একটা গান পাব। আমার ছবির সিচুয়েশনটা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। হেমন্তদার কণ্ঠে সে গান নিশ্চয়ই সংগীত রসিকরা শুনেছেন। আটকাল আর একটি গানে। পানুদা বললেন—রাজেনদা, আমার 'হিট' গান চাই। একদম আজকের গানের সুর। আমরা গান তৈরি করে পানুদাকে খবর দেব বললাম। পানুদা চলে গেলেন।

রাজেনদার বড় ছেলে বললে—পুলককাকা কী করা যায় বলুন তো?

প্রশ্নটা ওর একার নয়, রাজেনদা, আমার সকলেরই। অন্ধকারে আমরা হাতড়াচ্ছি। রাজেনদা অনেক সুর শোনাচ্ছেন পছন্দ হচ্ছে না।

হঠাৎ একটা আলোর ঝলক দেখতে পেলাম। বললাম—রীতেশ তুমি একদিন তোমাদের ছেলেবেলার 'বয়েজ স্কাউট'-এর কী একটা গান আমায় শোনাচ্ছিলে ওটা আর একবার গাও তো।

ও তৎক্ষণাৎ গেয়ে শোনাল ' গুংগাং গুলি গুলি আক্‌চা গুংগাং গো'।

ব্যাস, রাস্তা পেয়ে গেলাম। হুবহু ওই মিটারে লিখে ফেললাম—'লজ্জায় থরো থরো দৃষ্টি মিষ্টি গো সন্ধ্যায় ঝরো ঝরো বৃষ্টি মিষ্টি গো।' মানবেন্দ্রর কণ্ঠে সে গানটিও সুপারহিট হয়ে গেল। পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের 'মহাশ্বেতা' ছবির সময়ও এই ধরনেরই ঘটনা ঘটল।

১৪

পুতুল নাচের ওপর পানুদা একটা গানের সিচুয়েশন করেছিলেন। পুতুল নাচ বলতে আমরা গ্রামের মেলায় যে ধরনের পুতুল নাচ দেখি—ঠিক সে ধরনের পুতুল নাচ নয়। এ রীতিমতো আধুনিক পুতুল নাচ। আমার মনে আছে—ডালহৌসি স্কোয়ারে এর অসাধারণ পুতুল নাচ স্রষ্টা রঘুনাথ গোস্বামীর কাছে গেলাম পানুদা রাজেনদা আর আমি। ওখানে

অনেক অনেক 'আইটেম' দেখে ছিলাম। তার মধ্যে বেছে নিয়েছিলাম একটা আইটেম যেটা গল্পের সঙ্গে মিলবে। গান তৈরি হয়ে গেলে সেই গানের কথামতো কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নতুন করে রঘুনাথবাবু আইটেমটি বানাবেন—এটাই ঠিক হল।

রাজেনদা খুব খেতে ভালবাসতেন—ভালবাসতেন খাওয়াতেও। রাজেনদার সিটিং মানেই 'ভূরি ভোজ'—আমি একপায়ে খাড়া।

বসলাম গান নিয়ে। গান আর হয় না। শুধু খাওয়াই হয়। শুধু খাওয়াই হয়। দুদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনের দিন আবার ওর ছেলের কাছে ওর স্কুলে শেখা একটা ছোটদের ওয়েস্টার্ন গান শুনলাম। শুনতেই কাজ হয়ে গেল। লিখে ফেললাম— 'রাতদুপুরে শুরু হল সা রে গা মা পা'। শেয়াল-কুমির ইত্যাদি জন্তুদের নিয়ে গান। ঢুলির রাজেনদা ক্রমশ নতুন হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন।

রাজেনদা সব সময়েই হাসিমুখে থাকতেন। খুব মিশুকে মানুষ ছিলেন। রাজেনদার একটা ঘটনা না-বলে পারছি না। রাজেনদা তখন বিখ্যাত দেবকী বসুর ছবিতে কাজ করছিলেন। দেবকীবাবু খুবই সময় মেনে চলতেন। যেদিন দেবকীবাবুর সঙ্গে রাজেনদার 'সিটিং', সেদিনই তিনি ক্ল্যারিওনেট বাজানোর একটা মোটা টাকার আমন্ত্রণ পেয়ে গেলেন। রাজেনদা জানতেন—দেবকীবাবুকে বললে উনি ছাড়বেন না। ক্ল্যারিওনেট বাজানোর 'ক্ষেপ'টা চলে যাবে। তাই সেদিনটা না-বলে ডুব মেরে দিলেন রাজেনদা।

পরদিন সকালেই উনি হাজির হলেন দেবকীবাবুর বাড়ি। স্বভাবতই দেবকীবাবু একটু বিরূপ হলেন। রাজেনদা বললেন—হঠাৎ শরীরটা এমন খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তার ডাকতে হল।

দেবকীবাবু অর্থাৎ ডি. কে. বি.-র শরীরে 'বাত' ছিল। উনি হুইল চেয়ারও ব্যবহার করতেন। বললেন—সব কাজ ফেলে রেখে অপেক্ষা করলাম। জানেন তো আমার 'বাত' নিয়ে কাজ করার কত অসুবিধে।

রাজেনদা বিনীত হয়ে বললেন—স্যার বলছি তো আমার হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। আমার কথা কেন বিশ্বাস করছেন না? ডি. কে. বি. আবার বললেন—একটা ডেট মিস করা দারুণ ঝঞ্ঝাট। আমার কত কাজ। তার ওপর আমার 'বাত'। রাজেনদা বললেন—স্যার, মানছি অন্যায় হয়েছে। কী করব, শরীর খারাপ হল। ডি. কে. বি. রাজেনদাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—সত্যি রাজেনবাবু, বুঝছেন না আমার 'বাত'। রাজেনদা ডি. কে. বি.-র মুখে বোধহয় বারবার 'বাত' কথাটা শুনে অধৈর্য হয়ে গিয়েছিলেন। বলে ফেললেন—স্যার, আপনারই 'বাত', আমার কি 'বাত্ কে বাত্'? এ ঘটনাটা মনে পড়লে আজও ছেলে মানুষের মতো হেসে উঠি আমি। রাজেনদার সুরে অরবিন্দ মুখার্জীর (ঢুলুদা) 'নতুন জীবন' একটা স্মরণীয় ছবি। 'নতুন জীবন'-এ চারটি গান ছিল। ঢুলুদা তিনটি গান আমায় লিখতে বললেন, আর একটি গান বললেন রবীন্দ্রসংগীত রাখবেন।

প্রযোজক কার্তিক বর্মণ নির্ভেজাল ব্যবসায়ী লোক। উনি আমায় বললেন—না, না, মায়ের ইচ্ছায় চারটে গানই তুমি লেখো। নইলে রেকর্ড বের হবে কী করে? একটা গান 'কমন' করে রাখলে রেকর্ড মার খায়। তোমরা চারটে গানই তৈরি করো। আমি ঢুলুকে

অনুরোধ করব।

রাজেনদা আর আমি বানালাম চারটি গান। ও ছবির চারটি গান-ই সুপারহিট হয়েছিল। (১) সন্ধ্যার কণ্ঠে 'আমি তোমারে ভালোবেসেছি। (২) হেমন্তদার কণ্ঠে—'আমি গান শোনাবো একটি আশা নিয়ে (৩) হেমন্তদারই কণ্ঠে—লাজবতী নূপুরের রিনি ঝিনি ঝিনি। (৪) অর্থাৎ এর পরের গানটি ছিল রবীন্দ্রসংগীত। ঢুলুদা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'স্বপন পারের ডাক শুনেছি/জেগে তাই তো ভাবি' এ গানটি রাখবেন। গানটির সিচুয়েশন আমার জানা। রবীন্দ্রনাথের গানটি পাওয়ায় বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে হল না ঠিক কী ধরনের গান ঢুলুদা চান।

আমি লিখে ফেললাম—'এমন আমি ঘর বেঁধেছি/আহারে যার ঠিকানা নাই'।

পরিবেশক হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগবাজারের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া আর গান শোনানোর 'প্রোগ্রাম' ঠিক করা ছিল।

রাজেনদার গলা ছোট থেকেই ভাল ছিল না। ভাঙা ভাঙা গলায় গান শোনালে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না জেনেই রাজেনদার ছেলে প্রযোজকদের গান শোনাত। (প্রায় রাজেনদার মতোই ভাঙা গলা ছিল সুরশিল্পী অনিল বাগচীর। বিখ্যাত তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দী হলেন সেই রাধাকান্ত—যাঁকে নিয়ে 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিতে গান বানানো হয়েছিল—'শশীকান্ত, তুমিই দেখছি আসরটাকে করবে মাটি!'

'রাধাকান্ত'কে আইন বাঁচিয়ে করা হয়েছিল 'শশীকান্ত'। যা হোক, এই রাধাকান্ত নন্দী রাজেনদা আর অনিলদার কাল্পনিক ঝগড়া নিয়ে একটা হাসির নক্সা বানিয়ে ফেলেছিলেন। রাধাকান্তবাবু মুড পেলেই, অবশ্যই ওঁদের আড়ালে, এই নক্সাটি দুই সুরকারের গলা প্রায় হুবহু নকল করে আমাদের শোনাতেন। সে হেমন্তদা-মান্নাদা-শ্যামল-সন্ধ্যা হোক বা যেই হোক, যেই শুনত হেসে লুটিয়ে পড়ত। সত্যি অমন গুণী রসিক তবলিয়া, অমন আমুদে মানুষও আজ আমাদের মধ্যে নেই।)

যা হোক, আবার আগের কথায় আসি। নতুন জীবনের তিনটি গান শুনে সবাই তারিফ করলেন। ঢুলুদা বললেন—খুব ভাল। এই 'খুব ভাল।' কথাটা বলা ঢুলুদার চিরকালের অভ্যাস।

নতুন জীবনের চতুর্থ গানটি—'স্বপন পারের ডাক শুনেছি'র জায়গায় আমার 'এমন আমি ঘর বেঁধেছি/আহারে যার ঠিকানা নাই/স্বপনের সিঁড়ি দিয়ে/যেখানে পৌঁছে আমি যাই'—গানটি শুনেই উপস্থিত সকলে হই হই করে সাধুবাদ দিলেন। কার্তিকদা বোধহয় আগে থেকেই রেকর্ডের রয়্যালটির জন্যই গানটি বদলাতে চাইছেন—এটা বলে বুঝিয়ে ঢুলুদাকে রাজি করিয়ে রেখেছিলেন। তাই ঢুলুদা এই আধুনিক গানের কোনও প্রতিবাদ করলেন না—শুধু একটু গম্ভীর গলায় অভিমত দিলেন—'খুব ভাল'। ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির স্কোরিং-এ শব্দযন্ত্রী শ্যামসুন্দর ঘোষের রেকর্ডিং-এ হেমন্তদা যখন 'এমন আমি ঘর বেঁধেছি' গানটি রেকর্ড করলেন সেদিনও ঢুলুদা রেকর্ডিং শুনে অমনি একটু গম্ভীর গলায় বলেছিলেন—খুব ভাল।

'নতুন জীবন' মুক্তির পর যখন ছবি এবং গান দুই-ই সুপারহিট হয়ে গেল তখন আবার শুনতে পেলাম ঢুলুদার কণ্ঠে সেই 'খুব ভাল'। তবে এটা আর গাম্ভীর্যে নয়, উচ্ছ্বাসে ভরা।

রাজেনদার আর আমার যোগফলে পরবর্তী সুপারহিট ছবি 'বালুচরী'। এ ছবিতেও চারটি গান ছিল এবং প্রত্যেকটিই সুপারহিট। ছবির পরিচালক অজিত গাঙ্গুলি তখন গানের সিচুয়েশনের দিকে খুবই নজর দিতেন। সে কারণেই ওঁর ছবির গান সহজেই জনপ্রিয় হতে পারত। এই ছবিতে ছিল হেমন্তদার (১) 'আজও হৃদয় আমার পথ চেয়ে দিন গোনে' (২) হেমন্তদারই 'আজ হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখি' (৩) শ্যামল মিত্রের—'আমি তোমার কাছেই ফিরে আসবো' (৪) সন্ধ্যার কণ্ঠে 'আরও কিছু রাত তুমি জাগতে যদি'।

অজিত গাঙ্গুলির আমার ওপর খুবই ভরসা বা বিশ্বাস ছিল। জানি না, আজও আছে কি না। উনি প্রথম তিনটি গান শুনেছিলেন। চতুর্থ গানটি তখনও বানানো হয়নি। তখন উনি অন্য ছবি নিয়ে ব্যস্ত। আমায় বললেন—এই তো সিচুয়েশন—জন্মদিনের পার্টির গান, ও আপনি বানিয়ে ফেলুন। আমি একেবারে সুরসুদ্ধ রেকর্ডিং-এ শুনব।

জন্মদিনের মামুলি সিচুয়েশনে তথাকথিত গান কোনওদিনই জনপ্রিয় হয় না। তা ছাড়া, আমি আজীবন বিশ্বাস করে এসেছি গানে কথায় বা সুরে কোনও চমক বা 'নতুনত্ব' না থাকলে কিছুতেই সেটা 'হিট' করে না। তাই যে গান বানালাম জানতাম সে গান শুনে গুঁই গাঁই করবেন অজিতবাবু। তবু আমি জেনেশুনে ভুল করব না বলেই রাজেনদার সুরের ওপর লিখে ফেললাম—'আরো কিছু রাত তুমি জাগতে যদি/দেখতো গো সব তারা জ্বলছে/কী যে মিষ্টি কথা চাঁদ বলতে জানে/তুমি শুনতে পেলে না'—যা ভয় করছিলাম, ঠিক তাই-ই হল। অজিতবাবুরও প্রায় রাজেনদার মতোই কণ্ঠস্বর। উনি গলা চড়িয়ে বললেন—একী এ যে হোটেলের গান!

আমি অধোবদনে নিরুত্তর। রাজেনদা অল্প কথায় সারলেন।

আমি জানি না যা-বলবার পুলককে বলো।

এগিয়ে এলেন সেই কার্তিক বর্মণ। উনি এই ছবিরও প্রযোজক ছিলেন। বললেন অজিত, ওটা মানিয়ে নাও। গানটা সুপারহিট করবে। মায়ের ইচ্ছায় মোটা রয়্যালটি আসবে রেকর্ড থেকে।

তৎক্ষণাৎ অজিতবাবু কিন্তু মানলেন এ যুক্তি। বললেন—গানটা সত্যিই জমেছে। আমি সিচুয়েশনটা কিন্তু বদলে দেব।

কার্তিকদা হাসতে হাসতে বললেন—মায়ের ইচ্ছায় পুলক গানটা দারুণ লিখে ফেলেছে। সিচুয়েশন যা-খুশি বদলাও এ গানটা বদলানো চলবে না।

সম্পূর্ণ ভিন্ন সিচুয়েশনে অজিত গাঙ্গুলি গানটি লাগিয়েছিলেন। সুপারহিট হল—'আরো কিছু রাত তুমি জাগতে যদি' রাজেনদার আর আমার এরপরের উল্লেখযোগ্য ছবি 'মুক্তিস্নান'। 'মুক্তিস্নান' ছবিতে কিন্তু বেশ একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। এই ছবিরও প্রযোজক ছিলেন কার্তিক বর্মণ এবং পরিচালক ছিলেন অজিত গাঙ্গুলি। আমরা ছবির সিচুয়েশন পেয়ে গান বানালাম। ওঁরা বললেন গান শুনবেন ফিল্ম সার্ভিস-এর দোতলার ঘরে।

সেইমতো নির্দিষ্ট সময়ে আমরা টালিগঞ্জে হাজির হলাম। কিন্তু একটা গানও কার্তিকবাবু বা অজিতবাবু কারওর-ই পছন্দ হল না। কিন্তু আমি অনেক অভিজ্ঞতায়

আজীবন দেখেছি—যখন কোনও গান একাধিক শ্রোতার অপছন্দ হয়—তখন সে গানে নিশ্চয়ই কোনও সত্যিকারের খামতি থাকে। যাঁরা গান বানান তাঁরা তো শিল্পী (গীতিকার বা সুরকার) তাঁরা আগে নিজের পছন্দ হয়েছে বলেই তো সে গান পরিচালক-প্রযোজককে শোনাতে আসেন। তাই চট করে কোনও গান বাতিল করে দিতে অস্বীকার করেন। আমি হেমন্তদাকে অনেকবার দেখেছি একটা গানে দু-তিনটি সুর করে রাখতেন। উনি বলতেন—প্রত্যেকটিই তো আমার সৃষ্টি। যেটা খুশি প্রযোজকরা পছন্দ করুন না—আমার তাতে কী এল গেল?

হেমন্তদার কাছে বহু শিক্ষা পেয়েছি।

এই সুন্দর শিক্ষাটাও মনেপ্রাণে রেখে দিয়েছি।

তাই রাজেনদার গান বাতিলের স্বাভাবিক অতৃপ্তিটা আমি সেই শিক্ষার স্পোর্টসম্যান স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে মুছে দিয়ে বললাম—রাজেনদা মন খারাপ করবেন না। আসুন নতুন গান তৈরি করি।

ওঁদের সামনেই তৎক্ষণাৎ লিখলাম—'সুরের আসর থেকে মন নিয়ে এসেছি/ফুলের বাসর ঘরে বন্ধু'। রাজেনদাও তৎক্ষণাৎ সুর করে ফেললেন। জানতাম এ গান হেমন্তদার কণ্ঠে 'সুপারহিট' হবে। হলও তাই।

সেদিন খুব 'মুড' পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ওখানেই থেমে থাকিনি। লিখে ফেলেছিলাম 'দরদিয়া গো, যে তোমায় এতো জানায় সে-কেন জানায় না/কাউকে মন দিয়ে মন ফিরিয়ে নেওয়া মানায় না।'

গানটা অপূর্ব গেয়েছিল সন্ধ্যা।

মুক্তিস্নানের গান সুপারহিট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে কার্তিক বর্মণ ওঁর পরের ছবিতে সুধীন দাশগুপ্তকে নিলেন, আমাকে অবশ্য গীতিকার রেখেছিলেন। কিন্তু রাজেনদা মুখ ফুটে কাউকে কিছু না বললেও মনে মনে ভেঙে পড়েছিলেন। নিজেকে গুটিয়ে নিলেন তারপর থেকেই। এই হল স্রষ্টা শিল্পীর ভাগ্য। কখন যে আলো কখন অন্ধকার কেউ-ই তা বলতে পারে না।

আগেই বলেছি—সময়টাকে আমার স্মৃতি ঠিকমতো পরপর সাজাতে পারে না। এবার তাই বলছি—সেদিনের কথা যেদিন সকালে উত্তম-জায়া গৌরী আমায় ফোন করল—মামা, এক্ষুনি ভবানীপুরে চলে এসো। ও (উত্তম) বলল—বিধায়কদা (ভট্টাচার্য) ভ্রান্তিবিলাসের স্ক্রিপ্ট শোনাতে আসছেন। তুমি গানের সিচুয়েশনগুলো শুনে নেবে। শ্যামলদাও (মিত্র) আসছেন গান নিয়েও আলোচনা হবে। আর দুপুরে এখানে ইলিশ মাছ আর খিচুড়ি খেয়ে যাবে।

১৫

বিধায়ক ভট্টাচার্য অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। ওই খাটো মানুষটি দারুণ নাটক লিখতে জানতেন—জানতেন দারুণ সংলাপ, দারুণ অভিনয়—আর জানতেন দারুণ ভালবাসতে। ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ আমার একটি গীতিনাট্যে। উনি সেদিন সভাপতি

হয়ে এসেছিলেন। আমার প্রণামের উত্তরে উনি বলেছিলেন—তোর নাম আমি শুনেছি। তোর গান তো কাজে লাগাবই, তোর নামটাও কাজে লাগাব। লাগিয়েও ছিলেন। ওঁর রাজবংশী উপন্যাস যখন সিনেমায় 'ঢুলি' হয়ে এল সেখানে একটি প্রধান চরিত্রের নাম দিয়েছিলেন—পুলক।

বিধায়কদা তখন থাকতেন হাওড়ায়। কিন্তু কেউ-ই ওঁকে সময়মতো লেখাতে পারত না। মনে আছে—পাড়ার বন্ধু মুণ্ডি ও বিনু ভাই (প্রযোজকরা) ওদের 'অসমাপ্ত' ছবির সময় ওঁকে আমাদের পাড়ায় রীতিমতো নজরবন্দি করে রেখেছিলেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ 'আসছি' বলে বিধায়কদা উধাও হয়ে যেতেন। ঘণ্টা দুয়েক বাদে ফিরে এসে কোনও কোনও দিন বলতেন—তোদের সালকিয়ার হরগঞ্জবাজারে যা ছিপ আর বঁড়শি পাওয়া যায়—শেয়ালদাতেও তেমন পাওয়া যায় না। কোনও কোনও দিন বলতেন, সালকিয়ার চৌরাস্তার ওই পানের দোকানটায় নিজে না দাঁড়িয়ে থেকে পান সাজালে ঠিক জমে না।

বিধায়কদার চিত্রনাট্য, সংলাপ উত্তম দারুণ পছন্দ করত। তরুণকুমাররা যখন 'অবাক পৃথিবী' ছবি করছিল তখন একদিন উত্তমের বাড়িতে গল্প নিয়ে সিটিং হয়েছিল। উত্তম বুড়োকে বলল—আমি তো পকেটমার। আমার জন্য পকেটমারের 'জয়গান' দিয়ে মামাকে একটা গান লিখতে বল। বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল। তারপর দিনই আমি লিখে ফেললাম—'সূর্পণখার নাক কাটা যায়/উই কাটে বই চমৎকার/খদ্দেরকে জ্যান্ত ধরে গলা কাটে দোকানদার/আমরা কাটি পকেট ভাই/কাঁচি নিয়েই আমরা বাঁচি, কাঁচিই মোদের ঠাকুর তাই।'

কিন্তু লিখে ফেললে কী হবে? যেদিন ফাইনাল স্ক্রিপ্ট 'রিডিং হল, শুনলাম—এ গানটির কোনও সিচুয়েশন-ই করা যাচ্ছে না ছবিতে। বিরস বদনে বসে আছি। ছোট্টখাট্টো বিধায়কদা হঠাৎ তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। বললেন—গানটা মনে আছে তোর? পকেটেই ছিল গানটা। গড়গড় করে পড়ে গেলাম। আশীর্বাদ করলেন—দারুণ লিখেছিস। হিট করবে গানটা। আমি সিচুয়েশন পেয়ে গেছি। বিধায়কদার তৈরি অপূর্ব সিচুয়েশনে অমল মুখার্জির সুরে হেমন্তদার গাওয়া উত্তমের ঠোঁটে আমার লেখা—'সূর্পণখার নাক কাটা যায়' বা 'এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে মায়ের কথা মানতো না' ইত্যাদি গানগুলো কত ভাল হয়েছিল তা যাঁরা 'অবাক পৃথিবী' দেখেছেন—নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

বিধায়কদার সঙ্গে আরও বহু ছবিতে কাজ করেছি। কিন্তু স্মরণীয় হয়ে আছে 'ভ্রান্তিবিলাস'।

ভ্রান্তিবিলাসের সময়কার সব ছবিতেই বিধায়কদা শেয়ালদা স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে কিছুদিনের জন্য থেকে চিত্রনাট্য লিখতেন। টাকা-পয়সার শর্ত ছাড়া ওঁর প্রধান শর্ত ছিল—প্রতি প্রযোজককে ওঁকে দুটো লুঙ্গি আর দুটো হাফ হাতা ছিটের পাঞ্জাবি দিতে হবে। সব প্রযোজকই তা-ই দিতেন। 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর প্রযোজক উত্তমকুমারও তাই দিয়েছিল। বিধায়কদা 'ফুল স্কেপ' কাগজে লিখতেন না, স্কুলের ছোট-ছোট খাতায় নম্বর দিয়ে চিত্রনাট্য লিখতেন।

আর ওঁর 'আলসেমি' টালিগঞ্জের সবাই জানত। উত্তম অনেক অনেক তাগাদায় 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর চিত্রনাট্য ওঁকে দিয়ে শেষ করিয়ে ওঁর মুখ থেকে সেটা আমাদের শোনাতে ওর ভবানীপুরের বাড়িতে ডেকেছিল।

শেয়ালদায় গাড়ি পাঠিয়ে যথাসময়ে বিধায়কদাকে নিয়ে এল উত্তম। এক রাউন্ড চা খেয়ে—সামনে এক প্লেট পান নিয়ে ঘরের এক কোণে বসলেন বিধায়কদা। উত্তম বললেন—ও কী? ওখানে বসলেন কেন? আলো কম। পড়তে অসুবিধে হবে যে। উত্তমকে থামিয়ে দিয়ে বিধায়কদা বললেন—তুই থাম। আমার চোখ তোর থেকে পাওয়ারফুল। চোখের ওপর খাতা তুলে তুলে একটার পর একটা খাতা পড়ে শেষ করে বিধায়কদা থামলেন। গানের সিচুয়েশন বুঝিয়ে দিলেন আমাকে আর শ্যামল মিত্রকে। উত্তম দু-একটা সামান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। পরিচালক মানু সেন আর উপস্থিত সবাই বললেন—চমৎকার চিত্রনাট্য।

ভ্রান্তিবিলাসে উত্তমের সংলাপ সমৃদ্ধ সন্ধ্যা রায়ের ঠোঁটে সন্ধ্যা মুখার্জির গাওয়া আমার লেখা গান 'অ্যাতো ভোরে যেয়ো না গো জাগেনি সজনী' কিংবা 'তুমি কি সে তুমি নও' ইত্যাদি গান নিশ্চয়ই অনেকেই ভোলেননি।

যা হোক, সেদিন চিত্রনাট্য শোনার পর খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই উত্তম ওর গাড়ির চালক ন্যাপা-কে বলল—বিধায়কদাকে শেয়ালদায় ছেড়ে আসতে।

আমার সঙ্গে গাড়ি ছিল। আমারও ওদিকেই যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। বললাম—ন্যাপাকে পাঠানোর দরকার নেই। আমি ওদিকেই যাব। বিধায়কদাকে হোটেলে পৌঁছে দেব। বিধায়কদা চিত্রনাট্যের খাতাগুলো বগলদাবা করে হোটেলে গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বললেন—পুলক, ওপরে আমার ঘরে আয়। তোকে আর একটা ছবির গানের সিচুয়েশন দেব। সানন্দে গেলাম ওঁর সঙ্গে। বিধায়কদা বললেন—একটু বোস, আমি ধুতিটা ছেড়ে লুঙ্গি পরে আসি। আমার সামনের টেবিলটাতেই রেখে গেলেন 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর চিত্রনাট্যের খাতাগুলো। টেবিলে আরও কাগজপত্র ছিল। হঠাৎ পাখার হাওয়া লেগে 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর খাতাগুলো মেঝেতে পড়ে গেল। দু-একটা খাতার পাতাগুলো খুলেও গেল। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম—মাত্র দুটো কি তিনটে খাতায় পুরোপুরি লিখেছেন বিধায়কদা, বাকিগুলো শ্বেতশুভ্র—একটা কালির আঁচড়ও নেই।

হতবাক হয়ে বসে আছি। বাথরুম থেকে লুঙ্গি পরে বিধায়কদা এলেন। এসেই বুঝতে পারলেন তিনি ধরা পড়ে গেছেন। কিন্তু কোনওই তাপ-উত্তাপ নেই। বললেন—সমস্ত স্ক্রিপ্টটা তো মগজে রেকর্ড করা আছে। তোদের শোনালাম। তোদের মতামত পেলাম। বাকি খাতাগুলোতে ওসবগুলো লিখতে বড়জোর সময় লাগবে দুদিন।

বিধায়কদা টেবিল থেকে আর একটা খাতা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। উঁকি মেরে দেখলাম—ওটাও কালির আঁচড়হীন শ্বেতশুভ্র কি না? নিশ্চিত হলাম—ছোট ছোট হাতের লেখা দেখে।

মধু সংলাপী বিধায়কদা এ আপনার এক ধরনের অনন্য প্রতিভার পরিচয়। এতদিন এ কথাগুলো কাউকে বলিনি—আজকে এগুলো বলে আপনাকে প্রণাম জানালাম!

আমার সঠিক অভিজ্ঞতা তো শুরু পাঁচের দশকের মাঝ থেকে। তখন থেকে সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চিত্রনাট্যকার বা পরিচালকরা আমার মতো গীতিকারদের বলতেন—'ইনটারাপটেড মেলোডি' দেখেছেন। বা 'রেড সুজ' দেখেছেন? বা 'পিলো টক' কিংবা 'টু ক্যাচ এ থিভ' দেখেছেন? ওই ধরনের একটা গান আমরা চাই। গীতিকার সুরকার দুজনেরই বিখ্যাত ওই সব ছবির খবর রাখতে হত। সৃষ্টি করতে হত ওগুলোকে বাঙালির জারক রসে ভিজিয়ে সম্পূর্ণ নতুন বাংলা গান। আটের দশক থেকে (দু-চারজন ছাড়া) আজ পর্যন্ত প্রায় সব চিত্রনাট্যকার বা পরিচালকদের কাছে শুনি—'পাপ কি দুনিয়া' দেখেছেন? বা 'খুন কা বদলা খুন' বা 'দিওয়ানা তুমহারা লিয়ে' কিংবা ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যিই আজকের বাঙালি অনেক অনেক এগিয়ে গেছে। আগেকার চিত্রনাট্যকারদের আর একটা স্টাইল ছিল—ওঁরা নাটকের সঠিক গানের সিচুয়েশন বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কোনও গানের উল্লেখ করে রাখতেন। রবীন্দ্রনাথের সেই গানের উল্লেখ দেখে আমরা খুব সহজেই সিনেমার নাটক মিলিয়ে গান বানাতাম! শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রায় সব চিত্রনাট্যেই এইভাবে গান বোঝাতেন। আর ছিলেন অসাধারণ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নৃপেনদা 'হারানো সুর' ছবিতে উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের—'আমার এ পথ তোমার পথের থেকে/অনেক দূরে গেছে বেঁকে।'

হেমন্তদা যদি গীতিকার হতে চাইতেন, তিনি অসাধারণ এক গীতিকার-ও হতে পারতেন। কিন্তু তা কোনও দিনই চাননি, শুধু প্রচুর গানের মুখড়া বানিয়ে রাখতেন। হেমন্তদা ওই 'আমার এ পথ' গানটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটা একটু রকম ফের করে বানিয়ে রেখেছিলেন—'আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে।' অবশ্য গীতিকারকে এই মুখড়া পরিবর্তনের সুযোগ দিতেন। কিন্তু সুরের সঙ্গে জমাট বেঁধে যাওয়া—রবীন্দ্রনাথের কথা ব্যবহার করা এমন পঙ্‌ক্তি বদলানো কোনও গীতিকারেরই সহজসাধ্য ছিল না। প্রত্যেকেই বিনা দ্বিধায় তার পর থেকে গানটা লিখতেন।

ঠিক এই রকম করতেন চিত্রনাট্যকার পরিচালক সলিল সেন-ও। 'অজানা শপথ' ছবিতে তাঁর চাহিদা ছিল—রবীন্দ্রনাথের 'আজি বিজন ঘরে/নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য হাতে/আমি তাইতে কি ভয় মানি/জানি বন্ধু জানি/তোমার আছে তো হাতখানি।' হেমন্তদা রবীন্দ্রনাথের কথা ব্যবহার করে নিজের সুরে তৈরি করেছিলেন—'ও বন্ধু আঁধার রাতে যদি এলে/হাতখানি রাখো মোর হাতে/আমি নির্ভর তোমার হাতের ছোঁয়া পেলে।' গীতিকারের হাসিমুখে ওই পঙ্‌ক্তি রেখে দিয়ে তারপর থেকে গানটি না-লিখে কিছু করার ছিল না।

হেমন্তদার এমন অজস্র ঘটনার কথা বলব। যখন আমার স্মৃতিকথায় বিশদভাবে আসবেন এই অসাধারণ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আমি আগেই বলেছি—প্রতিটি কাজে কিছু

নতুনত্ব করার বাসনা আমার চিরদিনের। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রথম আধুনিক গান রেকর্ড করে আমারই কথায় প্রবীর মজুমদারের সুরে গানটি ছিল, 'যদি নিজেরে হারাই আমি তোমার চোখে।'

যদিও সুচিত্রা মিত্রের আধুনিক বাংলা গানের রেকর্ড 'এ কী লিপিকা হল লেখা আজি রাতে' আমাদের বাড়িতে ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সুচিত্রাদি রবীন্দ্রসংগীতেরই পূর্ণাঙ্গ শিল্পী হয়ে রইলেন। তবুও এই সেদিন যখন সুচিত্রাদি নিখিল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে বেতারের 'এ মাসের গান' আর 'রম্যগীতি'-তে আমার গান গাইলেন—খুবই উদ্দীপনা পেয়েছিলাম।

এই নতুনত্ব করার উৎসাহ দেখেই আমি পরিচালক অগ্রগামী গোষ্ঠীর সরোজ দে-র (কালুদা) এত কাছের মানুষ হয়ে গেছি। উনিই প্রথম সুযোগ দেন নতুন সুরশিল্পী সুধীন দাশগুপ্তকে। 'ডাক হরকরা' ছবিতে কালুদার ইচ্ছামতোই মান্না দে সুধীনবাবুর সুরে কোনও বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই পুরোপুরি খালি গলায় শুধু একটিমাত্র দোতারার রিদম্-এ গেয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত রচনা—'ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি'। তথাকথিত মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ছাড়াই যে গান সুপারহিট। উনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন ভাল কথা, ভাল সুর, ভাল গাওয়াই হল ভাল গানের আসল প্রাণ। ভাল বাদ্যি বাজনা নয়। এরপরে অপরেশ লাহিড়ি এই সত্যটা আবার প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। 'সুভাষচন্দ্র' ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের স্বর্ণকণ্ঠে, প্রচলিত সুরে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটি রেকর্ড করিয়ে। ও গানটিতেও ছিল একটিমাত্র দোতারার রিদম।

কালুদার নতুনত্বের পরীক্ষা প্রবৃত্তিতেই আরতি মুখোপাধ্যায় সুযোগ পায় ওঁর 'কান্না' ছবিতে। আরতি রবীন্দ্রসংগীত গায় ওঁর 'নিশীথে' ছবিতে। ওঁর 'বিলম্বিত লয়' ছবিটির আমার কথায় আর নচিকেতা ঘোষের সুরে—'আঁকাবাঁকা পথে যদি/মন হয়ে যায় নদী', 'সোনার রোদের গান আমার বেলা শেষের গান/অস্তরাগের রঙিন সুরে ভরাও আমার প্রাণ' এবং বিশেষ করে 'এক বৈশাখে দেখা হল দুজনার/জষ্ঠিতে হলো পরিচয়' গানটিতে পরিবেশক-প্রযোজক এবং ইউনিটের প্রায় সবাই চাইছিলেন লতা মঙ্গেশকরের প্লে-ব্যাক কণ্ঠ। কিন্তু কালুদা একরকম জেদ ধরেই আরতি মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে 'বিলম্বিত লয়ে'র সবকটি গানই গাইয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই আরতিরই একটু ভিন্ন ধরনের ব্যবহারে আহত হন কালুদা। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমাদের জানান। ওঁর তখনকার নির্মীয়মাণ ছবি ছিল 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'। যেখানে নায়করূপে দীপঙ্কর দে-র প্রথম আবির্ভাব এবং ভিন্ন নামে কিশোরী মহুয়ার আগমন। কালুদা ওই ছবির জন্য নতুন মহিলা কণ্ঠশিল্পীর সন্ধান চান। আমি বলেছিলাম—হৈমন্তী শুক্লাকে নিন। এই ক'দিন আগে ও আমার কথায় 'শিব ঠাকুরের গলায় দোলে বৈঁচি ফলের মালিকা'—দুর্দান্ত গেয়েছে। ছবির রেকর্ডটা বেরুলেই হিট করবে। কালুদা বললেন—না, না উনি তো এসে গেছেন। আমি সম্পূর্ণ নতুন কোনও মহিলা কণ্ঠশিল্পী আনতে চাই।

কালুদার ছায়া আমার ছোটবেলার বন্ধু জয়ন্ত ভট্টাচার্য কলকাতা বেতারের কর্মী প্রয়াত অতন্দ্র ঘোষ দস্তিদারের মাধ্যমে দীনেন্দ্র চৌধুরির পল্লীগীতির 'গ্রুপ' থেকে এক রোগা

লম্বা গায়িকাকে নিয়ে হাজির করল 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'র সুরকার বাহাদুর খানের বাড়িতে। মেয়েটির গান আমাদের সকলেরই ভাল লাগল। কালুদা হঠাৎ বললেন—না, না, আধুনিক গান নয়, এই পল্লীগীতি গায়িকাকে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াব। তাই হল। চিত্রসংগীত জগতে ভূমিষ্ঠ হল অরুন্ধতী হোমচৌধুরির রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। শুধু কালুদারই পৃষ্ঠপোষকতায়। আরতি মুখার্জির ওপর প্রচণ্ড অভিমানের প্রতিক্রিয়ায়।

১৬

এবার আসি কালুদার 'স্বাতী' ছবির প্রসঙ্গে। কেন 'স্বাতী' ছবির কথা বলছি তার একটা কারণ আছে।

কালুদা যখন 'স্বাতী' ছবি করেন ওঁর সঙ্গে প্রথম কাজ করেন হেমন্তদা। স্বাতীর নায়িকা হিসাবে উনি একটি নবাগত তরুণ নায়কের বিপরীতে হেমন্তদার মেয়ে রাণু মুখোপাধ্যায়কে নায়িকা নেবেন মনস্থ করেছিলেন। লোক মারফত কথাবার্তাও হয়েছিল। রাণু ও হেমন্তদা দুজনেই রাজিও হয়েছিলেন। যেদিন কালুদা আর আমি প্রথম হেমন্তদার বাড়ি গেলাম, টিন এজার লাভের গল্প 'স্বাতী' ছবির আইডিয়াটা হেমন্তদা আর রাণুকে শোনালেন কালুদা। তারপর হঠাৎ বললেন—হেমন্তবাবু, একটা কথা আপনাকে আগেই বলে রাখি। স্বাতীর প্লে-ব্যাক গান কিন্তু গাইবে অরুন্ধতী হোমচৌধুরি। হেমন্তদা আমতা আমতা করলেন—কিন্তু আমি যে ওর কোনও গানই এখনও পর্যন্ত শুনিনি। আমার দিকে ফিরে হেমন্তদা জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন গায় অরুন্ধতী? স্বভাবতই বললাম—বেশ মিষ্টি গলা—ভাল রেঞ্জ। তবে আপনি তো শিখিয়ে নেবেন।

হঠাৎ দেখি, রাণু এ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে গেছে। ও ঘর থেকে কে যেন এসে আমায় ও ঘরে যেতে অনুরোধ করল। গেলাম। রাণু বললে—কালুবাবুকে বলে দিন—ওঁর ছবিতে আমি অভিনয় করব না। আমি গান করি। ছবিতে আমি ঠোঁট নাড়ব, আমার গান গাইবে অন্যজন? তা হতে পারে না।

'কালুবাবু'-কে যথাসময়ে রাণুর বক্তব্যটি জানিয়ে দিলাম। নতুনত্বের পিয়াসি কালুদা 'স্বাতী'র নায়িকা করলেন আনন্দশঙ্করের স্ত্রী নৃত্যশিল্পী তনুশ্রীকে।

কালুদার এখন পর্যন্ত সবশেষ ফিচার ফিল্ম সাঁতারুর ছবি 'কোনি'-তেও নিয়েছিলেন নতুন নায়িকা আর সংগীত পরিচালক নিয়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসাবে খ্যাত চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে।

'স্বাতী'-তে আমার কথার আর হেমন্তদার সুরের প্রতিটি গানই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মান্নাদার গাওয়া—'ওই আকাশ খুঁজতে যারা চলেছে।'

মান্নাদা, হেমন্ত আর অরুন্ধতীর গাওয়া—'যেতে যেতে কিছু কথা।' অরুন্ধতীর গাওয়া—'গোধূলির স্বর্ণরাগে'—নিশ্চয়ই এখন অনেকেই ভুলতে পারেননি। এরপর কালুদা অরুন্ধতীকে নিয়ে রীতিমতো স্পনসরশিপ করেন। অরুন্ধতীকে ওঁর বন্ধু দীনেশ দের ছবিতে গাওয়ান। ওঁরই অনুরোধে বিমল দে 'দস্তা' ছবিতে সুচিত্রা সেনের লিপে অরুন্ধতীর গান দেন। এই কালুদাই ওঁর 'শঙ্খবেলা' ছবিতে উত্তমের লিপে প্রথম

দিয়েছিলেন মান্নাদার গান। সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত কালুদাকে বলেছিলেন—আপনার মতো আমারও বড় একঘেয়ে লাগছে উত্তমকুমারের গান মানেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান। যদি পরিবর্তনই করছেন—পুলকবাবু আর আমি যে সব গান বানিয়েছি সেগুলো কিশোরকুমারকে দিয়ে গাওয়ান। আমার ধারণা 'বেটার রেজাল্ট' হবে। কালুদা আমার মতামত চাইলেন। বহুদিন ধরে আমি সুযোগ খুঁজছিলাম। উত্তমের লিপে মান্না দের একটা গান হোক। তৎক্ষণাৎ আমি বললাম, 'আমি আগন্তুক. আমি বার্তা দিলাম',—মান্নাদার মতো ভারতবর্ষে কোনও শিল্পীই গাইতে পারবে না। কালুদা মেনে নিলেন। মান্নাদাই গাইলেন 'শঙ্খবেলা'-র গান। সংগীতজগতে সকলের-ই যে ধারণা আছে মান্না দেকে উত্তমের লিপে এনেছিলেন সুধীনবাবু, তা কিন্তু সর্বাংশে সঠিক নয়। কালুদা না-থাকলে হয়তো কিশোরদাই গাইতেন 'শঙ্খবেলা'র গান। মান্না দে এভাবে বাংলা গানে জনপ্রিয় হতে পারতেন না।

'র‍্যাপ' কী? আমরা তখনও কেউ জানতাম না। এই র‍্যাপের স্টাইল কিন্তু ওই 'আমি আগন্তুকের' মধ্যে অজান্তেই এসে গিয়েছিল। মনে করুন তো—আমি আগন্তুক গানটার সঞ্চারী। যেখানে রয়েছে—'মাঝখানে গোটা দুই স্টেডিয়ামে ফুটবল নেই/সাহারার দুপুরেতে কেন গায়ে কম্বল নেই/আল্পসের চুড়োতে উটপাখি উড়ছে। ভদ্‌গার ডুব জলে সিগারেট পুড়ছে/কার টুপি হলো যে নীলাম।' এটা আজকালকার 'র‍্যাপ' গানের থেকে কতটা দূরের? অবশ্য এই ক্রান্তদর্শনের আদি ও অকৃত্রিম উদাহরণ রেখে গেছেন আমাদের অনেক আগেই প্রণব রায় আর কমল দাশগুপ্ত। 'দম্পতি' ছবিতে কমলদার সুরে গেয়েছিলেন রবীন মজুমদার। গানটির প্রথমেই ছিল—নীলপরীগো নীলপরী/স্বপ্নলোকের অপ্সরী/বাসন্তিকার সঙ্গিনী গো কল্পলতার মঞ্জরী/নীলপরী/যৌবনের-ই কুঞ্জবনে/ছন্দ মধুর গুঞ্জরনে/চাঁদের আলোর ঢেউ তুলে আজ মর্তে এসো রূপ ধরি/নীলপরী/এই অ্যাতোটা অংশ ইদানীং কালের র‍্যাপের স্টাইলে গেয়েছেন রবীন মজুমদার। তারপর এসেছে 'সাইন' অর্থাৎ গানের মুখড়া এবং ভারতীয় মেলোডি—'নীলপরী স্বপ্নে জাগালোরে জাগলো।' এ দেশের গানের কোনও প্রকৃত গবেষক নেই, তা হলে সহজেই প্রমাণ হয়ে যেত এই 'নীলপরী' গানটিই পৃথিবীর প্রথম 'র‍্যাপ' গান যা সৃষ্টি করেছে বাঙালিরাই।

যা হোক, শঙ্খবেলার আরও একটু ঘটনা বাকি আছে। সেটা ঘটেছিল উত্তমের দেওয়া একটা পার্টিতে। তখন উত্তমের যে ছবিটির কাজ শেষ হয়ে যেত সেই বিশেষ ছবিটির প্রধানদের নিয়ে এবং আরও দু-চার জন নিমন্ত্রিত অতিথি নিয়ে উত্তম ওর বাড়িতে একটা করে পার্টি দিত। শঙ্খবেলার পার্টিতে কালুদা, জয়ন্ত, আমি, অজয় বসু (প্রযোজক) ইত্যাদিরা হাজির ছিলাম। ওখানে সেদিন বিশেষ নিমন্ত্রিত ছিলেন 'উদয়ের পথে'র বিখ্যাত নায়ক-অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য। উত্তমের পার্টি মানেই গানের আসর। ও প্রচণ্ড ভালবাসত গান। দ্রব্যরসে বিশেষ অতিথিরা সবাই যখন মশগুল কার যেন গান শেষ হতেই উত্তম হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দিল রাধামোহনদার দিকে। রাধামোহনদা ধরলেন ঠুংরি তারপর গজল। অপূর্ব গান। তখন আজকালকার মতো মুঠো মুঠো টেপরেকর্ডারের ছড়াছড়ি ছিল না। আজও আমার আক্ষেপ অভিনেতা রাধামোহন

ভট্টাচার্য কত নিপুণ কণ্ঠ সংগীত শিল্পী ছিলেন তার কোনও প্রমাণ রইল না। কোনওদিনও কেউ তাঁর গানকে রেকর্ড করে কেন রাখল না আমি ভেবে অবাক হই আজও।

এরপর স্বয়ং উত্তমকুমার হারমোনিয়াম টেনে নিল। গাইতে লাগল রবীন্দ্রসংগীত। সবশেষে একাই গাইল 'শঙ্খবেলা'র লতাজি আর মান্নাদার গাওয়া 'কে প্রথম কাছে এসেছি/কে প্রথম চেয়ে দেখেছি/কিছুতেই পাই না ভেবে/কে প্রথম ভালবেসেছি/তুমি না আমি?'

উত্তমও চমৎকার গাইল। গান শেষ হতেই আমার দিকে চেয়ে ঘটনাটি ঘটাল। হাসতে হাসতে বললে—পুলক মামা দারুণ লিখেছে গানটা। কিন্তু নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে। ওর বন্ধু মান্না দেকে দিয়ে গানটি গাইয়েছে। আমার গলার সঙ্গে মান্না দের গলা মিলবে না, গানটা মার খাবে। দোষ কিন্তু আমার নয় পুলক মামার। ঘামতে শুরু করলাম আমি। যেন কোনও বিচারালয়ে আমার খুনের বিচার হচ্ছে এমন অবস্থা। সবাই আমার দিকে কেমন যেন ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমার ঠিক পাশেই বসেছিলেন পরিচালক কালুদা আর জয়ন্ত ভট্টাচার্য। কালুদা এক ফাঁকে আমার কানে কানে বললেন যা খুশি বলুক, শুনবেন না। গান হিট করবেই।

শঙ্খবেলার গান আজও হিট। শুরু হয়ে গেল বাঙালির ঘরে ঘরে মান্না দের আন্তরিক অভিনন্দন।

এর কিছুদিন পরেই একদিন উত্তমের ফোন পেলাম!—মামা, মান্নাদা কবে আসছেন কলকাতায়? চমকে গেলাম—মান্নাদা? কী ব্যাপার, জলসা করবে নাকি? উত্তরে উত্তম বলল—না, 'এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'-র গানগুলো গাওয়াব, ওরা অন্য আর্টিস্ট চাইছে। উনি বড্ড 'আড়ি'তে (অফ বিটে) গান করেন লিপ দিতে অসুবিধা হয়। মান্নাদার 'বিটে বিটে' গানে লিপ দিতে খুব সুবিধে। এবার আমার কথা শোনানোর মওকা। বললাম—সে কী? মান্না দেকে গাওয়াবে? তোমার গলার সঙ্গে ওঁর গলা মিলবে? উত্তম এড়িয়ে গেল। বললে—ছাড়ো তো। ওঁর বম্বের বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটা দাও। ফোন করাই। মান্নাদার মুম্বই-এর টেলিফোন নাম্বারটা দিলাম উত্তমকে।

আগেই বলেছি আমার স্মৃতির কোনও সময়ের পরম্পরা নেই। আবার কবছর পেছিয়ে যাই। দেবকী বসুর সহকারী রতন চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'অসমাপ্ত' ছবির নায়ক ছিল—সরোজ মুখার্জির আবিষ্কৃত 'প্রশ্ন' ছবির নায়ক প্রবীরকুমার, নায়িকা কাবেরী বসু। ওই 'অসমাপ্ত' ছবির গান করতে ভূপেন হাজারিকা কলকাতায় এলেন। আগেই বলেছি ভূপেনবাবু আর তাঁর স্ত্রী প্রীয়ম হাজারিকা আমার বাড়ির কাছেই রইলেন প্রযোজকদের লিলুয়ার চমৎকার বাগান বাড়িতে। প্রীয়ম নৃত্যশিল্পী ছিলেন, ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন। সার্কাসের ওপর একটি বাংলা ছবিতে (ছবির নামটি স্মরণে আসছে না সম্ভবত 'তেরো নদীর পারে') উনি নায়িকার ভূমিকাতেও ছিলেন।

স্বভাবতই ওঁদের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা হল। এর কিছুদিন পরেই আমার খুবই পরিচিত সরোজ মুখার্জির 'ঘুম' ছবির সহ-প্রযোজক কলকাতার ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন অধিকর্তা প্রয়াত কে.কে. চৌধুরিরা একটি বাংলা ছবি আরম্ভ করছিলেন—ছবির নাম 'কড়ি ও কোমল'। নায়ক রবীন মজুমদার আর নায়িকা

ছিলেন বোম্বাইয়ের কমলা চট্টোপাধ্যায়। ওঁরাই পরবর্তীকালে আমার কাহিনী আর গানের 'সুপার হিট' ছবি 'রাগ-অনুরাগ' করেন।

ওঁদের ছবির চিত্রনাট্য শুনলাম ওঁদের নিউ আলিপুরের বাড়িতে। প্রশ্ন করলাম—মিউজিক কে করছে? সবাই বললেন—বলুন না কাকে নিলে ভাল হয়? বললাম—ভূপেন হাজারিকার নাম। কে.কে. চৌধুরি আসলে গৌহাটির বাঙালি। ভূপেনবাবুর নাম বলতেই বললেন—করেক্ট। এটাই ফাইনাল। আমিও ওঁরই কথা ভাবছিলাম।

ভূপেনবাবু তখন অহমিয়া 'এরা বটের সুর', 'শকুন্তলা' ইত্যাদি ছবি পরিচালনা করতে টালিগঞ্জে উঠে এসেছেন। লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে ভূপেনবাবুর বহুদিনের সদ্ভাব। ভূপেনবাবু বললেন—কে. কে. চৌধুরিকে রাজি করান—নায়িকার গানগুলো লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গাইয়ে আনি। লতা মঙ্গেশকর? চমকে উঠলাম আমি। তখন লতাজি নরেশ মিত্রের 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' ছবিতে প্রথম বাংলা গান গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'শাঙন গগনে ঘোর ঘন ঘটা', তারপর আরও গেয়েছেন ভি. শান্তারামের বাংলা ডাবিং ছবি 'অমর ভূপালি'তে (নীতীন বসুর তত্ত্বাবধানে গৃহীত) এই ছবিতেই মান্না দে-ও প্রথম বাংলা গান করেন। যত দূর মনে হয়, তখন লতাজি আরও দু-একটি বাংলা ছবিতে গেয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আমার গান একটাও গাননি। তাই, দারুণ উদ্দীপনায় রাজি করিয়ে ফেললাম 'কড়ি ও কোমল' ছবির প্রযোজকদের। ভূপেনবাবুর মাধ্যমেই সংগীত সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ। 'কড়ি ও কোমল' ছবিটা কিন্তু চলল না। ছবি না চললে শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রেই ছবির গান চলে না। 'কড়ি ও কোমল'-এর ভূপেনবাবুর সুর করা অনেকগুলি গানের মধ্যে লতাজির গাওয়া অপূর্ব দুটি বিশেষ গান 'তীর বেঁধা পাখি/আমি জেগে থাকি/আহত একাকী নীড়ে' এবং 'অস্ত আকাশে দিনের চিতা জ্বলে'র রেকর্ড আমি আমার বাড়িতে আজও শুনি। অবশ্য, 'অস্ত আকাশে দিনের চিতা জ্বলে' গানটির সুরে অন্য বাংলা কথা বসিয়ে অনেক বছর পরে ভূপেনবাবু লতাজিকে দিয়ে একবার পুজোয় এইচ.এম.ভি-তে আধুনিক বাংলা গান রেকর্ড করেন। কিন্তু স্বীকার করতে কারও কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়—সে গানটিও তেমন জনপ্রিয় হয়নি।

একটা কথা আগে বলতে ভুলে গেছি—লতাজির প্রথম পুজোর বাংলা গান হিসাবে আমার ও ভূপেন হাজারিকার 'মনে রেখো' আর 'রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে' যেমন একটা রেকর্ড—তেমনই আর একটা রেকর্ড ওইটাই ওঁর কলকাতায় রেকর্ড করা জীবনের প্রথম গান। মনে আছে—লতাজির কথাটা। উনি গান শুরু করবার আগেই স্টুডিয়োতে মাইকের সামনে বলেছিলেন—আজ আমি ধন্য যেখানে কে.এল. সায়গল প্রথম রেকর্ড করে গেছেন—সেই কলকাতায় আমি গান রেকর্ড করছি। সেই রেকর্ডিং-এ মুম্বই-এর কল্যাণজি-আনন্দজির কল্যাণজিও লতাজির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণজি সম্ভবত তখনও সুরশিল্পী হননি—বাদ্যযন্ত্রীই ছিলেন। লোকমুখে শুনেছিলাম উনিই নাকি 'নাগিন' ছবির 'মন ডোলে রে, প্রাণ ডোলে রে' সেই বিখ্যাত সাপুড়িয়া বীণ ওই বাঁশিটি বাজিয়েছিলেন। ওখানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী এ.টি. কানন এবং নির্মীয়মাণ 'জীবন-তৃষ্ণা' ছবির পরিচালক অসিত সেন। এক ফাঁকে অসিতবাবু আমায় বললেন—আপনার 'চৈতালী চাঁদ যাক যাক ডুবে যাক'—গানটা আমার খুব ভাল

লেগেছে। 'জীবন তৃষ্ণা'য় ওটা লাগাব।

চমকে উঠলাম—সে কী? ও গানটা যে শ্যামল রেকর্ড করে ফেলেছে। শিগগিরই বাজারে আসবে। কী হবে?

১৭

পরিচালক অসিত সেনকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে 'চৈতালী চাঁদ যাক যাক ডুবে যাক'-এর সুরের ওপর কাছাকাছি কথায় অন্য একটি গান লিখলাম। সেটা রইল 'জীবন তৃষ্ণা' ছবিতে। ওই ছবিতেই ভূপেন হাজারিকার একটি অসমিয়া ছবির বিখ্যাত গান 'সাগর সঙ্গমে কতোনা হাতিরুন্' বাংলায় করলাম 'সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কতো।' উত্তমের ঠোঁটে ও গানটি গেয়েছিলেন ভূপেনবাবু স্বয়ং। ওটাই ভূপেনবাবুর অসমিয়া থেকে রূপান্তরিত প্রথম বাংলা গান।

তখনকার ভূপেনবাবুর সঙ্গে আমার গানের জীবনের বহু ঘটনা আছে। বলে শেষ করা যাবে না। উনিই একদিন পাঁচ মিনিটেই সুর করে দিয়েছিলেন আমার কথার ওপর প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গান—'তোমায় কেন লাগছে এতো চেনা/এতো আপন ভাবছি কেন তোমায়?' উনি-ই 'কড়ি ও কোমল' ছবিতে প্রথম গাওয়ান আমার কথায় লতা মঙ্গেশকরের গান। উনিই 'দুই বেচারা' ছবিতে প্রথম গাওয়ান আমার কথায় গীতা দত্তের গান। যাক গে, একটা ঘটনা বলি। তখন গ্র্যান্ড হোটেলের 'শেরাজাদে' আর 'প্রিন্সেস'-এ অনেক বিদেশি ক্যাবারে আসত। অদ্ভুত সব নতুন নতুন সুরের নতুন নতুন ছন্দের গান আমরা দুজনে মাঝে মাঝে শুনতে যেতাম। ওখানেই হয়তো আমরা মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের (লেখক শঙ্কর) 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের 'কনি দ্য ওম্যান'-কে দেখে থাকব।

একবার কী একটা বিদেশি কৃষ্ণাঙ্গ শিল্পীর দল 'ক্যালিপসো' সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করতে এসেছিল। ওদের অনুষ্ঠান ভাল লেগেছিল। আমরা বোধহয় পরপর দুদিন ওখানে হাজির ছিলাম। ওদের ওখানে গান শুনতে শুনতে ভূপেনবাবু মশগুল হয়ে গেলেন। মিউজিক ব্রেকের সময় গুনগুন করতে করতে বললেন লিখুন পুলকবাবু। লিখুন। দারুণ 'মুড' আমার। লিখে ফেললাম—ক্যালিপসো সুরেরই খুব কাছাকাছি—'কী যেন বলবে আমায় গো/কী কথা নয়ন তারায় গো/আহা কী লাজের বাধায় গো/সে কথা বলে গেলে না/এখনও?'

গানটি রেকর্ডে গাইল তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার উল্টোপিঠে ছিল অহমিয়া 'বিহু' সুরের 'কাজল লতা মেয়ে শোনো/কৃষ্ণকলি নয়গো তোমায় দেব নতুন নাম'। তখনকার দিনে আধুনিক গান শোনার একমাত্র মাধ্যম ছিল রেডিয়ো। রেডিয়োর তখনকার সংগীতের এক অধিকর্তা গান গাইতেন, সুর করতেন—গান লিখতেন। এইচ. এম. ভি. তাঁকে পাত্তা না দেওয়ায় উনি বদলা নিতে সেই সময়কার বহু সুন্দর সুন্দর গান রেডিয়োতে 'স্ক্রিনিঙের' (এক ধরনের সেন্সর) দোহাই দিয়ে শিল্পী সুরে গাননি বা সুরে বিদেশি ছাপ বা লেখা দুর্বল ইত্যাদি অজুহাতে প্রচুর ভাল ভাল বাংলা গানকে খুন করে গেছেন। ওই অধিকর্তা এখন ইহলোকে নেই তাই ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করলাম না। তাঁরই ষড়যন্ত্রে

ওই রেকর্ডটি কেউ শুনতে পেল না। ভূপেনবাবুর অবশ্য ওই সুরটির ওপর খুবই নির্ভরতা ছিল। উনি পরে ওটি অহমিয়া কথায় গাইলেন 'মনু মনুহারি জন্য' ওই অহমিয়া গানের কথাগুলোই বাংলায় অনুবাদ করিয়ে লিখিয়েছিলেন—'মানুষ মানুষের জন্য'। ভূপেনবাবু 'দাদাভাই ফালকে' প্রাইজ পেয়েছেন—সবাই জানেন। কিন্তু আমাদের মতো অন্তরঙ্গ ছাড়া কেউ-ই জানেন না উনি কত সাবপ্রাইজ দিয়ে কত প্রাইজ জিতেছেন সারা পৃথিবীতে। একদিন সন্ধ্যায় গ্র্যান্ডের প্রিন্সেসের সেই বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ স্টুয়ার্ট—যতদূর মনে হচ্ছে তাঁর নাম ব্ল্যাকি—ওঁকে আমার সামনে বিলিতি 'ওক' কাঠের বাক্স থেকে একটা সুপ্রাচীন পানীয় উপহার দিয়ে বললেন—এটা এই হোটেলের পক্ষ থেকে আপনাকে দেওয়া উপহার। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন। প্রাইজের কারণটা হল ভূপেনবাবু ওঁদের দেওয়া ওঁর পানীয়টি যে নির্ভেজাল নয় তা একটা সুতো আর একটা দেশলাই কাঠির আগুন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। তখনকার বিদেশি অধ্যুষিত গ্র্যান্ড হোটেল সেটা হাসি মুখে মেনে নিয়ে হাতে হাতে পৌঁছে দিলেন এই উপঢৌকন। জানি না, আর কজন ভাগ্যবান এই পুরস্কার পেয়েছেন।

এই প্রিন্সেসেই আমি জীবনে প্রথম দেখি বিশাল-বিশাল 'ট্রিপল কঙ্গো'। কী অদ্ভুত ছন্দে বাজাচ্ছিলেন বিদেশি কৃষ্ণাঙ্গ বাদ্যযন্ত্রীরা। ভূপেনবাবু সেদিনও কানে কানে বলেছিলেন—পুলকবাবু, ছন্দটা ধরে ফেলুন। আমি ওই বাজনার মিটারে তালে তালে লিখেছিলাম—'কালো মেঘে ডম্বরু/গুরু গুরু ওই গুরু'। ভূপেনবাবুর প্রাণবন্ত সুরে সুবীর সেন ও গানটি রেকর্ড করেন। যার উল্টোপিঠে লিখেছিলাম—'ওগো শকুন্তলা চলে যেও না'। বাংলা 'কালো মেঘে ডম্বরু', ভূপেনবাবু পরে অহমিয়াতেও গেয়েছিলেন। গানটি ছিল—'ডুব ডুব ডুবডুব ডম্বরু।'

ভূপেনবাবুর সুরে পরে ওই ছন্দে আবার লিখেছিলাম দ্বিজেন মুখার্জির জন্য 'বড় ভয় ছিল যাবার বেলায়/এত ভালবেসেছো আমায়/অজান্তে যদি পিছু ডাকো।' রেকর্ডটির উল্টোপিঠে লিখেছিলাম—'আগামী প্রেমিক সুখী হয় যদি তাতেই আমরা সুখী।' বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি 'সুপারহিট' ইংরেজি গান শুনিয়ে এইচ.এম.ভি-র পি.কে. সেন আমাকে ওই বিশেষ 'আইডিয়া'টি দিয়ে ভারত-চিনের যুদ্ধের সময় লিখিয়েছিলেন ওই গান দুটি। আর একদিন ভূপেনবাবু হঠাৎ বললেন—আচ্ছা, রুমাকে দিয়ে বাংলা গান রেকর্ড করালে হয় না? রুমা দেবী তখন সদ্য কিশোরকুমারের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে রয়েছেন কলকাতায় মুদিয়ালি অঞ্চলে সত্যজিৎ রায়ের পুরনো ফ্ল্যাটটিতে। ওঁর মায়ের সঙ্গে থাকতেন। বম্বেতে রুমাদেবীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন শচীন ভৌমিক। 'লুকোচুরি' ছবিতে রুমাদেবীর রবীন্দ্রসংগীত শুনেছিলাম। ভাল লেগেছিল।

রুমাদেবীর মা ছিলেন বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কনক দাশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। উনিও গান গাইতেন দারুণ। রুমাদেবীর রক্তে গান, ঘরানায় গান। তা ছাড়া বম্বেতে তৈরি 'রজনী' অবলম্বনে 'সমর' আর 'মশাল' ছবিতে ওঁর অভিনয় (সম্ভবত নাচও) দেখেছিলাম। সেদিনই আমরা হাজির হলাম রুমা দেবীর কাছে। উনিও রাজি হয়ে গেলেন আধুনিক বাংলা গান গাইতে। তবে আমায় আলাদাভাবে বললেন তথাকথিত

'প্রেমসংগীত' তৈরি করবেন না। আমি কী ধরনের গান গাই জানেন-ই তো!

বুঝে নিলাম ওঁর বক্তব্য। লিখলাম—'ওরা আজ করবে আঘাত/ তবুতো ভেঙে পড়া চলবে না/তোমাদের সইতে হবে/না হলে বুকের আগুন জ্বলবে না।' উল্টোপিঠের জন্য ভূপেনবাবুর একটি মাটির সুরের ওপর লিখলাম—'রুম ঝুম নূপুর পায়/ কে বাউরি মেয়ে যায়/ময়নামতীর গাঁয়/রূপসী নদী কিনারে'।

আগেই বলেছি সে সময় এইচ.এম.ভি.-র গান বিশেষ কারণে রেডিয়ো বর্জন করেছিল। আমরা তাই রুমা গুহঠাকুরতার ওই প্রথম বাংলা আধুনিক গানের রেকর্ডটি 'মেগাফোন রেকর্ডে' প্রকাশ করালাম। স্বভাবতই 'মেগাফোন' রুমাদেবীকে চুক্তিবদ্ধ করে ফেলল।

তখন যে শিল্পী যে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকতেন তাঁর ফিল্মের গাওয়া গানও বিধিবদ্ধভাবে সেই কোম্পানিতেই প্রকাশিত হত। এখনকার মতো 'বেসিক' আর 'ফিল্ম সঙে'র এই ছাড়াছাড়ি ছিল না। তাই মেগাফোনে কানন দেবী, রবীন মজুমদারের সব ফিল্মের গান-ই প্রকাশিত হত। হিন্দুস্থান রেকর্ডে হত কুমার শচীনদেব বর্মণ, পঙ্কজ মল্লিক (নিউ থিয়েটার্স লেবেলে) সুপ্রভা সরকার, উৎপলা সেনের গান। সেনোলা রেকর্ডে হত বিখ্যাত গায়িকা শৈল দেবী আর দিলীপ রায়ের (কান্ত কবির দৌহিত্র) গান। গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত শচীন দেববর্মণের সুর দেওয়া 'ছদ্মবেশী' ছবিতে (প্রথম বারের চিত্রায়ন—যাতে নায়ক-নায়িকা ছিলেন জহর গাঙ্গুলি আর পদ্মা দেবী) একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি লক্ষ করেছিলাম। অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত ছবিতে একটি হাসির গান লিখেছিলেন অজয়বাবু নন, একজন ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর নাম পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটি—'আরে ছো ছো ছো ছো ছো ছো ছো ছো কেয়া সরম কি বাৎ/ভদ্দোর ঘরকা লেড়কি ভাগলো ড্রাইভার কো সাথ।' ও গানটি গেয়েছিলেন রঞ্জিৎ রায়। ওই রেকর্ডটি এইচ.এম.ভি-র চুক্তিবদ্ধ আর্টিস্ট রঞ্জিৎ রায়ের কল্যাণে প্রকাশিত হয়েছিল এইচ.এম.ভি-তে। পরের বার উত্তমকুমারের 'ছদ্মবেশী'তেও পতিতবাবুর এই গানটি অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে ছিল।

এই প্রসঙ্গে পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি সুপার হিট গান-রচনার কথা মনে আসছে। সেটি ছিল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীপ্তি রায় অভিনীত নরেশ মিত্র পরিচালিত 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবিতে। গানটি—'ও মা ছি /ছি ছি ছি একী বরগো/লাগেও না/রাগেও না/যতই মারো চড়গো।'

ডি.এল. রায়, (রবীন্দ্রনাথেরও) অনেক হাসির গান আছে। গল্প শুনেছি কাজী নজরুল সাহেব চারখিলি পান একসঙ্গে মুখে পুরে এইচ.এম.ভি.-র রিহার্সাল রুমে হাসির গানের বিখ্যাত শিল্পী রঞ্জিৎ রায়ের জন্য প্রথম 'ননসেন্স্ রাইমের' স্টাইলে লিখেছেন বাংলায় এক অভিনব গান—'কালো কুচকুচে কেঁচো কোঁচকায়/ছিঁচকে চোরের চোখ বোঁচকায়।' কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওঁরা ছাড়া তখনকার আধুনিক গানের কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত গীতিকারই হাসির গান লিখতেন না। অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরোকায়স্থ, তখনকার প্রণব রায়ের হাসির গান আমার স্মরণে আসছে না। তখনকার কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পীও 'কমেডি সঙ' গাইতেন না। জগন্ময় মিত্র, গৌরীকেদার, সত্য চৌধুরি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বা

তখনকার হেমন্তদা। সুপ্রভা সরকার, কানন দেবী, শৈল দেবী, উৎপলা সেন কেউ কোনওদিন কোনও হাসির গান 'প্লে-ব্যাক' করেননি। হাসির গান যেমন রচনা করতেন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর গীতিকারেরা—তেমনি হাসির গান গাইতেনও একটি আলাদা দলের কণ্ঠশিল্পীরা।

এই 'বরফ'টা প্রথম ভাঙা শুরু হয় মুম্বইতে। মহম্মদ রফি, মান্না দে এবং কিশোরকুমারই-ই এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য।

বাংলাতেও এই ঢেউ লাগে। প্রথম লব্ধপ্রতিষ্ঠিত গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন ওই 'কালো কুচকুচে কেঁচো কোঁচকায়' স্টাইলে লেখেন লুকোচুরিতে কিশোরদার 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ'। আমি লিখি 'প্রথম কদম ফুল' ছবিতে মান্নাদার 'আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না'। 'মায়াবিনী লেন' ছবিতে 'তুঙ্গি আমার বৃহস্পতি।' তারপরই শুরু হয় যে কোনও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর যে কোনও ধরনের গান গাওয়া আর যে-কোনও প্রতিষ্ঠিত গীতিকারের যে কোনও ধরনের গান লেখা। অবশ্য, দুটোই পারদর্শিতা সাপেক্ষ।

অসাধারণ সত্যজিৎ রায় 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এ অনুপ ঘোষালকে 'প্লে-ব্যাক' জগতে নিয়ে আসেন মূলত এই 'কমেডি সঙ' দিয়েই। আবার অজয় ভট্টাচার্যের 'ছদ্মবেশী'তে ফিরে আসি। আগেই বলেছি, এ ছবির একটি গান প্রকাশিত হয় এইচ.এম. ভি.-তে।

১৮

শচীনদেব বর্মণের সুরে এবং কণ্ঠে 'ছদ্মবেশী'র আর একটি রেকর্ড প্রকাশিত হয় হিন্দুস্থানে। যাতে ছিল—অন্ধ ব্রজেনবাবুর আবিষ্কৃত 'ডুগি'র মতো বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র। শুনেছি এর নাম কুমার শচীনদেব বর্মণ দিয়েছিলেন 'ব্রজ-তরঙ্গ'। ওঁর বাজানো ওই বাজনাটির বহু রেকর্ড রয়ে গেছে। বাজনাটি ব্যক্তিগতভাবে আমার দারুণ প্রিয় ছিল। আমি সুযোগ পেলেই ওটি আমার গানের সুরশিল্পীদের ব্যবহার করতে বলতাম। নচিকেতা ঘোষের সুরে আমার লেখা আরতি মুখার্জির আধুনিক গান—'আমি বুঝি না—কী ক্ষতি ছেলেবেলার মনটি ধরে রাখলে?' রেকর্ডটিতে ওঁর বাজনা ছিল।

নচিকেতার সুরেই 'ধন্যি মেয়ে'তে আরতির গাওয়া আমার—'যা যা বেহায়া পাখি যা না' এবং 'তিলোত্তমা' ছবিতে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে অরুন্ধতীর গাওয়া আমার 'খুব কি মন্দ হতো? যদি আজ সন্ধে থেকে' গান দুটিতে ওই বাজনা আছে। অবশ্য ব্রজেনবাবু তবলাও বাজাতেন অপূর্ব।

নচিতেকার সুরে সন্ধ্যা মুখার্জির গাওয়া আমার লেখা—'না না না, নেবো না সোনার চাঁপা কনক চাঁপা ফেলে' এবং 'দিন নেই ক্ষণ নেই/এখন তখন নেই।' দুটো গানেই উনি তবলা সঙ্গত করেছিলেন। 'ছদ্মবেশী' ছবিতে ব্রজেনবাবুর ওই বিশেষ বাজনা দিয়ে 'প্রিলিউড মিউজিক' বানিয়েই শচীনদা গেয়েছিলেন অজয় ভট্টাচার্যের বিখ্যাত রচনা—'বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে জোয়ার এসেছে আজ', এর উল্টোপিঠে ছিল—'নূতন উষার সৈনিক তুমি গৈরিক তব গায়।'

সেনোলা রেকর্ডে প্রকাশিত হয় 'ছদ্মবেশী'র শৈল দেবীর গাওয়া বিখ্যাত গান—'কোন দেশে ছিলো চাঁদ/গেলো কোন দেশে' এবং দিলীপ রায়ের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে—'ফুল যদি ফুটলো/অলি যদি জুটলো/মন চাহে মন যে'।

এই 'সেনোলা' রেকর্ডে সবচেয়ে বেশি বিক্রির শিল্পী ছিলেন নবদ্বীপ হালদার। ওঁর কমিক গান আর স্কেচ সারা বাংলার ঘরে ঘরে চলত। ওঁর হাসির গান—'আর খেতে পারি না মা গো/ফ্যান্তা ফ্যাচাং তরকারি/আলুভাতে বেগুন পোড়া শুধুই ডাঁটার চচ্চড়ি।' এবং এর উল্টোপিঠের—'শরীরটা আজ বেজায় খারাপ/বিশেষ কিছুই খাবো না।' অথবা সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্তের সম্পর্কীয় ভাই খগেন দাশগুপ্ত (বিশুবাবু) রচিত—'ও বাবা শালগ্রাম/তুমি কোন মুখেতে বাঁশরী বাজাও/আবার আপন মনে হেসে হেসে সিংহাসনে গড়গড়াও' ছিল অনাবিল সুন্দর হাসির গান।

এইচ.এম.ভি-র রঞ্জিৎ রায়ের 'অর্কেস্ট্রা সম্বলিত' ননসেন্স রাইমের স্টাইলে বানানো একটি গান আজও আমি শুনি—'লম্ পম্ পম্ পম্/দীরঘল গেছে হংকং/ভুঁড়ি কম্পম্।' তারপর এলেন যশোদাদুলাল মণ্ডল বেশ ভিন্ন স্টাইলের হাসির গান নিয়ে। ওঁর রচিত ও সুরসংযোজিত ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা নাইনটিন ফরটি থ্রি অক্টোবর' এবং ১৯৪৫ সালের—'টেন ইয়ার্স ব্যাক ক্যালকাটা'/সে সময়টা যে নাই/নাউ নাইনটিন ফরটি ফাইভ/একটু সামলে চলো ভাই' এসব এইচ.এম.ভি-র সুপারহিট তালিকা। উনিই এইচ.এম.ভি-তে রবীন্দ্রনাথের 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো'র হাসির প্যারোডি গান করেন—'মোর প্রেয়সীর মান হয়েছে গুমরে কেঁদে মলো।'

এরপর গ্রামোফোনে হাসির প্যারোডি গানের সার্থক 'সেলার' মিণ্টু দাশগুপ্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্যারোডি গানগুলো হয়ে উঠল 'পলিটিকাল স্যাটায়ার' বা রাজনীতির হাতিয়ার। গান থেকে হাসিটাই চলে গেল। শ্রোতারা মোটেই সেটা গ্রহণ করলেন না। আরও দু-একজন তাই এই বিভাগে প্রবেশের পরেই প্রস্থান করলেন। এ দেশ থেকে প্রায় পুরোপুরি উঠেই গেল প্যারোডি গান।

যা হোক, আবার তখনকার বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানির কথায় ফিরে আসি। পাইওনিয়ার আর ভারত রেকর্ডে ছিলেন বেচু দত্ত আর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। বেচু দত্তের ফিল্মের গান 'যাই তবে চলে যাই' আর ধনঞ্জয়বাবুর 'মাটির এ খেলাঘরে' বা 'রাধে, ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমিক শ্যামরায়। আমার বিশ্বাস, আজও বাংলার মাটিতে কান পাতলেই বাঙালি শুনতে পাবে। এইচ.এম.ভি, কলম্বিয়ায় (একই প্রতিষ্ঠান) ছিলেন—কৃষ্ণচন্দ্র দে, জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অণিমা দাশগুপ্ত আর কল্যাণী দাস (শৈলজানন্দের 'মানে-না-মানা' খ্যাত)। যা হোক, রুমাদেবীর মেগাফোনে যোগদানের পরেই তরুণ মজুমদারের 'পলাতক' ছবি হয়। রুমাদেবীর সেই বিখ্যাত গান 'মন যে আমার কেমন কেমন করে' পেয়ে গেল বন্ধুবর কমল ঘোষ। এর ধন্যবাদটা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাপ্য। মেগাফোনেই প্রকাশিত হল তাই আমার কথায় আর হেমন্তদার সুরে রুমা গুহঠাকুরতার গাওয়া 'বাঘিনী' ছবির গান—'শুধু পথ চেয়ে থাকা'। বিজন পালের সুরে আমার কথায় ওঁর গাওয়া 'আলো ও ছায়া' ছবির গান—'জানি না পথের সীমা/তবু আমি পথ চলি/পরাণে কাঁদে যে রাধা/কাঁদে যে চন্দ্রাবলী।'

এই সময়েই ভূপেন হাজারিকা আর আমি মেগাফোনে প্রচুর কাজ করি। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অপরেশ লাহিড়ির গাওয়া—'জলের জাহাজ জল কেটে যায় সোঁ সোঁ/কলের বাঁশি বাজিয়ে চলে ভোঁ ভোঁ/এই আজব দেশে পা চলে না মোটে/যাদুর কলে মাটিই নিজে ছোটে।' যার উল্টোপিঠে ছিল—বিখ্যাত 'জিঙ্গল বেল, জিঙ্গল বেল' স্টাইলে—'থাক থাক পিছু ডাক সাড়া দিও না'।

বাপি লাহিড়ি তখন অল্পবয়েসি হলেও তবলায় খুবই নাম করেছে। রিহার্সালে ও তো তবলা বাজাতই রেকর্ডিং-এও বোধহয় বাজিয়ে ছিল।

পরবর্তীকালে এই বাপি লাহিড়ি আর আমার বহু ঘটনা আছে। যথাসময়ে বলব।

আগেই বলেছি—আমি পড়তাম স্কটিশ চার্চ কলেজে। তখন স্কটিশ কলেজ যেমন লেখাপড়ায় বহু বিদ্বান মানুষের জন্ম দিয়েছিল —তেমনি দিয়েছিল চিত্র এবং গানের জগতের বহু মানুষের পরিচিতি।

আমি ওখানে পড়তে আসার আগে ওখানে পড়ে গেছেন—মান্না দে, বেতারের বিমান ঘোষ, গায়ক-নায়ক রবীন মজুমদার, গায়িকা উৎপলা সেন, সুচিত্রা মিত্র। আমার সময়ে ছিল চিত্রনাট্যকার জয়ন্ত ভট্টাচার্য, গায়িকা আরতি মুখার্জির প্রথম স্বামী গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার সুবীর হাজরা। চিত্রগ্রাহক দিলীপ মুখোপাধ্যায়, নজরুলগীতির বিমান মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ প্রমুখ। আমাদের পরেই ছিল প্রয়াতা অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী, পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরি এবং তার কিছুদিন পরেই ছিল আজকের মেগাস্টার মিঠুন চক্রবর্তী।

মিঠুন চক্রবর্তীর 'ভাগ্যদেবতা' ছবিতে এই স্কটিশের বাঙালি মিঠুনের জন্যে স্কটিশের বাঙালি আমি একটি দারুণ মজার গান লিখে দিয়েছি। মিঠুন সেটি নিজের গলায় মধু গোপাল বর্মণের সুরে গেয়েছে ভাগ্যদেবতায়। গানটি শুরু ওই স্কটিশের বসন্ত কেবিন নিয়েই। গানের কথাটা এই—'বসন্ত কেবিনের ধারে/হেদুয়ার রেলিঙের পারে/ভিক্টোরিয়ার গাছের তলায়/তোমায় আমায় যে মেলায়/এর-ই নাম ভালবাসা/এর-ই নাম ভালবাসা।'

গান রেকর্ডিং-এর পর খুশি হয়ে আমার ভালবাসা দিয়েছিলাম মিঠুনকে।

আমাদের সময়ে আড্ডা জমত মাঝে-মাঝে কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে—মাঝে-মাঝে বিখ্যাত বসন্ত কেবিনে। সনৎ সিংহ তখন উঠতি গায়ক,—ও এবং যতদূর মনে আসছে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পড়ত সিটি কলেজে। আমাদের আড্ডায় প্রায়ই ওরা আসত। ম্যাট্রিকে ফার্স্ট, ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট, পরবর্তীকালের মুখ্যসচিব তরুণ দত্ত, আর পরবর্তীকালের মন্ত্রী অজিত পাঁজাও সে সময়ে স্কটিশে। ওরাও মাঝেমধ্যে উঁকিঝুঁকি দিত।

আমাদের সঙ্গেই স্কটিশে পড়তেন আজকের রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের গানে বিখ্যাত নিশীথ সাধু। নিশীথ সাধু তখন থাকতেন উত্তর কলকাতার 'চোরবাগান' অঞ্চলে। আমাদের আড্ডায় ও পদার্পণ করলেই ঠাট্টা করে বলতাম—'আসুন আসুন চোরবাগানের নিশীথ সাধু'। ও অবশ্যই সে ঠাট্টা একমুখ মিষ্টি হাসি হেসে গ্রহণ করত। ওই স্কটিশ কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র পার্থপ্রতিম চৌধুরিকে 'দোলনা' ছবির পরিচালক হিসেবে

মনোনীত করলেন সুরকার গায়িকা অসীমা ভট্টাচার্যর (এখন মুখোপাধ্যায়) প্রথম স্বামী প্রয়াত দিলীপ ভট্টাচার্য। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরকার ও গায়ক শৈলেন মুখোপাধ্যায় গান শেখাতেন অসীমাকে। সুর সংযোজনের ভার পড়ল শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের ওপর। 'দোলনা' ছবিতে তনুজার দ্বিতীয়বার বাংলা ছবিতে আত্মপ্রকাশ।

সবাই বলল—দোলনা ছবির একটি গান যেন লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গাওয়ানো হয়। সে গান করানোর দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। আমি মান্নাদাকে টেলিফোনে অনুরোধ করলাম লতাজির একটি 'ডেট' নিয়ে বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরির স্কোরিং বুক করে রাখতে। শৈলেনের স্ত্রী রাণু মুখোপাধ্যায় দক্ষিণামোহন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠা আত্মীয়া। অর্কেস্ট্রার দিকটা ওঁকেই সামলাতে বলার জন্যও অনুরোধ করলাম। মান্নাদা চিরকালই পরোপকারী। অনুরোধ রাখলেন আমার। যথাসময়ে লতাজির ডেট জানালেন, আর শৈলেনকে আমাকে মুম্বইতে হাজির হতে বললেন।

আমি আর শৈলেন মুম্বই গেলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম প্রযোজক দিলীপ ভট্টাচার্য নেই, পরিচালক পার্থপ্রতিমও নেই। শৈলেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বললে—ঘাবড়িও না, আমার সঙ্গে টাকা আছে। সব ফাইনাল করে দিলীপবাবুকে জানাব। ওঁরা তৎক্ষণাৎ এসে যাবেন। মান্নাদার বাড়ি তখন বান্দ্রায়—মুম্বই-এর নিউ টকিজ সিনেমার কাছে। এপারে মান্না দে ওপারে মহম্মদ রফি, মধ্যিখানে একটা সুন্দর পার্ক। ওখানে হাজির হলাম আমি আর শৈলেন একটা বিশেষ ছুটির দিনে।

সবে কফিতে চুমুক দিয়েছি মান্নাদা বললেন—একটু আগেই লতাজির ফোন এসেছিল। ওঁর দারুণ দাঁত কনকন করছে। উনি বোধহয় রেকর্ডিং করতে পারবেন না।

আমাদের দুজনেরই কফিটা তখন চলকে জামায় পড়ে গেল । মান্নাদা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হঠাৎ জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন—দাঁড়ান, দাঁড়ান, রফি বেড়েছে (অর্থাৎ গায়ক রফি সাহেব ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন)।

মান্নাদা তৎক্ষণাৎ ভেতরের ঘর থেকে একটা বোমা লাটাই আর ঘুড়ি নিয়ে তাঁর তিনতলার ফ্ল্যাটের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেটা ওড়াতে লাগলেন। আমিও পায়ে পায়ে বারান্দায় দাঁড়ালাম। আমাকে পাশে দেখেই বললেন—ধরুন তো লাটাইটা—টেনে কেটে দিই রফিকে, প্রমাণ করে দি-ই আমি শ্যামবাজারের ছাওয়াল।

অবাক বিস্ময়ে দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে উনি রফি সাহেবের ঘুড়ির নীচে ওঁর ঘুড়িটা ফেলে দিয়েই সুতো ধরে টানতে লাগলেন। সে কী টান! সমুদ্র-মন্থনের সময়েও বোধহয় দেবতা বা অসুর কোনও পক্ষই এত শক্তি প্রয়োগ করেননি। কেটে গেল রফি সাহেবের ঘুড়ি। আমরাও রেকর্ডিং-এর টেনশন ভুলে চিৎকার করে উঠলাম—ভো কাট্টা-ভো কাট্টা। রফি সাহেব ভো কাট্টা!

মান্না ঘুড়িটা নামাচ্ছেন—ফোন এল রফি সাহেবের। মান্নাদা ফোনটা ধরে এসে হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন—রফি বলছে কী করে ওই 'টেনে' প্যাঁচ খেল একটু শিখিয়ে দেবে?

এই ছিল তখনকার প্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক শিল্পীর সম্পর্ক। মান্না দে, মুকেশ, তালাত, রফির যে অপূর্ব বন্ধুত্ব আমি চাক্ষুষ দেখেছি—তা আজকের মুম্বই বা কলকাতার কোনও

শিল্পীদের মধ্যে যদি কেউ আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন—আমি তাঁকে প্রণাম করে আসব। যা হোক, শৈলেন তখন কাঁদো কাঁদো গলায় বললে—লতাজি গাইবেন না? মান্নাদা অভয় দিলেন—চলুন, পেডার রোডে যাই, আজ তো ছুটির দিন, কোনও রেকর্ডিং নেই, ওঁকে বাড়িতে পেয়ে যাব। আমরা পেডার রোডে যাবার জন্য উঠলাম মান্নাদার গাড়িতে। উনি নিজে গাড়ি চালাতে লাগলেন। শহরতলি ছেড়ে চললাম মুম্বই-এর উদ্দেশে।

১৯

কিন্তু পেডার রোডের দিকে না গিয়ে গাড়ি সোজা চলে এল গেট অফ ইন্ডিয়ায়। মান্নাদা বললেন, চলুন, আগে পেট ভরে একটু সমুদ্রের হাওয়া খাই।

আমাদের টেনশন তখনও বেড়েই চলেছে। মুখে কিছু না বলে বাধ্য হয়েই সমুদ্রের হাওয়া খেতে হল। তারপর চার্চগেট স্টেশনের কাছে এসে বললেন, চলুন, আমাদের ফেবারিট আড্ডাখানার রেস্টুর‍্যান্ট 'গেলর্ডে' কিছু খাই।

শৈলেন বলল, আমার একদম খিদে নেই মান্নাদা। ভ্রূক্ষেপ করলেন না উনি। বললেন, চলুন তো, এদের ছানাভাজা খেলে চক্ষু যদি ছানাবড়া না হয় তখন বললেন। অগত্যা দুজনকেই গিলতে হল গেলর্ডের দামি ছানাভাজা। মান্নাদার ওই খাবারের তারিফ আর শেষ হয় না। শৈলেন চুপিচুপি আমার হাতটা ছুঁল। বরফের মতো ঠান্ডা। তারপর এক সময়ে রীতিমতো কাঁপতে কাঁপতে লতাজির দোতলার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলাম আমরা। আমি নমস্কার জানাতে উঠে দাঁড়াতেই লতাজি গালে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে হিন্দিতে বললেন—পুলকবাবু, কী গান লিখেছেন আমার জন্য? ও গান আমি গাইব না। আমি আঁতকে উঠলাম—সে কী? লতাজি বললেন আমি কাল রেকর্ড করব দাঁত-কনকনের গান। আমার গানের মুখড়া চাই—দাঁত কনকন, দাঁত কনকন।

সবাই হেসে উঠলাম। আমি আমার হিন্দিতে কী একটা বলতে যেতেই লতাজি আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন—বাংলায় বলুন—আমি মাস্টারমশাই রেখে বাংলা শিখছি। রবীন্দ্রনাথের গান আর শরৎচন্দ্রের নায়িকার হাতপাখা নেড়ে নায়ককে ভাত খাওয়ানো আমায় পাগল করে দিয়েছে। জানেন, শরৎচন্দ্রের মারাঠি ভাষার অনুবাদ প্রায় সব বইগুলোই আমি পড়ে ফেলেছি। অদ্ভুত লেখা। বাঙালি মেয়ে আর মারাঠি মেয়ে একেবারে এক।

মুখে এসে গিয়েছিল—মুম্বইতেও ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাঠি কোণঠাসা—কলকাতাতেও বাঙালির সেই একই অবস্থা। সত্যি, বাঙালি আর মারাঠি এক। কিন্তু প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বাংলাতেই বললাম—দাঁত কনকনের গানটা হবে সেকেন্ড রেকর্ডিং—ফার্স্ট রেকর্ডিং হবে শৈলেনের সুরে দোলনা ছবির গানটা।

লতাজি ওঁর ঘরে স্বামী বিবেকানন্দর ছবিকে দুহাত জোড় করে প্রণাম করে বললেন—যদি রাতে আর দাঁতের ব্যথা না-বাড়ে তা হলে আমি ঠিক কাল সকাল দশটায় রেকর্ডিং-এ আসব। পরদিন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় লতাজি স্টুডিয়োতে এলেন। আমাকে

পরিহাস তরল কণ্ঠে বললেন—আমি কিন্তু 'সেকেন্ড সঙ'টা আজই করব। দাঁত-কনকন। দাঁত-কনকন।

'রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে' গানটিতে 'চাঁদ' কথাটা লতাজি ' চান্দ' বলেছিলেন। অবাঙালি শিল্পীদের দেখেছি এই 'চন্দ্রবিন্দু' যুক্ত শব্দগুলো কিছুতেই ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেন না।

একবার আমার কী একটা গান রেকর্ডিং-এ বাঙালি কিশোরকুমারকেও আমাকে বারবার আমার নাকে আঙুল দিয়ে 'ভাঙগা' নয় 'ভাঙা' উচ্চারণ বোঝাতে হয়েছিল। কিশোরদা বলেছিলেন—আমি খোট্টা বনে গেছি। দোহাই, আমার গানে 'বিন্দি' দেওয়া শব্দ দেবেন না। যাঁরা বাংলা 'মালতী'কে 'মাল্‌তি' বলেন, সেই অবাঙালি শিল্পীদের আর একটা বিপদ ঘটে পরপর দুটি অকারান্ত স্বরান্ত শব্দ পেলে। ওঁরা 'রজনী'কে 'রোজেনী' বলবেন-ই।

আশাজির একটা গানে লিখেছিলাম—'শোনো হে বঙ্গবাসী' উনি কিছুতেই 'বঙ্গ' উচ্চারণ করতে পারছিলেন না—বলছিলেন—'বোঙ্গোবাসী'। রেকর্ডিং-এর একজন বাঙালি বাদ্যযন্ত্রী রিদম সেকসান থেকে 'বঙ্গো' বাজনাটি তুলে আশাজিকে দেখালেন। ওঁর কী হাসি। কিন্তু সুফল হল। স্পষ্ট বললেন—শোনো হে 'বঙ্গো'বাসী।

আমি সেইজন্যই অবাঙালি শিল্পীদের গানে আজীবন একটু সন্তর্পণে শব্দ প্রয়োগ করে এসেছি। কিন্তু লতাজির 'দোলনা'র গানটিতে একটু বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম।

লিখেছিলাম—'আমার কথা শিশির ধোয়া হাস্নুহানার কলি/নীরব রাতে মৃদুল হাওয়ায় হয়তো কিছু বলি।'

কিন্তু সেদিন দেখলাম লতা মঙ্গেশকরকে—বাংলা শেখার জন্য কিনা জানি না—নির্ভুল নিখুঁত উচ্চারণে গেয়েছিলেন গানটা। প্রশ্ন উঠতে পারে কে.এল. সায়গল-ও তো অবাঙালি ছিলেন—শান্তা আপ্তে (যিনি অসাধারণভাবে গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের—দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে), রাজেশ্বরী দত্ত (কবি সুধীন দত্তের পত্নী) যাঁর গাওয়া অপূর্ব রবীন্দ্রসংগীত আজও আমরা শুনছি—ওঁরা অত সুন্দরভাবে বাংলা উচ্চারণ করলেন কী করে? এর একটাই উত্তর—ওঁরা যত সময় দিয়ে যত অজস্রবার রিহার্সাল করে বাংলা গান রেকর্ড করতেন পরবর্তীকালের অবাঙালি শিল্পীরা কেউই সে সময় দেননি বা দেন না।

আমি আগেই বলেছি আমি 'একলব্য' ছিলাম প্রেমেন্দ্র মিত্র আর অজয় ভট্টাচার্যের। শেষ জনকে আমি চোখে দেখার সুযোগ পাইনি। কিন্তু প্রথমজনের খুবই কাছে পৌঁছোবার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম।

একদিন প্রেমেনদা আমায় বললেন—তোমার 'জিপসী মেয়ে'র গানের সমালোচনা আমি পড়েছি। ওদের কথা রাখো—ঠিক স্টাইলেই গান লিখেছ—জিপসী মেয়ে কি 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গাইবে?

একটু থেমে প্রেমেনদা কলকাতা বেতারকেন্দ্রের ওঁর নির্দিষ্ট ঘরটার ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বললেন—আমিও লিখেছিলাম 'রিক্তা' ছবিতে ও ধরনের দুটো গান। তোমাদের জিপসী মেয়ের নায়িকা ইহুদি মেয়ে, বমলাই ছিল আমাদের রিক্তা ছবিতেও।

ও আবার গায়িকাও ছিল। দুমাস ধরে রিহার্সাল দিয়ে বাংলাগান দুটো রেকর্ড করেছিল। তৎক্ষণাৎ বললাম—এখনও আমার কাছে আছে সে গানের রেকর্ড! একটা—'জানি না কোথায় আছি/রাশিয়া কিম্বা রাঁচি/শুধু জানি কাছাকাছি দুজনে' অন্যটি ছিল—'আরও একটু সরে বসতে পারো/আরও একটু কাছে/দূরে থাকা শুধু ছলনা/ছলো ছলো নয়ন যারে যাচে'। (ভাবতে পারা যায়—এই লঘু গান দুটিতে চটুলতম সুর সংযোজনা করেছিলেন বিখ্যাত উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়?)

মনে আছে, 'সংসার সীমান্তে' ছবিতে যখন পতিতাপল্লীর চোর জামাইকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) নিয়ে সবাই উৎসব করছে তখন বাড়িউলির (মাসি) মুখের জন্য প্রচলিত একটি গানের আশ্রয় নিয়ে লিখেছিলাম—ও সাধের জামাইগো তুমি কেন নাগর হইলে না। গানটি শুনতে শুনতে পরিচালক তরুণ মজুমদার গানের কাগজটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে 'নাগর' শব্দটি কেটে দিয়ে লিখে দিয়েছিলেন 'ভাতার'। হেমন্তদা সেই গানটিতে সুর সংযোজনা করেছিলেন নির্দ্ধিধায়। আসলে, ছবির যেমন সিচুয়েশন থাকবে সেই পরিবেশের ধরনেরই তো গান রচনা করতে হবে। অনেক 'অশোভন' শব্দও 'সিচুয়েশনে' শোভন হয়ে যায়। কিন্তু বেসিক গানেও (আধুনিক গানে) আজকাল যা-খুশি তাই লেখা হচ্ছে। এর নিশ্চয়ই তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কিন্তু হচ্ছে না! বিদগ্ধ বন্ধু বান্ধব শুভানুধ্যায়ী ভক্তরা যখন আমায় আমার লেখা সুপারহিট গান 'আমি কলকাতার রসগোল্লা'র বিরূপ সমালোচনা করতে শুরু করেছিলেন—তাদের প্রত্যেককেই যুক্তি দিয়েই বুঝিয়েছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সিচুয়েশনের চাহিদায় চিরকুমার সভায় লিখেছেন—'অভয় দাও তো/বলি আমার উইশ কী! একটি ছটাক জলের সাথে/বাকি তিন পোয়া হুইস্কি।' সুতরাং আমার ক্ষেত্রে কী করে আশা করেন একজন স্ট্রিট সিঙ্গার গাইবে—আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে।' সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি প্রেমেন মিত্রের ওই উক্তিটি—রাস্তার মেয়ে পকেটমারের গান—সে কি 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে গাইবে'? কেউ-ই আর কথা বাড়াননি। কিন্তু জানি না আজকালকার কিছু সুপারহিট ননফিল্ম বাংলা গানের 'যা খুশি লেখা' সম্বন্ধে তাঁরা কেউ কোনও কথা তুলছেন না কেন? আর একদিন এই প্রেমেন মিত্রকেই বলেছিলাম—সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত আমায় বলেছিলেন—'যোগাযোগ' ছবির কানন দেবীর গাওয়া আপনার লেখা 'হারামরুনদী' গানটার একটা পঙ্ক্তি নাকি উনি বদলাতে বলেছিলেন, আপনি বদলাননি। শেষে আপনার অনুমতি নিয়ে অন্য এক গীতিকারকে দিয়ে এ কাজটি করেছিলেন উনি—এটা যদি সত্যিই হয় কাজটা ভাল হয়নি।

প্রেমেনদা বললেন—ঠিক কথাই বলেছ। যদি কারও কাছে পুরনো 'যোগাযোগ'-এর বুকলেট থাকে। দেখে নিয়ো ওখানে আমার আসল লেখাটাই আছে। হাসপাতালে যাঁরা অসুস্থ তাঁদের পাশে রয়েছেন আমার নায়িকা নার্স। সেই উদ্দেশেই লিখেছিলাম—'হারামরু নদী/ডানা ভেঙে যাওয়া পাখি/নিভু নিভু দীপ/আধো আলো/নহো একাকী নহো একাকী'। আমি বলেছিলাম—কিন্তু ফিল্মে বা রেকর্ডে 'ডানা ভেঙে যাওয়া পাখি' নেই—আছে 'শ্রান্ত দিনের পাখি'। 'শ্রান্ত দিনের পাখি' মানে তো যার দিনের পরিক্রমা শেষ! বিপর্যয় কোথায় তার? তার তো সব কিছু পাওয়া হয়ে গেছে। প্রেমেনদা উত্তর

দিয়েছিলেন—ঠিক তাই। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম—কিন্তু স্বয়ং মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে ব্যাপারটা হজম করে নিয়েছিলাম। দ্যাখো, পুলক, তোমার এখনও অনেক বাকি। দেখবে সুরকাররা অনেক কথাই সুর করতে পারছে না বলে বদলাতে বলবে। যদি দ্যাখো সে কথা বদলালে গানের বক্তব্যের বিচ্যুতি হচ্ছে কখনও তা করবে না। আমিও জীবনে এ ভুল আর করিনি।

২০

আমার স্মৃতি ভাণ্ডারে জমা আছে আরও অনেক ঘটনা। লতাজির আরও অজস্র কথা—কিশোরদার আরও অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার। ওগুলো পরে বলব—এবার বলি—কলকাতার বেতারকেন্দ্র যখন গার্স্টিন প্লেস থেকে উঠে এল ইডেন গার্ডেনে তখন থেকেই বেতারের আর একটি স্বর্ণযুগ শুরু হয়। এখানেই তখন নিয়মিত কর্মী হয়ে যোগদান করেন সংগীতে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি. জি. যোগ, দক্ষিণামোহন ঠাকুর প্রভৃতিরা। সাহিত্যের দিকটায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, ছোটদের আসরে লীলা মজুমদার ইত্যাদি অসামান্যরা। মধ্যে বিমান ঘোষ ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিলেন দিল্লি কেন্দ্রে, ওখান থেকে উনিও আবার চলে আসেন কলকাতায়। নাটকে বীরেন ভদ্র তো ছিলেনই, গানের দিকে তখন উপদেষ্টা হিসাবে এলেন বিখ্যাত রাইচাঁদ বড়াল। এখনও তাঁর গিলে করা পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরা ধবধবে ফর্সা সৌম্যকান্তি রূপ আমার চোখে ভাসে। জ্ঞানবাবু শুরু করলেন রম্যগীতি। আলি আকবর, রবিশঙ্কর, ভি. বি. কৃষ্ণমূর্তি, নিখিল ঘোষ সবাই নিয়মিত সুরসৃষ্টি করতে লাগলেন রম্যগীতিতে।

লীলা মজুমদার, ঊষা দেবীর 'শিশুমহলে' তখন আমি প্রচুর সংগীতালেখ্য লিখেছিলাম। ছোটদের লেখা লিখতে আমি বরাবরই আনন্দ পেয়েছি, এখনও পাই। তখনই 'জলসা' পত্রিকায় প্রকাশিত বড়দের জন্য লেখা আমার একটি কাহিনীর বেতার নাট্যরূপ দেন অগ্নিমিত্র। কাহিনীর নাম দিয়েছিলাম 'জল ভরা মেঘ'। তাতে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখরা। বেতারে শুক্রবারের নাটকে তার টেপ কয়েকবারই শুনেছিলাম! বেতারের নাট্য আসরে জানি না সেই 'টেপ' এখনও আছে কি না।

ইচ্ছে ছিল রাইচাঁদ বড়ালের (আর. সি. বড়াল) সুরে গান লেখার। কিন্তু রাইবাবু তখন গানে সুর করা থেকে সরে এসেছেন। নিয়েছেন পরিদর্শকের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই ওই বেতারের তখনকার রম্যগীতির জন্য বেতার কর্তৃপক্ষের অনুরোধমতো গান লিখতে গেলাম রাইচাঁদ বড়ালের ভ্রাতুষ্পুত্র দুনিচাঁদ বড়ালের কাছে। সে সময় দুনিবাবুর সহকারী ছিলেন জনপ্রিয় কার্তিক বসন্তের অগ্রজ সুগায়ক বলরাম দাশ।

দুনিবাবুর সুরে অনেক গান লিখেছিলাম তখন। প্রথম গানটাই ছিল শ্যামল মিত্রের গাওয়া—'কতোটুকু তুমি জানো/তোমায় দিয়েছি কী যে/তোমায় কাঁদাতে কেন বারে বার আমিই কেঁদেছি নিজে/তার কতোটুকু তুমি জানো?' পরের গানটি ছিল মানবেন্দ্রর গাওয়া—'আমায় তুমি জড়িয়ে দিলে বন্ধনে/মালাতে নয় দুই নয়নের ক্রন্দনে'। এরপরের

গানটি ছিল—শ্যামল মিত্রেরই গাওয়া—'যেতে যেতে যদি সে গো ফিরে চায়।' তারপরই নির্মলা মিশ্রের গাওয়া—'পাখি আজ গাইবে কী গান পায়না ভেবে/কী সুরে সে ফাগুনকে আজ রাঙিয়ে দেবে?' স্বয়ং আর. সি. বড়ালের তত্ত্বাবধানে রেকর্ড করা ডি. সি. বড়ালের সে-সব গানগুলো আমার কাছে আজও তুলনাবিহীন।

দুনিবাবু তারপর এইচ. এম. ভি.-তেও কাজ করেছিলেন। সেখানেও ছিলাম আমি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রথম রেকর্ডটি করেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার গ্রামোফোন রেকর্ডের গানগুলো তেমন চলল না। তবুও বলতে বাধ্য হব—প্রকৃত বড় মাপের সংগীত পরিচালকের সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও কেন যে বাংলা সংগীতজগৎ তাঁকে তেমন করে কাছে টেনে নিল না, তার কারণ আমি আজও খুঁজে পাই না। দুনিচাঁদ বড়াল বোধহয় অভিমানেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরেও রম্যগীতিতে আমি প্রচুর গান লিখেছি। তার মধ্যে একটি গান আমার বিশেষ প্রিয়। সে গানটি গেয়েছিলেন তখনকার বেতারের উচ্চপদস্থ কর্মী সুধীন চট্টোপাধ্যায়।

গানটি হল—'এ-গান আমার শোনে সবাই/কী কথা সে কয় বোঝে ক'জন?/আঁখিতে সবার মায়া ভরাই/কে খোঁজে এ-চোখে কত স্বপন?' সুধীনবাবুর গাওয়া—'ভুলে যেও ভুলে যেও মোর গান/এ-শুধু আমার শেষ মিনতি এতো নয় অভিমান'—একদিন সবাই চলতে-ফিরতে গুনগুন করত।

এই সুধীন চট্টোপাধ্যায়েরই সুযোগ্য পুত্র আজকের জনপ্রিয় শিল্পী সুমন চট্টোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ছে—সুমন চট্টোপাধ্যায়—তখন কি তার কিছু পরে—কলকাতা বেতারে নিয়মিত সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান করত।

রম্যগীতির প্রসঙ্গে তখনকার কলকাতা বেতারের একটা প্রশংসনীয় ব্যাপার উল্লেখ করতেই হয়—তা হল মুম্বই-এর কোনও প্লে-ব্যাক শিল্পীকে দিয়ে কলকাতা বেতারের কোনও গান গাওয়ানোর কোনও প্রয়োজনই তখন ওঁরা অনুভব করেননি। এর পরবর্তীকালেও মুম্বই-এর বাঙালি শিল্পী মান্না দে-র প্রথম রম্যগীতির 'সবুজ সংকেত' আদায় করতে আমি তখনকার স্টেশন ডিরেক্টরকে বারবার অনুরোধ করেছিলাম। তবে কাজ হয়েছিল।

আজকালকার প্রায় সব বাংলা ছবিতেই মুম্বই-এর শিল্পীরা গান করেন। তার পেছনে চিত্রপ্রযোজকদের নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও বাণিজ্যিক স্বার্থ থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম এবং দুঃখ পেলাম তখন, যখন ১৯৯৪-এর শিলিগুড়ি ও কলকাতা বেতারের পুজোর বাংলা গান বেতার কর্তৃপক্ষ রেকর্ড করালেন কিছু বাঙালি শিল্পীদের সঙ্গে মাদ্রাজের বানী জয়রাম—মুম্বই-এর হরিহরণ, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অনুরাধা পড়োয়াল, অনুপমা প্রমুখের বাংলা গান। মুম্বই-এর শিল্পীদের শিলিগুড়ি বা কলকাতা বেতারের বাংলা পুজোর গান গাওয়ানোর অন্তরালে এখানকার অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বেতার কর্তৃপক্ষের কী বাণিজ্যিক স্বার্থ থাকতে পারে তা আমার মাথায় আসে না। তাঁদেরই তো উচিত নতুন নতুন গুণী শিল্পীদের সুযোগ দিয়ে বাংলা গানের আসরে তুলে ধরা। যাঁরা বাণিজ্যিক বাধায় গানের জগতে পা ফেলতে পারছেন না তাঁদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে

যাওয়া। মুম্বই বেতার কেন্দ্র শিলিগুড়ি বা কলকাতা বেতার কেন্দ্রের একজন শিল্পীকে দিয়েও গণেশ পুজো উপলক্ষে কোনও একটা 'গণপতি বন্দনার' গানও মুম্বইতে নিয়ে গিয়ে গাইয়েছেন কি? আশ্চর্য আমরা বাঙালি।

এবার অন্য কথায় আসি। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তখন কলের গানে ঘরে ঘরেই একটি গান বাজতে শুনতাম। ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বরে একটি পল্লীগীতি 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহনে...'। যতদূর জানি এটাই কুমার শচীন দেববর্মণের প্রথম রেকর্ড এবং প্রথম রেকর্ডটিই সুপারহিট। এরপরে উনি রেকর্ড করলেন 'নিশীথে যাইও ফুলবনেরে ভ্রমরা...'। সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীর কাছে শুনেছিলাম গানটি পুব বাংলার এক গ্রাম্য কবি শেখ ভানুর রচনা। গানটির প্রথম অন্তরায় ছিল জ্বালায়ে দিলের বাতি। জেগে রব সারারাতি গো। কুমার শচীন দেববর্মণ যখন গানটি রেকর্ড করেন তখন কবি জসিমউদ্দিন 'দিল' শব্দটি বদলে করে দেন 'জ্বালায়ে চান্দের বাতি/জেগে রব সারারাতি গো।' এই রেকর্ডটির পরে 'নতুন ফাগুন যবে' 'প্রেমের সমাধি তীরে', 'আমি ছিনু একা' ইত্যাদি অজস্র হিট গান তখন খুব শুনতাম। শচীন দেববর্মণ ছিলেন সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। হিমাংশু দত্তের সুর দেওয়া অজয় ভট্টাচার্যের লেখা 'আলোছায়া দোলা উতলা ফাগুনে', 'যদি দক্ষিণা পবন আসিয়া ফিরেগো দ্বারে', 'মম মন্দিরে এলে কে তুমি', এই রকম কিছু গান ছাড়া ওঁর নিজের গাওয়া অনবদ্য সব বাংলা নন-ফিল্মি গানের অধিকাংশই ওঁর নিজের সুর। কিন্তু ওঁর সুরে অন্য কোনও শিল্পী নন-ফিল্মি গান গেয়েছেন কিনা স্মরণে আসছে না। উনি নিজে অবশ্য অন্য সুরকারের সুরে বাংলা ছবিতেও গান গেয়েছেন একথা মনে আসছে। সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সুরে সে যুগের সুপারহিট ছবি 'জীবন সঙ্গিনী'তে গেয়েছিলেন অজয় ভট্টাচার্যের লেখা দুটি গান ১। 'জনম দুখিনী সীতা/লাঞ্ছিতা তুমি চির বঞ্চিতা' ২। 'কে যেন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময়...'

শচীন দেববর্মণ প্রচুর বাংলা ছবিতেও সংগীত পরিচালনা করেছেন। সেখানে গেয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীরা। কিন্তু শচীন দেবের নন ফিল্মি গান যেমন প্রকাশ হওয়া মাত্র সুপারহিট হয়েছে বাংলা ফিল্মের গান তেমন হয়নি। এ এক অবাক করা সত্য। বাংলা 'ছদ্মবেশী', 'জজ সাহেবের নাতনী' এমন দু-একটি ছবি ছাড়া কোনও ছবির গানই তেমন হিট করেনি। 'জজ সাহেবের নাতনী' ছবিতেই উনি সুযোগ দেন বিমলভূষণকে। বিমলভূষণের গাওয়া 'বড় নষ্টামি দুষ্টামি করে চাঁদরে...' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

শচীনদা বৃহত্তর সাফল্যের সন্ধানে চলে গেলেন মুম্বই। কিন্তু বাংলা ছাড়লেও বাংলা গানকে ছাড়েননি। মুম্বই-তে অনিল বিশ্বাস, রামচন্দ্র পাল-এর পর সংগীত জগতে আসা এই বাঙালি সুরকার এস ডি বর্মণ রাতারাতি কাঁপিয়ে দিলেন মুম্বই ফিল্ম জগৎকে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দেও মুম্বই-তে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন সহকারী হিসাবে কাজ করার জন্য ওঁর ভাইপো মান্না দেকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ওপর একটি হিন্দি ছবিতে গান গাইবার জন্য কে সি দে কলকাতা থেকে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে মুম্বই নিয়ে গিয়ে গান গাওয়ালেন। কিন্তু কিছু হিন্দি ছবি করার পরে কে সি দে দেখলেন স্বাস্থ্য এবং ভাগ্য ওঁর প্রতিবন্ধকতা করছে। উনি ফিরে এলেন কলকাতায়। মান্না দে কিন্তু ফিরলেন না। রয়ে গেলেন মুম্বই-তে এস ডি বর্মণের সহকারী হয়ে।

২১

মান্না দেকে প্রবাসে পায়ের নীচে একটু মাটির সন্ধান করতে কী কষ্ট করতে হয়েছে মান্নাদা তা অকপটে আমায় বলেছেন। যখন পায়ের নীচে মাটি পেয়ে গেছেন তখনও চলেছে এই স্ট্রাগল। চোখের কোণে জলের রেখা এনে আমায় বলেছেন, জানেন 'তালাশ' ছবির 'তেরি নয়না তালাশ করকে...' এই গানটা তুলতে গেছি শচীনদার মিউজিক রুমে। ওখানে পরিচালক এলেন গান শুনতে। শচীনদা আমাকে বললেন, মানা তুই গেয়ে শোনা (শচীনদা মান্নাদাকে আজীবন মানা বলে ডেকে এসেছেন)। পরিচালক মান্নাদার সামনেই বলে উঠেছেন, মান্না দে গাইবেন নাকি? মুকেশ কী হল? শচীনদা জবাব দিয়েছেন, মুকেশ এ গান গাইতে পারবে না? পরিচালক শচীনদাকে সোজাসুজি বললেন, এমন গান কেন বানালেন যা মুকেশ গাইতে পারবে না? শচীনদা তখন ওঁর নিজস্ব স্টাইলে হিন্দিতে উত্তর দিলেন, তালাশ ছবি যদি এস ডি বর্মণ করে তবে এই গানের সুরটাই থাকবে। আর গাইবে মানাই। তোমার অপছন্দ হলে তুমি অন্য মিউজিক ডিরেক্টর নাও। শচীনদা একরকম জোর করেই ও গানটি মান্না দেকে দিয়ে গাইয়েছিলেন এবং সবাই জানেন তার ফল কেমন হয়েছিল। পরিচালক মশাই সিলভার জুবিলিতে বলেছিলেন, এস ডি বর্মণ সাব আপনি আমাদের দাদা। আপনি চিরদিনের দাদা।

সবাই ওঁকে দাদা মানত। মুম্বই-তে হেমন্তদা যথারীতি হাসতে হাসতে আমাদের বলতেন, যাচ্ছি শচীনদার গান তুলতে। কিন্তু কে গাইবে কেউ জানে না। মান্নাবাবু, তালাত, মুকেশ, রফি সবাই গান তুলবেন। যাঁর কণ্ঠে এই বিশেষ গানটি ওঁর পছন্দ হবে সেই শেষ পর্যন্ত রেকর্ড করবেন। এ রকম ব্যাপার তখনকার মুম্বই-এর সব শিল্পীরাই হাসিমুখে মেনে নিতেন। কারও কোনও অনুযোগ ছিল না দাদার প্রতি। এহেন এস ডি বর্মণকে দিয়ে আমার লেখা গান গাওয়ানোর জন্য ধরলাম সহৃদয় সুশীলদাকে। আজকের সংগীত জগতের সবার প্রিয় 'মেলডি'-র দুলাল চক্রবর্তীর পিতা সুশীল চক্রবর্তী ছিলেন শচীনদার খুবই কাছের মানুষ। শচীনদা মুম্বই থেকে যখন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন তখনও নিয়মিত ঘড়ি ধরা সময়ে ওই মেলডির পুরনো বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গল্পগুজব করতেন। ওখানেই আমি প্রথম দেখি শচীনদার কলকাতার পুরনো সহকারী সুরশিল্পী কালীপদ সেনকে।

যাই হোক, সুশীলদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম, খোঁজ নিতাম কবে শচীনদা আসবেন। একসময় আমার ভাগ্য প্রসন্ন হল। সুশীলদা বললেন, ওমুক তারিখে সকালে ঠিক ওমুক সময়ে তুমি এসো। কর্তা কিন্তু খুবই টাইমের মানুষ। দেরি কোরো না। গেলাম। সুশীলদা আলাপ করালেন। আমি প্রণাম করলাম। শচীনদা বললেন, ওহো তুমি পুলক। মানা আমার কাছে তোমার খুবই সুনাম করে। খুব কম কথা বলতেন শচীনদা। এইটুকু বলেই চুপ করে গেলেন। সুশীলদা ধরিয়ে দিলেন পুলক গান নিয়ে কলকাতার বাড়িতে কবে যাবে। তখন কে একজন বললেন (বিষয়টা ঠিক মনে নেই, ধরা যাক) জানেন কর্তা কাল দেশপ্রিয় পার্কের ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে দেখি একটা পাগলা ষাঁড় ছুটে আসছে। একেবারে আমার সামনে। শচীনদার চোখ তখন ঘড়ির দিকে চলে গেছে।

তিনি বলে উঠলেন, চল রে ভাই।

ব্যাস, তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন তিনি। শুনলেনই না আর কোনও কথা। এমনই টাইমের মানুষ ছিলেন শচীনদা।

নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে পকেটে গান নিয়ে গেলাম শচীনদার কলকাতার বাড়ি সাউথ এন্ড পার্কে। ঘরে বসলাম। ওদিকের দরজায় হয়তো বউদি উঁকি দিয়েছিলেন। শচীনদা আমাকে ওঁর নিজস্ব ভঙ্গি আর ভাষায় বললেন, চা খাবা নাকি ভাই? অ্যাত বেলায় খাবা? তারপর আমায় কিছু বলার অবকাশটুকু না দিয়ে বললেন, না না অ্যাত বেলায় চার প্রয়োজন নেই।

এবার আমাকে হারমোনিয়ামটা দেখিয়ে বললেন, শোনাও। আমতা আমতা করে আমি বললাম, আপনি ভুল করছেন। আমি গান গাই না, গান লিখি।

শচীনদা বললেন, হ হ শোনাও। আবার আঙুল দিয়ে দেখালেন হারমোনিয়ামটা। এরকম বার কয়েক হবার পর ছোটবেলায় বাবার কাছে অরগান বাজাতে শেখা আমি মরিয়া হয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কী একটা গান গেয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিলেন উনি। বললেন, ব্যস ব্যস আর নয়। তোমার হবেরে ভাই তোমার হবে। আমি এতক্ষণ তোমার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম তোমার সুরবোধ কেমন। ভাল গান লিখতে হলে তোমাকে গান জানতেই হবে। বম্বের সব রাইটাররাই রীতিমতো গাইতে জানেন। ওঁরা যখন ওঁদের লেখা গান মিউজিক ডিরেক্টরকে দেন সে গানটা নিজের সুরে গেয়ে শুনিয়ে তবে দেন। তুমিও যদি সেটা করতে পার কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না ভাই।

শচীনদার এ কথা যে কত খাঁটি তার প্রমাণ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরেই। রেকর্ডিং-এ কিশোরকুমার অনুপস্থিত হওয়ায় ছবির একটি ডুয়েট গান লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে গাইতে দ্বিধা করেননি সে ছবির বিখ্যাত গীতিকার আনন্দ বক্সি। কাঁচ কা গুড়িয়া ছবিতে সম্ভবত একটা একক গানও গেয়েছিলেন আনন্দ বক্সি। এখনকার নামী মহিলা গীতিকার মায়া গোবিন্দকেও দেখেছি ওঁদের দেশওয়ালি গান গেয়ে গেয়ে শুনিয়ে সুরকারদের দিতে। অনেক সময়ই সুরকারও সেই সুরটি প্রয়োগ করেছেন সেই গানে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুম্বই-এর খ্যাতনামা গীতিকার ইন্দিবরও ওঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে খাওয়াতে কত নতুন নতুন হিন্দি গান শুনিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমিও আমার গলাতে গেয়ে অনেক নতুন নতুন বাংলা গান শুনিয়েছি।

যাই হোক, শচীনদার কাছ থেকে আমি কথা আদায় করে নিলাম উনি আমার গান গাইবেন। বললেন, পুজোর গানের জন্য ঠিক ওমুক মাসে ওমুক তারিখে আমাকে মুম্বই-তে যেতে। আমিও তারিখটা সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজে লিখে পকেটে পুরলাম।

মুম্বই-এ থাকার কিছুদিন পরেই লক্ষ করেছিলাম শচীনদার গাওয়া বাংলা আধুনিক গানের সুরের স্টাইলও খুব বদলে গেছে। অবশ্য হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি ছাড়ার আগেই তার ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। মোহিনী চৌধুরীর লেখা 'হায় কী যে করি এ মন নিয়া' এবং 'এই চৈতি সন্ধ্যা যায় বৃথা...'। মোহিনী চৌধুরীর লেখা আরও দুটি গান, একটি গেয়েছিলেন বউদি অর্থাৎ মীরা দেববর্মণ 'আজ দোল দিল কে আমার হিয়ায়' অন্যটি শচীনদার সঙ্গে বউদির দ্বৈতসংগীত 'ওই গায় যে পাপিয়া গায় কোয়েলা গায়'। এরপর

শচীনদা এইচ. এম. ভি.-তে গাইলেন মোহিনী চৌধুরীর লেখা আরও দুটি গান 'ভুলায় আমায় দু'দিন' এবং 'কে আমাকে আজও পিছু ডাকে'। এর পরেই রবি গুহমজুমদারের লেখা বিখ্যাত গান 'মন দিল না বধূ/মন নিল যে শুধু/আমি কী নিয়ে থাকি'—থেকে শচীনদা ভিন্নতর হয়ে গেলেন।

২২

দিন কেটে যাচ্ছিল। হাতের কাছে বাংলা গানের গীতিকার না পেয়ে বউদি মীরা দেববর্মণই লিখতে লাগলেন শচীনদার বাংলা আধুনিক গান। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় 'শোন গো দক্ষিণ হাওয়া প্রেম করেছি আমি', 'রূপে বর্ণে ছন্দে ছন্দে জীবন জাগালে তুমি'—ইত্যাদি গান। এদিকে আমারও সময় এসে গেল শচীনদার দেওয়া তারিখে মুম্বই যাওয়ার। নির্দিষ্ট তারিখে লিংকিন রোডে শচীনদার 'জেট' বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। শচীনদা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বিনীতভাবে বললাম, আপনি তো এই সময়েই এখানে আসতে বলেছিলেন। শচীনদা বোধহয় আমার ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, হ হ, তুমি বসো।

ঘরে আরও লোকজন ছিলেন। এক ভদ্রলোক আমার সামনেই তার হাতের ছোট টিনের সুটকেশ খুলে ওঁকে দেখালেন নোটের গোছা। শচীনদা ওঁর ভঙ্গিতে বললেন, তুম জিতনা রূপাইয়া দেখাও হাম তুমারা পিকচার নেহি করেঙ্গা। ওই ভদ্রলোকের অনেক কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে শচীনদা তাকে বিদায় দিলেন।

ঘরের মধ্যে বসা অন্য এক ভদ্রলোক বললেন, দাদা, সাত সকালে এতগুলো টাকা ছেড়ে দিলেন? উনি বললেন, কুয়া জান? পাতকুয়া? পাতকুয়া থেকে একসঙ্গে সব জল তুলে নিলে কুয়া শুকিয়ে যায়। কুয়াতে জল জমবার সময় দিতে হয়। মিউজিক ডিরেকশনও তাই। টাকার লোভে একগাদা ছবিতে কাজ করলে আমি ফুরিয়ে যাব। আমার ইয়ারলি কোটা আছে। তার বেশি আমি কাজ করি না। আমার এ বছরের কোটা কমপ্লিট। যে যত টাকাই দিক এ বছরে আর আমি ছবি করব না।

শচীনদা ওঁর এই উক্তির প্রমাণ রেখে গেছেন। কত নামী দামি সুরকার হইহই করে ছবি করেন। তারপর নিঃশব্দে কবে কখন সরে যান কেউ তার খবর রাখে না। কিন্তু এস ডি বর্মণ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওঁর ডিমান্ড রেখে গেছেন। ফুরিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করেননি। দিয়ে গেছেন নিত্য নতুন সুরের স্টাইল।

সেদিন নিজের বাড়িতে শচীনদা চা খাওয়ালেন। ঘরের লোকদের বিদায় দিয়ে বললেন, কী গান লিখেছ শোনাও। প্রথম গানটি শুনেই বললেন, এ গানটি যে গাইবে সুপারহিট হয়ে যাবে। কিন্তু ভাই আমি রেকর্ড করতে পারব না। চমকে উঠে বললাম, সে কী। শচীনদা বললেন, না পুলক হোমফ্রন্টে গণ্ডগোল ভাল না। তোমার বউদি গান লিখেছেন। আমি বানিয়ে ফেলেছি। তবে তোমায় আমি ফেরাব না। এখনই পঞ্চম আসবে। পঞ্চম দারুণ গাইছে। ওকে দিয়ে তোমার গান রেকর্ড করাব। (পঞ্চম তখন থাকত প্রথমা স্ত্রী রীতা পটেলের সঙ্গে সান্তাক্রুজের কাছে একটা সুন্দর বাড়িতে)।

বসে রইলাম। বসে বসেই ভাবতে লাগলাম স্বয়ং শচীন দেববর্মণ যখন বলেছেন গানটা সুপারহিট হবে তখন নিশ্চয় আমার গানটায় কিছু একটা আছে। কিন্তু কাকে দি। হঠাৎ মাথায় এল অখিলবন্ধু ঘোষের নাম। সেদিনই মুম্বই থেকে একটা পোস্টকার্ডে গানটা পাঠিয়ে ছিলাম কলকাতায়। অখিলবন্ধু নিজের সুরে গেয়েছিলেন সেই গান 'ও দয়াল বিচার করো। দাওনা তারে ফাঁসি/ আমায় গুণ করেছে। আমায় খুন করেছে ও বাঁশি...'।

শচীনদার ভবিষ্যৎবাণী বা আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। সত্যি সুপারহিট হল সে গান। যা হোক, পঞ্চম আসছে না। সময় কাটাবার জন্য বললাম, বউদির কী গান রেকর্ড করছেন একটু শোনাবেন?

হারমোনিয়ামটা নিলেন উনি। একটু বাজিয়ে বললেন, না থাক। এখনও রেকর্ড হয়নি। আমি অনুরোধ করলাম, রেকর্ড নাই বা হল। আপনার নতুন গান শুনতে দারুণ ইচ্ছে করছে।

শচীনদা বললেন, তবে একটু শোনো। কথাটা বলেই আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বলে উঠলেন, তুমি আবার মেরে দেবে না তো ভাই? এখনও রেকর্ড হয় নাই। আমার সুর আমার গানের আইডিয়া কেউ মেরে দিলে বুকে বড্ড ব্যথা লাগে। শচীনদা কখনও কাউকে রেকর্ড না হওয়া কোনও গান শোনাতে চাইতেন না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একবার আমার সঙ্গে আমার সুরকার বন্ধু সুধীন দাশগুপ্ত গিয়েছিলেন শচীনদার বাড়িতে। সুধীনবাবুর অনেক অনুরোধে উপরোধে অনেক বাহানা দেখিয়ে আমাকে রীতিমতো অবাক করে দিয়ে হারমোনিয়ামের সামনে বসলেন শচীনদা। সুধীনবাবু নিশ্চয় আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে ভাবলেন একটা অসাধারণ ব্যতিক্রমী ব্যাপার উনি ঘটাতে পারলেন। শচীনদা হারমোনিয়ামটা খুললেন। তারপর হঠাৎ একটা বেসুরো 'ডিসকর্ড' সুর বাজিয়েই বিরক্তিতে বলে উঠলেন, ধাস! না সুধীন হবে না। বেসুরো হারমোনিয়ামটা আমার মেজাজটাই নষ্ট করে দিল। হারমোনিয়ামটা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন শচীনদা। আর আমি মনে মনে হেসে গড়িয়ে পড়লাম।

যাই হোক, আবার আমি ফিরে আসি সেদিনের ঘটনায়। আমি নিশ্চয় সৌভাগ্যবান। আমায় একটু শোনালেন ওঁর রেকর্ড না হওয়া নতুন গান। শুনলাম এক অপূর্ব সুর, অপূর্ব কথা, অপূর্ব গানের পূর্বাভাষ। শচীনদা গান থামিয়ে বললেন, বলরে ভাই জমবে তো? এ কিন্তু 'আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে' নয় এ ভিন্ন গান। 'আমি ছিনু একা' সপ্তাহে চারটে বানাতে পারি। কিন্তু এ গান বানাতে লাগে চার চারটি মাস। কর্মাশিয়াল গান বানানো ভারী শক্তরে ভাই। মনে রাখবে তোমার বায়ার সতেরো থেকে সাতাশ, তাদের পছন্দ হলে তবে তোমার রেকর্ড কিনে বাড়ি যায়। তারপর তাদের বাপ-মায়েরা শোনে। সে গান পপুলার হয়।

এমন সময় পঞ্চম ঘরে ঢুকল। ওকে চিনতাম অনেক আগে থেকে। ওর তখন 'পড়োশন', 'ভূতবাংলা' ছবির গান হিট করে গেছে। আমায় দেখেই বললে, আরে কবে এলেন? শচীনদা বললেন, পুলক দারুণ মডার্ন গান লেখে। আর তুমি তো মডার্ন গানে দারুণ সুর করো। রেকর্ড করো পুলকের গান।

পঞ্চম বলে উঠল, কী যে বলেন ড্যাডি। আপনি আমাদের থেকে অনেক অনেক মডার্ন। কিন্তু বাংলা গান আমার আসে না। ও আমি গাইতেও পারব না। সুর করতেও পারব না।

শচীনদা বললেন, পুলক এখন তুমি বাড়ি যাও ভাই। কাল সকালে পঞ্চমের বাড়ি এসো। আমি মর্নিং ওয়ার্ক সেরে ওর বাড়িতে আসব।

পরদিন সকালে গেলাম পঞ্চমের বাড়িতে। পঞ্চম-রীতা বিশাল প্রাতঃরাশ দিয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানাল। ঠিক সময় শচীনদা এসে গেলেন। এসেই বললেন, তোমরা সিটিং শুরু করো। আমি লতাকে বলেছি। লতা তোমার সুরে পুলকের কথায় গাইবে এবারের পুজোর গান। আর এটাই হবে আর ডি বর্মণের প্রথম বাংলা গান।

অগত্যা পঞ্চম আমায় বলল, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। অমুক সময় কলকাতায় আসছি। ইতিমধ্যে কিছু সুর আমি বানিয়ে রাখছি। আপনাকে নিয়ে কলকাতায় সিটিং-এ বসব।

অসাধারণ সুরকার আর ডি বর্মণের বাংলা গানের প্রথম গীতিকার আমি এ নিশ্চয় আমার সৌভাগ্য। যথা সময়ে পঞ্চম কলকাতায় এল। গেলাম ওই সাউথ এণ্ড পার্কের বাড়িতে। পঞ্চম বলল, আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। একেবারে খেয়েদেয়ে যাবেন। দেখলাম এলাহি খাবারদাবারের আয়োজন। শচীনদার ঠিক উল্টো। পঞ্চম সুর শোনাতে শুরু করল। মনে আছে পর পর আটটা সুর শুনিয়েই পঞ্চম বলল, যে দুটো আপনার ভাল লাগে লিখুন।

আমি তো বাঁশ বনে ডোমকানা। বললাম, আটটা সুরেই কথা বসাব। পঞ্চম হেসে উঠল। এখন আমরা ক্যাসেটের যতই বদনাম করি তখন যদি আজকের মতো ব্যবস্থা থাকত তা হলে আটটি গানের অমর ক্যাসেট জন্ম নিতে পারত। যাই হোক, লটারি করে দুটো গান বেছে নিলাম। মনে পড়ল ভূপেন হাজারিকার সুরে কী একটা ছবির জন্য লতার নাম দিয়ে লিখেছিলাম 'পরশ পেলেই ঘুমিয়ে পড়ি আমি লজ্জাবতী লতা'। অনিবার্য কারণে ও গানটা রেকর্ড হয়নি। কিন্তু লতাজি শুনেছিলেন। আমায় হাসতে হাসতে বলেওছিলেন, আমার নাম দিয়ে লেখা গানটা আমি শুনেছি। ভাল লেগেছে।

তৎক্ষণাৎ মাথায় এসে গেল এই লতার নাম দিয়েই পঞ্চমের একটা গান লিখি। লিখেছিলাম 'আমার মালতী লতা/কী আবেশে দোলে/আমি সে কথা জানি না/আমায় কে যে দেবে বলে'। উল্টো পিঠে লিখেছিলাম 'আমি বলি তোমায় দূরে থাক/তুমি কথা রাখো না'।

আবার বলি আমি সৌভাগ্যবান। আর ডি বর্মণের প্রথম বাংলা গানের গীতিকার হতে পেরেছি বলে। আর যে রেকর্ডে কণ্ঠ দিয়েছিলেন অদ্বিতীয়া লতা মঙ্গেশকর।

এর কিছুদিন বাদেই উষা খান্নার সুরে চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের জন্য বাংলা গান লিখতে মুম্বইতে এলাম। তখন রোজ সকালে পঞ্চমের রেকর্ড না হওয়া বাকি সুরগুলোর ওপর কথা বসাতাম। পঞ্চম কিন্তু তখনও বাংলা গানের ওপর ততটা মন বসাতে পারেনি। প্রত্যেকটি সুরই হিন্দিতে লাগাল এবং গানগুলো সুপারহিটও হল। আর একবার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মুম্বই-এর রাস্তায় শচীনদার বাড়ির সামনে দিয়ে আসছি।

ওপরের বারান্দায় দাঁড়ানো শচীনদার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। দেখা করতে গেলাম। শচীনদা জিজ্ঞেস করলেন, কবে এলে? কার কাজে?

আমি উত্তর দিলাম, মান্না দের সুরে এইচ. এম. ভি.-র জন্য আশা ভোঁসলের পুজোর গান লিখতে।

শচীনদার বোধহয় তখন কোনও নতুন গানের সিটিং ছিল। আমাদের কথার মধ্যেই ঘরটায় অনেকে এসে গেলেন।

শচীনদা বললেন, কী গান লিখলে?

আমি বললাম, 'আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম/একটি তোমার সই গো/তুমি চোখের পাতায় লিখে দিলে/আমি হলাম তোমার সই গো'। গানটা শুনেই বাঙালি যাঁরা ছিলেন সবাই একসঙ্গে তারিফ করলেন। অবাঙালিরা বলে উঠলেন কেয়া মতলব? ওখানে আনন্দ বক্সিও ছিলেন। বাঙালিরা হিন্দিতে অবাঙালিদের গানের অর্থটি বুঝিতে দিতেই তারাও তারিফ করল। শচীনদা বললেন, কলকাতায় ফেরার দিন আমার সঙ্গে দেখা করে যাও।

ফেরার দিন দেখা করতে গেলাম। সেদিনও সিটিং ছিল। অনেকেই আসতে লাগলেন। তখন শচীনদার কী একটা গান বিবিধ ভারতীতে শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম সে কথাটা। শুনেই ওঁর সেই ব্যতিক্রমী হাসিটি হাসতে লাগলেন। বললেন, বিবিধ ভারতীতে আমার গান শুনলে? অদ্ভুত ব্যাপার। ওরা পয়সা চায়। আমি পয়সা দি না। তাই ওরা আমার গান বাজাতেই চায় না।

এরপর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বললেন, শুনেছি তুমি নাকি গল্পও লেখ? তোমার যদি কোনও ফিফটি ফিফটি গল্প থাকে আমায় দাও। দেব আনন্দকে শোনাব। ও আমায় খুবই মানে।

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, ফিফটি ফিফটি গল্প সেটা কেমন?

শচীনদা যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, সিনেমায় কাজ করছ আর ফিফটি ফিফটি বোঝ না। হিরো হিরোইনদের সমান প্রেফারেন্স। কে একজন বললেন, রিহার্সালটা শুনে যান। আমি বসে গেলাম। রিহার্সালে শুনলাম 'কোরা কাগজ থা মন মেরা/লিখ দিয়া নাম উসনে তেরা'/ আমি দুঃখ পাইনি। বরং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। যে বিষয়টা ব্যক্ত করতে আমার লেগেছিল এতগুলো কথা (আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম একটি তোমার সই গো/তুমি চোখের পাতায় লিখে দিলে আমি হলাম তোমার সই গো।) সেই ভাবটি আনন্দ বক্সি ব্যক্ত করেছেন কত কম কথায়, কত বেশি ঠাস বুনুনিতে। আনন্দ বক্সি তখন ওখানে ছিলেন না। ওঁকে আমার অজস্র প্রশংসা জানিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছিলাম।

২৩

শচীনদা প্রসঙ্গে আরও একটু বলি। সত্যি এক ভিন্নতর মানুষ ছিলেন এই এস ডি বর্মণ। কখনও কোনও কাজে কিছুতেই কম্প্রোমাইজ করতেন না। মান্নাদার কাছে গল্প শুনেছি বোম্বেতেই একবার কী একটা রেকর্ডিং-এ ওঁর রিদিম কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না।

তখন কী রিদম উনি চান সে কথা মিউজিশিয়ানদের বোঝাতে স্কোরিং থিয়েটারের মধ্যেই উনি আদ্দির পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন, এই দেখো, আমি বগল বাজাচ্ছি। শুনে নাও ঠিক এই আওয়াজ, এই চটাং চটাং আওয়াজ এই রিদমই আমি চাই।

মান্নাদার কাছে আরও শুনেছি তখন পঞ্চম কাজ করছে এস ডি বর্মণের অ্যারেঞ্জার হিসাবে। একটা রেকর্ডিং-এ অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ হচ্ছে তো হচ্ছেই। বেশ কিছুক্ষণ পর শচীনদা অধৈর্য হয়ে পড়ে বলে উঠেছিলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি আগে গানটা টেক করেনি। তারপর তোমরা ও-সবগুলো করো।

সত্যিকারের সৃজনশীল সুরকাররা দেশি-বিদেশি অজস্র সুর আহরণ করে তারপর নিজস্ব ভাবধারায় সেই সুর গানের কথার মাধ্যমে যুগে যুগে পরিবেশন করে এসেছেন। গীতিকারদেরও অনেকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যের ভাব-ভাবনা নিয়ে নিজের ভাষায় নতুন রূপে সেগুলো প্রকাশ করে এসেছেন। অবশ্যই প্রকৃত সৃজনশীল সুরকার বা গীতিকারদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা স্বতন্ত্র প্রতিভা থাকে। সেই নিজস্ব মৌলিক ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার স্পর্শ প্রতিটি সৃষ্টিতেই পাওয়া যায়। যার ফলে মাঝে মাঝে এক কথায় বলে দেওয়া সম্ভব হয় এটা অমুকের সুর বা অমুকের কথা। হিন্দি 'আরাধনা' সুপারহিট হওয়ার পর একদিন শচীনদাকে বলতে শুনেছিলাম, আমার 'মেরি স্বপ্ন কে রানি কভি আয়েগি তু' গানটা যারা বলছে আমি বিদেশি ট্যাকিলা থেকে নিয়েছি তাদের বলে দিয়ো হ্যাঁ, সুরটা আমি অনুসরণ করেছি—অনুকরণ নয়। তবে সেটা ট্যাকিলা নয়। পূর্ব বাংলার কুমিল্লার নৌকো বাইচের গান থেকে। আমি বাঙালি, আমার বাংলায় অজস্র সম্পদ ছড়ানো আছে। আমি সব আগে সেটাই তো নেব। মুম্বই-এর এক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতনামা চিত্র প্রযোজক যখন তাঁর হিন্দি 'ফাগুন' ছবিতে পুব বাংলার বহু বছরের পুরনো যাত্রাপালা 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না'র একটি গানের সুর লাগিয়েছেন 'এক পরদেশি মেরা দিল লেগায়া' গানটিতে তখন খুশিই হয়েছিলেন পুব বাংলার বাঙালি এস ডি বর্মণ।

শচীনদার কাছে যাবার যতটুকু সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তাতে বুঝেছিলাম এমন প্রতিভার সাক্ষাৎ বোধহয় আর আমরা পাব না। একদিন মুম্বই-তে ঘুরতে ঘুরতে শক্তি সামন্তের নটরাজ স্টুডিয়োতে হাজির হয়েছিলাম। শক্তিদা ওঁর স্টুডিয়োর প্রজেকশন থিয়েটারে শোনালেন ওঁর তখনকার নির্মীয়মাণ 'অনুসন্ধান' ছবির দুখানা গান। 'ফুল কলিগো ফুল কলি' আর 'ফেঁসে গেছে কালিরামের ঢোল' মুগ্ধ হয়েছিলাম গান দুটি শুনে আর তার চিত্রায়ণ দেখে। শক্তিদাকে বলেছিলাম, দারুণ। পঞ্চমকে আমার কংগ্রাচুলেশন দেবেন।

শুনে শক্তিদা একটু হাসলেন বললেন, ও দুটো ওর সুর কোথায়। পুব বাংলার নিজস্ব ঘরানায় বানানো শচীন দেববর্মণের সুর। অবশ্য, আমি পঞ্চমকে ওই সুর দুটো লাগাতে বলেছিলাম। বাবার সম্পত্তি ছেলে তো পাবেই। আমি কথাটা ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। শক্তিদা বললেন, শোনেননি শচীনদার বিখ্যাত সুর 'সুন্দরী গো সুন্দরী/দল বেঁধে আয় গান ধরি' এটা থেকেই 'ফুল কলিগো ফুল কলি/বল রে এটা কোন গলি'।

আর 'শুনি তাকদুম তাকদুম বাজে/বাজে ভাঙা ঢোল/ওমন যা ভুলে যা কি হারালি/ভোলরে ব্যথা ভোল' এই সুরটাতেই 'বল হরি বোল হরি বোল/ফেসে গেছে ফেসে গেছে কালিরামের ঢোল'। এই দুটো সুরের ফারাক কোথায়?

আমার মনে পড়ে গেল এই শক্তিদারই 'অমানুষ' ছবিতে কে এল সায়গলের বাঁধিনু মিছে ঘর/ভুলেরি বালু চরে' অনুসরণ করে হয়েছিল 'কী আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে।' একদিন মুম্বই-তেই কী একটা রেকর্ডিং-এর ফাঁকে কথায় কথায় কে যেন বললেন, শচীনদা ওঁর গানে ওঁর দেওয়া কাজ ছাড়া কণ্ঠশিল্পীর বাড়তি কোনও কাজ একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, কালোয়াতি করছ কেন? কালোয়াতি চাই না।

আর একদিন কে যেন বললেন হিমাংশু দত্ত বিখ্যাত হয়েছেন বিদেশি 'রেমোনা' সুরটা লাগিয়ে। 'বনের কুহু কেকা সনে/মনের বেণু বীনা গায়' বা ওই যে 'বন্ধন হারা ওই বন্ধুর পথ/নিদ্রিত অজগর যক্ষের প্রায়।' রেমোনার স্টাইলটাই হচ্ছে প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি একটু চড়ায় উঠবে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি উঠবে আরও চড়ায়। চতুর্থ পঙ্‌ক্তিটি নেমে আসবে খাদে। পূর্ণ হবে একটি স্তবক।

মনে আছে আমি মন্তব্য করেছিলাম রেমোনার স্টাইলটি একটি অমর স্টাইল। বন্ধুবর সুধীন দাশগুপ্ত 'শঙ্খবেলা' ছবিতে আমার 'কে প্রথম চেয়ে দেখেছি' গানটিতে এই স্টাইল লাগিয়েছিলেন। এবং সেটি হিমাংশু দত্তের সময়ের অনেক পরে রিলিজ হয়েও সুপারহিট।

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে মুম্বই-তেই শচীনদার সামনেই শচীনদার কাছের মানুষদের মধ্যে কে যেন বলে উঠেছিলেন সলিল চৌধুরী কিন্তু দারুণ কায়দা করে দুটো বিখ্যাত বিদেশি গানকে বাংলায় কাজে লাগিয়েছেন। একটা 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ/হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' সুর নিয়ে 'ক্লান্তি নামে গো/রাত্রি নামে গো'। বিখ্যাত গায়ক প্যাট বুনের টেকনিক গানের সুর নিয়ে 'দুরন্ত ঘূর্ণি তাই লেগেছে পাক/এই দুনিয়া ঘোরে বন বন বন।' ধরা ছোঁয়ার উপায় নেই।

স্বল্পভাষী শচীন দেববর্মণ এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি। কিন্তু ওই আলোচনাটা থামিয়ে দিয়েছিলেন একটা মারাত্মক কথা বলে। বলেছিলেন, ওই যে বললে কায়দা করে লাগানো। ওই কায়দাটা হচ্ছে আসল জিনিস। রবি ঠাকুর করেছেন। ডি এল রায়, কাজী সাহেব সবাই করেছেন। আমিও করেছি। গুরু দত্তর 'পিয়াসা' ছবিতে যে গানটা হেমন্তকে দিয়ে গাইয়েছিলাম। 'যানে হো ক্যায়সে/লোগসে জিনকে/প্যায়ার তো প্যায়ার মিলা/হামনেতো যব কালিয়া মাঙ্গি/কাঁটাকো হার মিলা'। এই সেকেন্ড লাইনটা যে আমাদের ন্যাশানাল সঙের 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ'—আমি বলার আগে কেউ কোনও দিন বুঝতে পেরেছিল কি? ও সব কথা ছাড়ান দাও। চলরে ভাই—বলেই ওখান থেকে উঠে পড়েছিলেন সংগীত জগতের এক তুলনাহীন সংগীতব্যক্তিত্ব।

আর ডি বর্মণ অর্থাৎ পঞ্চমের সঙ্গে কাজ করতে করতে ক্রমশ লক্ষ করতে লাগলাম ও সন্ধেবেলা কেমন যেন নিয়মিত 'অস্থির পঞ্চম' হয়ে যেতে লাগল। গানের জগতে বিরাট সাফল্যের সুখ ছাড়া ও বোধহয় মানসিক সুখ কোনও দিনই পায়নি। রীতা

পটেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর পঞ্চমের একটা বন্ধুচক্র ওকে এমনভাবে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরল যে ও সেই বন্ধন থেকে কিছুতেই নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে পারল না। আশা ভোঁসলেকে বিয়ে করার পর মনে হয়েছিল এবার হয়তো পঞ্চম স্বস্তি পাবে। কিন্তু পেয়েছিল কি? ওকে জড়িয়ে থাকা বন্ধুদের কবল থেকে ও যখন মুক্তি পেল তখন বোধ হয় অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। থাক এ সব কথা। জীবনের শেষ ক'বছর মনে হয় সবাই ওকে এক্সপ্লয়েট করেছে।

মুম্বই-এর প্রযোজকের ব্যাপারগুলো জানি না। কিন্তু কলকাতার ব্যাপারগুলো জানি। একদিন গান নিয়ে ওর সান্তাক্রুজের বাড়িতে বসেছি। দুর্ধর্ষ পঞ্চম হারমোনিয়াম একটু বাজিয়েই বলে ফেলল, ধ্যাৎ, যেটাই বাজাই মনে হয় এ সুরটা হয়ে গেছে। জোর করে সুর করা যায় না। স্পনটেনিয়াস ব্যাপারটা হচ্ছে না। আমি একটা ধুন বানিয়ে কাল ঠিক এই সময়ে আপনার সঙ্গে বসব। ভদ্রতায়, আতিথ্যে এবং সময়নিষ্ঠায় পঞ্চম অদ্বিতীয় ছিল। আগেই বলেছি তখন পঞ্চমের জীবনের শেষের দিক। তখন ওর একটাও ছবির গান আগের মতো হিট করছে না। তবুও কাজ-পাগল পঞ্চম কাজ করে যাচ্ছে।

মুম্বই-এর এক নামী রেকর্ড কোম্পানির মালিক ও চিত্র প্রযোজকের তথাকথিত 'মিউজিক ব্যাঙ্ক'-এর পর্যন্ত গান রেকর্ড করতে দ্বিধা করেনি পঞ্চম। যে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে ওর থেকে নিচু শ্রেণীর সংগীত পরিচালকও সম্মতি দেয়নি। পঞ্চমের জীবিত অবস্থাতে কিছুদিন পরে অন্য সুরকারের নাম নিয়ে বাজারে বেরিয়েছে তার কিছু রেকর্ড করা সে সব গান। হিটও করেছে। সংগীতজগতের যাঁরা এ ব্যাপারটা জেনেছেন তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন আর ডি বর্মণের নাম থাকলে হয়তো হিট করত না। ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। এই সময়েই বাপি লাহিড়িকে নিয়ে কাজ করা সুপারহিট গান পাওয়া কলকাতার এক প্রযোজক-পরিচালক গোষ্ঠীর সঙ্গে হঠাৎ বাপির কিছু অমিল হয়। ওরা পঞ্চমকে দিয়ে তাই পর পর বাংলা ছবি বানাতে লাগলেন। কিন্তু একটা ছবিরও গান জনপ্রিয় হল না। সেই সময়টাতে অন্য এক প্রযোজকের বাংলা ছবির গান লিখতে পঞ্চমের কাছে এসেছিলাম। সুরের মিটার নিতে নিতে পঞ্চমকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লতাজিকে দিয়ে গাইয়েও তোমার কলকাতার একটা গানও হিট করছে না এ সম্বন্ধে তুমি কী বলবে?

তৎক্ষণাৎ উত্তর পেয়েছিলাম, ওরা ছবিতে গানের সিচুয়েশনই বানাতে জানেন না। আমি গান বানাব কী করে? তার ওপর কলকাতায় যেমন বিয়ের পদ্য লেখা হয় কলকাতার নামী দামি চিত্রনাট্যকার কাহিনীকার প্রযোজক পরিচালক তেমন সব ছন্দের গান নিজে লিখে নিয়ে হাজির হন। ওঁকে বা ওঁর দলকে ফেরাই কেমন করে? কী করে ও সব গান হিট করবে? কোনও নতুন স্ক্যানিং, নতুন ছন্দই আমি বার করতে পারি না। সেই একঘেয়ে সিক্স এইট বা টু ফোর (দাদরা বা কাহারবা) করতে হয়। আর মিটার? ইউ মিন গানের মিটার? ওঁদের কাছে গানের মিটার আর কিলোমিটার এক। কোনও তফাত নেই। পঞ্চমকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, তা হলে গান করছ কেন? শুধু শুধু বদনাম হচ্ছে। তোমাকে ভালবাসি বলেই কথাগুলো বললাম। কিছু মনে কোরো না।

পঞ্চম উত্তর দিয়েছিল, আগে এত ব্যস্ত থাকতাম যে আমার গান আমি নিজেই ভাল

করে শোনার সময় পেতাম না। এখন এই সুযোগটা পাচ্ছি। এটাই আমার আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই এখনও জেনে শুনে ও সব গানের সুর করে যাচ্ছি।

উত্তরটা শুনে অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম।

২৪

আমার প্রিয় পঞ্চম সম্পর্কে আরও অনেক কথা মনে পড়ছে। মনে আছে একবার কী একটা ছবির গানে অনিবার্য কারণে বাজেট একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত মিউজিশিয়ানদের দোষেই 'ওভার টাইম' হয়ে যায়। তাতেই বাজেট বাড়ে।

পরের দিনই আবার রেকর্ডিং ছিল। রাত্রে প্রযোজক-পরিচালক দুজনেই হোটেলে আমায় বললেন, পুলকবাবু টাকায় তো টান পড়বে। আমরা তো বেশি কিছু আনিনি। তৎক্ষণাৎ হোটেলের বাইরে থেকে পঞ্চমকে ফোন করে ব্যাপারটা খুলে বললাম। এও বললাম একটা কাজ করলে হয় না? যদি মিউজিশিয়ান একটু কমিয়ে দেওয়া যায় তা হলেই তো বাজেটটা ঠিক থাকে। ও প্রান্ত থেকে পঞ্চম বলল, ও সব ভাবার প্রয়োজন নেই। ও আমি ম্যানেজ করব।

পরদিন রেকর্ডিং-এ এসে দেখলাম একটা মিউজিশিয়ানও কমায়নি পঞ্চম। ঠিক আগের তালিকা মতোই বাদ্যযন্ত্রীরা হাজির। বুঝে নিতে দেরি হল না শিল্পী পঞ্চম স্রষ্টা পঞ্চম, বণিক পঞ্চম, বাণিজ্যিক পঞ্চমকে এক্সপ্লয়েট করেছে। নিজের পকেট থেকে দিয়েছে সেই পেমেন্ট। তবুও নিজের সৃষ্টির এতটুকু অঙ্গহানি করতে দেয়নি।

পঞ্চমকে নিয়ে আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সেবার মুম্বই থেকে ভেনাস ক্যাসেটের চম্পক জৈনের ফোন পেলাম, দাদা, ওমুক তারিখ বোম্বেতে আসুন। পঞ্চমদার বাড়ির কাছে 'লিংকওয়ে' হোটেলে থাকবেন। এবার পুজোয় আশাজি আর অমিতের ক্যাসেট করব। এক একদিকে এক একজনের দুটো করে সোলো আর দুটো করে ডুয়েট।

ফোনেই জিজ্ঞাসা করলাম, আশাজি রাজি? চম্পক বলল, আশার বাড়িতে বসে কথা হয়েছে। উনি রাজি। অমিতও এক কথায় মত দিয়েছে। আর পঞ্চমদা সুর বানিয়ে ফেলেছেন। আপনি এসে শুধু লিখে দেবেন।

ইভনিং ফ্লাইটটা দমদম থেকে উঠতেই দেখলাম চাঁদের আলোয় আকাশটা ঝলমল করছে। আমার জানলায় পূর্ণিমার পূর্ণ আলো। পঞ্চমের কথা মনে হতে লাগল। নিশ্চয় কিছু অসাধারণ সুর বানিয়ে ফেলেছে। ভাবছি শুধু ভাবছি।

কিছুক্ষণ পর এক অল্পবয়সি বিমান সেবিকা আমার খাবারের খালি ট্রেটা নিয়ে গিয়েই আবার ফিরে এলেন। বুঝিনি উনি বাঙালি। একটা অটোগ্রাফের খাতা আমার দিকে এগিয়ে বললেন, প্লিজ কিছু লিখে দেবেন।

বার বার পঞ্চমের কথা আমার মনে পড়ছিল। জানলা দিয়ে আবার দেখলাম রুপালি জ্যোৎস্নায় ঝলমল করা চাঁদটাকে। তার দু পাশে দু টুকরো সাদা মেঘ। আমি লিখে দিলাম 'সাদা দুটো মেঘ যেন দুখানা ডানা/চাঁদকে করেছে আজ রুপালি পরী/এমন রাতে/যারা শুনছে না গান/যারা করছে না পান/তাদের আমি করুণা করি।

মেয়েটি রূপসী, লেখাটা পড়ে গালে টোল ফেলে একটু হেসে বলে গেল, সরি, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসকে একটু ক্ষমা করবেন। নমস্কার।

পরদিন মেরিল্যান্ডস-এ এসেই পঞ্চমকে ঘটনাটা বললাম। শুনেই পঞ্চম বলল, আবার বলুন তো গানটা।

পঞ্চম ছোট ছোট বাঁধানো খাতায় নিজের হাতে সব গানই লিখে নিত। এটাও লিখে নিল। তবলা ও অন্যান্য রিদম প্লেয়ারদের বলল বাজাতে। ঘরে রাখা স্টিরিও স্পিকারে গমগম করে উঠল পঞ্চমের কণ্ঠস্বর। ওর সেক্রেটারি ভরতজি কানে হেড ফোন দিয়ে বড় কমার্শিয়াল টেপে রেকর্ড করতে লাগল পঞ্চমের সদ্য রচিত নতুন গানের সুর। ভরতের কাজই ছিল সিটিং-এর সব কিছু রেকর্ড করা। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো খুঁজে বার করা। অপূর্ব মেজাজে, অপূর্ব সুরে মাইক্রোফোনের সামনে আমার গানটা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে যেতে লাগল রাহুল দেববর্মণ। আর আমি তাকিয়ায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে আত্মহারা হয়ে শুনতে লাগলাম।

ওদিকটাতে দু-চারজন রিদম প্লেয়ার, একজন গিটারিস্ট আর পঞ্চমের পেছনে চালচিত্রের মতো শচীন দেববর্মণের বিরাট একটি ফটোগ্রাফ। রেকর্ড করেই পঞ্চম বলল, এবার আমি পরের গানটা সুর দেব। লিখতে হবে। আটটা গান তো ক্যাসেটে থাকবে। আমরা কিন্তু ষোলোটা গান বানাব। তারপর বাছব আটটা গান। সেই আটটা গানই বের হবে ক্যাসেটে।

তথাস্তু। পরপর সিটিং করে আমরা তৈরি করলাম ষোলোটা দারুণ গান। অবশ্য রোজই পঞ্চম রাত আটটার আগেই উশখুশ করতে করতে বলত, এবার আমাদের ছুটি।

আমরা বাছাই করা আটটি গান হাতে নিয়ে শুনতে ডাকলাম চম্পক জৈন আর আশাজিকে। আমাকে একটু আগেই ডেকেছিল পঞ্চম। গানগুলো আবার আমাকে শুনিয়ে ঝালিয়ে নিল ও। আমি বললাম, অমিত আসবে তো? পঞ্চম বলল, না, সকালে গৌরীকুঞ্জ গিয়েছিলাম, অমিত গান শুনে পাগলা হয়ে গেছে। তুলেও দিয়েছি দুটো গান।

যথাসময়ে চম্পক আর আশাজি এলেন। গান শুনে দুজনেই আমাদের খুব তারিফ করলেন। পঞ্চম আশাজিকে জিজ্ঞাসা করল, কাল তা হলে তোমার সেক্রেটারির কাছ থেকে ফোনে জেনে নেব কবে তোমার ডেট পাওয়া যাবে।

আশাজি হঠাৎ চম্পকের দিকে ফিরে বললেন, কিন্তু অমিতের সঙ্গে আমি ডুয়েট গাইব না। ফিল্মে গাইতে পারি। তবে নন ফিল্মি গানে নয়। নন ফিল্মি গান পঞ্চম ছাড়া আমি কারও সঙ্গে গাইব না।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, তা হলে তো খুবই ভাল হয়। ডুয়েট গানগুলো আরও লাইফ পাবে।

পঞ্চম বলল, না, আমার গলা ভাল নেই। আমি গাইতে পারব না।

চম্পক জৈন গম্ভীর গলায় বলল, কিন্তু দিদি, আমি তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করেই অমিতের সঙ্গে কথা বলেছি।

আশাজি কোনও উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। যাবার আগে বললেন, পঞ্চম, আমি পেডার রোডে যাচ্ছি। চম্পক রাজি হলে ফোন করো।

আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে আশাজি চলে গেলেন।

আশাজি যাবার পর চম্পকও উঠে পড়ল, এবং বলল, না এ হতে পারে না আমি অমিতকে কথা দিয়েছি। চলুন দাদা আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দি। ওখানে গিয়ে আপনার এয়ার টিকিট, হোটেল বিল, রেমুনারেশন সব ঠিক করে ফেলব।

আমি হোটেলে এসে আমার গানের জন্য কোনও রেমুনারেশনই নিলাম না। নিলেই গানগুলো ভেনাসে আটকে থাকবে। কথাটা চম্পককে বুঝিয়ে বলতেই চম্পক এককথায় কথাটা মেনে নিল। চম্পক সত্যি আমায় সম্মান করে তাই নাছোড় চম্পক আমার কাছ থেকে গানের কোনও রাইট না নিয়েও একটা সম্মান দক্ষিণার প্যাকেট হোটেলের টেবিলে রেখে দিয়ে গেল।

মারা যাবার মাসখানেক আগেও পঞ্চমের সঙ্গে মুম্বই-তে দেখা হয়েছে। পঞ্চম বলেছে, ও গানগুলো একটা আলাদা খাতায় ভাল করে লিখে রেখেছি। পর পর রেকর্ড করব, পর পর হিট করবে। পঞ্চম চলে যাবার পর ওই গানের টেপগুলো কোথায় আছে সে কথা আশাজির কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছি। উনি বলেছেন পঞ্চমের সেক্রেটারি ভরতের কাছে। ভরত বলেছে আশাজির কাছে। শুধু ও গানগুলো নয় কলকাতার জগদীশের প্রযোজনায় হরনাথ চক্রবর্তীর 'গুণ্ডা' ছবির রেকর্ড না হওয়া আমাদের বানানো ভাল কিছু গান আর এরকমই আমার লেখা কত গান যাতে পঞ্চম সুর দিয়েছিল কিন্তু রেকর্ড হয়নি সে গানগুলো কোথায় আছে কার কাছে আছে এখনও তা জানা হল না। কে বলতে পারে ওর মধ্যেই আরও একটা 'নাইনটিন ফরটি টু আ লভ স্টোরি'-র মতো অসাধারণ গান নেই?

পঞ্চমের জীবিত অবস্থাতেই যদি ওর সুরে রেকর্ড করা গান অন্য সুরকারদের নামে মার্কেটে বের হতে পারে তা হলে এখন ওর মৃত্যুর পর যে কোনও মিউজিক ব্যাঙ্কের বেনামি ভল্টে গচ্ছিত রাখা ওর সুর করা গানের ওই টেপগুলো, যে কোনও দিন অন্য মিউজিক ডিরেক্টরের নামের লেবেল বুকে এঁটে যে কোনও ভাষার গান হয়ে বাজারে আসতে পারে। ওই গানগুলি মার্কেটে টপ সেলার হওয়া অসম্ভব নয়।

কিশোরকুমার যখন চিত্রাভিনেতা ছিলেন তখন নিজের ভূমিকার গান নিজেই গাইতেন। কোনও দিন কারও জন্য প্লে-ব্যাক করেননি। কিন্তু অভিনেতা কিশোরকুমার যখন নিষ্প্রভ হয়ে এলেন তখন পঞ্চমই ওঁকে জোর করে অন্যের প্লে-ব্যাক করাতে রাজি করাল। এ কথা বলতে বাধা নেই এস ডি বর্মণের ক্যাম্প থেকেই কিশোরদা হয়ে উঠলেন পরিপূর্ণ গায়ক। শচীনদা হেমন্তদাকে দিয়ে প্রচুর ছবিতে গান গাইয়েছেন। কিন্তু পঞ্চম তেমন কোনও ছবিতে হেমন্তদাকে দিয়ে প্লে-ব্যাক করিয়েছে কিনা মনে করতে পারছি না।

ভাগ্যের পরিহাসে যখন হেমন্তদার গীতাঞ্জলি পিকচার্সের ছবিগুলো পর পর ফ্লপ হতে লাগল তখন হেমন্তদার মুখে খেদোক্তি শুনেছিলাম সোজা তিরুপতিতে গিয়ে পুজো দিয়ে ছবি শুরু করলাম। সে ছবিও ফ্লপ।

শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি'-র মতো গল্পে মীনাকুমারীকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে বানালাম 'মেজলিদিদি' তাও চলল না। এবারের ছবিতে তাই আমি মিউজিক করছি না। পঞ্চমকে

নিয়েছি মিউজিক করতে। তোমার কাছে স্বীকার করতে দুঃখ নেই পুলক। আমার মিউজিক থাকলে এখন আমার ছবির সার্কিটই বিক্রি হবে না।

পঞ্চম হেমন্তদার গীতাঞ্জলি পিকচার্সের ব্যানারের ছবিতে তাই মিউজিকও করেছিল। কিন্তু এত সুরেলা পঞ্চমের একটা বেসুরো উক্তি আজও আমার কানে বাজে। ও একদিন কথায় কথায় সরাসরি আমাকে বলে ফেলেছিল, হেমন্তকুমার শুড লার্ন ফ্রম কিশোরকুমার হাউ টু সিঙ।

২৫

পঞ্চম যত বড়ই সুরকার হোক বা কিশোরদা পঞ্চমের যত প্রিয় আর বড় গায়কই হন ওই উক্তি আমি সেদিন হজম করিনি। প্রতিবাদ করেছিলাম যুক্তি তর্ক প্রমাণ দেখিয়ে। পরে অবশ্য পঞ্চম বাধ্য হয়ে অন্তত আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল কথাটা।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যে কিশোরদাকে নিয়ে এই তুলনামূলক বিতর্কের উৎপত্তি সেই কিশোরদা ছিলেন হেমন্তদার সুরের এবং কণ্ঠের প্রশংসায় সরব। সেই জন্যই কিশোরদা প্রযোজিত 'লুকোচুরি' ছবিতে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল হেমন্তদাকে। কিশোরদার ওই ছবিতেই গাইতে হয়েছিল একক কণ্ঠে একটি গান 'মুছে যাওয়া দিনগুলি আমারে যে পিছু ডাকে'। শুধু তাই নয়, মেগাফোন রেকর্ডে পুজোর গান গাইবার সময় কিশোরদা চেয়েছিলেন হেমন্তদারই সুর—অন্য কারও নয়। সেই সুরেই সৃষ্টি হয়েছিল 'আমার পূজার ফুল ভালবাসা হয়ে গেছে।' পঞ্চম, আশাজি সম্বন্ধে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। কিছু দিন আগে মুম্বই-তে একটি রেকর্ডিং-এ আশাজির সঙ্গে আমার দেখা হল। আশাজি এসেছিলেন আমারই একটি গান ডাবিং করতে। ওঁর অভ্যাসমতো আমার কাছ থেকে গানটি শুনে শুনে খাতায় লিখে নিলেন উনি। ঠিক করে নিলেন বাংলা উচ্চারণ, বুঝে নিলেন গানের প্রকৃত বক্তব্য। এর পর সুরকারের কাছ থেকে সুরটি তুলে নিয়ে 'সঙ ভায়োলিন' শুনে শুনে আগে থেকে রেকর্ড করা বাজনার ওপর অপূর্ব গাইলেন আশাজি। তখনই ফাইনাল মিক্সিং হওয়া সম্ভব নয়। তবুও শব্দযন্ত্রী যতটা সম্ভব তাৎক্ষণিক মিক্সিং করে গানটি আমাদের শোনালেন। যথারীতি গান শুনে উঠে দাঁড়াতেই ওঁর পেমেন্টটা দেবার জন্য এগিয়ে এলেন প্রযোজক পক্ষ। আশাজি হঠাৎ হাতের ইশারায় প্রযোজকদের কাছ থেকে সময় নিয়ে আমাকে ডাকলেন। আমাকে নিয়েই আবার থিয়েটারে ঢুকলেন। ওখানে একটা নিরিবিলি কক্ষে আমায় সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, কলকাতায় আমার নামে খুবই বদনাম শুনছেন তো।

বদনাম? চমকে উঠলাম আমি।

আশাজি দৃঢ়ভাবে বললেন, হ্যাঁ, বদনাম। শোনেননি? আমি পঞ্চমের সম্পত্তির লোভে এখন গানটান ছেড়ে দিয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছি।

আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই আশাজি বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, আমি ছোটাছুটি করছি ঠিকই তবে আমার নিজের জন্য নয়। প্রয়াত পঞ্চমের যে সব তথাকথিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে পঞ্চমের টাকা আছে সেগুলি আমি উদ্ধার করবই। টাকাগুলো

পঞ্চমের নামে কোনও সেবাপ্রতিষ্ঠানে দান করব। আমি জানি, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে পঞ্চমের কিছু প্রতারক বন্ধু সেই টাকাগুলো সব হজম করে রেখেছে। আমি যোগাযোগ করলে এখন আমায় এড়িয়ে যাচ্ছে। আর আমার নামে বদনাম রটাচ্ছে আমি নাকি প্রচণ্ড অর্থলোভী।

উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগলেন আশাজি। এ সব কথা শুনে আমার কী লাভ আমি তো ভেবে পাচ্ছিলাম না। উনি বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। বললেন, দেখুন, মুম্বই-তেই আমার চারটে বাড়ি আছে। যাদের অ্যাভারেজ ভ্যালুয়েশন অনেক টাকা। আর কোথায় কী আছে নাইবা শুনলেন। শুধু একটা কথা শুনে রাখুন আমার আর নতুন করে পঞ্চমের টাকার কীসের প্রয়োজন। কেন এই পঞ্চমের টাকার পেছনে ঘুরে বেড়াব? শুধু পঞ্চমের বুকের রক্তঢালা পরিশ্রমে অর্জন করা অতগুলো টাকা ভণ্ড বন্ধুরা মেরে দেবে তা আমি সহ্য করব না কিছুতেই। কলকাতায় কেউ যদি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলে তা হলে তাদের মুখের ওপর আমার এই কথাগুলো বলে দেবেন। আপনি শুধু আমার নয় আমাদের সবার বহুদিনের চেনা লোক বলেই আপনাকে এ সব কথা খোলাখুলি জানালাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে আশাজি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন থিয়েটার থেকে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি গান-পাগলদের কথা। কতরকম গান-পাগল পৃথিবীতে আছে। আমরা যাঁরা গান লিখি, যাঁরা সুর করেন, যাঁরা বাজনা বাজান, যাঁরা রেকর্ড করেন তাঁরা সকলেই এক-এক ধরনের গান-পাগল। আর শ্রোতা? কত রকমের যে গান-পাগল শ্রোতা পৃথিবীতে আছে তার পরিসংখ্যান নিতে গেলে কমপিউটার যন্ত্রও হার মেনে যাবে। প্রথমেই আমি কলকাতার বাসিন্দা হারু মুখোপাধ্যায়ের নাম করছি। যাঁর কাছে রয়েছে বাংলা গানের সংগ্রহ সেই আদি যুগ থেকে। রেকর্ডগুলো আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। কোনও রেকর্ড কোম্পানির স্টোররুমেও সে সব রেকর্ডের অর্ধেক ভাগও নেই। বহু পুরনো গান ওঁর কাছ থেকেই নিয়ে ক্যাসেটে ট্রান্সফার করছেন রেকর্ড কোম্পানি। আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মাদ্রাজে বাঙালি চরিত্রাভিনেতা অমিতের মাধ্যমে সেবার মাদ্রাজেই আলাপ হল। তাঁর নাম ভি এ কে রঙ্গারাও, ডম। ভদ্রলোকের মাতৃভাষা তেলুগু। একবার মাদ্রাজে থাকার সময় অমিতের সঙ্গে আমার হোটেলে এলেন। আর আলাপের পরেই আমাকে হোটেল থেকে ধরে নিয়ে গেলেন ওঁর বিশাল অট্টালিকায়। বসবার ঘরে আমায় বসিয়ে রেখে বললেন, বলুন দাদা। কোন সালে আপনার লেখা কোন গান প্রথম রেকর্ডে প্রকাশিত হয়?

আমি বললাম, ১৯৪৯। বাংলা 'অভিমান' ছবির গান। গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা শোনার পর রঙ্গারাও ঘর থেকে উঠে গেলেন। এবং একটু পরে ঘরে ঢুকলেন একটি ৭৮ ডিস্ক হাতে করে। চমকে উঠলাম। সুদূর মাদ্রাজে এক তেলুগুভাষীর সংগ্রহশালায় আমার প্রথম গান। উনি রেকর্ড কভারে আমার অটোগ্রাফ নিলেন। তার পর সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখালেন ঘরে ঘরে রক্ষিত গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি। বিভিন্ন

ভাষার রেকর্ড। তামিল, তেলুগু তো আছেই। বাংলাও রয়েছে অজস্র অসংখ্য। ক্যাসেট কিন্তু একটিও উনি রাখেননি।

আমায় বললেন, আপনার গানের বোধহয় সমস্ত ৭৮, ই পি, এস পি, এল পি এবং নতুন কমপ্যাক্ট ডিস্কগুলোও আমার কাছে আছে। দরকার হলে বলবেন।

খেতে খেতে ওঁর এই রেকর্ড সংগ্রহের বাতিকের গল্প শুনতে লাগলাম। বাড়ি দেখেই বুঝেছিলাম উনি আমার মতোই কোনও পুরনো জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী। প্রচুর কাজের লোকজন। ঝকঝকে তকতকে বাড়ি। ওঁর সামনেই দক্ষিণের চিত্রাভিনেতা অমিত বাংলায় আমাকে বললেন, উনি একা। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এই রেকর্ড সংগ্রহ আর এর জন্য অতিরিক্ত মনোযোগই নাকি বিচ্ছেদের মূল কারণ। যার জন্যে স্ত্রীর অভিযোগ। উনি তাঁর প্রতি কোনও সময় দিতে পারেন না।

খাওয়ার পর বললাম, আচ্ছা, লতা মঙ্গেশকরের প্রথম বাংলা পুজোর গানটি দেখান তো।

উনি সালটি আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে একটি বিশেষ ঘরে চলে গেলেন। নিয়ে এলেন আমার লেখা 'রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে' রেকর্ডটি। সঙ্গে নিয়ে এলেন সে বার পুজোয় প্রকাশিত আমার লেখা আরও দুটি পুজোর রেকর্ড। একটি আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারাদের চুমকি জ্বলে আকাশে' আর একটি গায়ত্রী বসুর গাওয়া 'দূর বনপথে ছায়াতে আলোতে'। এরই সঙ্গে নিয়ে এলেন অন্য সময়ে প্রকাশিত সতীনাথের নিজ কণ্ঠের গান যা আমার রচনা 'কারে আমি এ ব্যথা জানাবো'। রঙ্গরাও বললেন, আমার এক বাঙালি বন্ধু এ গানের অর্থ কী আমায় ইংরাজিতে লিখে দিয়েছেন। আমি এখনও এই গানটা শুনি আর মনে মনে কাঁদি।

'দূর বনপথে' গানটির সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই বলেছি অভিজিৎবাবুই আমায় রেকর্ডের আধুনিক জগতে নিয়ে আসেন। আমার রচিত প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তোমার দু চোখে আমার স্বপ্ন আঁকা' গানটি সুর করে। তারপর কত গান আমরা করেছি। তখন কিন্তু রেকর্ড জগতে সুরকারকে বলা হত ট্রেনার। অমুক শিল্পী অমুক সুরকারের সুরের গান রেকর্ড করেছেন এমনটা কেউ বলত না। বলত অমুকের ট্রেনিং-এ। সিনেমার গানে অভিজিৎবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ 'জীবন রহস্য' ছবিতে। ছবি না চললে গান চলে না এ কথা যে সব সময় সত্যি নয় এটা প্রমাণ করে দিয়েছিল 'জীবন রহস্য' ছবিটি। ছবিটা তেমন চলেনি। কিন্তু আমাদের চারখানি গানই সুপারহিট হয়ে গেল। যেমন আশা ভোঁসলের গাওয়া 'যদি কানে কানে কিছু বলে বঁধুয়া', এবং আর একটি গান 'ও পাখি উড়ে আয় উড়ে আয়'। আর দুটি ছিল মান্নাদার গাওয়া। একটি হচ্ছে 'পৃথিবী তাকিয়ে দেখ' অন্যটি হল 'কে তুমি শুধুই ডাকো'। এ সব গান আজও শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শোনেন।

শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ মল্লিকের কোনও গান লেখার সুযোগ আমি না পেলেও ছাত্রজীবনেই তাঁর কিছুটা সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম সেই ঝকঝকে রোভার গাড়ির মালিক এক অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলা গীতিসাহিত্যের এক বিরাট পণ্ডিত মানুষকে। একবার হাসতে হাসতে বলেছিলেন ওঁর বাসস্থান সেবক বৈদ্য স্ট্রিট দিয়ে

যেতে যেতে ওঁর গাড়ির মধ্যে বসা দুজন বিদেশি অতিথি, সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেল দেখে আর মাইকের গান শুনে ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এই যে অ্যামপ্লিফায়ারে এত জোরে রেকর্ডে গান বাজছে এটাও কি গডেস অফ লার্নিং-এর আরাধনার অঙ্গ? রেকর্ডে তখন সর্বত্র বাজছিল 'লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা'। পঙ্কজ মল্লিককে তখন দেশের মান বাঁচাতে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছিল, ইয়েস। এটা এক ধরনের হিম অর্থাৎ স্তবগান। শুনলেন তো কত পুজো প্যান্ডেলে এ গান বেজে চলেছে।

২৬

পঙ্কজ মল্লিক সম্বন্ধে একটি দারুণ গল্প শুনেছি বিশিষ্ট গায়ক বিমলভূষণের কাছে। একবার বিমলভূষণ আমাকে বলেছিলেন, একদিন কালোদা মানে অসিতবরণকে (তখন তিনি বেতারে তবলিয়ার কাজ করতেন) তিনি শিয়ালদহের সর্বজনীন দুর্গোৎসবের জলসায় বেতার কেন্দ্র থেকে সোজা নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। বিমলবাবু দেখলেন সামনে শচীন দেববর্মণ, পঙ্কজ মল্লিক এবং তারাপদ চক্রবর্তীর মতো মানুষরা বসে রয়েছেন। বিমলবাবু অনুষ্ঠান শুরু করেন বাণীকুমারের লেখা গান দিয়ে। 'তুমি হৃদয় আমার করলে সচেতন'। তারপর গাইলেন বাণীকুমারেরই রচনা 'বাঁধন দিয়ে গেলে মোহিনী মায়াডোরে'। বিমলবাবুর গান শচীন দেববর্মণের খুবই ভাল লাগল। উনি পাশে বসা পঙ্কজ মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেন, সুন্দর গায় তো। কার সুর? পঙ্কজ মল্লিক উত্তর দিলেন, রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত।

কথাটা শুনতে পেয়ে বিমলভূষণ অবাক হয়ে পঙ্কজ মল্লিককে বলেছিলেন, সেকী পঙ্কজদা। এ দুটোই তো আপনার সুর করা গান। নিজের গান নিজেই ভুলে গেছেন। উত্তরে পঙ্কজবাবু শুধু বলেছিলেন, বুঝলে বিমল এতক্ষণ এই জন্যই গান দুটো এত চেনা চেনা লাগছিল। অথচ ঠিক ধরতে পারছিলাম না।'

বাংলা গানের জগতে পঙ্কজ মল্লিকের মতো এত পণ্ডিত মানুষ বোধহয় আর আসেনি। রবীন্দ্র সাহিত্য তো ছিলই। বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়েও প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। পঙ্কজ মল্লিকের নানা কথায় এই পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়ে পড়ত। যেটুকু শুনতাম তাতেই আমি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যেতাম। আমার জানা মানুষদের মধ্যে এর পরে যাঁর নাম করতে হয় তিনি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও পঙ্কজবাবুর মতো অত বড় পণ্ডিত না হলেও ওঁর প্রায় প্রতিটি গানেই ওঁর শিক্ষা ওঁর রুচির ছাপ পাওয়া যায়। ওঁর সুরের সর্বাঙ্গে সলিল চৌধুরীর (উনি সলিল চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সহকারী ছিলেন) ছাপ প্রকট হলেও বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র ভাব আমি লক্ষ করে এসেছি। এই প্রসঙ্গে খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি সলিলদার মুম্বই-এর সহকারী কানু ঘোষের নাম করি। কানুবাবু সলিলদার সঙ্গে তখন দিনরাত ছায়ার মতো লেগে থাকলেও ওঁর সুরে কিন্তু সলিল চৌধুরীর কোনও প্রভাব নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনলদা মানে অনল চট্টোপাধ্যায় ও আমার রচিত গীতা দত্তের অনেক বাংলা গানে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাবে। বিশেষ করে তালাত মামুদের গাওয়া শ্যামল গুপ্ত রচিত 'এই তো বেশ এই নদীর তীরে বসে গান শোনা' এবং

তালাত মামুদের গাওয়া আমার লেখা 'বউ কথা কও গায় যে পাখি বউ কি কথা কয়?' এবং 'অনেক সন্ধ্যা তারা' এ দুটি গানে।

এরপর আমি আবার তালাত মামুদের জন্য কানু ঘোষের সুরে 'তুমি এস ফিরে এস' এবং 'দেখি নতুন নতুন দেশ' ইত্যাদি গানগুলো লিখতে লিখতে কানুবাবুর একান্ত নিজস্ব ভাবটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। অভিজিৎবাবু আর আমার পরের ছবি 'দুষ্টু মিষ্টি' এবং 'বালক শরৎচন্দ্র'। দুটো ছবিতেই আমার অনুরোধমতো অভিজিৎবাবু প্লে-ব্যাকে নবাগতা শিল্পী হৈমন্তী শুক্লাকে সুযোগ দেন। হৈমন্তী সে সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নেয় 'শিবঠাকুরের গলায় দোলে বৈঁচি ফলের মালিকা' গানটি দারুণ গেয়ে হিট করিয়ে দিয়ে। এর পরের উল্লেখযোগ্য ছবি 'হারায়ে খুঁজি'। তখন আমাদেব টিউনিং অর্থাৎ দু জনের মানসিক মিলন এত সুন্দর হয়ে গিয়েছিল যে আমরা দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বাণীচক্রের চারতলায় ভরদুপুর থেকে রাতদুপুর অবধি মাত্র একদিন সিটিং করে 'হারায়ে খুঁজি'-র সব কটি গান তৈরি করে ফেলেছিলাম। আমার পরের দিন বোম্বে যাবার কথা। গভীর রাতে অভিজিৎবাবু আমাকে বললেন, না, আর বাধা নেই। আপনি কাল যেতে পারেন বোম্বে।

'হারায়ে খুঁজি' ছবিতে আরতির গাওয়া 'টুং টাং পিয়ানোয় সারাটি দুপুর' এবং 'ঝনন্‌ন্ বাজে রে', অনুপ ঘোষালের গাওয়া 'ফুলে ফুলে অলি দুলে দুলে' এবং হেমন্তদার গলায় 'সে ভাবে সবুজ পাথর আমি ভাবি পান্না।' এই গানগুলো আশা করি শ্রোতারা মনে রেখেছেন। এর পরের ছবি 'সেলাম মেমসাহেব'। এ ছবিতে আমাদের টিমের দুখানা গান এখনও যত্রতত্র শোনা যায়। যেমন উষা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'শুনো সখি মোহনিয়া' এবং মান্না দের গাওয়া 'ঝর্না ঝরঝরিয়ে...'। আমরা অন্য আধুনিক গানও অনেক করেছি। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একবার পুজোয় হেমন্তদার আধুনিক গানের এল পি রেকর্ডের দুটি গান। যার টাইটেল ছিল 'নতুন সুরে নতুন গান'। গান দুটি হল 'ও যে বলতে বলতে থেমে গেল', আর 'দিন চলে যায় সবই বদলায়'। এই গানের অনুভবটিই তো আমার সারা জীবন, আমার গানের জীবনী। এরপর আমরা মিলিত হলাম অজয় বসু প্রযোজিত দীনেন গুপ্তের 'তিলোত্তমা' ছবিতে। আমি দীনেন গুপ্তের প্রচুর ছবিতে গান লিখেছি। আমি বুঝি, দীনেনবাবু কোন সিচুয়েশনে কী গান চান। উনি প্রকৃতই গানের সুর বোঝেন। অভিজিৎবাবুর সঙ্গে ওঁর প্রথম কাজ। উনি স্বাভাবিকভাবেই ওঁকে বোঝেন না জানেন না। প্রথমেই আমরা বসলাম 'গোলাপের অলি আছে' গানটির সিচুয়েশন নিয়ে। আমি এক লহমায় বুঝে নিলাম দীনেনবাবু কী গান চাইছেন। কিন্তু অভিজিৎবাবু কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। অভিজিৎবাবু বরাবরই সুরের উপর গান লিখিয়ে এসেছেন। তাই অনেক ধরনের সুর শোনাতে লাগলেন। একটাও পছন্দ হল না পরিচালক দীনেন গুপ্তের। শেষে অভিজিৎবাবুর সুবিধা হবে মনে করে লিখে ফেললাম, 'গোলাপের অলি আছে/ ফাগুনের আছে বাহার/ সকলেরই সাথী আছে/ সাথী কেউ নেই আমার/ হায়রে কেউ নেই আমার।' দীনেনবাবু শুনেই বললেন, ঠিক এই গানটাই আমি চাইছিলাম। সুর করে ফেলুন না।

অভিজিৎবাবু 'কেউ নেই আমার' কথাটা পেয়েই বোধহয় স্যাড সঙ বানিয়ে ফেলতে

লাগলেন। দীনেনবাবুর অপছন্দ হতে লাগল। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে এসে গেল দীনেনবাবু এক সময় আমায় পাশের ঘরে ডেকে বললেন, না, এঁকে দিয়ে হবে না। আর একদিন সিটিং করতে হবে অন্য মিউজিক ডিরেক্টর নিয়ে। আপনাকে খবর দেব।

আমি বললাম, আমায় ওঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে একটু সময় দিন। উনি একটু গোঁড়া মানসিকতার মানুষ। যেটা করে ফেলেন কিছুতেই বদলাতে পারেন না। আটকে থাকেন সেখানে। এ মানসিকতা বাণিজ্যিক গানের জগতে একদিকে যেমন খুব ভাল অন্যদিকে আবার খুব খারাপ। বিশেষ করে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে সমন্বয়টাই সার্থকতার মাপকাঠি। অনেক কিছু মিললে-মিশলে তবেই এখানে সাফল্য লাভ করা যায়। অভিজিৎবাবুকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, ক্লাব ঘরের আড্ডায় নায়ক গান গাইছে। গানের ভাষায় সে বন্ধুকে রসিকতা করে বলছে রাম তোর বান্ধবী আছে, শ্যাম তোরও বান্ধবী আছে...যদু, তুই শালা বেঁটে বামুন তোরও বান্ধবী আছে—মধু, তুই শালা, কানা শুদ্দুর, তোরও বান্ধবী আছে, হরি, তুই শালা হ্যাংলা রোগা—তোরও বান্ধবী জুটেছে। আর আমার? একলা আমার বেলাতেই টুঁ টুঁ কোম্পানি? কেউ নেই কিছু নেই? চিত্রনাট্যে এ সবের উল্লেখ না থাকলেও সিনটা ভেবে ঠিক এই অ্যাঙ্গেলে আমি গানটা লিখেছি। এই অ্যাপ্রোচটা মাথায় রেখে আপনি সুরটা বানিয়ে ফেলুন।

কথাটা শোনামাত্র অভিজিৎবাবুর সুগৌর মুখমণ্ডলে দেখতে পেলাম সলজ্জ হাসির উচ্ছ্বাস। উনি তৎক্ষণাৎ হারমোনিয়াম নিয়ে আবার বসলেন। মান্নাদার কণ্ঠে সুপারহিট হয়ে গেল 'গোলাপের অলি আছে'। 'তিলোত্তমা'-তে আমাদের প্রতিটি গানই দারুণ জমেছিল। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মান্নাদা আর অরুন্ধতীর গাওয়া 'রং শুধু দিয়েই গেলে'। অরুন্ধতীর গাওয়া 'খুব কি মন্দ হত...' এবং আরতির গাওয়া 'আমায় তোমার মতোই পাষাণ করে গড়'। শেষের দুটো গানই আমার অনুরোধমতো লেখার ওপর সুর করেছিলেন অভিজিৎবাবু। আরতির গাওয়া গানটির বাণী খুব পছন্দ হল। অনেক নাড়াচাড়া করেও কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলেন না। হঠাৎ বলে উঠলেন, শুনুন তো। হেমন্তদার গাওয়া আর সুর করা আপনার লেখা 'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না' গানটির স্টাইলে সুর করলে কেমন হয়? আমি শুনলাম। খুব ভাল লাগল। পরিচালক প্রযোজক সবাই শুনলেন। সবারই ভাল লাগল।

অভিজিৎবাবুর বলা ওই যে আমার লেখা হেমন্তদার 'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না' স্টাইলের সুর ওই কথাটা নিয়ে আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে খুব আন্তরিকভাবে হাসি-ঠাট্টা হত। সেই হাসি ঠাট্টার ছলে ওঁকে একদিন বলেছিলাম অনুপম ঘটকের সুর হীরেন বসুর রচনা 'প্রিয়ার প্রেমের লিপি লেখনী ভরে'—এই স্টাইলেই তো আপনার সুরে শ্যামল মিত্রের 'হংস পাখা দিয়ে' গানটির জন্ম। 'আনন্দ' ছবিতে সলিলদার সুরে মান্নাদার গাওয়া 'জিন্দেগী এই সা পহেলি' এই স্টাইলেই তো আমাকে দিয়ে মান্নাদার জন্য লেখালেন 'পৃথিবী তাকিয়ে দেখ/ আমরা দুজনে কত সুখী।' আবার মান্নাদার সুরে আমার লেখা 'রামধাক্কা' ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'দেখনা আমায় ওগো আয়না' গানটির স্টাইলেই তো গান বানিয়ে আপনি নির্মলা মিশ্রকে দিয়ে গাইয়েছেন 'বলতো আরশি আমার মুখটি দেখে'।

বিরাট মনের মানুষ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার এবকম ঠাট্টা মেশানো কথায় এতটুকু বিরক্তি বা আপত্তি প্রকাশ করেননি। আমার ধারণা অধিকাংশ সুর শিল্পীরা করতেন একমাত্র কালীপদ সেন ছাড়া। কালীদা প্রযোজক পরিচালককে জোর গলায় হাসতে হাসতে সবার সামনেই বলতেন, আপনারা কেউই বুঝতে পারলেন না আমি এ সুরটা কোনখান থেকে কার স্টাইল থেকে নিয়েছি। স্টাইল অর্থ অবশ্যই নকল করা নয়, অনুকরণ করা নয়। শুধুমাত্র অনুসরণ। সেজন্যই আমার উক্তি শুনে অভিজিৎবাবু আমাকে বলেছিলেন, আমি অনুজ হয়ে অগ্রজদের দেখানো পথেই এগিয়ে এসেছি। এটাই তো চলমান জীবনের ধর্ম। আপনার শুধু কান নয় প্রাণ আছে। আপনি ছাড়া একথা কেউই বলেননি। আজ থেকে আপনার ওপর আমার বিশ্বাসের মাত্রা আরও বেশি বাড়ল।

২৭

অভিজিৎবাবুর ব্যাপারে আশ্চর্যের ঘটনা হল অভিজিৎবাবুর সমকালীন অনেক সুরকারদের কপালে কত সংবর্ধনা জুটেছে। অথচ অভিজিৎবাবুর ভাগ্যে আজ পর্যন্ত কিছুই জোটেনি। যাই হোক অভিজিৎবাবু আর আমার জুটির আরও একটি ভাল কাজ পরিচালক অমল দত্তের 'সন্ধি'। এ ছবিতে অনেক গান ছিল। প্রতিটি গানই ভাল হয়েছিল। বিশেষ উল্লেখ্য তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৈমন্তী শুক্লার 'বাবা বুড়ো শিবের চরণে...'। মান্নাদার 'কাণ্ডারী গো পার কর' এরকম আরও অনেক গান। কিন্তু এই ছবিতেই একটি গান নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধল। এবার সেই গণ্ডগোলের ঘটনাটা বলি।

ছবিটির ছ' নম্বর গানটি পিন্টু ভট্টাচার্যকে দিয়ে গাওয়ানো হবে এমন একটা অনুরোধ প্রযোজকদের তরফ থেকে করা হয়েছিল। আমরা আমাদের মনের মতো করে ছ' নম্বর গানটি বানালাম। নির্দিষ্ট দিনে অভিজিৎবাবু গান শোনাতে লাগলেন প্রযোজক-পরিচালককে। ওঁরা পর পর পাঁচখানি গান আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু ছ' নম্বর গানটি শুনে সরাসরি বললেন আমাদের পছন্দ হচ্ছে না। অন্য গান তৈরি করুন।

অভিজিৎবাবু কিন্তু কিছুতেই গান বদলাতে রাজি হলেন না। শেষে আমি ওঁদের বললাম, একটু সময় দিন। নতুন গান তৈরি করে খবর দেব।

ওঁরা চলে গেলেন।

অভিজিৎবাবুকে শান্ত করে বোঝালাম, ওঁরা আমাদের অতগুলো গানের প্রশংসা করলেন। মাত্র একটি গান বাদ দিয়ে। নিশ্চয়ই আমাদের কোনও খামতি আছে। যে খামতিটা আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু ওঁরা পারছেন। ওঁরা বুঝতে পারছেন কিন্তু বোঝাতে পারছেন না। আসুন আর একটা গান বানাই।

বাণীচক্রের যে ঘরে ওঁরা গান শুনতে এসেছিলেন ওখানেই লিখলাম 'আসা যাওয়ার পথের ধারে/ সুখের সাথে ভাব হল যে/ দুখের সাথে জানাশোনা হল/ আমাকে তোমরা সবাই/ পথের পথিক বোলো।' এ গান যে শুনল তারই ভাল লাগল। পিন্টুর গলায় এ গানটিও হিট হয়ে গেল। এরপর আমরা করেছিলাম 'পূজারিণী' এবং আরও কয়েকটি

ভাল গানের ছবি।

এখন একটু অন্য কথায় যাই। গানের সার্থকতার যদি পরিসংখ্যান নেওয়া যায় তা হলে সহজেই বোধগম্য হয় এক একটি বিশেষ জুটিতে যতটা সাফল্য লাভ হয়েছে, অন্য নতুন জুটিতে চট করে ততখানি সার্থকতা পাওয়া যায়নি। যেমন আজকের দিনেও নাদিম-শ্রাবণ ও সমীর জুটি বা আনন্দ-মিলিন্দ ও সমীর জুটি। সমীর ওঁদের ছাড়া অন্য কোনও সুরকারের গান লিখে ততখানি সার্থকতা দেখাতে পারেননি। ঠিক তেমনি নাদিম-শ্রাবণ এবং আনন্দ-মিলিন্দও ততখানি সার্থকতা দেখাতে পারেননি অন্য গীতিকারের গান নিয়ে। এই যে কম্বিনেশন একে 'টিম ওয়ার্ক'ই বলুন বা ভাগ্যই বলুন এটা কিন্তু স্বীকৃত সত্য। কেন জানি না অভিজিৎবাবু ক্রমশ আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। আমার বলা উচিত নয় তবু বলছি, কিশোরকুমার গলা দিলেই যখন বাংলা গান হিট হচ্ছে। তখন অভিজিৎবাবু কিশোরদাকে দিয়ে গাইয়েও 'মৌনমুখর' ছবির একটা গানও হিট করাতে পারেননি। অথচ আর ডি বর্মণ, বাপি লাহিড়ির কথা নয় ছেড়েই দিলাম। কলকাতার সব সুরকারের সুরেই কিশোরদার গান তখন সুপারহিট। যেমন শ্যামল মিত্র, বীরেশ্বর সরকার, অজয় দাশ, মৃণাল ব্যানার্জি, কানু ভট্টাচার্য, গৌতম বসু সকলেরই সুরে গান হিট শুধু ওঁর ছাড়া।

এরপর অভিজিৎবাবুর মতো প্রতিভাবান সুরশিল্পী কী এক অজ্ঞাত কারণে বাণিজ্যিক গানের জগৎ থেকে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন। কিন্তু আমি জানি, বিশ্বাস করি আবার অচিরেই তিনি বাংলা গানের জগতে ফিরে আসবেন। আমি সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষায় আছি।

গানের জগতে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পদক্ষেপ গোপেন মল্লিকের সুরে 'বলো ভুলেছো কি মোরে ভুলেছো' আধুনিক গানটি গেয়ে। তবুও কণ্ঠশিল্পী সতীনাথের ধ্যান-জ্ঞান ছিল সুরশিল্পী হওয়ার। সবাই জানেন পরবর্তীকালে সতীনাথ সুরশিল্পী ও কণ্ঠশিল্পী দুটোতেই সমান সাফল্য লাভ করেছিলেন। সতীনাথের প্রসঙ্গে পরে আসছি। এখন এই দ্বিমুখী ব্যাপারটায় আসি। এ ব্যাপারটা সাধারণত কলকাতার অনেক শিল্পীর মধ্যেই দেখেছি। কিন্তু মুম্বই-তে তেমন নয়। মুম্বই-তে হেমন্তকুমার ছাড়া কেউই পুরোপুরি এ কাজটা করেননি। এস ডি বর্মণ ও আর ডি বর্মণ, সি রামচন্দ্র, বাপি লাহিড়ি, অনু মালিক এরকম গাইতে জানা সুরকাররা কদাচিৎ সুর ও গান একসঙ্গে করেছেন। হেমন্তদা ছাড়া মুম্বই-এর এই সব সুরকাররা কেউই কিন্তু অন্যের সুরে একটাও গান গাননি। হেমন্তদাই সৌভাগ্যবান বা এক অর্থে স্বতন্ত্র যিনি এই ধরনের দ্বিমুখী কাজ করেছেন। অন্যের সুরে গেয়েছেন এবং নিয়মিত সংগীত পরিচালনাও করেছেন।

কে. এল. সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার এবং প্রথম দিকে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত এবং আধুনিক গানে সমানভাবে সার্থক। কিন্তু আবার অনেক আধুনিক গায়কই রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গিয়ে সফল হননি। আবার সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের মতো রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা আধুনিক গানের ক্ষেত্রে তেমন জনপ্রিয় হননি। তবুও সুচিত্রাদির গাওয়া সলিল চৌধুরীর 'সেই মেয়ে', রেকর্ডটি চলেছিল। কিন্তু কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় আধুনিক গান তাঁর শ্রোতারা শুনতে পান

না। কণিকাদি অল্প বয়সে একবার সম্ভবত নীহারবিন্দু সেনের, দুটি গানের একটি রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা চলেনি। উনি যখন রবীন্দ্রসংগীতের এক অন্যতমা শিল্পী হয়ে গেছেন সেই উজ্জ্বল সময়ে এইচ. এম. ভি.-তে পি কে সেনের আমলেই মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে শ্যামল গুপ্তের কথায় কণিকাদি একটি বাংলা আধুনিক গানের রেকর্ড করেন। রেকর্ডের স্যাম্পেল কপি বিভাগীয় কর্তারা সানন্দে অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের তৎকালীন এক বিরাট কর্তা। কণিকাদি অর্থাৎ মোহরদি নিজে আমায় বলেছেন ওই অধিকর্তা ওঁকে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মোহর, বেছে নাও তুমি কোন দিকে যাবে। তোমার দু নৌকোয় পা দেওয়া আমরা বরদাস্ত করব না। মোহরদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমায় বলেছিলেন, সাধ ইচ্ছে কার না থাকে। আমারও ইচ্ছে ছিল তোমাদের ওদিকটায় যোগ দেবার। এতে সাফল্য পাই বা না পাই সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তৎকালীন শান্তিনিকেতনের ওই কর্তার কথায় আমি আধুনিক গান রেকর্ড করেও সে গান কাউকে শোনাতে পারলাম না। কেউ জানতে পারল না আমি আধুনিক গান গাইতে পারি কি পারি না। এমন ঘটনা বোধহয় আমার জীবনেই ঘটল।

এই সেদিন কথাটা শুনতে শুনতে আজকের কণিকাদির পুরু কাচের চশমা পরা চোখের আড়ালেও দেখতে পেলাম চিক চিক অশ্রু লেখা।

যাক এবার আবার সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায় ফিরে আসি। বিখ্যাত প্রযোজক সরোজ মুখার্জির 'মর্যাদা' ছবিতে (এই ছবিতে উত্তমকুমার 'অরূপকুমার' নামে অভিনয় করেছিলেন।) সংগীত পরিচালক রামচন্দ্র পাল একজন সহকারী সুরশিল্পীর খোঁজ করেছিলেন। তার কাছে সহকারী সুরকার হিসাবে কাজ করার জন্য চুঁচুড়া থেকে সতীনাথকে নিয়ে এলেন গীতিকার শ্যামল গুপ্ত। তখনকার গানের জগতে এখনকার মতো সরাসরি ফ্রিল্যান্স মিউজিক ডিরেক্টর কেউই হতে পারত না। এবং আজকের মতো ফিন্যান্স আনতে পারলেই সরাসরি চিত্র পরিচালকও হওয়া যেত না। প্রত্যেককে বেশ কিছু দিন সহকারী হয়ে কাজ শিখে যোগ্যতা অর্জন করতে হত। 'মর্যাদা' ছবিতে আমার লেখা একটি গান আমাদের সকলের অনুরোধেই রামচন্দ্র পাল সতীনাথকে দিয়ে গাইয়ে ছিলেন। এটাই সতীনাথের প্রথম প্লে-ব্যাক। রামবাবুর পরবর্তী ছবি বোম্বের সুলোচনা চ্যাটার্জি ও প্রদীপকুমার অভিনীত বাংলা 'অপবাদ'। আগেই বলেছি এই ছবিতে প্রথম আমার গান প্লে-ব্যাক করেন হেমন্তদা। এই ছবিতেও সহকারী সংগীত পরিচালক ছিলেন সতীনাথ। এর পরেই প্রযোজক সরোজ মুখার্জির সঙ্গে মতান্তর হতে থাকে সংগীত পরিচালক রামচন্দ্র পালের। সরোজদা সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে প্রথম ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালনা করার সুযোগ দেন তাঁর পরবর্তী ছবি 'অনুরাগ'-এ। অপূর্ব সুর করেছিলেন সতীনাথ। ইহুদি মেয়ে রমলাদেবী ছিলেন এ ছবির নায়িকা। চমৎকার অভিব্যক্তি দিয়ে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানগুলো চিত্রায়িত করেছিলেন রমলাদেবী। তবে নায়কের ঠোঁটে কিন্তু সতীনাথ গাননি। গেয়েছিলেন তখনকার জনপ্রিয় গায়ক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটির কথা লিখেছিলাম 'অভিমানী গেলে চলে/ বুক ভরা অভিমানে/ আমার শুরুর পালা/ সারা হল অবসানে।'

ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে ওই প্রোডাকসনের অফিসঘরে সতীনাথকে গানটি দিয়েছিলাম। গান নিয়ে চলে গেলেন সতীনাথ। উনি তখন চুঁচুড়া ছেড়ে চলে এসেছেন কালীঘাটে। একটা মেসে বোধহয় চারজন বোর্ডারের সঙ্গে একটা ঘরে থাকতেন। বাকি সবাই অফিসে চাকুরি করেন। সারাদিনই ঘরটা খালি থাকত। সতীনাথ তক্তপোশের তলায় রাখা ছোট একটা হারমোনিয়াম বার করে বিছানায় রেখে আমাকে শোনালেন গানটির সুর। মুগ্ধ হয়ে গেলাম শুনে। বললাম দুর্দান্ত হয়েছে। সতীনাথ তখনই মেসবাড়ির কাজের লোককে ডেকে বললেন, এই বাবুর আমার সুর পছন্দ হয়েছে রে। যা যা এখনই বাবুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে লক্ষ্মীর দোকান থেকে চারটে খুচরো গোল্ডফ্লেক সিগারেট আমার নাম করে নিয়ে আয়। দেখিস যেন ড্যাম্প না লেগে থাকে।

কিন্তু এই গান খুব কম লোকই শুনল। কারণ 'অনুরাগ' ছবিটি দর্শক নেয়নি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

এর পরে এল সতীনাথের জীবনের সেই সন্ধিক্ষণ। সেবার কলকাতাতেই রাজ্যপালের একটা সাহায্য তহবিলের জন্য সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যখন লতা মঙ্গেশকরের গানের অনুষ্ঠানের পর স্থানীয় কোনও নামী শিল্পীই গান শোনাতে সাহস করছিল না তখনই উৎপলা সেনের আন্তরিক প্রেরণায় প্রায় অনামী কণ্ঠশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় নির্ভয়ে মঞ্চে এসে মাইকের সামনে বসলেন। সিনেমার তথাকথিত গানের সিচুয়েশনের মতো সেদিনের অনুষ্ঠানেই রাতারাতি সতীনাথ হয়ে উঠলেন অনন্য কণ্ঠশিল্পী। পেয়ে গেল অনন্ত আত্মবিশ্বাস। আর আরও প্রাণের কাছে পেয়ে গেলেন অনুপ্রেরণাদাত্রী উৎপলা সেনকে।

সারা ভারতবর্ষের গানের জগতের যদি পরিসংখ্যান নেওয়া যায় তবে বোধহয় সহজেই প্রমাণিত হবে, যে পুরুষ শিল্পী তার প্রথম পরিণয়ে গ্রহণ করেছেন অন্যপূর্বাকে। সেই শিল্পী আজীবন রয়ে গেছেন পুরোপুরি 'সিঙ্গল উওম্যান ম্যান।' এমন কিছু উদাহরণ, কিছু নজির হাতের কাছেই আছে। যেমন জগজিৎ সিং, যিনি স্ত্রী ছাড়া জীবনে বোধহয় অন্য নারীর মুখটাও ভাল করে দর্শন করেননি। সতীনাথ কিন্তু এ ব্যাপারে আরও বিরাট আরও বিশাল দৃষ্টান্ত। এবং আরও বিরাট উদাহরণ দিকপাল শিল্পী মান্না দে।

সিনেমার পর্দায় যেমন উত্তম-সুচিত্রা পাশাপাশি উচ্চারিত হয় তেমনি গানের জগতের বাস্তব জীবনেও পাশাপাশি উচ্চারিত দুটি নাম সতীনাথ-উৎপলা। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সতীনাথের এই দিকটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে লতা মঙ্গেশকরের প্রথম সুপারহিট আধুনিক বাংলা গান 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে' এবং সুপ্রীতি ঘোষের 'যেথায় গেলে হারায় সবাই' ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নভরা অন্ধকারে'-তে সুর সংযোজনা করার পরেই বলে দিলেন সতীনাথ, উৎপলা সেন ছাড়া অন্য কোনও মহিলা শিল্পীর গানে সতীনাথ আর সুর করবে না। সত্যি এ একটা অভিনব ব্যাপার। এবং এই নিয়েই এইচ. এম. ভি.-র সঙ্গে ওঁর প্রথম মন কষাকষির শুরু।

তখন সতীনাথের সুরে আমি নিয়মিত গান লিখতাম বেতারে পরিবেশনের জন্য। সতীনাথ নিজে এবং ওঁর প্রিয় বহু ছাত্ররা ও বহু নামী পুরুষ কণ্ঠশিল্পীরা সে সব গান নিয়মিত বেতারে পরিবেশন করত। মহিলা কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে সে সব গান গাইতেন

শুধুমাত্র একজন। তিনি উৎপলা সেন। রেডিয়োর জন্য বানানো সে সব গানগুলো থেকেই পরে বাছাই করা হত রেকর্ডের জন্য গান। এবং ওই বাছাই করা গানগুলি কেবল রেকর্ড হত। রেডিয়োকে ভীষণ ভালবাসতেন সতীনাথ। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে হাসতে হাসতে উত্তর করতেন, চিন্ময় লাহিড়ীর ছাত্র হয়েও পাঁচবার রেডিয়োর অডিশনে ফেল করে তারপর পাশ করে আমি রেডিয়োতে ঢুকেছি। একদম এর শেষ দেখে যাবরে।

সতীনাথের সুরে এবং কণ্ঠে আমার লেখা প্রথম আধুনিক গান 'কারে আমি এ ব্যথা জানাবো।' এই গানটির কথা আগেই বলেছি। ইংরাজি সেভেন এইট বিটে অর্থাৎ তেওড়া তালে চমৎকার সুর করেছিলেন সতীনাথ। গানটি প্রকাশিত হয়েই তখনকার এইচ. এম. ভি.-র ভয়েস পত্রিকায় টপ সেলার হিসাবে উল্লেখিত হল। তারপর আমাদের কত গান যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা বলে শেষ করতে পারব না। তার মধ্যে আমার নিজের প্রিয় কিছু গান উল্লেখ করছি। যেমন 'আজ মনে হয় এই নিরালায়' দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'তুমি এলে কি আমার ঘরে' এবং 'যেদিন তোমায় আমি দেখেছি'। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'এত যে শোনাই গান তবু মনে হয়।' এ ছাড়া আমার বিশেষ পছন্দের গান সতীনাথেরই নিজের সুরে গাওয়া 'দুটি জলে ভেজা চোখ', 'যশের কাঙাল নইতো আমি' এবং 'যদি সহেলী আমায় কানে কানে কিছু বলে'। 'এমন অনেক কথাই বলো তুমি/ মন থেকে যা বলো না।' এরকম আরও প্রচুর গানের কথা আমার মনে পড়ছে!

২৮

'অনুরাগ' ছবির পর সতীনাথ 'ভাগ্য চক্র' ছবিতে সুর দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোনও ছবিতে সুর দিয়েছিলেন কি না সে কথা মনে আসছে না। খুব কম ছবিতেই প্লে-ব্যাক করেছিলেন সতীনাথ। প্রায় অখিলবন্ধু ঘোষের মতো সতীনাথও কিন্তু সারা জীবন নন-ফিল্মি গান শুনিয়েই শেষ দিন পর্যন্ত জনপ্রিয়তার শিখরে কাটিয়ে গেলেন যথেষ্ট গৌরব এবং মর্যাদার সঙ্গে।

আগেই বলেছি, সতীনাথ-উৎপলা প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারিত এই দুটি নামের কথা। এবার একটা নগ্ন সত্যকে জনসমক্ষে উন্মোচন করছি বন্ধু সতীনাথের ভালবাসার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে। প্রত্যেক শিল্পীরই ওঠা-নামার সময় থাকে। দু-একজন ছাড়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেউই সমান জনপ্রিয় থাকতে পারেননি। বহু শিল্পীর জীবনে এটা বাস্তব সত্য। এই সত্যকে না মেনে উপায় নেই। উৎপলা সেনেরও এক সময় রেকর্ডের বিক্রি ক্রমশ কমে এল। সেই কারণেই এইচ. এম. ভি. উৎপলা সেনের রেকর্ড আর করতে চাইলেন না। সতীনাথ ওঁদের অনেক বোঝালেন। কিন্তু ওঁরা কিছুতেই রাজি হলেন না। সতীনাথকে ওঁরা বললেন, আপনার বিক্রি দারুণ। আপনি রেকর্ড করে যান। আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের প্রতিষ্ঠানে থেকে আপনি পর পর রেকর্ড করুন।

এই কথা শুনেই দপ্ করে জ্বলে উঠল সতীনাথের ভালবাসার আগুন। সতীনাথ

বললেন, না, এইচ. এম. ভি. ছাড়লে শুধু উৎপলা নয় আমিও ছাড়ব। সেদিন এক কথায় শুধু ভালবাসার খাতিরে তখনকার এইচ. এম. ভি.-র মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান থেকে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এলেন সতীনাথ। দুজনে একসঙ্গে যোগদান করলেন মেগাফোন কোম্পানিতে। এ ধরনের নিখাদ ভালবাসা কোনও শিল্পীর মধ্যে আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি।

ঘটনাটা যখন আমার কানে এল, চোখের ওপর ভেসে উঠল সতীনাথের মুখটা। সেই মুখের ওপর সিনেমার মতো ওভারল্যাপ করতে লাগল সতীনাথেরই সুরে উৎপলা সেনের গাওয়া আমার রচিত একটি গান। 'গানে গানে কতবার এই কথা কয়েছি/ আমরা দুজনে শুধু দুজনার/ এই গান শুনে ওরা দিয়ে গেছে অপবাদ/ হাসিমুখে তাই আমি সয়েছি।'

উৎপলাদি কিন্তু আমার কাছে এক স্বতন্ত্র সত্তা। সারা সকাল এখানে ওখানে ঘুরে দুপুরে ওঁর কেয়াতলার বাড়িতে অথবা পরবর্তীকালে সাউথ এন্ড পার্কের বাড়িতে যখনই হাজির হয়েছি তখনই বলেছি, চা দিন। একান্ত মমতাময়ীর মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, পুলক, তোমার খাওয়া হয়েছে? ধরা পড়ে গেছি উৎপলাদির কাছে। পরম পরিতৃপ্তিতে খেয়েছি ওঁর রান্না কতদিন কত বার। বিকেলের দিকে হঠাৎ বলেছেন, চলো, তোমার গাড়িতে একটু ঘুরে আসি। সতীনাথের গাড়িতে তো রোজই চাপছি।

কপট চোখে সতীনাথের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, সতীনাথ তুমি থাকো। আমরা ঘুরে আসছি। সতীনাথ হাসিমুখে বলেছেন, বেশ তো। বিকেলে লেকের ধার দিয়ে ঘুরেছি বোধহয় পাঁচ বা ছ' মিনিট। তার মধ্যে দুবার আমায় ধমকেছেন ও মেয়েটার দিকে অমন করে তাকিয়ো না। সোজা গাড়ি চালাও। অ্যাকসিডেন্ট করবে। আবার আর একটি মেয়ের বেলায় বলেছেন, ধুস, ও তো বুড়ি। ওভাবে দেখলে কেন? তারপরই বলে উঠেছেন, চলো সতীনাথ বোধহয় আমাদের চা তৈরি করে ফেলেছে। আর দেরি করলে জুড়িয়ে যাবে। এমনই ছিল আমাদের দিন। এই উৎপলাদিই কিন্তু বদলে যেতেন যখন সতীনাথ আর উৎপলার জন্য পুজোর গান লিখতাম।

কিছু না ভেবেই কীসের তাগিদে কী কারণে জানি না প্রতিবারই প্রথমে লিখতাম সতীনাথের গান। দুটো গান যখন তৈরি হয়ে যেত স্বাভাবিকভাবেই আমরা খানিকটা ভরসা খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে হঠাৎ উপস্থিত কোনও কোনও স্বজনবন্ধুকে শোনাতাম। তারিফ করতেন ওঁরা। অনেক কমে আসত উদ্বেগ। তারপর বসতাম উৎপলাদির গান নিয়ে। মনের মতো দারুণ একটা গান লিখলাম। চমৎকার সুর করলেন সতীনাথ। গানের ঘরে কেউ যদি ঢুকত শুনে ভাল বলতে বাধ্য হত। কিন্তু যাঁর গান তাঁর মতামত নিতে গিয়ে সবিস্ময়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতাম তিনি গানের ঘরে নেই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সতীনাথের মুখের দিকে চাইতেই উনি ইশারা করে বুঝিয়ে দিতেন ছাদে আছে। যেতাম ছাদে। দেখতাম লেকের হাওয়ায় চুল উড়িয়ে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে আছেন শিল্পী। অস্ফুট স্বরে বলতে হত, কী হল।

হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতেন তিনি। বলতেন, তোমাদের সবাইকে আমি জানি। তোমরা দারুণ ভাল লেখ সবাই সতীনাথের গান। আমার গানে

একটুও নজর দাও না। এইমাত্র সতীনাথের যে গানটা তুমি লিখলে এক কথায় অপূর্ব। কিন্তু আমি জানি আমার গান অত ভাল তুমি লিখবে না।

আমি বলতাম, কী আজেবাজে বলছেন, নীচে চলুন। গান শুনুন। তারপর তো বলবেন? 'এক হাতে মোর পূজার থালা', 'বনফুল জাগে পথের ধারে', 'দূরে গেলে মনে রবে না জানি', 'হরিনাম লিখে নিয়ো অঙ্গে'—এই রকম অজস্র সুপারহিট গানের গায়িকা উৎপলাদির চোখের জল মোছাতাম তাঁরই আঁচল দিয়ে। হঠাৎ দু চোখের কোনায় আগুন জ্বলে উঠত উৎপলাদির। বলে উঠতেন, সতীনাথ আমার স্বামী হতে পারে। আমি ওকে বা ও আমাকে প্রাণ ভরে ভালবাসতে পারে। কিন্তু কমার্শিয়াল জগতে থেকে আমি কিছুতেই চাইব না কেউ আমার থেকে ভাল গান গেয়ে যাক। কারও গান আমার থেকে ভাল হোক এটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। এ ব্যাপারে আমি প্রচণ্ড স্বার্থপর। আমি আমার একান্ত আপন সতীনাথকেই সহ্য করব না। তোমরা, সতীনাথের বন্ধুরা আমার নামে যা খুশি বলতে পার। আমি পরোয়া করি না।

অকপটে সত্য কথা বলা, এক অদ্ভুত শিল্পীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার আর কিছু করার থাকত না। বোধহয় সেই কারণেই প্রত্যেকবারই যে গানই লিখি না কেন সতীনাথ বা অন্য সবার দারুণ পছন্দ হলেও ওঁর কিছুতেই পছন্দ হত না। যতদূর মনে পড়ছে দুবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। একবার এইচ. এম. ভি.-তে যখন লিখেছিলাম 'আজ থেকে সেই অনেক দিনের পরে/ এমনি করে বকুল যদি ঝরে/ সেদিন তুমি থাকবে তো/ আমায় মনে রাখবে তো?'

উৎপলাদি গান শেষ হতে আমাকে এলিট সিনেমায় নিয়ে গিয়ে সিনেমা দেখিয়েছিলেন।

সতীনাথ দারুণ গ্রীষ্মকালে এয়ারকন্ডিশনের ভয়ে গরম শাল জড়িয়ে সিনেমায় ঢুকেছিলেন।

আর একবার মেগাফোনে সুধীন দাশগুপ্তের সুরে যখন লিখেছিলাম 'ছোট্ট একটা দুষ্টু মেয়ে নামটি সোনালি'। গানটা শুনেই বলেছিলেন, চলো, আজ পার্ক স্ট্রিটে ডিনার খেতে যাব। ফোন করে তোমার পতিব্রতা সুন্দরী বউকে বলে দাও বাড়িতে খাবে না।

প্রায়ই সতীনাথ ওঁর পছন্দ হবে না মনে করে ওঁর পুজোর গান তৈরি করতে চাইত না। একবার পুজোয় বরং ওঁরই সুরে সতীনাথ গেয়েছিলেন আমার গান 'শুধু তোমার জন্যে ওই অরণ্যে পলাশ হয়েছে লাল'।

অনেকবারই সতীনাথ নিজের সুরে নিজের গান বানিয়ে উৎপলাদির গানের জন্য অনুরোধ করতেন অন্য সুরকারদের। তাই মান্না দের সুরে লিখেছিলাম 'আমি ভুল তো করিনি ভালবেসে/ ভুল যে করেছি ভালবাসা আশা করে।'

শ্যামল মিত্রের সুরে লিখেছিলাম 'মেঘ এসেছে আকাশে।' হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে লিখেছিলাম, 'এ আমার কি যে হল।'

সতীনাথের সুরে আমার লেখা এবং উৎপলাদির গাওয়া গানের মধ্যে সব থেকে প্রিয় গান আমার 'তুমি কত সহজেই ভুলে গিয়েছো আমায়।'

সার্থক সুরশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় বাধ্য হয়ে একবার নচিকেতা ঘোষকে অনুরোধ

করেছিলেন দুজনারই গান তৈরি করতে। সেবার সতীনাথের জন্য নচিবাবুর সুরে লিখেছিলাম 'সূর্যমুখী আর সূর্য দেখবে না' এবং 'কিছু কালিই না হয় লাগল গালে/ ব্যস্ত হাতে কাজল চোখে পরাতে/ নতুন ক্ষতি কি হবে আর কলঙ্কিনীর বরাতে?'

উৎপলাদির জন্য লিখেছিলাম 'কিংশুক ফুল হিংসুক ভারি'। আর একবার উৎপলাদির জন্য অলকনাথ দে-র সুরে লিখেছিলাম, 'পাখিদের এই পাঠশালাতে'। আজ সতীনাথ নেই। উৎপলা একা—দারুণ একা। যতই জোর করে মুখে হাসি এনে কথাবার্তা বলুন। কিন্তু আমি জানি, এই নিঃসঙ্গতা আকাশের মতো অনন্ত—অসীম।

কিশোরকুমার, কুমার শানু, বাপি লাহিড়ি, সুধীন দাশগুপ্ত এবং বিশেষ করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে শেষের যে দুটি স্তম্ভের উপর আমার গীতিকার জীবনের প্রতিষ্ঠা তাঁদের কথা পরে বলব। কিন্তু এখনও বলিনি তাঁদের কথা, যাঁরা না থাকলে আমি হয়তো গান লেখার উদ্দীপনা বা উৎসাহই পেতাম না। আমার স্মৃতিতে তাঁরা এখনও উজ্জ্বল। এঁদের মধ্যে একজন উমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। যাঁর কাছে প্রায় নিয়মিতই গান শিখতেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। আর একজন উমাশঙ্করবাবুর ছাত্র হিমাংশুশেখর ঘোষ। আমার ভাইঝি পরবর্তীকালে কমল দাশগুপ্তের সুরে ও প্রণব রায়ের কথায় এইচ. এম. ভি.-র গায়িকা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (মুখোপাধ্যায়) গান শেখাতে আসতেন ওঁরা দুজনেই। স্কুলের ক্লাশ। নাইনে পড়া তথাকথিত ডেঁপো ও পাকা ছেলে আমি ভয়ে ভয়ে উমাশঙ্করবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমার লেখা একটি আধুনিক গান—'জীবন নদীর মাঝখানে জাগে, ভাললাগা বালুচর/ ভুলবোঝা এক জোয়ারের টানে/ মুছে যায় তারপর।'

উমাশঙ্করবাবু বিরক্তি প্রকাশ করে গানটি গ্রহণ করলেন। পড়লেন। বললেন, লিখেছ তো ভালই। পরশু ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমার একটা অনুষ্ঠান আছে। গাইব এটা। তুমি এসো। গান লেখার প্রচণ্ড উৎসাহদাতা আমার পাড়ার আবাল্য সুহৃদ, অধুনা নামী ডাক্তার শৈলেন চট্টোপাধ্যায়কে পর্যন্ত বলিনি ব্যাপারটা। গাইবেন বলে যদি উনি না গান। তাই একাই গেলাম অনুষ্ঠান শুনতে। উমাশঙ্করবাবু গাইলেন আমার গান। গীতিকারের নাম বলেননি। কেউই জানলেন না এ গান কার লেখা। কিন্তু আমি তো জানলাম। শিরায় শিরায় সে কী উদ্দীপনা। হৃৎপিণ্ডে সে কী ধ্বনি, উল্লাস। চোখের চেনা বহু দেখা প্রেক্ষাগৃহটা মনে হতে থাকল বিরাট এক আনন্দের সমুদ্র। উত্তাল তার তরঙ্গ। শুধু ঢেউ আর ঢেউ। আমি যেন তার মাঝে ডুবে গেলাম।

এ গানটা শুনেছিলেন হিমাংশুবাবু। তিনি আমায় প্রেরণা দিতে লাগলেন। বন্ধু শৈলেন আর হিমাংশুবাবুর তাগাদায় ওই স্কুলের ছাত্রজীবনেই তৈরি হয়ে গেল একটা গানের সংকলন। হিমাংশুবাবুর সুর স্বরলিপিতে সেই বইটির নাম হল আধুনিকা। যদিও এর একটি গানও রেকর্ড হয়নি। কিন্তু বেতারে প্রায় সব কটি গানই পরিবেশিত হয়েছিল। গাইত আমাদেরই এক বন্ধু পরবর্তীকালে বিখ্যাত শিল্পী সনৎ সিংহ। অবশ্য তখনই তার প্রথম রেকর্ডের গান নচিকেতা ঘোষের সুরে 'কালনাগিনীর কাল মাথার মণি', 'আমার ঝুমুর ঝুমুর নাচ' হিট হয়ে গেছে। সনতের কথামতোই ক্লাস টেনের ছাত্র আমি পঁচিশটি আধুনিক গান শৈলেনকে দিয়ে কপি করিয়ে পাঠিয়ে দিলাম রেডিয়োতে। কিছুদিনের

মধ্যে উত্তর এল আমি রেডিয়োর অনুমোদিত গীতিকার হয়ে গেছি। রেডিয়ো আমায় ডাকল চুক্তি করার জন্য।

২৯

প্রায় কিশোর বয়সে আমি রেডিয়ো থেকে গীতিকার হওয়ার আমন্ত্রণ পাই। রেডিয়ো অফিসে যাবার পর এক ভদ্রলোক আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অনেকগুলো কাগজে আমাকে সই করিয়ে নেন। আমি জানতে পারলাম রেডিয়োতে কোনও শিল্পী যখনি আমার লেখা গান গাইবেন তার জন্য প্রতি ব্রডকাস্টিং-এ আমি পারিশ্রমিক পাব চার আনা। এখন হয়তো অনেক বেশি পাচ্ছি কিন্তু তখন ওই চার আনা একসঙ্গে যোগ হয়ে যখন তিন মাস অন্তর সতেরো টাকা বা একুশ টাকা আমায় এনে দিত তখন কী যে আনন্দ পেতাম তা এখন আর ভাষায় বোঝাবার শক্তি আমার নেই।

তখন কিছুদিন হিন্দি গানের ভার্সানে বাংলা গান গাওয়ার খুব প্রচলন হয়েছিল। 'আয়েগা আনেবালা'র সুরে ধনঞ্জয়বাবুর 'শোন গো শোন গো প্রিয়তম শোন গো'। গায়ত্রী বসুর 'কোন দূরের বনের পাখি বারে বারে আমায় ডাক দেয়' ইত্যাদি গান খুবই জনপ্রিয় হয়। তখন আমি লিখেছিলাম 'তথ্‌দির সে বিখ্‌রে হুয়ে'—সুরে 'স্বপ্নেরই লগ্নে কে স্বপন রাঙালে'। সনৎ সিংহ যেদিন গানটি রেডিয়োতে গাইল সেদিনই তোলপাড় হয়ে গেল সব রকমের শ্রোতাদের মন। কিন্তু সে সময় লতা মঙ্গেশকরকে বলতে শুনেছিলাম কলকাতায় এত ভাল সুরকার এত ভাল গীতিকার থাকতে আমার গাওয়া হিন্দি গানের সুরে বাংলা গান কেন গাইছেন সবাই? বাঙালির হল কী?

কথাটা শুনেই আমরা অনেকেই কলম নামিয়ে ফেলেছিলাম। আর একবার এই ঘটনার অনেক দিন পরে সনতের পুজোর গান লিখতে গেলাম শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে। সেদিন সুরকার ও শিল্পী শৈলেনের দেশপ্রিয় পার্কের বাড়ির কাছেই কোনও বিয়েবাড়ি ছিল। সনৎকে বললাম, শৈলেন আর আমার দুজনেরই ঘটকালির বিয়ে, বিয়ের সানাই শুনলেই দুজনেই কেমন যেন উদাস হয়ে যাই। তুই তো প্রেম করে বিয়ে করেছিস। তোরও কি তাই হয়? সনৎ বলল, থাম তো তুই। বরং এই সাবজেক্টটা নিয়ে আমার জন্য গান লেখ।

সনতের আইডিয়াটা ভাল লাগল। লিখে ফেললাম 'ক' বছর আগের সে রাত মনে করো না/ তুলে রাখা বেনারসীটা পর না।' সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুর করল শৈলেন। সনৎও খুব ভাল গাইল। খুবই জনপ্রিয় হল রেকর্ডটি। আর সব থেকে খুশি হল সনৎ পত্নী রাধাদেবী। সনৎ হেমন্তদার সুরে আমার লেখা 'মান করে নয় রাগ করে আজ চলে গেলেন রাই' গেয়েছে 'হংসমিথুন' ছবিতে।

আমার অনেক ভাল ভাল ভক্তিগীতিও দারুণ ভাল গেয়েছে বিভিন্ন রেকর্ডে। আর গেয়েছে ছোটদের গান।

ছোটদের গানেই ও কিন্তু বেশি জনপ্রিয়। আমার লেখা—আমার প্রিয় ছোটদের দুটি গান মনে পড়ছে। একটি—'এসেছে সার্কাস' আর একটি 'ম্যাজিক।' দুটো গানই রত্ন

মুখোপাধ্যায়ের সুরে সৃষ্টি! ওর বন্ধুবান্ধবরা তাই ওকে 'চাইল্ড স্পেশালিস্ট' বলে ডাকে। সনৎ হাসতে হাসতে জবাব দেয়, এই 'চাইল্ড স্পেশালিস্টের' ফি'জ বা রেট কিন্তু একটু বেশি।

আর একজনের নাম মনে পড়ছে। আমার পাড়ার লোক বিনয়দা। অর্থাৎ বিনয় অধিকারী। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের খুবই কাছের লোক। আমার লেখা শ্যামাসংগীত প্রথম গেয়েছিলেন রেডিয়োতে। হিন্দুস্তান এবং কোহিনুর রেকর্ডে গেয়েছেন আমার অনেক গান। ওঁর হিট গান 'গুনগুনিয়ে যাও হে ভ্রমর কোথায় বলে যাও'। অনেক ছবিতেও নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন।

কত সহজ সরল মানুষ ছিলেন সে যুগের এই সব শিল্পীরা। প্রকৃতই ভালবাসতেন গান শোনাতে। যে কোনও অনুষ্ঠানে যখনই কেউ ডাক দিতেন হাসিমুখে আসতেন। আজকের তথাকথিত শিল্পীদের মতো প্রথমেই পয়সা নিয়ে দরাদরি করতেন না। অনুষ্ঠানের পর যে খামটি দেওয়া হত তাই নিয়েই খুশি মনে বাড়ি গিয়ে খুলে দেখতেন কে কী দিয়েছে। কোনও অনুযোগ কোনও অভিযোগ কারও বিরুদ্ধে কখনও করেননি। তাই আজকাল আনাচে কানাচে তথাকথিত বড়লোক শিল্পীকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না কোনও বড়মাপের মনওয়ালা শিল্পীকে।

এই প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা মনে পড়ছে। তার নাম ধীরেন বসু। বিখ্যাত সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী শচীন গুপ্তের শ্যালক হলেও শচীনবাবুর মাধ্যমে নয়, আমার ভাগ্নে ভবানীপুরের সুনীল চক্রবর্তীর মাধ্যমে ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ। তখন আধুনিক গান গাইত ধীরেন। প্রায়ই আমার কাছে গান নিত রেডিয়োতে গাইবার জন্য। বেতারে নিয়মিত পরিবেশন করত আমার গান। কিন্তু আধুনিক গানে নাম করতে পারল না। নাম করল ওর যৌবনে নয়, প্রায় উত্তর যৌবনে নজরুলগীতি গেয়ে। কিন্তু নাম করলে কী হবে স্বভাবটা আজও পাল্টাতে পারল না। আমাদের দেখা হলে সে আগেকার আড্ডাটা আজও নতুন করে তেমনি জমজমাট হয়ে যায়।

আর একজন তার নাম মৃণাল চক্রবর্তী। প্রথম আলাপ থেকেই গাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে যায় আমাদের মধ্যে। গানে এবং সুরে খুবই যখন নাম তখন আমার কিছু গান খুবই ভাল গায়। আমি দেখলাম রোমান্টিক গানেই ওর স্বাচ্ছন্দ্য বেশি।

শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে আমার দুটি গান আজও ভুলতে পারিনি। যেমন 'দু হাতে আর এনো না/ কণক চাঁপার ফুল তুলি/ ভেবে মরি/ ফুল নেব কী নেব তোমার কণক চাঁপা অঙ্গুলি'। আর একটি 'ভুলে থাকা কথা ছিল তোমারই আমার তো নয়'।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য অগ্রগামী গোষ্ঠীর অর্থাৎ কালুদার খুবই আপন জন। আমার খুবই শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধু। অগ্রগামীর সুপারহিট ছবি 'সাগরিকা' ও 'শিল্পী'-তে সুর দিয়েছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু 'ডাক হরকরা' ছবি থেকে কালুদা নিয়ে এলেন সুধীন দাশগুপ্তকে। কালুদার 'নিশীথে' এবং 'কান্না' পর পর দুটো ছবিরই সুরকার ছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত। 'শঙ্খবেলা'-তেও সুধীন দাশগুপ্তকেই নিলেন। 'কান্না'-র পর থেকেই জয়ন্ত যখন তখন আমায় বলত, সুধীনবাবুকে কেন গান দিচ্ছ না। অপূর্ব সুর করেন উনি।

আমি বলেছিলাম, মানলাম। কিন্তু উনি যদি না ডাকেন তবে আমি যাই কী করে।

শেষটায় জয়ন্তর পীড়াপীড়িতে বোধহয় সুধীনবাবু আমায় ফোন করলেন। বসলাম ওঁর সিঁথির বাড়িতে। ওঁর হারমোনিয়াম বাজানো শুনেই ওঁর প্রেমে পড়ে গেলাম আমি। বললাম কথাটা। খুব রসিক ছিলেন উনি। অবশ্য খুব কম কথা বলতেন। শুধু বললেন, দাস ফার নো ফারদার। গানের খাতা সঙ্গে ছিল দেখাতে গেলাম। বললেন, প্লিজ, না। সুরের ওপর লিখুন। নতুন ছন্দ দিয়ে।

তাই করতে হল। সুর শুনে লিখতে শুরু করলাম গান। কিন্তু দেখলাম সুধীনবাবু, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাপি লাহিড়ি বা আর ডি বর্মণ নন। ওঁর সুরের একটা 'নোট'-ও উনি একটুও এদিক ওদিক করতে দেবেন না। যে ওজনে উনি সুর দেবেন ঠিক সেই ওজনে কথা দিতে হবে। এতটুকুও কম্প্রোমাইজ করবেন না।

আমারও জেদ সাংঘাতিক। অসম্ভব মনের জোর এসে গেল আমার। সুধীনবাবু ঠিক যা 'মিটার' দিলেন হুবহু সেই মিটারেই আমি লিখতে লাগলাম। শেষটায় হাসি ফুটল ওঁর।

বললেন, ঠিক হয়েছে।

লিখলাম ওঁর সুরে আমার প্রথম গান 'চাঁদের আলোয় রাতের পাখি কী সুর শিখেছে/ তারায় তারায় ওই যে আকাশ কী গান লিখেছে।'

এ গানটি পুজোয় এইচ. এম. ভি.-তে রেকর্ড করল বন্ধুবর শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

এরপর আমি বুঝে নিলাম সুধীন দাশগুপ্তকে। বুঝে নিলাম ওঁর স্টাইলকে। হয়ে গেল আমাদের টিউনিং। যতদূর মনে আসছে এরপরে লিখেছিলাম তারাশঙ্করের 'মঞ্জরী অপেরা'র গান।

এরপরে এল 'শঙ্খবেলা' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার যোগাযোগ। পরিচালক অগ্রগামীর কাছে চিত্রনাট্য শুনেই আমি সুধীনবাবুকে বললাম, এত চমৎকার রোমান্টিক গানের সিচুয়েশন সচরাচর হয় না। সুধীনবাবু, প্লিজ আমি এ ছবির গান সুরের উপর লিখব না আমার লেখার উপরে আপনি সুর দেবেন। অবশ্য একেবারে ভিন্ন ধরনের ছন্দ দেব। সুধীনবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, বেশ তাই হবে।

জীবনে সব থেকে কম সময়ে যে গানটা আমি লিখেছি সেটি হল 'মণিহার' ছবির 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়'।

৩০

আর সব থেকে বেশি সময় নিয়ে যে সুপারহিট গানটি আমি লিখেছি সেটি হল 'শঙ্খবেলা' ছবির গান 'আমি আগন্তুক আমি বার্তা দিলাম'। ছবির পরিচালক কালুদা আমায় বলেছিলেন, পার্টিতে মদ্যপান করে নায়ক গান গাইলেই হয় সে দার্শনিক হয়ে যায় নইলে হয়ে যায় হাসির স্যাটায়ার করা এক ধরনের কমেডি সিঙ্গার। দুটোই আমি চাই না। একটা নতুন কিছু লিখুন।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই কথাটা শুনেই চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। তবুও আমার সেই অসম্ভব মনের জোরে মোকাবিলা করতে চেয়েছিলাম ব্যাপারটা। একদিন দুদিন

করতে করতে যখন প্রায় ন'দিন ধরে সুধীনবাবুর বাড়িতে ওঁর মিউজিক রুমে যাতায়াত করেও আমি কিছুতেই লিখে উঠতে পারছিলাম না কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা। সেরকম সময়ে হঠাৎ আমাদের সিটিং-এ এলেন কালুদা আর জয়ন্ত ভট্টাচার্য। আশ্চর্য, ওঁরা আসতেই হয়ে গেল গান। লিখে ফেললাম 'আমি আগন্তুক আমি বার্তা দিলাম।' মনে হল আমার দু হাতের মুঠোতে ধরে ফেলেছি পৃথিবীর যত আলো, যত খুশি যত আনন্দ। পরের গানটি আমার বাড়িতে মাঝরাতে লিখেছিলাম। 'কে প্রথম চেয়ে দেখেছি/ কে প্রথম কাছে এসেছি/ কিছুতেই পাই না ভেবে/ কে প্রথম ভালবেসেছি/ তুমি না আমি।'

পরদিন টেলিফোনে গানটা দিয়ে দিলাম সুধীনবাবুকে। গানটা লিখে নিয়ে ও প্রান্ত থেকে সুধীনবাবু শুধু বললেন, বেশ জমবে মনে হচ্ছে। আর একটি সিচুয়েশনে দুটি গান লিখে নিয়ে হাজির হলাম সুধীনবাবুর সিঁথির বাড়িতে। দুটো গানই এগিয়ে দিয়ে বললাম, যেটা সুর করতে সুবিধা হয় সেটা বেছে নিন। দুটোই পরিচালককে দেখিয়েছি। ওঁদের সবার সমান পছন্দ। সুধীনবাবু বেছে নিলেন একটি গান অন্যটি আমায় ফেরত দিলেন। অভ্যাসমতো পকেটে পুরে নিলাম সেই গানটি। আমি কিছু বলার আগেই সম্ভবত স্প্যানিশ গিটার বাজাতে বাজাতে আমাকে শোনালেন, 'কে প্রথম চেয়ে দেখেছি' গানটি। মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অপূর্ব। এবার নতুন নেওয়া গানটি নিয়ে বসলেন হারমোনিয়ামের সামনে। বার কতক মনে মনে পড়লেন তারপর সেই তুলনাহীন হারমোনিয়াম বাজানো সুরের সঙ্গে শোনালেন আমার লেখা নতুন গানটি 'আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব/ হারিয়ে যাব আমি তোমার সাথে/ সেই অঙ্গীকারের রাখী পরিয়ে দিতে/ কিছু সময় রেখো তোমার হাতে।'

সেই সুর এত সাবলীল এত স্পনটেনিয়াস যে এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল না সুধীনবাবু এই মাত্র এই গানটিতে সুর বসাতে বসাতে গানটি আমায় শোনাচ্ছেন। গানটি যেন ওঁর বহু দিনের জানা, বহু দিনের সুর করা। লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া এই গানটি আমার লেখা আমার প্রিয় গানগুলির মধ্যে একটি অন্যতম প্রিয় গান।

আমার ভগ্নীপতি সরোজ মুখোপাধ্যায় খুব দার্জিলিং-এর ভক্ত ছিলেন। উনি সময় পেলেই ছুটতেন ওই শৈলনগরীতে। দিদিও সঙ্গে থাকতেন, আমাকেও বার কয়েক সঙ্গে নিয়ে গেছেন। সরোজদা সেই সময়েই ওঁর প্রথম ছবি প্রযোজনা করেন। ছবির নাম 'অলকানন্দা'। গল্প ও চিত্রনাট্য দেবকী বসুর। এই ছবিতেই তখনকার গ্র্যান্ড হোটেলে বাঙালি রিসেপশনিস্ট সুদর্শন শীতল দাশ বটব্যালকে নায়কের ভূমিকায় প্রথম সুযোগ দেন। ওঁর ধর্মতলার অফিস বাড়িতে আমার ছিল অবারিত দ্বার। আমি তখন স্কুলে পড়ি। একদিন আমার সামনেই সরোজদার চেম্বারে এলেন শীতল দাশ বটব্যাল। চেহারা দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। সরোজদা বললেন, সব ঠিক আছে তবে ওই নামটি চলবে না। তৎক্ষণাৎ নামটি পরিবর্তিত করে রাখা হল প্রদীপকুমার। প্রদীপকুমার খুব খুশি হয়েই রাজি হলেন। আগেই বলেছি এই সরোজদাই ওঁর একটি ছবি 'কামনা'-র তখনকার বিফল নায়ক উত্তমকুমারকে আমাদের একান্ত অনুরোধে সুযোগ দেন ওঁর পরবর্তী ছবি 'মর্যাদা'য় অরূপকুমার নামে। সে নামকরণও উত্তম হাসিমুখে মেনে নেয়। সে ছবিও অবশ্য চলেনি। স্মৃতিরেখা বিশ্বাস ছিলেন ওই ছবির নায়িকা। এই 'মর্যাদা' ছবির শুটিং দেখতে এসে এম

পি প্রোডাকশনসের 'অগ্রদূত'-এর বিমল ঘোষ (বিখ্যাত পরিচালক অগ্রগামীর সরোজ দে অর্থাৎ কালুদার মামা) উত্তমকে দেখে পছন্দ হয়। ওখানেই কথাবার্তা পাকা হয়ে যায়। তারপরই এম পি-তে মাস মাহিনাতে নিযুক্ত হয় উত্তমকুমার। ওঁদের 'সহযাত্রী'ও ফ্লপ হয়। তখন উত্তমকুমারকে প্রায়ই ভাগ্যের পরিহাসে অসিতবরণ ইত্যাদি শিল্পীর ক্যামেরার ডামি পুরুষ হয়ে মাস মাহিনা নিতে হত। যাই হোক 'অলকানন্দা' ছবির আউটডোর শুটিং হবার কথা ছিল দার্জিলিং-এ। পরে অবশ্য আউটডোর হয় শিলং-এ। দার্জিলিং-এ আউটডোর লোকেশন দেখার সময় আমিও ওঁদের সঙ্গে গেলাম। দার্জিলিং-এ ওই জিমখানা ক্লাবে শুনেছিলাম পৃথিবী বিখ্যাত গায়ক টনি ব্রেন্টের অপূর্ব গান। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয় আমাদের মুকেশ সাহেব বোধহয় এই কণ্ঠস্বরটা জেনে অথবা না জেনে অনুসরণ করেছিলেন। ওখানেই সেবার আলাপ হয় অল্পবয়স্ক এক বাঙালি শ্রোতার সঙ্গে তার নাম সুধীন দাশগুপ্ত। বছর কয়েক পরে দিদির সঙ্গে আবার দার্জিলিং-এ গিয়ে একটা দোকানে দেখলাম ওই ভদ্রলোককে। উনি তখন নব্য যুবক। ওই পাথরের গয়নার দোকানের উনি সেলসম্যান। উনি পাথর ভাল চিনতে জানলেও আমায় চিনতে পেরেছিলেন কি না জানি না। তবে আমি চিনতে পেরেছিলাম।

আমি পূর্ব পরিচয়ের কথা জানালাম। উনি বললেন, আমি তো দার্জিলিং-এ থাকি। আমার বাবার চাকরি তো এখানেই। আমিও এই গয়নার দোকানে কাজ করি। সময় পেলেই আমার এক নেপালি বন্ধুর বাড়ি যাই। যখন তখন পিয়ানো বাজাই। গিটার বাজাই। আর শুনি লেটেস্ট সব বিদেশের রেকর্ডের গান। আসুন না আজ বিকালে আড্ডা জমবে।

তখন কিন্তু আমার জীবনের প্রথম গান রেকর্ডিং হয়ে গেছে 'অভিমান' ছবিতে। ছবিটি অবশ্য তখনও মুক্তি পায়নি। সুধীনবাবুকে বললাম। অবশ্যই যাব। আমারও মজ্জায় গান। ইতিমধ্যে রেকর্ড হয়ে গেছে আমার লেখা কিছু গান। সুধীনবাবুর সেদিনকার বাজনা শুনে মনে হয়েছিল কে কার অলঙ্কার? বাজনা না সুধীন দাশগুপ্ত? যদিও সে দিনের অনেক পরে উনি সুর করেছিলেন সতীনাথের গাওয়া অন্য এক গীতিকারের রচিত বিখ্যাত গান 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার।' গানের কথায় অবশ্যই ছিল মোহিতলাল মজুমদারের একটি কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই নিয়ে তখনকার এইচ. এম. ভি.-র বিপক্ষে আদালতে মামলা ওঠার উপক্রম হয়েছিল। বেশ কিছু মোটা টাকা খেসারত দিয়ে এইচ. এম. ভি.-কে সেই অভিযোগ মেটাতে হয়েছিল।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি হাসির নক্সার রচয়িতা গীতিকার পবিত্র মিত্রের বিরুদ্ধেও একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও এইচ. এম. ভি.-কে মোটা টাকা খেসারত দিয়ে সেই অভিযোগ মেটাতে হয়েছিল। দু'টি ক্ষেত্রেই গীতিকারদের উপর এইচ. এম. ভি. কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। অথচ কঠোর শাস্তি পেলেন আর একবার অন্য এক গীতিকার। যিনি সেবার পুজোয় নচিকেতা ঘোষের সুরে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান লিখেছিলেন 'ওগো আমার কোকিল কালো মেয়ে'।

এই গানটি ছিল অন্য একজনের কবিতার প্রায় অনুলিপি। এ ক্ষেত্রেও মোটা টাকা খেসারত দিয়ে রেকর্ডটি বাতিল করলেন এইচ. এম. ভি.। এবং হুকুম দিলেন ওই বিশেষ

গীতিকার যেন এইচ. এম. ভি.-র চৌকাঠ না পেরোয়। যেহেতু ওই গীতিকারের তেমন কোনও আত্মীয়স্বজন এইচ. এম. ভি.-তে বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না তাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে ওঁকে এই হুকুমনামা মেনে নিতে হয়েছিল। ক্ষমা চাওয়ায় কোনও ফল হয়নি। যদিও এ ধরনের অপরাধ অবশ্যই অমার্জনীয়। তবুও আমরা ওঁর অজান্তেই ওঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। তবুও টলাতে পারিনি পি কে সেনের মনোভাব। এর বেশ কয়েক বছর পরে আমরা অনেকে অনুরোধ করে করে ওই বাতিল গীতিকারকে এইচ. এম. ভি.-তে পুনঃপ্রবেশ করাতে পারি। তখন অবশ্য এইচ. এম. ভি.-র ম্যানেজমেন্ট বদলে গেছে। তা না হলে তাও হত কি না সন্দেহ আছে।

'ওগো আমার কোকিল কালো মেয়ে' গানটি বাতিল হবার খবর এবং কারণ আমার গোচরে সর্বাগ্রে এল এই জন্যে যে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এইচ. এম. ভি.-র খুব ভাল সেলার। ওর রেকর্ড বাতিল মানে কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থে বড় আঘাত। কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কোম্পানি আমাকে দিয়ে লেখাল 'আঁখি ছল ছলিয়া/ কেন গেলে চলিয়া'। নিখিল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া দুটি গানের একটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। গান দুটি আজ সকালে লেখা হল, সন্ধ্যায় সুর করা হল। পরের দিন রিহার্সাল হল। তার পরের দিন রেকর্ডিং। আর রেকর্ডিং-এর দু দিন পরেই রেকর্ড বাজারে এসে গেল। এমন ঘটনা আমার গানের জীবনে আর ঘটেনি।

যাই হোক দার্জিলিং-এর পর সুধীন দাশগুপ্তের সঙ্গে আবার দেখা হয় কলকাতাতেই। এন্টালির তখনকার সেই বিখ্যাত বাৎসরিক সংগীতানুষ্ঠানে। আমি তখন নিমন্ত্রিত শ্রোতা। উনি তখন কণ্ঠশিল্পী। মনে আছে গেয়েছিলেন 'ওই উজ্জ্বল দিন/ ডাকে স্বপ্ন রঙিন', তারপর 'নীল আকাশের ওই কোলে/ কান্না হাসির ঢেউ তোলে।' ভাল লেগেছিল ওঁর গাওয়ার ধরনটি। সে রাতের গাওয়া ওঁর কোনও গানই তখন রেকর্ড হয়নি। অনুষ্ঠানের পর আবার নতুন করে আলাপ করলাম। বললেন, এখন তো দার্জিলিং-এ থাকি না। থাকি এখানে, কলকাতাতেই। তবে বেশ কিছুটা দূরে সিঁথিতে। ওই 'নীল আকাশের ওই কোলে' গানটি শুনে আমি সুধীনবাবুকে পুরোপুরি বুঝে নিলাম। উনি সত্যিই সুরসৃষ্টি করতে জানেন। কারণ বিখ্যাত একটি বিদেশি গান 'ইস্তাম্বুল ইস্তাম্বুল' থেকে ওই গানটি উনি সৃষ্টি করেছিলেন। ওই গানটি টু-ফোর বিটে ছিল। উনি বাংলা গানকে বানিয়েছিলেন সিক্স এইট বিটে। অর্থাৎ মোটামুটি কাহারবা থেকে দাদরায়। কিন্তু এই রূপান্তরে ঝলমল করে উঠেছিল একটি গান। একটি নতুন গান। এখানেই কৃতিত্ব ওঁর। আজীবন উনি, আমার ধারণা এই পথেই সার্থক পথ পরিক্রমা করে গেছেন। ঠিক তেমনি একটি বিদেশি গানের সুরে 'আই এ্যাম এ জলি গুড ফেলা'-র স্টাইল অনুসরণ করে সুধীনবাবু সুর করেছিলেন 'আকাশ এত মেঘলা/ যেং না কো একলা...'। সতীনাথের গাওয়া এই গানটি এখনও অনেকের স্মরণে আছে।

ওর সঙ্গে আবার দেখা ওই সিঁথির কাছে এম পি স্টুডিওতে বের জয়ন্ত ভট্টাচার্য ওঁর সঙ্গে আলাপ করাতে যাচ্ছিল। আমরা দুজনেই বললাম আমরা দুজনকেই চিনি। আমি সুধীনবাবুকে বললাম, আপনি তো দার্জিলিং-এ প্রায় জহুরির বিদ্যা অর্জন

করেছেন। কিন্তু আমার ও বিদ্যা নেই। সোজাসুজি একটা ইনটিউশন বা ধারণায় বলতে পারি আমি আজ জহুরি হয়েছি একটা জহরকে চিনতে পেরেছি।

৩১

অগ্রগামীর সরোজ দে অর্থাৎ কালুদা একদিন কথায় কথায় আমায় বলেছিলেন, আমরা প্রথম ছবি করি 'সাগরিকা'। ছবি সুপারহিট, মিউজিকও সুপারহিট। পরের ছবি 'শিল্পী' তারও মিউজিক সুপারহিট। দুটো ছবিরই সফল সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। তবে এখনকার 'ডাক হরকরা' ছবিতে সুরকার নিয়েছি সুধীনবাবুকে। কেন জানেন?

আমাকে নেতিবাচক ঘাড় দোলাতে হল। কালুদা বললেন, সুধীনবাবুর অসম্ভব আত্মবিশ্বাস। উনি সোজাসুজি এসে বললেন, আমায় সুর করতে দিন। আমি ভাল কাজ করতে পারবই পারব। ব্যাস, এটুকুই যথেষ্ট। আব কারও রেফারেন্স, কারও সার্টিফিকেট আমি নিইনি।

এবার আমার বলার পালা। হাসতে হাসতে আমি বলেছিলাম এক-ই কথা, এক জহুরিকে চিনে নিলেন আর এক জহুরি।

'ডাক হরকরা' ছবির গানগুলো কেউ কোনও দিন ভুলতে পারবে? এরপর সুধীনবাবু সুর করলেন কালুদার ছবি 'কান্না', 'নিশীথে' এবং 'হেডমাস্টার'। তারপর এল 'শঙ্খবেলা'। যার গান লেখার দায়িত্ব হাসিমুখে প্রচুর আত্মবিশ্বাসে কালুদা আমায় দিয়েছিলেন। সুধীনবাবু এরপর সুর করেছিলেন মঞ্জু দে-র 'অভিশপ্ত চম্বল' ছবিতে। এই ছবির পর থেকে সুধীনবাবুর সুরে গান গাইবার জন্য আশাজি প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠলেন। এরপর ইন্দর সেনের প্রথম ছবি 'প্রথম কদম ফুল'-এ আশাজি গাইলেন 'কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে'। ওই ছবিতে মান্না দের জন্য আমি লিখেছিলাম 'আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না'। এই গানটির প্রসঙ্গে একটি বিষয় জানানোর আন্তরিক তাগিদ অনুভব করছি। দুই মে সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন। আমার জন্মদিনও ওই দুই মে। উনি ছিলেন আমার এক আত্মীয়ের সহপাঠী। আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। প্রত্যেক বছর দুই মে আমি ওঁকে টেলিফোনে প্রণাম জানাতাম। উনি প্রত্যেকবারই বলতেন, এ বছর যেন ভজহরি মান্নার মতো আর একটা গান পাই।

বিনীতভাবে জানাতাম, ওটার স্টাইল তো আপনার পিতৃদেবের কাছ থেকে নেওয়া। উনি বলতেন, তাতে কী। দারুণ গান ওটা। তারপর উনি আমার জন্মদিনের শুভ কামনা জানাতেন যা ছিল আমার কাছে আশীর্বাদ।

এরপর সুধীনবাবু আর আমি প্রচুর ছবিতে একসঙ্গে কাজ করি। প্রথমেই মনে পড়ছে মঞ্জু দে-র 'সজারুর কাঁটা', ছবির গানের ব্যাপার। 'শঙ্খবেলা' আর 'সজারুর কাঁটা'-তে আমার লেখার ওপর সুর করেছিলেন উনি। এরপর সারা জীবনে একটি গানও কিন্তু আমার লেখার ওপর আর সুর করেননি। ওঁর সুরের ওপর আমাকে গান লিখতে হত। 'সজারুর কাঁটা' ছবিটা না চললেও গানটা চলেছিল সাংঘাতিক। পরিচালিকা মঞ্জু দে আমায় সিচুয়েশন বোঝাবার সময় উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'যার অদৃষ্টে যা

জুটেছে সেই আমাদের ভাল' ঠিক এই ধরনের একটি গান চাই। আমি লিখেছিলাম 'বিধাতার এই জগতে/এই তো মুখবন্ধ/কারও কারও কপাল ভাল/কারও কপাল মন্দ'। মান্না দের কণ্ঠে সুপারহিট হয়েছিল এই গানটি। আর একটি গান ছিল হেমন্তদার কণ্ঠে।

হেমন্তদা আর ডি বর্মণের মতোই সুধীনবাবুর 'গুড বুকে' ছিলেন না। খুবই কম সংখ্যক গান হেমন্তদা গেয়েছেন সুধীনবাবুর সুরে। সুধীনবাবুর প্রিয়তম পুরুষকণ্ঠ ছিলেন কিশোরকুমার, তারপর মান্না দে, তারপর শ্যামল মিত্র। এ প্রসঙ্গে পরে আবার কিছু কথা বলব।

এদিকে মঞ্জু দে-র খুবই প্রিয় শিল্পী ছিলেন হেমন্তদা। সম্ভবত সেই কারণেই সুধীনবাবু আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন হেমন্তদাকে গাওয়ানোর ব্যাপারে।

হেমন্তদার গানটি লিখেছিলাম, 'সময় কখন যে থমকে দাঁড়ালো/ কালবোশেখীর মাসে/কি যে করে মন জানে না এখন/ঝড়ের পূর্বাভাসে'। অপূর্ব সুর করেছিলেন উনি। এ গানটিও খুবই প্রশংসিত হয়েছিল।

এরপর আমি সুধীনবাবুর সুরের ঝড়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম ইন্দর সেনের 'পিকনিক' ছবির সময়। উনি তখন সিঁথি ছেড়ে চলে এসেছেন আমাদের সবাইর সুবিধাজনক জায়গায় দক্ষিণের যতীন দাস রোডে। সেদিনকার কালবোশেখের মাসে আমি সুধীনবাবুর সুরের ওপর লিখে ফেললাম মান্নাদার জন্য 'কাশ্মীরে নয় শিলঙেও নয়/আন্দামান কি রাঁচিতেও নয়/আরও যে সুন্দর/আকাশ প্রান্তর।' কিন্তু থমকে গেলাম আর একটি গানে যেটি গিয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। 'কেন সর্বনাশের নেশা ধরিয়ে তুমি এলে না যে।' এর মুখড়া পার হয়ে অন্তরায় এসে সুধীনবাবুকে আমায় বলতে হল, হয় সুর বদল করুন। না হয় আমাকে মুক্তি দিন। আমি লিখতে পারব না।

উনি কেন জানি না আমার ওপর খুবই আস্থা রাখতেন। একান্ত মরমিয়া বন্ধুর মতো বললেন, আপনিই পারবেন। কিছুই বদলাবার প্রয়োজন নেই। সঙ্গে গাড়ি তো রয়েছে। আপনার যতই রাত হোক ক্ষতি কী। আমরা আরও সময় নিলাম। আপনি আরও একটু ধ্যান দিন। আমি বললাম, অসম্ভব। আপনি তো গাইছেন শুধু মিটার টুং তা-না-না-না। আবার আর একটা ওই সমান ওজনের টুং তা রা না না না, ভাব ভাবনা অর্থ কবিতা অবাঙালি নেপথ্য গায়িকার উচ্চারণ, পরিবেশ ফিল্মের সিচুয়েশন মিলিয়ে কী লিখব আমি। কিছুই মাথায় আসছে না।

আমার কথাটা শুনে সুধীনবাবু বললেন, দাঁড়ান।

কথাটা বলেই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, ব্যাস। এবার নিশ্চিন্ত। আপনার বাড়িতে ফোন করে এলাম। আপনি আজ বাড়ি ফিরছেন না। এখানেই থাকছেন। এবার মন দিয়ে শুনুন আর লিখুন।

সুধীনবাবু হয়তো ঠিকই ধরেছিলেন। মনে হয়তো টেনশন ছিল। কী করে মাঝরাতে নিজে গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে বাড়ি ফিরব। এবার কিন্তু শুনেই লিখে ফেললাম ওই গানের অন্তরাটা। ওঁর টুং তা-না-না-না গুলো আমারই কলমে হয়ে গেল 'দিন এসে এসে/যায় ফিরে ফিরে/চোখ চেয়েই যে থাকে/মন সারাবেলা/সেই পথে পথে/কান পেতে রাখে/সব হারানোর পথে নেমে কি/পথ চাওয়া আর সাজে/মরি লাজে/বুকে

বাজে।'

হারানো সে সব কথা আমি শুনি। চোখের সামনে দেখি। যখনই বাড়ি ফেরার পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। চোখের উপর ভেসে যায় কত মেঘ, ঝরে যায় কত আলো। ক্রমশ কত আলো অন্ধকার হয়ে যায়। এখন জ্বলে ওঠে বড় বড় হ্যালোজেন। আগে জ্বলত গ্যাসের বাতি। একজন লোক ছুটতে ছুটতে যেত একটা লাঠির মাথায় আগুন জ্বালিয়ে। পর পর গ্যাসের বাতিগুলো জ্বলে উঠত দপ দপ করে। আমার স্মৃতিতে আলো ঝলমল করা সে সব দিনগুলো আজও স্পষ্ট দেখি আগে যেমন দেখতাম। পুরনো সেই দিনের কথা আজও ভোলা যায় না। অন্তত আমি পারি না ভুলতে। আগেকার দিন আর এখনকার দিনের আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকলেও এখনও অহরহ বুকে বাজে সেই বিখ্যাত গানের আকুতি 'তবু মনে রেখ'।

৩২

সুধীনবাবুর প্রসঙ্গে আরও একটু কথা বলে নিই। কলকাতার মহিলা কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে সুধীনবাবুর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন আরতি মুখোপাধ্যায়। যদিও দমদমের আরতি গান শিখত শ্যামবাজারের সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তবুও সিঁথির সুধীন দাশগুপ্তের সংস্পর্শে না এলে আরতির এমন বিকাশ হত না বলেই আমার নিজের ধারণা। সুধীনবাবুর যতীন দাস রোডের বাড়িতেই আমি লিখেছি পুজোর জন্য আরতির সেই বিখ্যাত গান অনড় অটল সুধীনবাবুর সুরের মিটারে। গান দুটি ছিল (১) 'যদি আকাশ হত আঁখি/ তুমি হতে রাতের পাখি', (২) 'না বলে এসেছি/তা বলে ভেব না/না বলে বিদায় নেব।'

এরপর সুধীনবাবু চলে এলেন ডোভার রোডের বহুতল বাড়িতে নিজের ফ্ল্যাটে। ওর গ্যারেজটা খালিই ছিল। ওখানে আমার গাড়ি রেখে কত রাত যে বাড়ি ফিরিনি তার ইয়ত্তা নেই। তখন সুধীনবাবুর হাতে অজস্র ছবি।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গান কী অজ্ঞাত কারণে জানি না উনি খুব একটা পছন্দ করতেন না। আঙুলে গোনা যায় এমন সামান্য কয়েকটি ওঁর লেখা গান সুধীনবাবু সারা জীবনে সুর করেছেন। সে জন্য ওঁর প্রায় সব ছবিতেই থাকতাম আমি। আমার হাতে আবার অন্যান্য মিউজিক ডিরেক্টররাও ছিলেন। এ দিকে সুধীনবাবু বাণীচক্রে নিয়মিত ক্লাস নিতেন। বাড়িতেও অনেক ছাত্রী। সুতরাং রাত জাগা ছাড়া কাজ শেষ করার উপায় ছিল না আমাদের দুজনেরই।

আমাদের এখানে মাঝে মাঝে এসে হাজির হত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। ব্যস, সব কিছু তুলে রেখে দিয়ে শুরু হত আমাদের অনর্গল আড্ডা, হাসি, গান আর তামাসা। ওখানেই বিখ্যাত ছবি 'হংসরাজ'-এর গানের জন্ম। 'হংসরাজ' ছবির পরিচালক অজিত গাঙ্গুলিকেও আমরা একটা রাত বাড়ি ফিরতে দিইনি। বাউলাঙ্গের এই সব অতি জনপ্রিয় গানগুলোর কোনওটাই কিন্তু আমার লেখার ওপর সুর করা নয়।

সবই সুরের ওপর আমি লিখেছি। যেমন (১) 'শহরটার এই গোলক ধাঁধায় আঁধার হল মন'। (২) 'ও দিদিমণি গানের রানি'। সব কটা গানই কিন্তু দারুণ গেয়েছিল আরতি। অমিতকুমার তখন সম্ভবত কলকাতার পাঠভবনের ছাত্র। অমিত গেয়েছিল 'চিৎকার চেঁচামেচি মাথাব্যথা/এই নিয়ে হল কলকাতা।' আর গেয়েছিল শ্যামশ্রী মজুমদার নামে একটি নতুন মেয়ে। ওর গান ছিল 'টিয়া টিয়া টিয়া/অজ পাড়াগাঁয়ে থাকে।' ওখানেই একদিন রাত সাড়ে তিনটেতে যখন সুধীনবাবু আমাকে ওঁর মিউজিক রুমে শোয়ার ব্যবস্থা করে নিজে শুতে গেলেন। তার খানিক পরেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এসেছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে বুঝতে পারিনি। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টি ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল আমার ঘরে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। সুধীনবাবু তখন অতি সন্তর্পণে একটা চাদর এনে আমার গায়ে দিয়ে দিচ্ছিলেন। ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে চারটে। এই ছিল আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক।

ওইখানেই লিখেছিলাম 'জীবন সৈকতে' ছবির গান। আর লিখেছিলাম দীনেন গুপ্তের 'সঙ্গিনী' ছবির গানও। আরতির গাওয়া সেই গানটি ছিল 'এই বৃষ্টিতে কে ভিজবে সে এস না।' যেটা পিকচারাইজেশন হয়েছিল ঐতিহাসিক প্রিন্সেপ ঘাটে। যেটি দ্বিতীয় সেতুর জন্য ভাঙা পড়েছে।

ওই ছবিরই আর একটি গান যা সুধীনবাবুর সুরে হেমন্তদা গেয়েছিলেন। গানটি ছিল 'একটু বাতাস ছিল/কখন যে হয়ে গেল ঝড়/নিজেদের কাছে আজ/নিজেরাই হলাম যে পর।' আমার অনুরোধেই সুধীনবাবু হেমন্তদাকে দিয়ে গানটি গাইয়ে ছিলেন।

মুম্বইতে সুধীনবাবুর সঙ্গে বাংলা গান রেকর্ড করতে আমি একবারই গিয়েছিলাম। সেটা 'শঙ্খবেলা' ছবির সময়। যেহেতু আমি মান্নাদাকে টেলিফোনে বলেছিলাম লতাজির একটা তারিখের জন্য। মান্নাদা তাই লতাজির তারিখ ঠিক করে আমাকেও মুম্বইতে নিয়ে আসার জন্য প্রযোজক পক্ষকে জানিয়ে ছিলেন। প্রথমে 'গলি থেকে রাজপথ', তারপর 'শঙ্খবেলা'। এরপর আর কোনও ছবিতেই লতাজি সুধীনবাবুর সুরে গেয়েছেন কি না মনে আসছে না। তবে আশা ভোঁসলে অনেক গেয়েছেন। আমার লেখা প্রচুর গান উনি আশাজির কণ্ঠে মুম্বইতে রেকর্ড করিয়েছেন। তার তারিখও পেয়েছেন মান্নাদার কাছ থেকে। আমি আগেই বলেছি সুধীনবাবুর ফার্স্ট চয়েস ছিলেন কিশোরকুমার। 'শঙ্খবেলা' ছবিতে উনি উত্তমের লিপে মান্না দেকে চাননি—চেয়েছিলেন কিশোরদাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যতদূর মনে হয়, একবারও উনি কিশোরদাকে দিয়ে ওঁর সুরে বাংলা গান গাওয়াতে পারেননি।

'পিকনিক' ছবির 'একদিন দল বেঁধে ক'জনে মিলে' গানটি কিশোরদাকে দিয়ে গাওয়াবার জন্য উনি বেশ কিছুদিন মুম্বইয়ের হোটেলে মিথ্যে সময় নষ্ট করেছেন। কিন্তু কিশোরদাকে পাওয়া যায়নি।

এই 'পিকনিক' ছবিতে গান গাওয়াবার জন্য সুধীনবাবু যখন মুম্বইতে কিশোরদার ডেটের জন্য অপেক্ষা করছেন তখন অন্য একটা কাজে আমিও মুম্বইতে ছিলাম। ব্যাপারটা জানতে পেরে এক দিন সরাসরি কিশোরদাকে বলেছিলাম, দিয়ে দিন না একটা ডেট। কতক্ষণেরই বা ব্যাপার।

কিশোর যথারীতি ওঁর ড্রাইভার কাম সেক্রেটারি আবদুলের দিকে তাকালেন, আবদুল শুধু মুচকি হাসল। কেন হাসল তাও বুঝলাম না। কিশোরদা আমাকে বললেন, কী পুলকবাবু। পোলাও খাবেন? আমি বুঝে গেলাম সুধীনবাবুর ভাগ্য মন্দ। অথচ কতবার কিশোরদাকে বাংলা গানের জন্য অনুরোধ করেছি উনি কথা রেখেছেন। কিন্তু সুধীনবাবুর গান গাননি। এর যে কী কারণ আজও তা আমার কাছে অজ্ঞাত। কিশোরকুমার এবং সুধীন দাশগুপ্ত দুজনেই আজ প্রয়াত। ঠিক জানি না এর কারণ কী? জানি না কিশোরদা সুধীনবাবুর সুরে জীবনে একটাও গান গেয়েছেন কি না। যাই হোক কিশোরকুমারকে না পেয়ে 'পিকনিক' ছবির ওই গানটা শেষ পর্যন্ত মান্নাদাকে দিয়েই মুম্বইতে রেকর্ড করাতে হল।

একদিন সন্ধ্যায় সুধীনবাবুর বাড়ির কাছ দিয়ে যেতে যেতে সুধীনবাবুর বাড়িতে হাজির হলাম। এমন ঘটনা অবশ্য প্রায়ই ঘটত। এমনভাবেই তৈরি হত অনেক নতুন গান। উনি ছাত্র-ছাত্রীদের সে সব গান শেখাতেন। কিছু কিছু আধুনিক গানের লেবেল এঁটে রেকর্ডও প্রকাশ হত।

সেদিন সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি বাড়িতে কেউ নেই। উনি একা। কী ব্যাপার? উত্তরে শুনলাম বাড়ির সবাই কোথায় নিমন্ত্রণে গেছেন। উনি যাননি। এইমাত্র গানের ক্লাস শেষ করেছেন।

মিউজিক রুমে ওঁর একটা সেতার থাকত। সেতারটা দেখতাম। কোনওদিন বাজাতে শুনিনি। সেদিন হঠাৎ তুলে নিলেন সেতারটা। বাজাতে লাগলেন। অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম। মাঝ পথে হঠাৎ ওঁকে থামিয়ে বললাম, রাখুন সেতারটা। যে সুরটা বাজালেন আমার দারুণ লাগল। আমার এখন ভীষণ মুড। ধরুন হারমোনিয়াম। এখনই গান লিখব।

সুধীনবাবু বললেন, ধুর! এ আবার সুর নাকি? মামুলি ব্যাপার। যা মনে আসছিল বাজাচ্ছিলাম। আমি অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম, না না, সময় নষ্ট নয়। বাজান হারমোনিয়াম। অগত্যা উনি হারমোনিয়ামে হাত দিলেন। তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলতে পেরেছিলাম 'এত বড় আকাশটাকে ভরলে জোছনায়/ওগো চাঁদ এ রাতে আজ তোমায় বোঝা দায়।'

বোধহয় পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সমস্ত গানটা বানানো হয়ে গেল। এমনকী একটা সঞ্চারীও আমরা যোগ করলাম। এই গানটা পরে অরুন্ধতী হোমচৌধুরী এইচ. এম. ভি.-তে রেকর্ড করেন। আমি প্রায়ই এ গানটার উদাহরণ দিয়ে সুধীনবাবুকে বলতাম, এ রকম কত সুরই তো আপনি মামুলি বলে ফেলে দেন। কিন্তু সে কথা আমি মানতে সবসময় রাজি নই। এ ভাবেই আমরা সৃষ্টি করেছিলাম শিপ্রা বসুর বিখ্যাত গান 'এই জন্মে যদি মরণ হয় কোনও দিন/মরি যেন ভালবাসাতে।' মনে পড়ছে দীনেন গুপ্তর 'বসন্ত বিলাপ' ছবির গান লেখার সময়ের ঘটনা। ছবিটিতে আমাদের চারটে গান ছিল। চারটেই হিট হয়। আরতির গলায় 'এক চড়েতেই ঠাণ্ডা/ধেড়ে খোকাদের পাণ্ডা।' আরতির আরও একটি গান 'আমি মিস ক্যালকাটা।' মান্নাদার গলায় 'আগুন—লেগেছে লেগেছে আগুন' এবং আরতি আর সুজাতার গলায় 'ও শ্যাম যখন তখন/খেলোনা খেলা অমন।'

প্রথম গানটি অর্থাৎ 'এক চড়েতেই ঠাণ্ডা' ওটি কিন্তু ছবির স্ক্রিপ্টে ছিল না। সিচুয়েশনটা ঠিক করে দিলেন সুধীনবাবু। আমরা সবাই তাতে সায় দিয়েছিলাম। মান্নাদার 'আগুন লেগেছে আগুন' গানটি আমরা করেছিলাম মান্নাদারই 'লাগা চুনারি মে দাগ' থেকে অনুপ্রাণিত হয়। ভারতবর্ষে তারানা গাইতে মান্নাদা প্রায় অদ্বিতীয়। মান্নাদার এই ক্ষমতাটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে ছিলাম।

সলিল চৌধুরীও একবার তাই করেছিলেন। 'মর্জিনা আবদল্লা'-তে 'বাজে গো বীণা' গানটিতে। গানগুলো রেকর্ডিং হয়েছিল কলকাতাতেই, মুম্বইতে নয়। কী ভাল রেকর্ডিং হত তখন এখানে।

এবার মনে পড়ছে আমার নিজের কাহিনীর ছবি 'প্রান্ত রেখা'-র কথা। এই ছবিরও পরিচালক ছিলেন দীনেন গুপ্ত। যাতে মান্নাদার হিট গান লিখেছিলাম—'যে কদিন আকাশ দিয়ে/দল বেঁধে যায় হাঁস/যে কদিন শিমুল তলায় দাঁড়ায় ফাগুন মাস।'

এই প্রসঙ্গে মনে এল 'অপরাজিতা' ছবিতে আমার লেখা এবং আরতির গাওয়া একটা গানের কথা। গানটি ছিল 'একটি মেয়ের স্বপ্ন ছিল কেউ তা মানে না। হাসতে গিয়ে কাঁদলো কত কেউ তা জানে না।' ছবিটা একেবারেই চলেনি। কিন্তু এ গানটা জনপ্রিয় হয়েছিল। বাকি গানগুলো কিন্তু আমার মনে নেই। নিশ্চয় সে গানগুলোতে আমার কিছু খামতি ছিল।

'তিন ভুবনের পারে' ছবিতে আরতির জন্য লিখেছিলাম 'কোনও এক চেনা পথে/যেতে যেতে একদিন/পথ বলে অরণ্যে যাব।' গানটি লেখা শেষ হতেই সুধীনবাবু বললেন, আজ থাক। কাল একটা এক্সপেরিমেন্টাল গান নিয়ে আপনার সঙ্গে বসব। সুধীনবাবুর মুখে এ কথা শুনে আমি তো সারা রাত ভাল করে ঘুমাতেই পারলাম না। পরদিন সকালে আর কিছু লেখা হল না।

কেবল ঘড়ি দেখছি কখন সুধীনবাবুর বাড়ি যাবার সময় আসবে।

যথাসময়ে হাজির হলাম। সুধীনবাবু বললেন, এখন তো 'সাউন্ড অন সাউন্ড' এখানেও রেকর্ডিং করা যাচ্ছে। ওটাই কাজে লাগালে হয় না? এমন একটা বিষয় নিয়ে গান লিখুন যাতে প্রমাণ করা যায় শুধু স্টান্ট দিতে নয়, শুধু গিমিক দিতে নয়। এই বিশেষ যান্ত্রিক মিক্সিং-এর খেলাটা যেন মনে হয় অনিবার্য। সেরকম ভাবে গানটি লিখুন।

ব্যাপারটা আমি বুঝে নিলাম। বললাম, যেমন সত্যজিৎ বাবু টেপের স্পিড পরিবর্তন করে 'গুগা বাবা'তে ভূতের কণ্ঠ তৈরি করেছেন। শুনে মনে হয়েছিল ভূতের গলাটা বোধহয় এই রকম। সত্যিকারের ভূতরা বোধহয় এই স্বরেতে গান করে কথা কয়। এটা একেবারেই সত্যজিৎবাবুর গিমিক বা স্টান্টবাজি নয়। এটা ওঁর সার্থক চিন্তা।

সুধীনবাবু বললেন, ঠিক এই রকমই আসুন আমরা কিছু করি। এখন ভাবি সে সময় একটা গানের জন্য সুরকাররা কত ভাবতেন। এখনকার মতো কোনও রকমে একটা গান খাড়া করেই কাজ শেষ করতেন না। আমি সুধীনবাবুর ওই চিন্তাটা যাতে সার্থক হয় তার জন্য লিখে ফেললাম 'দূরে দূরে/কাছে কাছে/এখানে ওখানে/কে ডাকে আমায়।' প্রথম 'দূরে দূরে'র পর প্রতিধ্বনি হয়েছিল—'দূরে দূরে'। প্রথম 'কাছে কাছে'র পর প্রতিধ্বনি হয়েছিল 'কাছে কাছে'—যাঁরা শুনেছেন—নিশ্চয়ই তাঁদের মনে পড়ছে।

এই কলকাতার টেকনিসিয়ান্স স্টুডিয়োতেই শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায় গানটি অপূর্ব রেকর্ডিং করেছিলেন। আর তেমনই সুন্দর গেয়েছিল আরতি। গানটিতে লিপ দিয়েছিল তনুজা। গান শুনে তনুজা আমায় বলেছিল, এ ধরনের টেকনিকের গান ভারতবর্ষে প্রথম শুনলাম। যাঁরা এ গান শুনেছেন তাঁরাও আশা করি তনুজার সঙ্গে একমত হবেন।

৩৩

সুধীনবাবু কলকাতায় এসে গানের জগতে যোগ দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্তের সহকারী সুরকার হিসেবে। কমল দাশগুপ্তের কথা ভাবলেই মনে হয় ওঁর প্রাপ্য সম্মান আমরা কি ওঁকে আজ পর্যন্ত দিয়েছি? সুধীনবাবু আমাকে প্রায়ই বলতেন, অমন 'মিউজিক্যাল ট্যালেন্ট' সত্যিই বিরল। কিন্তু এইচ. এম. ভি. কি তাই বলেন বা মনে করেন?

এইচ. এম. ভি.-র বাংলা আধুনিক গান এবং ছবির গানের আসল ভিত যাঁদের রক্তে তৈরি সেই রক্তদানের কতটুকু প্রতিদান এরা দিয়েছেন? ফিরোজা বেগমকে দিয়ে যূথিকা রায় ও বীণা চৌধুরীর অনেক গান গাইয়ে এইচ. এম. ভি. ফিরোজা বেগমকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু ওগুলো যে কমল দাশগুপ্তের গান তা কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

শ্রোতারা চিনেছেন ফিরোজা বেগমকে কমল দাশগুপ্তকে নয়। 'ডাউন মেমরি লেন'-এ ওঁর কিছু গান ঢুকিয়ে ওঁরা বাণিজ্য করেছেন কিন্তু ওই লেনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে যে কমল দাশগুপ্ত তা কি কোনও দিন কোনও শ্রোতা বুঝতে পেরেছেন।

কাজী নজরুলের লেখা কত গান কমল দাশগুপ্ত সুর করেছেন। টোটাল নজরুলগীতি বলতে আমরা যা বুঝি নিশ্চয় সে গানগুলো তা নয়। এ ব্যাপারে একটু গবেষণামূলক কাজ করে গীতিকার কাজী নজরুল এবং সুরকার কমল দাশগুপ্তের পৃথক পরিচয়ে গানের একটি এল পি বা ফোরপ্যাক ক্যাসেটও প্রকাশ করা যায়। এইচ. এম. ভি. তা পারেন।

কমল দাশগুপ্তের শেষ জীবনে ওঁর কিছু ছবিতে গান লেখার এবং ছবির বাইরে আধুনিক গান লেখার সুযোগ আমি পেয়েছি। লক্ষ করতাম কমলদা কোনও দিনও তবলা নিয়ে বা তখনকার চলতি মেট্রোনাম যন্ত্র নিয়ে সুর করতেন না। গানের কথাগুলো আমার মুখে একাধিকবার শুনতেন। তারপর গানের কাগজটা একেবারে চোখের তারার কাছে এনে দেখতেন। মনে মনে গাইতেন। তারপর যেটুকু সুর হল সেটুকু শুধু হারমোনিয়াম বাজিয়ে একবার স্বকণ্ঠে গাইতেন। তারপরই গানের কথার মাথায় লিখে রাখতেন এক বিচিত্র আঁকিবুকি। যার নাম ছিল শর্টহ্যান্ড স্বরলিপি। তখনকার প্রায় সব রেগুলার মিউজিক ডিরেক্টররাই এবং অনেক বাদ্যযন্ত্র শিল্পীরাও এটা শিখতেন এবং ব্যবহার করতেন। তখন তো আর টেপ রেকর্ডারের ব্যবহার শুরু হয়নি। সুতরাং এই শিক্ষাটা তখন ছিল খুবই প্রয়োজনের।

মান্না দে অবশ্য এই টেপ রেকর্ডারের যুগেও ওঁর প্রতিটি গানের কথার উপর আজও লিখে রাখেন এই শর্টহ্যান্ড স্বরলিপি। কমল দাশগুপ্তের একদা সহকারী সুধীন দাশগুপ্তকেও কখনও দেখিনি তবলিয়া নিয়ে গানের সুর করতে। শুধু হারমোনিয়ামই ছিল ওঁর যথেষ্ট।

আমি যাঁদের সুরে গান লিখেছি বা আজও লিখে চলেছি সেই সব সুরকারদের মধ্যে সুর করার সময় অনেকেই সঙ্গতকার নেন না। আমি অন্তত নিতে দেখিনি। যেমন রামচন্দ্র পাল, দক্ষিণামোহন ঠাকুর, খগেন দাশগুপ্ত, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন সরকার, গোপেন মল্লিক, শৈলেশ রায়, কালীপদ সেন, মান্না দে, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, দিলীপ রায়, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, দুনিচাঁদ বড়াল, উত্তমকুমার, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, উস্তাদ আলি আকবর খান, আনন্দশঙ্কর এরকম আরও অনেক নাম করা যায়।

আলি আকবর অবশ্য মাঝে মধ্যে সরোদও বাজিয়ে গেছেন গানের সুর করার সময়। আমি সে সুরের ওপরই গান লিখেছি। রবিশঙ্করও মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম সরিয়ে রেখে সেতার বাজিয়েছেন। গান লিখেছি সেই সেতারের সুরের উপরে। আনন্দশঙ্কর কেবল সেতারই বাজিয়ে গেছেন। গানের কথা লিখেছি সেতার শুনে শুনে। আবার ঠিক তার বিপরীতটাও লিখেছি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরের সঙ্গে গান লিখতে বসে। তবলচি ছাড়া হেমন্তদা গানের সুর করতে বসেছেন এটা কোনও দিনও আমার কষ্টকল্পনাতেও আসবে না।

নচিকেতা ঘোষ এবং ওঁর সুযোগ্য পুত্র সুপর্ণকান্তিও তাই। নচিকেতা ঘোষ অবশ্য দুদিনের দুটি ঘটনায় এর ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। দুবারই তবলচি আসার যখন সময় নয় সেই অসময়েই আমার পকেট থেকে হঠাৎ উদ্ধার করেছেন লিখে রাখা দুটি গান। এবং গান দুটো ওঁর এত ভাল লেগে গেছে যে প্রাণের আবেগকে সংবরণ করতে না পেরে শোবার ঘরের খাটের ওপরেই হারমোনিয়াম তুলে নিয়ে তবলা সঙ্গত ছাড়াই সুর করেছেন আমার লেখা মানবেন্দ্রের বিখ্যাত গান 'ও আমার চন্দ্রমল্লিকা বুঝি চন্দ্র দেখেছে'। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটেছিল আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সেই গানটির সময় 'এক বৈশাখে দেখা হল দু'জনায়'।

আমার দেখা রবীন চট্টোপাধ্যায়ও তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দীর তবলা না শুনে কোনও গান সুর করেননি।

শ্যামল মিত্রও ওইভাবে সুর করতেন। এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও। আর মুম্বইয়ের অরূপ-প্রণয় আর জগজিৎ সিং ছাড়া রাহুল দেববর্মণ, বাপি লাহিড়ি, যতীন-ললিত গায়িকা হেমলতার অগ্রজ বিনোদ ভাট, রবীন্দ্র জৈন, উষা খান্না, বাবুল বোস, উত্তম সিং এবং নৌশাদ সাহেবদের সঙ্গে গান লিখতে বসে শুধু একাধিক তবলা ঢোল নয়, একাধিক গিটার, পারকারসান ইত্যাদি রিদম ছাড়া কারও কোনও সিটিং-এ আমি গান লিখিনি।

মাদ্রাজের রমেশ আইয়ার, বিখ্যাত ভি বি কৃষ্ণমূর্তিও কোনও সঙ্গতকার নেন না। বাজিয়ে যান শুধু কি-বোর্ড। ওঁর সুরে আমি লিখেছি বাংলা গান।

ওড়িশার অনেক দ্বিভাষিক ছবিতে আমি গান লিখেছি। ভুবনেশ্বরের প্রফুল্ল কর, তাঁর

সঙ্গে যে কটি ছবিতে আমি গান লিখেছি সব কটি ছবির গান লেখার সময় হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছেন আমার সঙ্গে।

আবার ভুবনেশ্বরের প্রশান্ত নন্দা বাজিয়ে গেছেন টেপকরা ভায়োলিন ও আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র। তার ওপরেই গান লিখতে হয়েছে।

কটকের অক্ষয় মহান্তি এবং বাসুদেব রথ হারমোনিয়াম এবং সঙ্গতকার নিয়েই গান লিখিয়েছেন আমায়।

উটিতে মিঠুনের মনার্ক হোটেল মিঠুনের 'ভাগ্যদেবতা' ছবির গান লিখতে গিয়ে সুরকার হিসাবে পেলাম বাঙালি দুই ভাইকে। লন্ডনের এক অনুষ্ঠানে মিঠুন এদের আবিষ্কার করেন। মধু বর্মণ আর গোপাল বর্মণ। উটির সিটিং-এ একভাই গিটার বাজাল। আর এক ভাই বাজাল ঢোল। ওদের গলার ডামি ওয়ার্ডের ওপর কথা বসালাম আমি। গান কেমন দাঁড়াচ্ছে নিজের গলায় আমার কথাগুলো গেয়ে চলল মিঠুন। বাংলা গান পাগল মিঠুন প্রতিটি সিটিং-এ নিজে হাজির থেকেছে। গলা মিলিয়ে গেয়ে গেছে গান। এর জন্য ওর অন্য হিন্দি ছবির শুটিং আটকে যাচ্ছে মিঠুন তার পরোয়াই করেনি। ভাগ্যদেবতার গানগুলো লেখা শেষ হলে আবেগে অস্থির মিঠুন সঙ্গে সঙ্গে ডিমান্ড লাইনে কলকাতায় আমার স্ত্রীকে ফোন করে জানিয়ে ফেললে, বউদি দাদা কী কাণ্ডটা ঘটিয়ে ফেলেছেন। আপনি কালকেই চলে আসুন উটিতে। এসেই নিজে শুনে যান।

বউদি অবশ্য ঘরসংসার আর আদরের নাতনি প্রতীতিকে ছেড়ে উটিতে যেতে পারেননি। তবে বুঝতে পেরেছেন বাঙালি মিঠুনের নিশ্চয় কোনও বাঙালিয়ানা গর্বে বুক ভরে গেছে।

এমন ঘটনা এর আগেও মিঠুন ঘটিয়েছে। মিঠুন তখন উটিতে নয় থাকত মুম্বইতে। হঠাৎ আমায় ফোন করে পরের দিন উড়িয়ে নিয়ে এল মুম্বইতে। বললে, এবার পুজোয় বাংলা গানের ক্যাসেট করব। মুম্বইয়ের বাঙালি সুরকার বাবুল বোস সুর করবে। গান লিখুন। সিটিং-এ এসে মিঠুন হঠাৎ বললে, প্রধানমন্ত্রিত্বটা না হয় ছেড়েই দিলাম। আজ পর্যন্ত একজন বাঙালি কি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন? কেন বাঙালির কারও কি সে যোগ্যতা নেই?

যেখানে গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী তিনজনেই বাঙালি সেখানে বাঙালিয়ানা নিয়ে গান তৈরি করুন। আমি বাংলার বুকের গানই গাইব ক্যাসেটে।

গানগুলো কী করে লিখেছিলাম আমি জানি না। তবে তিনটি গানই আমার বুকে খোদাই করে লেখা হয়ে গিয়েছে। ওদের ভুলব না কোনও দিন। প্রথম গানটি 'বাঙালি কাঙালি নয়/জীবন রসের কারবারি'। দ্বিতীয় গান 'বাঙালির গড়া এই বাংলা/শস্য সবুজ চির শ্যামলা।' তৃতীয় গানটি 'শুধু একটি শহীদ ক্ষুদিরাম'। এই শেষের গানটা মিঠুন মেদিনীপুরের এক অনুষ্ঠানে গেয়েছিল। ওর সেই আবেগ আপ্লুত গান আজও ঘুম না হওয়া গভীর রাতে আমার কানে ভেসে আসে। মিঠুনের এই বাঙালি দরদী মনের পরিচয় সেবারই পেয়েছিলাম যখন ৮০% বাঙালি কর্মচারী নিয়ে উটিতে ওর নিজস্ব ফাইভস্টার হোটেল 'দ্য মনার্ক' খুলল। একবার ওই হোটেল থেকে আমায় ওর গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরের পাহাড় জঙ্গল ঘেরা মাইসোর রোডে ওর নিজস্ব রিসর্টে।

নীলগিরি পাহাড়ের মধ্যে বোক্কাপুরাম মাসিনাগুড্ডি ঠিকানার দ্য মনার্ক সাফারি পার্কে এসে সত্যি চোখ জুড়ানো প্রাকৃতিক পরিবেশে আহিরিটোলার গৌরাঙ্গ অর্থাৎ মিঠুন চক্রবর্তীর ম্যাজিক দেখে কথা হারিয়ে ফেলেছিলাম। যাতে বন্যজন্তুরা রিসর্টে ঢুকে না পড়ে সেইজন্য বিরাট পার্কটিকে স্বল্প ভোল্টেজের বিদ্যুৎবাহি তার দিয়ে ঘিরে রেখেছে মিঠুন। ও আমায় ঘোরাতে ঘোরাতে টারজনের বাড়ির মতো গাছের ওপরে রীতিমতো ফাইভস্টার হোটেলের অনেকগুলো কটেজরুম দেখাতে লাগল। নিয়ে গেল ওখানকার ঘোড়ার আস্তাবলে। চকলেট, সাদা, কালো অনেকগুলো ঘোড়া পর্যটকদের জন্য আস্তাবলে মজুত ছিল। মিঠুন চেঁচিয়ে ডাকল চ-ম-পা। চম্পা ঘোড়াটি উত্তর করল চিহি চিহি। যেন বলল, ভাল আছি ভাল আছি। আবার আরেকটির নাম ধরে ডাকল। সাড়া দিল সেও। জিজ্ঞাসা করলাম, কুকুরগুলো কি মুম্বইতেই রইল? মিঠুন উত্তর দিল, হ্যাঁ, মা বাবাকে পাহারা দিচ্ছে।

ওখানকার মতামতের খাতায় প্রচুর বিদেশি পর্যটকদের লেখা পড়লাম। সকলেরই প্রায় একই উক্তি 'ওয়ান অব দ্য বেস্ট রিসর্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'। মিঠুন ওখানকার তরুণ বাঙালি ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলে উঠল, এর আগেও আমি বাঙালি ম্যানেজার রেখেছিলাম। সে আমার সর্বনাশ করে পালিয়ে গেছে।আমি আবার বাঙালি রেখেছি। আমি জানি এও আমার সর্বনাশ করে পালাবে। তবুও আবার বাঙালি ম্যানেজারই রাখব।

কথায় কথায় কোথা থেকে কোথায় চলে গিয়েছিলাম। এবার আবার ফিরে আসি সুধীন দাশগুপ্তের কথায়। ওঁর যতীন দাস রোডের বাড়ির সামনে একদিন আমি এসে দাঁড়ালাম। প্রচণ্ড গরমের সন্ধ্যা। উদ্দেশ্য গান লেখা নয়। ওঁর বাড়িতে সন্ধ্যায় স্নান করে ফ্রেশ হওয়া। উনি বাড়িই ছিলেন। আমার গাড়ির শব্দটা ওঁর চেনা হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে নামতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, আরে, আসুন আসুন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্যটা জানালাম। আমি স্নান করে পাউডার টাউডার মেখে ঢুকলাম ওঁর দেড়তলার মিউজিক রুমে। বললেন, আশ্চর্য টেলিপ্যাথি। আপনার কথায় ভাবছিলাম।

সুধীনবাবু আমায় একটা সুর শোনালেন। অবশ্যই বিদেশি ঘরানায় কিন্তু বুক ভরানো স্বদেশি মেলোডিতে ভরপুর। আমিও তৎক্ষণাৎ লিখে ফেললাম 'আমি তার ঠিকানা রাখিনি/ছবিও আঁকিনি।'

গানটি শেষ হতে যথারীতি উনি বললেন, কিশোরকুমার দারুণ গাইবেন। কোনও উত্তর করলাম না। শুধু বললাম, আধুনিক গান তো। রেকর্ডের উল্টোপিঠটা বানান। উনি বললেন, আজ থাক পরে।

নাছোড় আমার পাল্লায় পড়ে আবার ধরলেন হারমোনিয়াম। অবশ্য অন্য লয়ে অন্য তালে। লিখলাম 'কথায় কথায় যে রাত হয়ে যায়/কী কথা রাখলে বাকি।' সুধীনবাবু কিন্তু কোনও গানই টেপ করে রাখতেন না। আশ্চর্য স্মরণশক্তি ছিল ওঁর। দুমাস আগে বানানো একটা গান দুমাস পরে গাইলেও একটুও সুরের বিচ্যুতি হত না ওঁর। গান দুটি শেষ হতেই বললাম, কিশোরদার খেয়ালিপনার পেছনে দৌড়ে লাভ নেই। গান দুটি ভাল

হয়েছে। আমি মান্নাদাকে অনুরোধ করব এবার পুজোয় এই গান দুটি যাতে উনি রেকর্ড করেন। মান্নাদা আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। সেবার পুজোর রেকর্ডে গেয়েছিলেন ওই গান দুটি। এখনও সবাই তা শুনছেন।

৩৪

'তিন ভুবনের পারে' ছবির পর পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্লু অ্যাঞ্জেল-এর ট্রিটমেন্ট দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'নিশিকন্যা' ছবি বানান। কিন্তু যেহেতু বিভূতিভূষণের কাহিনী সেইহেতু ব্লু অ্যাঞ্জেল-এর আসল নাটকটাই ওখানে দিলেন না। যদি বিভূতিবাবুর গল্পের পরিবর্তন দর্শকরা সমালোচনা করেন এই আশঙ্কায়। আমি বললাম, তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী'-ও ছবিতে বদল হয়ে সুপারহিট হল। তোমার তা হলে আপত্তি কীসের?

আশুতোষ বলল, তারাশঙ্করবাবু জীবিত ছিলেন। কিন্তু বিভূতিবাবু নেই। ওঁর অনুমতি ছাড়া কোনও পরিবর্তন আমি করতে পারব না। নীতিগতভাবে ব্যাপারটা অবশ্য আদর্শ। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে নয়। তাই মিঠু মুখার্জি এবং সৌমিত্র চ্যাটার্জি অভিনীত 'নিশিকন্যা' ফ্লপ হয়ে গেল। কিন্তু ফ্লপ হল না সুধীনবাবুর সুর করা আমার গান। আশাজির গাওয়া 'বেলাবেলি আসতে যদি বধূঁয়া এই ঘরে, লোকের কথায় কান দিয়ো না, পীরিতির পসরা নিয়ে তাকেই খুঁজে মরি।' এ ছাড়া আশাজি আর রুমা গুহঠাকুরতার গাওয়া 'ভেঙে যাবে ঠুনকো কাচের চুড়ি যে।' আর মান্নাদার 'ভেবে কে আর ভাব করে হে।' এইসব গান নিয়ে পলিডর রেকর্ডের বাংলা ছবির গানের জন্ম হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সুধীনবাবুর এমন অবস্থা হয়েছিল যে গুণমুগ্ধ মানুষ আত্মীয়স্বজন আর প্রযোজকদের আসা-যাওয়ার জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন উনি। গানের সুর সৃষ্টির সময়ই দিতে পারছিলেন না সুধীনবাবু। অথচ উনি যথার্থ ভদ্রলোক ছিলেন। বাড়িতে থেকে বাড়ি নেই একথা কাউকে বলতে পারতেন না। সেই সময় আমাদের গোপন সিটিং-এর জায়গা ছিল আরতি মুখার্জির হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি। যেখান সুধীনবাবু ছাড়া আর কেউ থাকত না। কেউই জানত না আমাদের এই অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা। ওখানেই সৃষ্টি হয়েছিল শমিত ভঞ্জের 'জবান' ছবির গান। এই ছবিতে শত্রুঘ্ন, অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র এই সব মুম্বইয়ের নায়করা ছিলেন। ওঁদের ছিল গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স। ওই 'জবান' ছবিতে মান্নাদার একটি গান 'যদি প্রেম করি তুমি আমি'।

ওখানে বসেই পরিমল ভট্টাচার্যের ছবির সুর হয়েছিল এবং উত্তম-সুচিত্রার 'হার মানা হার' ছবির গানও ওখানেই তৈরি। ও ছবির গান সুর করার জন্য প্রযোজকপক্ষ মান্না দে-কে প্রচুর অনুরোধ করেছিল। কিন্তু মান্নাদা রাজি হননি। তিনি ছবির কাজটি পাইয়ে দিয়েছিলেন সুধীন দাশগুপ্তকে। ওখানে ওই আরতির বাড়িতে একদিন পড়ন্ত বিকেলে পৌঁছে শুনলাম সুধীনবাবুর আসতে আজ একটু দেরি হবে। আমায় অপেক্ষা করতে বলেছেন। অগত্যা আরতির সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে সময় কাটাচ্ছিলাম। পশ্চিমের জানালা দিয়ে গোধূলির রঙিন আলো আরতির চোখে-মুখে লাগছিল। আরতি একটু ভিন্ন

আরতি হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। বলল, পুলকদা আমার ভাল লাগছে না, কিছুই ভাল লাগছে না। আমি চমকে উঠে বললাম, সে কী! তুমি তো এখন এখানকার সবথেকে জনপ্রিয় গায়িকা। তোমার অ্যাচিভমেন্ট তো সাঙ্ঘাতিক। তোমার আবার কীসের দুঃখ। চোখের তারায় একটা আলোর দ্যুতি ঝিলিক দিল আরতির। এটা আনন্দ না কান্নার বুঝলাম না। ও বলল, না পুলকদা, না। সে আমি কিছুতেই খোলাখুলি বলতে পারব না। বোঝাতে পারব না। আপনি তো সবারই মনের কথা বোঝেন। গানে তাই তো লেখেন। সবারই মনের সঙ্গে মিলে যায় বলেই তো আপনার গান এত হিট হয়। সেই আপনি বুঝছেন না। তখন সত্যিই বুঝিনি কী চায় আরতি? অন্য ঘর? অন্য সংসার? অন্য স্বামী? না কি একটি সন্তান? সব মেয়েরাই তো যুগে যুগে এইসবই কামনা করে।

এ ঘটনা কাউকে কোনওদিন বলতে পারিনি। আজ বহুদিন বাদে বলে ফেললাম। জানি না বলা উচিত হল কি না। সেই নির্জন কক্ষে পরিচিত এক আরতি মুখার্জির চেহারায় আমি দেখেছিলাম অচেনা-অজানা আশ্চর্য আর এক আরতি মুখার্জিকে। কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। ধরতে পারিনি ওর কথার অর্থ। বুঝতে পারিনি ওর চোখের চাউনির আসল মানে। এসবই আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল বেশ কয়েকবছর পর। আরতি মুখার্জি-সুবীর হাজরার বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায়।

ওই 'হার মানা হার' ছবিতে আরতির ওখানে বসেই লিখেছিলাম 'আমি যেন তারই আলো হতে পারি।' সুধীনবাবুর সুরে গানটি গেয়েছিল আরতি। পর্দায় এ গানটি শোনা গিয়েছিল সুচিত্রার ঠোঁটে। ওই ছবিরই গান উত্তমকুমারের ঠোঁটে মান্নাদার গাওয়া গানটি লিখেছিলাম 'এসেছি আমি এসেছি।' আরতির গলায় আর একটি গান ছিল 'এই আকাশ নতুন বাতাস নতুন সবই তোমার জন্য'।

তখনও ভাবিনি আরতির অন্বেষণ সার্থক হবে। আরতি প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। আজকাল বহু কপি সিঙ্গারই আরতির বহু গান গেয়ে শোনান। এমনকী ক্যাসেটেও। কিন্তু একজনও কি আমার লেখা এবং নচিকেতা ঘোষের সুর করা 'ধন্যি মেয়ে' ছবির গান 'যা যা বেহায়া পাখি যা না' গানটি গাইতে সাহস করেন। এখানেই আরতি অনন্যা অদ্বিতীয়া। ঠিক তেমনি যে সন্ধ্যা মুখার্জি বড়ে গোলাম আলির সামনে খেয়াল গাইবার যোগ্যতা রাখেন সেই সন্ধ্যার 'সপ্তপদী' ছবিতে 'না, না, তুমি। না না তুমি বল' এই সুরের অভিনয়ের অভিব্যক্তিটি ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন কি কোনও একজন সন্ধ্যার কপি সিঙ্গার। এখানেই সন্ধ্যা অনন্যা, অদ্বিতীয়া।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি, ঠিকানাটা অবশ্য মুম্বইয়ের জুহু সেন্টুর হোটেলের একটি সুসজ্জিত ঘর। সময় ১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যরাত। চম্পক জৈনের ভেনাস রেকর্ডের গজল শিল্পী তালাত আজিজের একটি ক্যাসেট রিলিজের বিশাল পার্টি। ওখানেই মুম্বইয়ের সৌরীন বড়াল আমায় প্রশ্ন করলেন, দাদা বলুন তো কোন বিখ্যাত কৌতুক গায়কের পল্লী অঙ্গের আধুনিক বাংলা গান হাস্যরসে নয়, আন্তরিক মানবিক পরিবেশনাতেই সুপারহিট?

প্রশ্নটা শুনেই ওই সুন্দর পানাহারের মজলিশেও কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মন চলে গেল টালিগঞ্জের নিউ থিয়েটার্সে। বললাম, 'বিরাজ বৌ' ছবিতে রাইচাঁদ

বড়ালের সুরে কমিক গানের বিখ্যাত শিল্পী রঞ্জিত রায়ের কণ্ঠে একটি গান ছিল । গানটা হচ্ছে 'এই না জলের আরশিতে তুই দেখতে পেলি কারে/তাই বুঝি তুই চার ফেলেছিস ধরবি বলে তারে' খুব সম্ভব গানটি প্রণব রায়ের রচনা।

আমি জিতে গেলাম। এবার ওখানে উপস্থিত হুগলির গলরগাছা নিবাসী উত্তমের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের খোকাবাবুর বিখ্যাত অভিনেতা জহর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করলেন, বলুন তো রাইবাবুর সুরে উৎপলা সেন কোন ছবিতে পল্লীগীতি গেয়েছেন? আমি বললাম, বিমল রায়ের 'অঞ্জন গড়' ছবিতে গানটি ছিল 'পরাণ বধুয়ারে'।

এই সে দিন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়ো থেকে পায়ে হেঁটে আসছিলাম। টালিগঞ্জের নানুবাবুর বাজারের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। একটা মটরবাইক তীব্র আওয়াজ করতে করতে চলে গেল । ঠিক এইখানটায় যেখানে তখনও ভাল বাঁধানো রাস্তা হয়নি। ট্রাম ডিপো পর্যন্তই তখন শহরতলির শেষ ছিল। সেখানেই এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে মানসচক্ষে দেখলাম প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে গেল একটা মটরবাইক। মটরবাইকটা এখানে এসেই জার্ক খেল । ছিটকে পড়লেন পেছনের এক আরোহী। ভাগ্য ভাল ওঁর আঘাত নিতান্ত মামুলি ছিল। কিন্তু উনি যে পড়ে গেছেন সেটা বুঝতেই পারলেন না মটরবাইক চালক। আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই কলকাতায় ভীতিপ্রদ মটরবাইক চালাতে দেখেছি সাধারণ তিনটি শ্রেণীকে। এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্জেন্ট, দুই অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশানের মেম্বারের বন্ধ হয়ে যাওয়া গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ানো মটর মেকানিক, তিন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির যন্ত্রবিদ। দু-একজন ডাকাবুকো বাঙালি এরপর ক্রমে ক্রমে মটরবাইক চালাতে শুরু করেন। জীবনে আমি প্রথম মটরবাইক চাপি রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে। সঙ্গে গাড়ি ছিল না। অথচ প্রয়োজন ছিল খুব তাড়াতাড়ি গড়িয়াহাট যাওয়ার। রীতিমতো ধমক খেয়ে ইষ্টনাম জপতে জপতে উঠেছিলাম ওই ভয়াভয় যন্ত্রটিতে। পেছনে বসে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। সামনের চালক মানুষটিকে লজ্জা শরম ভুলে রীতিমতো জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম। চালকটি কে ছিল জানেন? উনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কণ্ঠশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস অর্থাৎ জর্জদা। জর্জদা ধমক দিয়ে আমার পৌরুষকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আজকাল মেয়েরা চাপছে আর তুমি পারবে না? পরে আরও কয়েকবার জর্জদার বাইকের পেছনে উঠেছি। আর ভেবেছি কই আর কোনও কণ্ঠশিল্পী তো এই যানটি ব্যবহার করেননি।

সব দিক থেকেই জর্জদা ছিলেন তুলনাহীন।

নিউ থিয়েটার্সে পঙ্কজ মল্লিকের ছায়াসঙ্গী বিমলভূষণ কিছুদিন আগে আমায় বলেছিলেন কুন্দনলাল সায়গল মটোরবাইক চালিয়েছেন। একদিন পঙ্কজবাবুর সঙ্গে গাড়ি ছিল না। সায়গল সাহেব ওঁকে বললেন, চলো, আজ আমার নতুন মটরবাইকে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি যতীন দাস রোডে ফিরব। সায়গল সাহেব আর মদিরা যেন মেড ফর ইচ আদার। উনি প্রায় সর্বক্ষণই সেই রসে সিক্ত থাকতেন। পঙ্কজবাবু সেই ভয়ে ওঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন না। সায়গল সাহেব নাকি বলেছিলেন, পঞ্জাবে মেয়েরা বাইক চালাচ্ছে আর তুমি পিছনে চাপতে ভয় পাচ্ছ? তখন বাধ্য হয়ে উঠেছিলেন পঙ্কজবাবু। ওই চণ্ডী ঘোষ রোডে নানুবাবু বাজারের ঠিক সামনে পঙ্কজ মল্লিককে ফেলে

সজোরে চলে গিয়েছিলেন কে এল সায়গল। বাড়ি গিয়ে হুঁশ হল কোথায় গেল পঙ্কজ মল্লিক? তখন তো টেলিফোনের এত সুবিধা ছিল না। তাই পরদিন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতে এসে সায়গল সাহেব পঙ্কজবাবুকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পঙ্কজ কাল কখন তুমি নেমে গেলে? পঙ্কজবাবু বলেছিলেন, নেমে যাইনি। পড়ে গিয়েছিলাম। এই দেখ হাতে পায়ে কাটা ছড়ার দাগ। খুব বেঁচে গেছি হাত পা ভাঙেনি।

সায়গল সাহেব সব শুনে হাসিমুখে গুনগুন করে গেয়েছিলেন, 'প্রেমের পুজায় এইতো লভিনু ফল।'

সেদিনের আড্ডায় বিমলভূষণ আরও একটি দারুণ ঘটনার কথা বলেছিলেন। সে ঘটনাটি আপনাদের সকলকে শোনানোর লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

বেতারের ১৯২৬ সালে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি ৬ নং টেম্পল স্ট্রিটের টপ ফ্লোর থেকে ১৯৩০ সালে উঠে এল গার্স্টিন প্লেসে। নামকরণ হল ইন্ডিয়ান ট্রেড ব্রডকাস্টিং সার্ভিস। ১৯৩৯ সালে সায়গল সাহেব তখনকার দিনে সারা ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক ৪০০ টাকা নিয়ে রাস পূর্ণিমা অনুষ্ঠান করেছিলেন। ওইখানেই এক রাতে সায়গল সাহেব প্রিয় শ্রোতাদের জন্য পরিবেশন করেন ছায়াছবির বিখ্যাত গান 'এ গান তোমার শেষ করে দাও/নতুন সুরে বাঁধ বীণাখানি।' সেই অলৌকিক কণ্ঠের লাইভ ব্রডকাস্ট আমি শুনেছি মনে মনে। রবীন্দ্রনাথের 'কোথায় আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা/মনে মনে' ঠিক সেই ভাবেই আমি শুনেছি এই গান। বিমলবাবুর কাছেই কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে একটা ঘটনা শুনেছি। তখনকার এইচ. এম. ভি.-র অফিস ছিল চিৎপুরের গরানহাটায় 'বিষ্ণু ভবন'-এ।

তখনকার 'টপ আর্টিস্টে'র মেয়েদের তালিকায় ছিলেন—আশ্চর্যময়ী দাসী, আঙুরবালা, ইন্দুবালা ইত্যাদিরা। সুদূর ঝরিয়া থেকে এসে তখন এক আশ্চর্য সুকণ্ঠী শিল্পী এইচ.এম.ভি.-তে যোগদান করেন। ওঁর পদবি কী হবে, যখন ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছেন না কেউ, শুনেছি তখন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলামই নাকি ওঁর পদবি ঠিক করে দেন—'ঝরিয়া'। 'কমলা দাসী' হয়ে যান বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী 'কমলা ঝরিয়া'। বাসস্থানের নামে শিল্পীর পরিচিতি সম্ভবত বাংলাগানের জগতে আর কারও নেই। তখনকার অধিকর্তা ছিলেন হেম সোম। হেম সোম ছিলেন রেবা সোমের পিতা। যিনি সে সময় রেকর্ডে 'নন্দদুলাল আয়রে আয়/ গোঠের বেলা যায়' গেয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন। কাজী সাহেব তখন দিন রাত এইচ. এম. ভি.-তে বসেই গান লিখতেন সুর করতেন। হঠাৎ একদিন নিখোঁজ—বেপাত্তা। হঠাৎ করেই একদিন আবার এইচ এম ভি অফিসে ফিরে আসেন। তাঁকে দেখে হেম সোম সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলেন?

কাজী সাহেব উত্তর করলেন, গিয়েছিলাম গুরুদেবের কাছে শান্তিনিকেতনে। কথায় কথায় গুরুদেব কী বললেন জানো? বললেন, তোমাদের মণ্টু নাকি আজকাল খুবই হাস্যাস্পদ হচ্ছে। (মণ্টু অর্থাৎ গায়ক সুরকার গীতিকার দিলীপ কুমার রায়, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র। ওঁরই ছাত্রী উমা বসুর ডাক নাম ছিল হাসি। ওঁদের অ্যাফেয়ারটা শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের কানেও পৌঁছে গিয়েছিল। উনি তাই কাজী সাহেবকে

'হাসি'-র ব্যাপারে বলেছিলেন হাস্যাস্পদ)। কাজী সাহেব হো হো করে দিলখোলা হাসতে লাগলেন, বললেন, শুনলে তো গুরুদেব কেমন হাসিকে হাস্যাস্পদ করে দিলেন।

৩৫

কাজী সাহেবকে নিয়ে আরও একটু আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি কাজী সাহেবের স্বভাব ছিল মাঝে মধ্যে বেপাত্তা হয়ে যাওয়া। উনি বেপাত্তা হলে স্বভাবতই গ্রামাফোন কোম্পানির কাজকর্ম ব্যহত হত। একবার কাজী সাহেব ফিরে আসার পর হেম সোম অভিমানে বলেছিলেন, বেশ তো ছিলেন শান্তিনিকেতন। আবার অশান্তি ঘটাতে এখানে ফিরে এলেন কেন?

কাজী সাহেব বললেন, কী করব। মনটা হঠাৎ আকুলি বিকুলি করে উঠল বিজটুর জন্য (এইচ এম ভি-র বাড়ি বিষ্ণু ভবন। তাই উনি বলতেন বিজটু)। হেমবাবু বললেন, বিজটু অর্থাৎ দুটো মৌমাছির মৌ-এর জন্য আপনার মন কেমন করল তো? এবার আমরা যদি আপনাকে 'বিষটু' দিই অর্থাৎ পরিবেশন করি বিষের ঝোল, তা হলে অনুগ্রহ করে গ্রহণ করবেন তো? কাজী সাহেব আবার হো হো করে পরিচিত সেই দিলখোলা হাসিটি দিয়ে উত্তর দিলেন, 'কদম বুশি আস সালাম/তাইতো ছুটে আসলাম/গরল পানে গর রাজি নয়/কাজী নজরুল ইসলাম।'

সত্যি ভাবলে রোমাঞ্চ লাগে। কী অপূর্ব ছিল এই বাংলা গানের জগৎ আর সেখানকার বাসিন্দারা। যাই হোক আবার ফিরে আসি নতুন এক কথায়। সেদিন হঠাৎ টেলিফোন পেলাম। 'আমি বলছি। আমিও শেষটায় লেজ কাটলাম।' আমি কিছুই বুঝলাম না কে কার লেজ কাটল। আমাকে নিরুত্তর দেখে ও প্রান্ত থেকে জবাব এল আমি বীরেশ্বর সরকার বলছি, উত্তম-অপর্ণাকে নিয়ে 'সোনার খাঁচা' নামে একটি ছবি করছি। খোকাবাবু (অগ্রদূত) পরিচালনা করবেন। আপনাকে গান লিখতে হবে। আসুন দ্বিজেন মুখার্জির শ্যামপুকুরের বাড়িতে।

নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে গেলাম। ঘনিষ্ঠ সুহৃদ দ্বিজেনবাবুর নীচের ঘরে বিখ্যাত বি. সরকার জহুরির দোকানের মালিক বীরেশ্বর সরকার আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দ্বিজেনবাবু বসে ছিলেন। আমার আসার পরই দ্বিজেনবাবু বললেন, আমার একটু অন্য কাজ আছে, আমি ঘুরে আসছি। চা-টা সব সময়মতো আমার কাজের লোক দিয়ে যাবে।

দ্বিজেন মুখার্জি চলে গেলেন। বীরেশ্বরবাবু ওঁর স্বরচিত কাহিনীর চিত্রনাট্যটি শোনালেন টেপ রেকর্ডে। আমি শুনলাম। উনি বললেন, সুরগুলো আমি 'ডামি বোল' দিয়ে বানিয়ে রেখেছি। আপনি সুরের উপর মিটারে লিখে দিন। দেখলাম উনিও সুধীন দাশগুপ্তের মতো কট্টর মিটারবাদী। এতটুকুও কমপ্রোমাইজে রাজি নন। শোনালেন ডামি বোলে প্রথম গানটি। গানটি ছিল 'এই হায়রে কলকাত্তা/দিল মেরা বেপাত্তা।' ছবির সিচুয়েশন, নাটক সব মিলিয়ে যথারীতি আমি ওই সুরের মিটার বজায় রেখে লিখলাম গানটির মুখড়া 'এই হায়রে কলকাত্তা/দিল মেরা বেপাত্তা'—আমার কলমে হল 'কে জানে ক ঘণ্টা/পাবে রে জীবনটা/যেটুকু চোখে পড়ে মনে ধরে নিয়ে যা/যে মনে মন

দিতে চাস দিয়ে যা।' পুরো গানটি হয়ে যেতেই বীরেশ্বরবাবু বার কতক গাইলেন তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, মান্না দে কবে আসছেন? একটা ডেট নিতে হয়। এদিকে আমি তখন একটা অদ্ভুত অন্তর্জ্বালায় দিন কাটাচ্ছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় 'বিকেলে ভোরের ফুল' ছবির গান লিখছিলাম হেমন্তদার বাড়িতে। সে সময় ওখানে হেমন্তদার পরিচিতা একজন প্রশ্ন করলেন, হেমন্তদা এখন উত্তমকুমারের কোন ছবিতে আপনি গাইছেন? হেমন্তদা প্রশ্নটি ঘুরিয়ে দিলেন আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, পুলক, উত্তমের লিপে কোন ছবিতে আমি গাইছি? তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, এই তো 'বিকেলে ভোরের ফুল' ছবিতে। মহিলা বললেন, সে তো রবীন্দ্রসংগীত। আধুনিক কোন গান রিসেন্ট কোন ছবিতে গাইছেন হেমন্তদা? আমি বা হেমন্তদা কেউই এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলাম না। তখন উত্তমের সব ছবিতেই গাইতেন মান্না দে।

আগেই বলেছি 'শঙ্খবেলা' ছবিতে উত্তমের লিপে মান্না দেকে আনার ব্যাপারে আমার সক্রিয় ভূমিকার কথা। কিন্তু এর ফল যে এমন হবে তা ভাবিনি। ভাবিনি, যেখানে উত্তম মানে ছিলেন হেমন্তদা সেখানে এইভাবে সর্বত্র মান্না দের অনুপ্রবেশ ঘটবে। যে নচিকেতা ঘোষ কোনও দিনই মান্না দের গান সহ্য করতে পারতেন না, বলতেন, ওঁর কথা বোলো না। ওঁর গান শুনলেই আমার যাত্রা দলের বিবেকের গানের কথা মনে পড়ে যায়। সেই অন্ধ হেমন্ত-ভক্ত নচিকেতা ঘোষও হঠাৎ 'শঙ্খবেলা', 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'র পর মত বদল করে সব ছবিতেই উত্তমের লিপের জন্য বেছে নিলেন মান্না দেকে। সুধীন দাশগুপ্তের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কমল দাশগুপ্তের অর্কেস্টায় যিনি প্রখ্যাত সেতারবাদক ছিলেন সেই হেমন্ত অনুরাগী পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরে পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'আলো আমার আলো' ছবিতে উত্তমের লিপের জন্য যেই লিখলাম 'এই এত আলো/এত আকাশ আগে দেখিনি।' অমনি পবিত্রদা আমায় বললেন, কী পুলক। মান্নাবাবু গাইলে দারুণ জমবে মনে হচ্ছে না? তোমার কী মত? সুতরাং গানটি গাইলেন মান্না দে এবং দারুণ জমল।

'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিতে উত্তমের একটি গান বাধ্য হয়ে নচিকেতা ঘোষ হেমন্তদাকে দিয়ে গাওয়ালেও পরের পর বহু ছবিতে গাওয়াতে লাগলেন মান্নাদাকে। ফলে 'বিকেলে ভোরের ফুল' ছবিতে শুধু রবীন্দ্রসংগীত নিয়েই সেই সময় সন্তুষ্ট থাকতে হল হেমন্তদাকে। হেমন্তদার বাড়িতে ওই মহিলার প্রশ্ন আমায় যেন তাড়া করতে লাগল। এটা হেমন্তদার ভাগ্য নয়। মনে হতে লাগল আমারই অনধিকার হস্তক্ষেপ। আমি যেন এর জন্য মূলত দায়ী। যে করেই হোক এই দোষ থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ খুঁজছিলাম আমি। আমাকে নিরুত্তর দেখে বীরেশ্বরবাবু বললেন, কী ভাবছেন পুলকবাবু?

আমার চমক ভাঙল। বীরেশ্বরবাবু আবার বললেন, কিন্তু একটা রিসক মনে হচ্ছে। এই তো আর ডি বর্মণ কিশোরকুমারকে দিয়ে 'রাজকুমারী' ছবিতে উত্তমের লিপে সবকটি গানই গাওয়ালেন। কিন্তু একটা গানও চলল না। শ্রোতারা বললেন হেমন্তদা গাইলে চলত। কিশোরদার গলা উত্তমের লিপে একদম মানায়নি। আজ অকপটে স্বীকার করছি। তৎক্ষণাৎ লুফে নিলাম এই সুযোগটা। বললাম, দরকার নেই রিসক নিয়ে। হেমন্তদাই গান করুন। 'কে জানে ক ঘণ্টা' দারুণ গাইবেন হেমন্তদা। বীরেশ্বরবাবুকে আর

ভাববার সময় না দিয়ে ওখান থেকেই ফোন করলাম হেমন্তদাকে। বললাম, হেমন্তদা, বীরেশ্বরবাবু দারুণ সুর করেছেন উত্তমের লিপের জন্য আপনার গান। কবে উনি তোলাতে যাবেন? জবাবে হেমন্তদা বললেন, ওঁকে আসতে হবে না, আমি গান তুলতে যাব।

হেমন্তদার এই অভাবিত প্রস্তাবে বীরেশ্বরবাবু খুশি হয়ে বললেন, তা হলে গাড়ি পাঠিয়েদি? গান তুলে খেয়েদেয়ে যাবেন আমার বাড়ি থেকে। সেদিন রাতে যতটা নিশ্চিন্তে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, জীবনে এমন সুনিদ্রা আর কোনও দিনও আমার হয়নি।

'সোনার খাঁচা'র পর মান্নাদার উত্তমকণ্ঠে গানের মনোপলি ভেঙে হেমন্তদা আবার এসে দাঁড়ালেন। উত্তমের লিপে চলতে থাকল মান্নাদা এবং হেমন্তদা দুজনের গান। 'অমানুষ' ছবিতে শ্যামল মিত্র আবার নিয়ে এলেন কিশোরকুমারকে। শ্যামল মিত্র নিজের মৃত্যুবাণটিকে নিজেই কিন্তু এরই মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এলেন। নিজে উত্তমের লিপে একটিও গান না গেয়ে কণ্ঠশিল্পী এবং সুরশিল্পী শ্যামল 'অমানুষ', 'আনন্দ আশ্রম', 'বন্দি', 'নিশান' প্রভৃতি সব ছবিতেই উত্তমের গানগুলো দিয়ে দিলেন কিশোরকুমারকে। হেমন্তদা হলে একাজটি কখনওই করতেন না। হেমন্তদা খুবই প্র্যাকটিক্যাল ছিলেন। দারুণ দূরদৃষ্টি ছিল ওঁর। তাই ওঁর সুরে 'লুকোচুরি' এবং কিশোরকুমার অভিনীত শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত 'দুষ্টু প্রজাপতি' ছবিতে এবং এমন আরও অনেক ছবিতেই কিশোরকুমার গান গাইলেও দুই-একটি দারুণ সিচুয়েশানে হেমন্তদা নিজেও গেয়েছেন। পুরোপুরি শ্যামল মিত্রের মতো কিশোরদার হাতে সমস্ত অস্ত্র তুলে দিয়ে উনি গায়ক হেমন্তকুমারকে হারিয়ে যেতে দেননি কোনও দিনই। শ্যামল হয়তো সেই সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শুধু সুরকার হিসাবেই উনি বাকি জীবনটা কাটাবেন। কিন্তু তা হল না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ওঁর মুম্বই-এর সুরকার জীবনটাতে তো ছেদ হলই সেই সঙ্গে হয়ে গেল কণ্ঠশিল্পী জীবনেরও প্রায় পরিসমাপ্তি। মুম্বই-এর ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন শ্যামল। এসে একরকম আত্মসমর্পণ করে আমায় বললেন, পুলক আমার জন্য প্লে-ব্যাক আর মিউজিক ডিরেকশনের কাজ দেখ। আমি আবার কলকাতায় কাজ করতে চাই।

অনেক পরিচালক প্রযোজককে বলতেই অনেকেই হাসিমুখে শ্যামলকে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব দিতে রাজি হলেন। কিন্তু প্লে-ব্যাক শিল্পীর ভূমিকা দিতে রাজি হলেন না। কোনও কোনও প্রযোজক পরিচালক আমার মুখের উপর বলে দিয়েছিলেন মিউজিক ডিরেক্টর শ্যামল মিত্র নিজের ছবির বেলায় গাওয়াবেন কিশোরকুমারকে আর আমরা কেন গাওয়াব শ্যামল মিত্রকে? আমরাও নেব কিশোরকুমারকে।

নিজের ভুলেই এই অবলুপ্তির পথে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন শ্যামল মিত্র। জীবনে নেমে এল প্রচণ্ড হতাশা। অপূর্ব গায়ক শ্যামল মিত্র ক্রমশ দূরে হারিয়ে যেতে লাগলেন। সেই সময় ইন্দর সেনের পরিচালনায় আমার কাহিনী নিয়ে 'বন্দি বলাকা' ছবিতে পরিবেশক প্রণব বসুকে আমিই রাজি করিয়েছিলাম শ্যামল মিত্রকে সুরশিল্পী হিসেবে নিতে। ওঁরা নিয়েছিলেন। কিন্তু মোটেও চাননি শ্যামল গান করুন। ওঁরা চেয়েছিলেন কিশোরকুমারকে। এরপর আমিই রাজি করিয়েছিলাম পরিমল ভট্টাচার্যকে 'মায়ের

আশীর্বাদ' ছবিতে সুরকার হিসাবে নিতে। গান রেকর্ডিং হয়েছিল মুম্বইতে। নারী-কণ্ঠে গান গেয়েছিলেন আশাজি। ছেলেদের গান গাইবার কথা ছিল কিশোরদার। যাতে শ্যামল প্লে-ব্যাক করেন তাই আমি সবাইকে মিথ্যা বলেছিলাম কিশোরদা মুম্বইতে নেই, আছেন বাঙ্গালোরে। কিন্তু শ্যামলের গাওয়া গান চলেনি। চলেছিল আশাজির গান।

যাই হোক বীরেশ্বর সরকারের বাকি গানগুলো লিখেছিলাম দমদম এয়ারপোর্টের কাছে ওঁর সুন্দর বাগান বাড়িতে। ওই পরিবেশে গান আপনি এসে যায়। তাই লিখতে পেরেছিলাম 'শুধু ভালবাসা দিয়ে বলে যাই/আমি তোমারে বেসেছি ভাল।' হেমন্তদার কণ্ঠে এ গানটিও খুবই জনপ্রিয় হল।

উত্তমের ঠোঁটে হেমন্তদার 'কে জানে ক ঘণ্টা'ও সুপারহিট হয়ে গেল। অপর্ণার ঠোঁটে ছিল লতা মঙ্গেশকরের গান। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'যা যা ভুলে যা/এ হৃদয়ের যত ব্যথা।' এরপর বীরেশ্বরবাবুর 'মাদার' ছবির জন্য গান লিখেছিলাম। 'সোনার খাঁচা'র গান সুপারহিট হওয়ায় স্বভাবতই বহু প্রযোজক ওঁকে তাঁদের ছবির সংগীত পরিচালনায় দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরবাবু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নিজের ছবি ছাড়া কারও ছবি উনি করবেন না। সংগীত পরিচালনাটা ছিল ওঁর নেশা, পেশা নয়। তখনই এইচ. এম. ভি.-র বহু শিল্পী ওঁকে পুজোর গানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সবাইকে একই উত্তর দিয়েছিলেন উনি। নাছোড় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল ওঁর কাছে। তখন উনি হাসিমুখে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। নিজের ছবি বা নিজস্ব গান ছাড়া অন্য কোনও গানে উনি সুর করবেন না এই ছিল ওঁর প্রতিজ্ঞা।

৩৬

এবার আসি 'মাদার' ছবির সুর করার প্রসঙ্গে। সুর করতে বসে বীরেশ্বরবাবু বললেন, এবার কিন্তু আমার কিশোরদাকে চাই। তখন লক্ষ করেছিলাম বহু সাধারণ গানই কিশোরদার গাওয়ার গুণে অসাধারণ হয়ে যাচ্ছে। শ্রোতাদের প্রথম পছন্দ কিশোরকুমার। আমিও তাই সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করে কিশোরদাকে ভেবেই কলম ধরলাম। অসাধারণ সুর করেছিলেন বীরেশ্বরবাবু। আমার লেখা কিশোরদার প্রথম সুপারহিট গানটি ছিল 'আমার নাম অ্যান্টনী/কাজের কিছুই শিখিনি'। বিদেশি 'ওভার দ্য ওয়েভস'-এর সুরের ওপর কিশোরদা আশার জন্য লিখলাম 'এক যে ছিল রাজপুত্তুর'। লতাজির জন্য লিখলাম 'হাজার তারার আলোয় ভরা/চোখের তারা তুই'। গানগুলো আজও নতুন লাগে।

'মাদার' ছবিতেই একটা গান কিশোরদার কণ্ঠে ছিল। গানটার শুরুতে কোনও বাজনা ছিল না, ছিল শুধু 'আ-হা কী দারুণ দেখতে!' 'মাদার' ছবিতে আমার লেখা মীনা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'আমার তুমি আছো' গানটিও হিট।

'মাদার' ছবির পর বীরেশ্বরবাবু করলেন 'রাজনর্তকী'। লিখলাম সে ছবির গান। এ ছবিতে সুধা চন্দ্রন রাজনর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ছবিতে একটি ভাল গান

গেয়েছিলেন মীনা মুখোপাধ্যায়। 'এসেছে তোমারই রাধা/মঞ্জুল মধু বনে'। লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ছিল 'সেই যদি স্বপনে এলে/এসো নয়নে'। আশা ভোঁসলের কণ্ঠে 'বাঁশরী বাজ না'। এই গানগুলো আমার নিজেরও প্রিয় রচনা।

মনের দিক থেকে বীরেশ্বরবাবু খুবই বড় মাপের মানুষ ছিলেন। সেদিন যখন আমরা গান নিয়ে বসেছিলাম তখন ওখানে আমাকে খুঁজতে হাজির হয়েছিলেন আর এক বিখ্যাত সুরকার রতু মুখোপাধ্যায়। বীরেশ্বরবাবু ওঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। নির্দ্বিধায় শুনিয়েছিলেন আমাদের তৈরি কিন্তু তখনও রেকর্ড না হওয়া নতুন গান। খুব কম সুরশিল্পীই এরকম কাজ করেন। এটা সম্ভব হয়েছিল এ জন্যই যে দুজন সুরকারই ছিলেন নেশায় কাজ করা সুরকার। একজন বি সরকার জহুরির মালিক বীরেশ্বর সরকার আর একজন তখনকার ইনচেক টায়ারস এবং আজকের টাইগার সিনেমা লেসলি হাউসের অংশীদার রতু মুখোপাধ্যায়। আমি যতদূর জানি বীরেশ্বরবাবু নিজের তিনটি ছবি 'সোনার খাঁচা', 'মাদার', 'রাজনর্তকী' এবং মীনা মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান ছাড়া অন্য কারও আধুনিক গান করেননি। তেমনি রতু মুখোপাধ্যায়ও জীবনে কোনও ছায়াছবি করেননি। বা অজ্ঞাত কোনও কারণে তেমন কোনও প্রযোজক পরিচালক পাননি যিনি ওঁকে ছবির গানের সুর করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তবে উনি বেশ কিছু অসাধারণ আধুনিক গান তৈরি করেছেন। যে সব গানের শতকরা পঁচানব্বইটি আমার লেখা। আজকের এই হই হট্টগোল গানের বিরুদ্ধে নির্বাক প্রতিবাদ জানিয়ে উনি আজ সুখের অবসর নিয়েছেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা গানকে দিয়ে গেছেন অনেক সম্পদ।

কুন্দনলাল সায়গলের অগ্রজ আর এক সায়গল সাহেব কলকাতায় তখন 'কোহিনুর রেকর্ড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন। সায়গল সাহেব আমাকে ওঁর বাংলা গানের নিয়মিত লেখক হিসাবে নিয়ে যান। আমি নিয়ে যাই রতু মুখোপাধ্যায়কে। রতু কোহিনুরে তখনকার নামী গায়ক অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়ের গানের ট্রেনিং করেন। গান দুটি লিখেছিলাম ১। 'যেখানে নীল আকাশে', ২। 'কার রিনিঝিনি কাঁকনের ঝঙ্কার'।

এরপর রতুকে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ওঁর পুজোর গান করার জন্য এইচ এম ভি-তে আহ্বান জানান। রতু মুখোপাধ্যায়ের সুর করা আমার গান দুটি ছিল ১। চামেলি মেল না আঁখি, ২। তোমার ভাল লাগাতে।

এবার রতু শ্যামল মিত্রের গান করেন। ১। 'মন মেতেছে নীল আকাশে রাজহংসীর ঝাঁকে', ২। 'সূর্যমুখী সূর্য খোঁজে সুর যে খোঁজে বীণা'। এ রেকর্ডটি বেশ জনপ্রিয় হয়। এরপর মান্না দে-কে আমি অনুরোধ করি রতুর ট্রেনিং-এ গান করতে। মান্নাদার জন্য সেবার লিখেছিলাম ১। 'হৃদয়ের গান শিখে তো গায় গো সবাই', ২। 'দেখি ওই হাসির ঝিলিক/ঝরে চোখের প্রান্তে'। সুপারহিট হয় রেকর্ডটি।

খুব সম্ভব তারপরেই হেমন্তদা ওঁর প্রিয় বন্ধু শান্তি মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে রতুর সুরে গান করতে রাজি হন। হেমন্তদার জন্য দুটো গান আমরা বানিয়ে নিয়ে যথাসময়ে গেলাম ভবানীপুরে শান্তি মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। হেমন্তদার প্রথম গানটি 'বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা'। হেমন্তদা শুনেই বললেন চমৎকার। উল্টো পিঠটা শোনাও। উল্টো পিঠের গান কিন্তু অম্লানবদনে রিজেক্ট করলেন হেমন্তদা। রতু তখন ওঁর স্টক থেকে আমার

লেখা অনেকগুলো গান হেমন্তদাকে শোনালেন। কোনওটাই পছন্দ হল না ওঁর। শেষটায় হেমন্তদা সোজাসুজিই আমায় বললেন, পুলক, তুমি বন্ধুকে ভাল গান দাওনি।

শুনে মর্মাহত হলেন রতু। ভাগ্যক্রমে সেদিন একটি ছোট গানের খাতা সঙ্গে ছিল। ওখানে ছিল রতুর সুর করা আমার একটি গান। শেষ চেষ্টা হিসাবে রতুর সেই গানটি হেমন্তদাকে দেখালাম। উনি পড়েই বললেন, এটা তো আবৃত্তি করলেই হিট হয়ে যাবে। গাওয়ার দরকার নেই। তারপরে হেসে আমায় বললেন, সবাই ঠিকই বলে দেখছি। তোমাকে খোঁচা না দিলে জিনিস বার হয় না। রতুবাবু শোনান সুরটা। দেখলাম জ্বলজ্বল করে উঠল রতুর বিমর্ষ মুখটা। ও সানন্দে গেয়ে শোনাল আমার লেখা গানটি। 'কী দেখি পাই না ভেবে গো/ওই মেঘের কালো বরণ/নাকি তোমার দুটি কাজল কালো নয়ন'?

কিন্তু গোলমাল বাঁধল এইচ. এম. ভি.-তে গানটি রেকর্ড করতে গিয়ে। তখন এইচ. এম. ভি. 'রেকর্ড সঙ্গীত' নাম দিয়ে স্বরলিপি সমেত কিছু গান নিয়ে নিয়মিত একটা পত্রিকা প্রকাশ করত। ওঁরা একটি গানের সম্পূর্ণ রাইট পেলেই তবে সেটা রেকর্ড করবে এই সিদ্ধান্ত নিল। কারণ 'সম্পূর্ণ রাইট' পেলে স্বাভাবিকভাবেই এসে যাবে পাবলিশিং রাইটও। গীতিকারকে আলাদা পয়সা দিয়ে বা অনুরোধ করে সে রাইট নিতে হবে না। আমি এবং আমরা যাঁরা রেডিয়োতে 'ব্রডকাস্টিং রাইট' দিয়ে চুক্তিবদ্ধ ছিলাম তাঁরা স্বভাবতই সম্পূর্ণ রাইট দিতে পারলাম না। এইচ. এম. ভি. তখন আমি, গৌরীপ্রসন্ন, শ্যামল গুপ্ত এবং প্রণব রায়ের মতো বেতারে চুক্তিবদ্ধ গীতিকার ছাড়া যাঁরা তখনও বেতারের অনুমোদন পাননি শুধু তাঁদেরই গান রেকর্ড করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদেই যখন দেখলেন আমাদের গান ছাড়া তেমন সুফল ওঁরা পাচ্ছেন না তখন এই সিদ্ধান্ত ওঁরাই তুলে নিলেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই 'রেকর্ড সঙ্গীত' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা আবার সসম্মানে ফিরে এলাম এইচ. এম. ভি.-তে।

যাই হোক, ওই গণ্ডগোলের মুখে প্রথম পড়ল আমার ওই দুটি গান। যা হেমন্তদার রেকর্ড করার কথা। কিন্তু এইচ. এম. ভি. আন্দাজ করেছিল এ রেকর্ডটি সুপারহিট হবেই। তাই ওঁরা আমায় আলাদাভাবে অনুরোধ করল আমার ছদ্মনামে এ গানটি প্রকাশের অনুমতি দিতে। বন্ধু রতু মুখোপাধ্যায়ের বিমর্ষ মুখটার কথা মনে করে, নিজের নামটি বিসর্জন দিয়ে, আমি এইচ. এম. ভি-র এই প্রস্তাবটি মেনে নিলাম। আমার নাম আর পদবির ইংরেজি দুটি আদ্যাক্ষর দিয়ে ছদ্মনাম বানালাম পি বি। পি বি থেকে নাম করলাম প্রিয়ব্রত। হেমন্তদার ওই সুপারহিট রেকর্ডটির গীতিকার হিসাবে আমার নামের জায়গায় ঝলমল করতে লাগল 'প্রিয়ব্রত'। তখনকার রেকর্ডটির প্রিয়ব্রত নামেতে যদি আমার বন্ধুত্বের বুক ভরা ভালবাসা আমি দেখে থাকি সেটা কি আমার অন্যায় অপরাধ? অবশ্য গান দুটি শুনে আমার বহু অনুরাগী শ্রোতারা আমায় ধন্যবাদ জানালেন। আমি বুঝলাম আমি ধরা পড়ে গেছি। ওঁরা বুঝে নিয়েছেন গানের এই বিশেষ ভঙ্গিমা আমার ছাড়া আর কারও নয়। এই নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু লেখালেখিও হয়েছিল। অচিরেই খুলে পড়ে গিয়েছিল আমার ছদ্মনামের মুখোশ।

এর আগে ও পরে আমার স্বনামে রতুর সুর করা উল্লেখযোগ্য গান হল সুমন কল্যাণপুরের 'মনে কর আমি নেই', 'দুরাশার বালুচরে', 'তোমার আকাশ থেকে',

'বাদলের মাদল বাজে'। মুকেশের গলায় 'দেহেরি পিঞ্জিরায়', 'ওগো আবার নতুন করে'।

রতুর সুরে আমার লেখা আরও অনেক গান সুপারহিট হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মান্না দের 'আবার হবে তো দেখা', 'রিম ঝিম বৃষ্টি', 'রাত জাগা দুটি চোখ', 'অভিমানে চলে যেও না', 'তুমি আঁধার দেখ', 'পার যদি এস ফিরে' এবং শ্যামল মিত্রের গলায় 'চোখের আর এক নাম', 'তোমাকে দূরের আকাশ', প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন যে খুশি খুশি আজ' মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের 'চোখে চোখ রেখে বলতে গেলাম', 'মনে কর মনে মনে', 'আকাশে নেই তারার দীপ' (নির্মলা মিশ্রের)। আমি আবারও বলছি এত অজস্র সুপারহিট গান বানানোর পরেও একটা ছবির সংগীত পরিচালনার সুযোগ রতু পেলেন না। এর কারণ কাকে জিজ্ঞাসা করব? বাংলা গানের শ্রোতাদের? বাংলা ছবির পরিবেশক, প্রযোজক, পরিচালকদের? নাকি রতু আর আমার ভাগ্যকে? জানি না এই জিজ্ঞাসার জবাব কোনও দিন কোথাও পাওয়া যাবে কি না? তবু রেখে গেলাম এ প্রশ্ন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ইচ্ছা করলেই দারুণ গান লিখতে পারতেন। প্রচুর গানের মুখড়া জুগিয়ে গেছেন উনি নিয়মিত আমাদের। ওঁর সঙ্গে যে গীতিকারই যখন কাজ করেছেন এ কথাটা তাঁরা নিশ্চয় মানবেন। কিন্তু হেমন্তদা কেন একটা গানও রচনা কবছেন না আমি বার বার তাঁর কাছে এ প্রশ্ন করেছি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'দেশ' পত্রিকার ছোট গল্পের লেখক হেমন্তদা এর উত্তরে আমাকে প্রতিবারই বলেছেন, সুরকার ও গায়ক আমি দুটোই ঘটনাচক্রে হয়ে গেছি। কিন্তু গীতিকার আর হতে চাই না। তা হলে আমি একটা গণ্ডিতে আটকে যাব। কিছুতেই নতুন দিকের সন্ধান পাব না। এবং তাতে আমার কোনও দিকটাই পূর্ণতা পাবে না।

আগেই বলেছি সুধীন দাশগুপ্ত আর আমার একাত্মতার কথা। বেশ কিছু ভাল গানও সুধীনবাবু রচনা করেছেন। কিন্তু ভরাডুবিও করে ফেলেছেন বেশ কিছু গানে। একদিন বন্ধুবরকে হাসতে-হাসতে বলেছিলাম, আশা ভোঁসলের জন্য 'নাচ ময়ূরী নাচ রে' তো লিখে ফেললেন। কিন্তু একটুও ভেবে দেখলেন কি ময়ূরী নাচে না, নাচে ময়ূর। উনি উত্তর করেছিলেন আপনার মতো শুধু গীতিকার ছাড়া আর কারও চোখে সে ভুল ধরা পড়বে না। আপনি তো এইচ. এম. ভি.-র প্রায়-কর্ণধার পবিত্র মিত্রের লেখা উৎপলা সেনের 'দোলা দিয়ে যায়' গানের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'পলাশ কুমকুম গন্ধে বনছায়' সমালোচনা করে নিজের চরম ক্ষতি করতে বসেছিলেন। আপনার ওপর চটে গিয়েছিলেন এইচ. এম. ভি.। এবার উত্তর দেওয়ার মওকা ছিল আমার। মনে আছে, বলেছিলাম, ছোটবেলায় পড়েছি, 'দেখ না পলাশ ফুল/রূপে নাহি সমতুল/গন্ধ নাহি বলে কেউ/করে না আদর'—এটা কি মিথ্যে হয়ে যাবে নাকি?

আধুনিক গীতিকার যদি পলাশ কুমকুম গন্ধে বন ভরাতে পারেন এটা তাঁর একার কৃতিত্ব। সমগ্র গীতিকারদের চিন্তাভাবনার সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি নয়।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ও গায়ক এবং সুরকার। গীতিকার হতে চাননি হেমন্তদার মতো। দ্বিজেনবাবু আমার গান প্রথম রেকর্ড করেন 'মহিষাসুর বধ' ছবিতে দক্ষিণামোহন ঠাকুরের সুরে।

সেই থেকে আলাপ, সেই থেকে ঘনিষ্ঠতা। একাধারে সংগীত এবং ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ গানের জগতে খুব বেশি নেই। আবার তাঁর মতো হঠাৎ রেগে যাওয়া মানুষও গানের জগতে প্রায় বিরল। বহুদিন আগে যখন ক্রুশ্চেভ-বুলগানিন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তাঁদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তখনকার সেই তরতাজা তরুণ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় তৎকালীন প্রচার ও জনসংযোগের অধিকর্তা মাথুর সাহেবের এক অশোভন উক্তিতে তেড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাথুর সাহেবের ওপর। এর জন্য পরে স্বয়ং বিধান রায় দ্বিজেনকে ডেকে পাঠান জবাবদিহি করার জন্য। দ্বিজেনের মুখ থেকে সব শুনে ডা. রায় যখন বুঝলেন দোষটা মাথুর সাহেবের তখন নাকি দ্বিজেনকে অম্লানবদনে বলেছিলেন, ওহে, তুমি তো বাঙালি। তা ওইটুকুতেই দোষীকে ছেড়ে দিলে কেন? যদিও আইন নিজের হাতে নিতে নেই।

যতদূর জানি দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গান মেগাফোন রেকর্ডে আধুনিক গান। বন্ধু নচিকেতা ঘোষের সুরে। সে গান চলেও ছিল ভাল। তারপর সুরকার গায়ক নচিকেতা ঘোষ এইচ. এম. ভি.-তে যোগদান করলেন। টেনে নিয়ে এলেন দ্বিজেনবাবুকেও এইচ. এম. ভি-তে। সেই সময় দ্বিজেনবাবুর 'আমি কবি এই বিশ্ব জনে'র সমাদৃত হয়েছিল। তারপরেই গাইলেন সলিল চৌধুরীর সুরে 'শ্যামল বরণী তুমি কন্যা' এবং 'ক্লান্তি নামেগো রাত্রি নামেগো'। এই দুটি গানেই রাতারাতি সংগীত রসিকদের মন জয় করে নিলেন দ্বিজেনবাবু। এরপর গাইলেন সলিলদারই সুরে হেমন্তদার বিখ্যাত গান 'কোনও এক গাঁয়ের বঁধুর কথা তোমায় শোনায় শোন'-র একটি প্রতিবাদ সংগীত। সম্পূর্ণ নতুন বিষয়বস্তুর গানটি ছিল 'কে বলে গো গাঁয়ের বঁধূর জীবনের সুখের নীড়ে বসন্ত সেই দোল আনে না আর'। গানটি রচনা করেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর দিয়েছিলেন অনুপম ঘটক। এ গানটি নিয়ে তখন কলকাতার বিদগ্ধ মহলে বেশ একটা চাপান-উতোরের ঝড় উঠেছিল।

তখন দ্বিজেনবাবুকে প্রায় বলতাম, কবে বিয়ের নিমন্ত্রণ খাচ্ছি? হেসে এড়িয়ে যেতেন দ্বিজেনবাবু। একদিন একটি মেয়ের ফটো দেখালেন আমায়। বললেন, অনেক সম্বন্ধই আসছে। এই মেয়েটির নাম সবিতা। দেখতে কেমন? বললাম, ভালই তো।

যথাসময়ে সবিতা দেবীর সঙ্গে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ লিপি পেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার তখন মুম্বই যেতে হল। দ্বিজেনবাবুর বিয়ের বউভাতে হাজির হতে পারলাম না। তার কিছুদিন পরেই গেলাম দিল্লিতে। দিল্লিতে কুতুবমিনার দেখতে গিয়ে দেখতে পেলাম দ্বিজেনবাবুর দেখানো ফটোগ্রাফের সেই মেয়েটিকে। তখন ওঁর কপালে সিঁদুর। কিন্তু দেখলাম দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে নেই। রয়েছেন অন্য মানুষ। ঘনিষ্ঠতা দেখেই বুঝলাম উনি সবিতারই স্বামী। দারুণ খটকা লাগল আমার। তবু কী যেন একটা অসাধারণ

লেখার বিষয় পেলাম আমি। লিখে ফেললাম 'আবার দু'জনে দেখা/যমুনার ওই কিনারে। না না বৃন্দাবনে নয়/নয় ওই ব্রজপুরে/তার চেয়ে কিছু দূরে, কুতুবের মিনারে।'

কলকাতায় এসেই গানটি দিলাম নচিকেতা ঘোষকে। তৎক্ষণাৎ লুফে নিয়ে দারুণ সুর করে ফেললেন তিনি। কিন্তু গানটি লেখার কারণ জানতেই নচিবাবু তাঁর সেই বিখ্যাত হাসিটি হেসে বললেন, ও তুমি তো বিয়েতে ছিলে না। তাই জান না। ওই সবিতার সঙ্গে দ্বিজেনের বিয়ে হয়নি। বিয়ে হয়েছে অন্য সবিতার সঙ্গে। তাই চিঠিতে দেখেছ সবিতারই নাম।

আমি চমকে উঠে বললাম, আরে বাস! এ যে রীতিমতো কমেডি অফ এররস।

সেবারে পুজোর গান হিসাবে নচিবাবু এ গানটি শিখতে ডাকলেন দ্বিজেনকে। দ্বিজেনকে ব্যাপারটা খুলে বলে আবার হো হো করে হেসে নিয়ে গানটা তোলাতে চাইলেন নচিবাবু। দ্বিজেন বললেন, নচি এ গান আমি কিছুতেই গাইব না। এ তোর আর পুলকের বদমাইশি। অন্য গান দে।

আমি রগচটা দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে এড়িয়ে বাড়ি পালিয়ে এলাম। পরের দিন নচিবাবুর ফোন পেলাম। ফোনে বললেন, দ্বিজেন কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। শেষটায় ওর গিন্নি সবিতাকে, সব খুলে বলতে সবিতাই ওকে রাজি করিয়েছে। সবিতা কিন্তু তোমার বিষয়বস্তুকে এবং তোমার লেখাকে খুবই প্রশংসা করেছে। তুমি ওকে ফোন করো।

পরবর্তীকালে দ্বিজেনবাবুর শান্তিনিকেতনের বাড়িতে আমি সস্ত্রীক বেড়াতে গিয়েছিলাম। সবিতাদেবীর সে আন্তরিক আতিথ্য জীবনেও ভুলব না।

আজ উনি নেই। দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ওঁকে অসময়ে পৃথিবী ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন সময়ে ওঁর সুন্দর ব্যবহারের স্মৃতির আঁচড় রয়ে গেছে আমার মনের খাতার পাতায় পাতায়। আমার অনেক গানই দ্বিজেনবাবু গেয়েছেন। তার মধ্যে আমার প্রিয় ওঁর নিজের সুর দেওয়া (১) 'ঝাউ বনটাকে পেরিয়ে'। সতীনাথের সুর দেওয়া (২) 'যেদিন তোমায় আমি দেখেছি।' (৩) 'তুমি এলে কি আমার ঘরে'।

চিনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষের সময় এইচ. এম. ভি.-র বিশেষ নিবেদন ভূপেন হাজারিকার সুরে আমার লেখা 'বড় ভয় ছিল যাবার বেলায়' এবং 'আগামী প্রেমিকা সুখী হয় যদি তাতেই আমরা সুখী'। এরকম আরও বহু গান রয়েছে দ্বিজেনবাবুর। 'দুই নারী' নামে একটি ছবির সংগীত পরিচালনাও করেছিলেন দ্বিজেনবাবু। তাতেও গীতিকার ছিলাম আমি। রেকর্ডিং-এর দিন আঁচ করেছিলাম আমার পেমেন্টের একটা অংশ দ্বিজেনবাবুর জন্য খরচ করতে হবে। রেকর্ডিং-এর পরে আমাদের কোনও হোটেলে যেতে হবে। ওখানে নির্ঘাত যোগ দেবেন নচিকেতা ঘোষ। এই আন্দাজ করে বাড়ি থেকে বার হবার সময় আমার প্রতিবেশী শ্রীমনু বোসকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে হাজির হয়েছিলাম রেকর্ডিং থিয়েটারে। পেমেন্ট পেতেই মনুকে দিয়ে আমার টাকাটা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর দ্বিজেনবাবু আমার আঁচ করা ঘটনাটা ঘটালেন। ফোনে ডাকলেন বন্ধু নচিকেতা ঘোষকে পার্ক স্ট্রিটে। আমিও গেলাম। খাওয়ার-দাওয়ার পর বিল আসতেই দ্বিজেনবাবু দেখিয়ে দিলেন আমাকে। বললাম, টাকা কোথায় আমার?

দেখুন সার্চ করুন।

আমায় রীতিমতো সার্চ করে নিরাশ হয়ে পেমেন্ট করতে হল দ্বিজেনবাবুকে। এখনও এই ঘটনাটা আলোচনা করলেই দ্বিজেনবাবু হাত জোড় করে আমায় নমস্কার করেন।

সেবার মুম্বাইতে গিয়ে সলিল চৌধুরীর সহকারী আমাদের পাড়ার কানু রায়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। কানুবাবু বললেন দ্বিজেন এসেছে সলিলদার হিন্দি ছবি 'মায়া'-তে প্লে-ব্যাক করতে। আছে সলিলদারই আন্ধেরি ইস্টের বাড়িতে। পরদিন ভোর হতে হাজির হলাম সলিলদার আন্ধেরি ইস্টের বাড়িতে।

তখনকার আন্ধেরি মুম্বই-এর নিতান্ত শহরতলি। গ্রাম্য পরিবেশ। সলিলদা থাকতেন একটি বাড়ির দোতলায়। নীচের তলায় প্রায় ধর্মশালার মতো লোকজন। তখন সলিলদার 'মধুমতী' সুপারহিট হয়ে গেছে।

ওপরে উঠে পেলাম সলিলদাকে আর দ্বিজেনবাবুকে। সাদর অভ্যর্থনার পর ব্রেকফাস্ট খাইয়ে সলিলদা বললেন, চলো মোহন স্টুডিয়োতে। কলকাতার পিয়ানোবাদক পুঁটেদা আমার মিউজিক রুমের পার্মানেন্ট হয়ে রয়েছেন। তুমি ওঁর পিয়ানো শুনবে, আমরা কাজ করব। তারপর সন্ধ্যায় তোমাকে আমি চার্চ গেটে পৌঁছে দেব।

আমরা একসঙ্গে নীচে নামলাম। নীচের তলার এক একজন অতিথিকে সলিলদা বলতে বলতে চললেন, আরে বিষ্টু কবে এলে? ও হরিদাস তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? আবার একজনকে বললেন, আরে শোভন তুমি তো আজই চলে যাবে? তোমার জ্যোতিবউদিকে বলো রাতের ডিনারটা যাতে সঙ্গে দিয়ে দেয়।

দ্বিজেনবাবু আমাকে কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, প্রায় মিনি কসবা, সলিলের এখানে প্রত্যহ আসা যাওয়া করে। (মুম্বই যাবার আগে সলিলদা কলকাতার কসবাতে থাকতেন।) দ্বিজেনবাবু বলে চললেন, মুম্বইতে ঘর সংসারের কাজ করা ছাড়া সলিলের বউ জ্যোতির আসল কাজ প্রত্যেক অতিথিকে রোজ ব্রেকফাস্ট খাওয়ানো। এমন লোকও আসে এখানে সলিল যাকে চেনেও না। সবাই আসে কাজের ধান্ধায়। বিরাট মনের মানুষ সলিল চৌধুরী সবাইকে দেন আশ্রয় এবং ব্রেকফাস্ট।

মুচকি হাসলেন দ্বিজেনবাবু। মোহন স্টুডিয়োতে যাওয়ার জন্যে সলিলদার বিরাট গাড়িতে উঠলাম। সলিলদাই চালাতে লাগলেন। আমি পেছনে বসে ছিলাম। হঠাৎ আমাকে বললেন, পুলক, তুমি নাকি গীতিকার শৈলেন্দ্রর থেকে ভাল গাড়ি চালাও। কথাটা বলেই হাসতে লাগলেন। আমরা পৌঁছলাম বিমল রায়ের মোহন স্টুডিয়োতে।

একতলাতেই সলিলদার এয়ারকন্ডিশন মিউজিক রুম। একদিকে পিয়ানো, বঙ্গো, নানা দেশি-বিদেশি বাদ্য যন্ত্র। এপাশে সলিলদার হারমোনিয়াম। মুম্বইতে যার কথ্য নাম পেটি। আর একদিকে রেকর্ডপ্লেয়ার। আলমারিতে সাজানো দেশ-বিদেশের গানের রেকর্ড, অর্কেস্ট্রার রেকর্ড।

পুঁটেদা ওখানে পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন। আমরা চুপ করে সে বাজনা শুনছিলাম। হঠাৎ সলিলদা ওকে থামিয়ে নিজে বসলেন পিয়ানোতে। অদ্ভুত একটা সুরতরঙ্গ তুললেন পিয়ানোতে উনি। সলিলদার দ্বিতীয় সহকারী কানু রায় সেই সুর লিখে নিতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ বাদে থামলেন সলিলদা। তুলে নিলেন একটা বাঁশি। বাজাতে লাগলেন গ্রাম্য সুর। তারপরই আগের পিয়ানোর ওই বিদেশি সুরটা এসে গেল ওঁর হাতের বাঁশিতে। শুরু হল সুন্দর এক অভিনব সংগীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তারপরই কফি এল। কফি খেতে খেতে শুনতে লাগলেন লেটেস্ট একটি বিদেশি এল পি রেকর্ড।

সলিলদার ওই মিউজিক রুম এখন আর নেই। নেই বিমল রায়ের মোহন স্টুডিয়ো। ওখানে তৈরি হয়ে গেছে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। ওখান দিয়ে যেতে যেতে কেউ কেউ হয়তো এখনও শুনতে পান পরিণীতার কোনও কোনও সংলাপ। দেবদাস বা বন্দিনীর কোনও কোনও গান। আমার মতো কেউ হয়তো শুনতে পান পুঁটেদার পিয়ানো, সলিলদার বাঁশি আর হারমোনিয়ামের সুর।

আমি ওখান দিয়ে গেলে এখনও থমকে দাঁড়াই। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করি দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের হিন্দি 'মায়া' ছবির গান। যার পেছনে লতাজির অপূর্ব হামিং, যার ভার্সান সলিলদা নিজেই লিখেছিলেন। হয়তো বুঝেছিলেন তাঁর স্বাধীন মিউজিক রুম একদিন থাকবে না। তাই বোধ হয় লিখে ফেলেছিলেন 'একদিন ফিরে যাব চলে/এঘর শূন্য করে/বাঁধন ছিন্ন করে। যদি পার যেও ভুলে'। কিন্তু সলিলদা আমি ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারব না।

মাদ্রাজে এখনও কিছু কিছু থাকলেও দেশের আর সর্বত্র স্টুডিয়ো থেকে হারিয়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট মিউজিক ডিরেক্টরের মিউজিক রুম। সবাই এখন যার যার তার তার। নির্দিষ্ট মিউজিক রুম এখন সবারই বাড়িতে। স্টুডিয়োতে নয়। সেদিন বিকালে দ্বিজেনবাবু অন্য কোথাও কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টে চলে গেলেন। সারাদিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় সলিলদা চার্চ গেটে আমাকে নামাতে এসে নিয়ে গেলেন চার্চ গেটেরই বাসিন্দা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে। সবিতা তখনও চৌধুরী হননি। বললেন, চলো তোমায় আমার নতুন কিছু বাংলা গান শোনাই। আমার মনে থাকে না, সবিতার সব কণ্ঠস্থ। তখন মুম্বাইতে দীপাবলি আসন্ন। গাড়ি থেকে নামতেই সশব্দে একটা বাজি ফাটল। সলিলদা চমকে উঠে বললেন, এখানকার আতসবাজিতে আলো নেই শুধু আওয়াজ। এখন হয়তো বলতেন, এখনকার হিন্দি ফিল্মি গানে সুর নেই শুধু শব্দ। লিফটে চড়ে আমরা এলাম ওঁদের ঘরে।

৩৮

সলিলদার সঙ্গে আমরা এলাম সবিতা দেবীর ফ্ল্যাটে। সবিতা দেবী এবং তাঁর মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন সলিলদা।

(সবিতা দেবী তখন যত দূর জানি প্রথম স্বামীকে ছেড়ে মুম্বইতে মায়ের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েই আছেন। তখন চৌধুরী হননি।) তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, পুলক এবারের পুজোয় আমার সুরে লতার গান নাকি কলকাতায় দারুণ হিট? খবর পেয়েছ কিছু?

আমি বললাম, শুধু কলকাতায় নয়, সারা ইস্টার্ন জোনে সুপারহিট হয়ে গেছে

আপনার 'সাত ভাই চম্পা জাগরে' গানটি। এরপর সবিতার সুকণ্ঠে শুনলাম সলিলদার নতুন বেশ কয়েকটা গান। কিন্তু কোনও গানই পুরো শোনা হয়নি। কোনওটার শুধু মুখড়া, কোনও কোনও গানের অন্তরা অবধি। রেকর্ড হওয়ার আগে কোনও একটি পরিপূর্ণ গান শুনিনি সলিলদার। প্রায় সব গানেরই শেষ অন্তরা উনি লিখতেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে। স্টুডিয়োতে শিল্পী আসার পর তাকে শেখাতে গিয়ে চমকে উঠে দেখতেন গানটি শেষ করা হয়নি।

সলিলদা অন্যের কবিতায় সুর করেছেন। কিন্তু সব সুরকরা গানই ওঁর নিজের রচনা। আমি বোধহয় সেই একমাত্র ব্যতিক্রমী গীতিকার যার সলিলদার সুরে গান লেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সলিলদার সুরে আমি লিখলাম, 'এই মন মোর জানি না হারালো কোথা যে...।'

যেই প্রথম অন্তরাটি শেষ করেছি সলিলদা বললেন, আজ এই পর্যন্ত থাক পুলক। বাকিটা পরে করব।

আমি বললাম, দোহাই সলিলদা, আমি পারব না। আমায় শেষ করতে দিন।

আমার অনুরোধে বাধ্য হয়ে সলিলদা রাজি হলেন। আমার আর একটি গান 'আমার এ বেদন মাঝে তুমি অশ্রু হয়ে এলে' লেখার সময় ওই একই কাণ্ড হয়েছিল। সেবারও আমার অনুরোধে বাধ্য হয়ে ধৈর্য ধরে উনি হারমোনিয়াম নিয়ে শেষ করেছিলেন গানটি।

সলিলদা ছিলেন প্রকৃত ক্রিয়েটিভ মানুষ। শ্রদ্ধেয় শিল্পী। দুরন্ত এবং দুর্বার। ওঁর সুরের গ্রাফ যদি নেওয়া যায় তা হলেই ওঁর মানসিকতাটিকে সহজেই ধরে ফেলা যাবে। এই আরোহণ, এই অবরোহণ। এই এখানে আবার ওই ওখানে। কোথাও এতটুকু থেমে নেই ওঁর সুর, ওঁর মন। শুধু গতি, অনন্ত গতি।

সলিলদা প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে আমার আর একটি সৌভাগ্যের কথা নিশ্চয় বলতে হয়। সেটি হল সবিতা চৌধুরীর প্রথম বাংলা গান রেকর্ডিং হয় নচিকেতা ঘোষের সুরে। সলিলদাই এটা চেয়েছিলেন। রেকর্ডের একটি গান উনি নিজেই রচনা করেছিলেন 'আঁধারে লেখে গান/হাজারো জোনাকি'। উল্টো পিঠের গানটি আমাকে লিখতে বলেছিলেন সলিলদা স্বয়ং। লিখেছিলাম একটি ছড়ার ঢঙে গান 'ডাগর ডাগর নয়ন মেলে...'।

আমার গান শুনে দারুণ খুশি হয়েছিলেন সলিলদা এবং নচিকেতা ঘোষ দুজনেই। সে সব একটা দিন গেছে আমাদের সংগীত জগতে। আজ সবই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু দিন যাচ্ছে আর দিন আসছে। পুরনো চলে গিয়ে আসছে নতুন। চিরদিনই এই নিয়মে জগৎ চলেছে এবং চলবেও। কিন্তু ওই আসা-যাওয়ার মধ্যে আমরা কী পাচ্ছি। জানি না মথুরা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কীসের বাঁশি বাজিয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালি চিরদিনই বাজিয়েছেন বাঁশের বাঁশি। বিখ্যাত হিন্দুস্তান রেকর্ডের লোগোটাই ছিল বটের ছায়ায় বসে রাখাল ছেলের বাঁশি বাজাবার ছবি।

বেশ কিছুদিন ধরে দেখছিলাম দিনের পর দিন কলকাতায় এই বাঁশের বাঁশিটা গানের যন্ত্রানুষঙ্গ থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। যা বাজছে সবই স্টিলের। অর্থাৎ ইংলিশ বাঁশি। ওই বাঁশিতে বাংলার সেই মেঠো সুর বাজানো অসম্ভব। আর আছে সিনথেসাইজার

অথবা কি-বোর্ডের মাধ্যমে বাঁশি। সেই যান্ত্রিক সুর বাংলার আকাশ, বাতাস, মাটি, নদী কিছুই ছুঁয়ে যায় না। আজও কেন এল না পান্নালাল ঘোষের বাঁশির কোনও উত্তরসূরি? কেন কুমার শচীন দেববর্মণের দুজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ আর গোপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল ত্রিপুরার বাঁশির সেই অন্তরস্পর্শী সুর।

সুরশ্রী অর্কেস্ট্রায় বাঁশি বাজাতেন শৈলেশ রায়। অর্কেস্ট্রার রিহার্সালের ঘর ছিল লেনিন সরণির চারতলার ঘরে। আর ছিল গণেশ অ্যাভিনিউতে ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা ছ' তলায়। কোথাও লিফট ছিল না। ওখানে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে মাঝে মাঝে আমরা উঠতাম। নিয়মিত উঠতেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। হেমন্তদা ওই সময়টাই মুম্বইতে খুবই ব্যস্ত। তাই উনি নিয়মিত নয় মাঝে মাঝে ওই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেন। ন্যাশনাল অর্কেস্ট্রার ঘর ছিল ভবানীপুরে। ওখানেই প্রথম দেখলাম রেডিয়োর বাদ্যযন্ত্রবিদ তারকনাথ দে-র পুত্র বংশীবাদক অলকনাথ দে-কে। মনে আছে সেদিন ছিল সুপ্রভা সরকারের গানের রিহার্সাল। গানটি ছিল আমারই লেখা। ওই অর্কেস্ট্রা রিহার্সালের ওপর ওভারল্যাপ করছিল সুপ্রভা সরকার অর্থাৎ বড়দির কণ্ঠস্বর—ওই অলক ছেলেটি দারুণ বাজায়। বিরাট নাম করবে ওই ছেলেটি। অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল সেই ভবিষ্যৎ বাণী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য অলকনাথ দে চিরতরে চলে গেলেন। সেই সঙ্গে নিয়ে গেলেন ওঁর বাঁশিটি। এইচ. এম. ভি.-তে ছিলেন আর এক কৃতী বংশীবাদক তাঁর নাম কমল মিত্র। আমি খুব অল্প দিনই তাঁকে কলকাতার অর্কেস্ট্রায় দেখেছিলাম, তিনি চলে গিয়েছিলেন মুম্বইতে।

আমাদের গানের জগতে আর একজন দারুণ বাঁশি বাজাতে পারতেন, তাঁর নাম ছিল হিমাংশু বিশ্বাস। শুধু বাঁশি নয়, অন্য বাদ্যযন্ত্রও খুবই দক্ষতার সঙ্গে বাজাতেন। তিনিও চলে গেলেন অকালে। সেই সঙ্গে থেমে গেল তাঁর বাঁশিটিও।

তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দীর ভাই চন্দ্রকান্ত নন্দীও ভালই বাঁশি বাজাতেন। এখনও বাজিয়ে যাচ্ছেন পুলুবাবু, (ভাল নামটি জানি না) ওঁরাও রেখে যাচ্ছেন না উত্তরাধিকারী। কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ অর্থাৎ আমাদের চানুদার বাঁশির ফুঁ-এ যেমন ছিল অন্য মেজাজ তেমনি কথাবার্তায় কাজকর্মেও ছিল অপূর্ব মেজাজ। একবার চানুদা ওঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কুমার শচীন দেববর্মণের আহ্বানে মুম্বই গিয়েছিলেন। শচীনদার ছবির গানে বাঁশি বাজাতে। দাদার স্টেশনে নেমে দেখলেন ওঁকে নিতে লোক এসেছে কিন্তু ওঁকে যেতে হবে ট্যাক্সিতে। শচীনদা ওঁর জন্য গাড়ি পাঠাননি। অভিমানে আহত চানুদা শুধুমাত্র গাড়ি না পাঠানোর কারণে ফিরতি ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। এক মুহূর্তও আর থাকতে চাননি ওখানে।

মদিরায় ওঁর আসক্তি ছিল খুবই বেশি। একবার নাকি কোন এক প্রডিউসার এক হোটেলে পানীয়ের টেবিলে ওঁকে ডেকেছিলেন। আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন চানুদা। ভদ্রলোক চানুদাকে সিগারেট দেন। চানুদা সিগারেট ঠোঁটে লাগান। এরপর ওই প্রোডিউসার ভদ্রলোক নিজের সিগারেটের আগুনে একটা দশ টাকার নোট জ্বালিয়ে

সেই আগুনটা দিয়ে চানুদার সিগারেট ধরিয়ে দেন। চানুদা সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দেন এবং প্রোডিউসারের দিকে একবার তাকান। কিন্তু একটু পরেই আমাদের চানুদা যে কাণ্ডটি করেছিলেন সেটা শচীনদা জীবনে কখনও করতেন না। হয়তো পঞ্চমের দ্বারা সম্ভব হলেও হতে পারত।

পরের বার সিগারেট খাবার সময় ওই ব্যবসায়ী প্রোডিউসারের সিগারেটে চানুদা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার দিনের একটা নতুন কড়কড়ে একশো টাকার নোট পকেট থেকে বার করে। এই রকম মেজাজি ছিলেন উনি।

হিন্দুস্থান রেকর্ডের গানে এবং সেনোলা রেকর্ডের বহু গানে একটু কান পাতলেই যে অপূর্ব ব্যতিক্রমী বাঁশির সুরগুলো শ্রোতারা শুনতে পাবেন সেগুলো এই দুই বিখ্যাত বংশীবাদক দুই ভাই কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ অর্থাৎ চানুদা নয়তো কুমার গোপেন্দ্রনারায়ণ অর্থাৎ রাজাবাবুর।

আজকের বাংলাদেশের বিখ্যাত সুরশিল্পী সত্য সাহা তখন কলকাতায়। এই সত্য সাহাকে নিয়ে প্রচুর জায়গায় ঘুরেছেন চানুদা। বলেছেন, দেখিস এ একদিন কোথায় পৌঁছে যাবে। আমার কিশোরবেলার বন্ধু সত্য সাহা হয়তো কলকাতায় কিছু করে উঠতে পারেনি। কিন্তু সার্থক হয়ে উঠেছে ঢাকায়। ঢাকায় সত্য সাহা একজন বিখ্যাত লোক। প্রযোজক, পরিবেশক এবং পরিচালক। ঢাকায় ওঁর নিজস্ব অফিসও রয়েছে। সুরশিল্পী সত্য সাহার সঙ্গে সম্প্রতি আমি কিছু ছবিতে কাজ করেছি। এখন ওঁকে দেখলেই আমি যেন চানুদার পরিতৃপ্ত হাসি মুখটি দেখতে পাই।

হিন্দুস্থান রেকর্ডের বর্তমান মালিক প্রয়াত চণ্ডীবাবুর ছেলে মোহনবাবু সেদিন এক পার্টিতে জানালেন হিন্দুস্থান রেকর্ডের সব গান উনি এইচ. এম. ভি.-কে দিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ হিন্দুস্থানের গান এখন থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হবে এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে। সংবাদটা শুনেই আমার যেন মনে হল হিন্দুস্থানের সেই বিখ্যাত ছবি বটের ছায়ায় বাঁশি বাজানো রাখাল ছেলেটির হাতের বাঁশের বাঁশিটা মড়মড় করে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ল। আজ এই বাঁশের বাঁশিতে বিশ্ব জয় করছেন ওড়িশার হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া। যিনি শিবকুমার শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে শিব-হরি নাম নিয়ে এক সুরকার গোষ্ঠী বানিয়ে হিন্দি ছবিতে প্রচুর সুপারহিট গান দিয়েছেন।

মুম্বইতে রয়েছেন বেনারসের প্রবাসী বাঙালি রোনো। যাঁর ফুঁয়ের তুলনা এখন সত্যিই বিরল। কিন্তু বাংলায় অর্থাৎ কলকাতায় বাঁশুরিয়া কোথায়?

আজকের অর্কেস্ট্রাতেও বাঁশির কতটা প্রয়োজন হয় তার প্রমাণ তো মুম্বইয়ের বাঙালি বাঁশুরিয়া রোনোর কর্মব্যস্ততা। বাঙালির অনেক কিছু হারানোর তালিকায় রয়ে গেছে এই বাঁশের বাঁশিটিও।

ক্ল্যারিওনেটও তাই। রাজেন সরকারের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় কোনও যন্ত্রানুষঙ্গেই শোনা যায় না ক্ল্যারিওনেট। অথচ আজ পর্যন্ত মুম্বইতে প্রায় প্রতিটি রেকর্ডিং-এ অবশ্য প্রয়োজনীয় হচ্ছে এই বাদ্যযন্ত্রটি। কেন এমন হল? বাঙালি ক্ল্যারিওনেট বাদক কি সিনেমা বা ক্যাসেটে আসছেন না? নাকি তাঁদের আনা হচ্ছে না। তাই যে কজন আছেন তাঁরা সবাই যোগ দিচ্ছেন যাত্রা পার্টিতে। ভাল বাজাতে পারছেন

না বলে এই যন্ত্রটা এখন হেলাফেলার বস্তু হয়ে গেছে। অথচ বিখ্যাত কমল দাশগুপ্তের যে কোনও রেকর্ডের গান শুনলে শোনা যাবে রাজেন সরকারের ক্ল্যারিওনেট। রাইচাঁদ বড়ালের সুর-করা নিউ থিয়েটার্সের যে কোনও রেকর্ড শুনলে শোনা যাবে অমর সিংহের ক্ল্যারিওনেট।

সানাইয়েরও সেই একই অবস্থা। আলি সাহেব ছাড়া একজনও সার্থক সানাইবাদক আজ পর্যন্ত এলেন না। যে আলি সাহেব আমার লেখা প্রচুর গানে সানাইকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন মান্না দের গাওয়া 'সুন্দরী গো দোহাই, দোহাই মান কর না' হেমন্তদার 'খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ার' ইত্যাদি অজস্র সুপারহিট বাংলা গানে সেই আলি সাহেব ছাড়া আর কাউকেই আবিষ্কার করতে পারলেন না আজকের কলকাতার কোনও সুরকার অথবা অ্যারেঞ্জার। অথচ এই সেদিন মুম্বইতে আমার লেখা গানে যতীন-ললিতের সুরে 'বিয়ের ফুল' ছবিতে বিয়ের সানাইবাদক দেখলাম একাধিক। কেউ কারও চেয়ে কমতি নন। আর কলকাতায় এই ধরনের (বিশেষ করে বিয়ে-টিয়ের গান) যদি সানাইবাদক আলি সাহেবকে না পাওয়া যায় অ্যারেঞ্জাররা আশ্রয় নেন ইলেকট্রনিক্সে। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রে আর যাই বাজুক সানাই বাজে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি শ্রোতারা এখন আর এ ধরনের গান পছন্দ করছেন না। যদি ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রে সানাই বাজানো যেত তা হলে বিদেশি যন্ত্রে সানাইকে মুম্বই সবার আগে লুফে নিত।

সব কিছু কলকাতায় কেন এ ভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কে তার জবাব দেবে?

আর একটা জিনিস আমি আজকাল অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছি, যে দুজন সর্বভারতীয় বাঙালি পুরুষ কণ্ঠের শিল্পী আজ শ্রোতাদের কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত সেই কুমার শানু আর অভিজিৎ কলকাতার অনুষ্ঠানে বাংলা গান প্রায় গাইতেই চান না। কুমার শানু অবশ্য মাঝে মাঝে শ্রোতাদের আবদারে গেয়ে ফেলেন বাংলা গান। কিন্তু একটি অনুষ্ঠানে তার সংখ্যা একটি বা দুটি। অথচ গায়ক হিসেবে ওঁর প্রথম স্বীকৃতি বাংলা গান দিয়েই। বাবুল বসুর সুর করা এবং আমার লেখা 'অমর শিল্পী তুমি কিশোরকুমার/তোমাকে জানাই প্রণাম।' মানছি বাংলা ছবির গান ওঁর হিট হচ্ছে না কিন্তু আধুনিক গান তো হচ্ছে। 'সুরের রজনীগন্ধা' বা 'প্রিয়তমা মনে রেখ' বা 'সোনার মেয়ে' এই সব গানগুলো বাংলাব অনুষ্ঠানে গাইতে ওঁর আপত্তি কোথায়? শানুর কিন্তু এ ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা দরকার।

৩৯

অভিজিৎ পুজোর সময় বিভিন্ন কোম্পানি থেকে চার-পাঁচটি ক্যাসেট করে কিন্তু কলকাতায় এসে একটাও বাংলা গান গায় না। বাংলা গান গাইতে ওর যদি ভালই না লাগে তবে বিভিন্ন বাংলা ছবিতে বা বাংলা ক্যাসেটে কীসের আনন্দে ও বাংলা গান গেয়ে চলেছে আমি তার উত্তর খুঁজে পাইনি। ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছি, ও বলেছে, কলকাতার অনুষ্ঠানে কেউ বাংলা গান শুনতে চায় না। আমার প্রশ্ন, তা হলে শ্রোতারা ওর

বাংলা ছায়াছবির গান বা ক্যাসেটের গান শুনছে কী জন্যে?

এ ব্যাপারে একটা আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রত্যেককে জানানো কর্তব্য বলে আমি আমার জীবনের দু-একটি ঘটনার কথা বলি। লতা মঙ্গেশকর কলকাতায় এলে উনি দু-একটি বাংলা গান না গেয়ে কোনও অনুষ্ঠান করেন না। প্রচুর গান উনি গান। ওঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি হলেও প্রতিটি ডিটেল হয়তো আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্য কয়েক বছর আগে একবার এখানে এসে আমায় খবর দিলেন আমার লেখা 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা...' গানটির রেকর্ড নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। উনি রেকর্ড বাজিয়ে রিহার্সাল করে গানটি নিখুঁতভাবে জলসায় গাইবেন। এবং গাইলেনও। এরকমভাবে আমি ওঁর কাছে নিয়ে গেছি আরও কিছু গানের রেকর্ড।

কিছুদিন আগে এইচ. এম. ভি.-র অনুষ্ঠানে এসে যথারীতি আমায় আহ্বান জানালেন। সেবার ছিলেন গ্র্যান্ড হোটেলে। আমি গেলাম। জানতে চাইলেন এখন আমার লেখা ওঁর কোন বাংলা গান সব থেকে হিট। আমি বললাম, 'মন্দিরা' ছবির 'সব লাল পাথরই তো চুনি হতে পারে না'। ও গানটি এড়িয়ে গিয়ে বললেন, পুলকবাবু আপনি এখনই আমায় লিখে দিন 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া'-র দিল দিওয়ানা গানটির বাংলা ভার্সান।

আমি বললাম, তথাস্তু।

উনি হিন্দিটা গাইতে লাগলেন আমি লিখতে লাগলাম 'মন মানে না প্রাণ মানে না মানে না'। গানটি লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পর উনি রীতিমতো রিহার্সাল করে তবেই অনুষ্ঠানে গেয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী দরকার ছিল লতা মঙ্গেশকরের বাংলা গান গাইবার? যেহেতু আজকাল উনি খুবই অল্পসংখ্যক গান রেকর্ড করেন, বাংলা গান প্রায় করেনই না। তাই পছন্দমতো নতুন বাংলা গান না খুঁজে পেয়ে, হিন্দি গানের বাংলা রূপান্তর আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে অনুষ্ঠানে গাইলেন। সবাই জানেন উনি অবাঙালি। উনি বাংলা গান নাও গাইতে পারেন। কিন্তু এখানেই বিখ্যাত শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। কলকাতায় এসেছেন বাংলা গান গাওয়া ওঁর কর্তব্য।

আবার এক প্রশ্নের উত্তরে উনি খোলাখুলিই জানিয়েছিলেন, ভারতের প্রথম নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বাঙালি। প্রথম অস্কারও পেয়েছেন বাঙালি। আমি বাঙালিকে শ্রদ্ধা করি। অথচ বাঙালি শিল্পীরা যাঁরা বাংলা অনুষ্ঠানে বাংলা গান প্রায় বর্জন করে ফেলেছেন, তাঁরা কতটা শ্রদ্ধা করেন বাঙালিকে?

কিশোরদা তো এখানে অনুষ্ঠানে বাংলা গান গেয়েছেন। মান্না দে তো আজও গান। রফি সাহেবও গাইতেন। প্রায়ই অনুষ্ঠান করতে এসে আমায় আমন্ত্রণ জানাতেন রফি সাহেব। ফাংশনের গানে গিমিক করার জন্য ওঁর সাম্প্রতিক হিট হিন্দি গানের মুখড়ার পঙ্‌ক্তিটি আমায় বাংলায় লিখে দিতে বলতেন। কণ্ঠস্থ করে রাখতেন মুখড়ার বাংলা কথাগুলো। হিন্দি গানটি গেয়ে শেষ করে, যেই শেষবারের মতো 'সাইন লাইন'টি অর্থাৎ মুখড়াটি রিপিট করতেন তখন ওটা গাইতেন আমার বাংলা কথায়। শুনে হই হই করে উঠতেন শ্রোতারা। এ কাজটি অবশ্য অলকা ইয়াগনিকও করে। বিশেষ করে যখনই 'সাজন' ছবির 'দেখা হ্যায় পহেলি বার' গানটি অলকা গায় তখনই প্রথমে হিন্দিটা গেয়ে

নিয়ে তারপর রিপিট করে আমার বানানো 'সাজন' ছবির বাংলা গানটি। বাংলা শুনে শ্রোতারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে ওঠেন। কিন্তু বাংলার জলসায় বাংলা গানে আজও নীরব কেন বাংলার অভিজিৎ?

সুরকার অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুর আমার খুবই প্রিয়। অনেক ছবিতে ওঁর সুরে আমি গান লিখেছি। দারুণ আনন্দ পেয়েছি অনলদাকে সুরকার হিসেবে পেয়ে। বিশেষ করে তপন সাহা পরিচালিত এবং মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত 'উপলব্ধি' ছবির দুটি গান। একটি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'গোলাপের আতর আছে' অন্যটি এরই জবাবে মান্না দে-র গাওয়া 'ও গোলাপ ও গোলাপ'।

এরপরে উল্লেখযোগ্য আমার কথায় ওঁর সুর-করা 'জি টি রোড' ছবির গান যেটি শ্যামল মিত্র গেয়েছিলেন 'এই পথেই জীবন/এই পথেই মরণ..'।

আর একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। একবার তৈরি হল রাগ অঙ্গের একটি গান। গানটি ছিল দুটি মহিলার কণ্ঠে। অনলদা জিজ্ঞেস করলেন, পুলক কাদের দিয়ে গাওয়াই বলো তো?

সে সময়টা হৈমন্তী শুক্লা আর অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর খুবই কমপিটিশন। আমি বললাম, ওদের দুজনকে লড়িয়ে দিন। রেকর্ডিং থিয়েটারে আমি যখন ঢুকলাম দেখি ওরা দুজনে গানটি নিয়ে রীতিমতো লড়াই করছে। অনলদা আমায় দেখেই হাসতে হাসতে বললেন, পুলক দুজনকে লড়িয়ে দিতে বলেছে। আমি লড়িয়ে দিলাম। তোমরা লড়ে যাও। আমি বললাম, যে জিতবে, সে পাবে একটা গোটা ক্যাডবেরি পুরস্কার।

অনলদা আমায় একবার নিয়ে যান তখনকার বাণিজ্যিক সফল পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কনকবাবুর 'মায়াবিনী লেন' ছিল প্রায় গানের ছবি। প্রতিটি গানই আমাদের খুব ভাল হয়েছিল। এইচ. এম. ভি. সে বার সুবীর সেনের আধুনিক গানের সুর করতে বললেন অনলদাকে। অনলদা আমায় ডাকলেন। প্রিয়া সিনেমার পাশে বাণীচক্রে। গিয়ে দেখি ওখানে রয়েছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনলদা বললেন, অভিজিৎই তোমায় দিয়ে সুবীর সেনের গান দুটি লেখাতে বলেছেন। তাই ওঁকেও ডেকেছি। ওঁর সামনে তুমি গান দুটি তৈরি করো।

দুটি গানই অভিজিতের সামনে বসে আমরা বানিয়ে ফেলেছিলাম। একটি গান খুবই জনপ্রিয়। গানটি হচ্ছে 'চন্দন আঁকা ছোট্ট কপাল'। মনে আছে গান দুটি শুনতে এল সুবীর সেন। গান দুটো খুব পছন্দ হল। জিজ্ঞেস করল কী খাবেন? খাবার আনাই।

এরপর অনলদা, আমার উল্লেখ্য যোগাযোগ অনলদার পুত্র ইমনকল্যাণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজপুরুষ' ছবিতে। ইমনকল্যাণের রক্তে গান। দেখলাম ও খুবই ভাল বোঝে গান। 'রাজপুরুষ' ছবির জন্য আমি গান লিখেছিলাম।

আরতি মুখোপাধ্যায়ের 'মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেক না', প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছলকে পড়ে কলকে ফুলের', গীতা দত্তের 'কৃষ্ণ নগর থেকে আমি কৃষ্ণ খুঁজে এনেছি'-র মতো বহু হিট গানের সুরকার অনলদা আজকের গানের জগৎ থেকে নিঃশব্দে যেন হারিয়ে যেতে বসেছেন। অভিমান না করে ওঁর উচিত আজকের দিনেও ভাল ভাল সুর করা। প্রমাণ করে দেওয়া, ভাল গান পেলে শ্রোতারা আজও তা সাদরে গ্রহণ করে।

তখনকার আই. পি. টি.-এর তিনজন সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবীর মজুমদার এই ত্রয়ীর মধ্যে একজনকে আমরা হারিয়েছি। তিনি প্রবীর মজুমদার। প্রবীর মজুমদারের সুরের স্টাইল কিন্তু একেবারে ভিন্ন। ওঁর সুরে এবং কথায় ধনঞ্জয়বাবুর 'মাটিতে জন্ম নিলাম' নির্মলা মিশ্রের 'ও তোতা পাখিরে' বাঙালি কোনও দিনও ভুলবে না।

আমার লেখা গান উনি প্রথম করেন অখিলবন্ধু ঘোষের কণ্ঠে। তারপর আমরা আর কিছু গান করি। ওর মধ্যে স্মরণীয়, রাজেন তরফদারের 'জীবন কাহিনী' ছবির গান। দুটি গানই ভিন্ন ধরনের সুর করেছিলেন প্রবীর মজুমদার। একটি 'আমি তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে/বাঁচার ঠিকানা' আজও ভুলিনি।

একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি যে কোনও সুর শিল্পীর কন্যা যদি গায়িকা হয় তা হলে সেই সুরশিল্পী পিতা তাকেই প্রায় সর্বোত্তমা মনে করে। একমাত্র ব্যতিক্রম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সলিলদার মতো মানুষও এই দুর্বলতা মাঝে মাঝে প্রকাশ করে ফেলতেন।

লক্ষ করেছি প্রবীর মজুমদারেরও এই দুর্বলতা, আমি ওঁর সঙ্গে ছবির গান লেখার সময়ে।

অনেক প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে গেছেন প্রবীর মজুমদার। আমার ধারণা যা ওঁর প্রতিভা ছিল যা ওঁর প্রাপ্য ছিল তার অনেক কিছুই জীবনে পাওয়া হয়নি। এটাই বোধহয় শিল্পীর প্রকৃত জীবন। কে যে কখন সাফল্য পাবে কে যে পাবে না, কেউই তা বলতে পারে না।

৪০

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একটা সংগীতানুষ্ঠানে বিশিষ্ট কমেডিয়ান জহর রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হল। আমায় দেখেই জহর রায় বলল, এই যে পুলক, তোমায় খুঁজছিলাম। আমরা একটা ছবি করছি। ছবিটার নাম 'আলেয়ার আলো'। তোমায় তার জন্য গান লিখতে হবে। মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালক। আর তোমার ফেবারিট গোপেন মল্লিক সংগীত পরিচালক। সময় করে কাল সকালের দিকে আমার মির্জাপুরের মেস বাড়িতে এসো। ওদের ডাকলেই ওরা আসবে। আমরা গান নিয়ে আলোচনা করব। স্ক্রিপ্টটা তোমায় শোনাব।

আমি বললাম, ঠিক সময় হাজির হব। তুমি ওদের খবর দাও জহরদা।

সেই সময় ফাংশনে চলছিল উৎপলা-সতীনাথের অনুষ্ঠান। ওরা দ্বৈত গান দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করত। তখন গাইছিল আমারই গান 'এ বেজায় ভারি শহর। গাড়ির বহর...'। গান খুবই জমে গিয়েছিল। গান শেষ করে দুজনেই মঞ্চ থেকে নেমে এল। জহরদাকে দেখেই উৎপলাদি জিজ্ঞেস করল, এই যে জহর, কেমন লাগল আমাদের গান?

জহরদা উৎপলা-সতীনাথের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অম্লান বদনে বলল, মোটামুটি।

জহর রায়ে রসিকতাবোধ ছিল সর্বজন পরিচিত। উৎপলা-সতীনাথ কেউই রোগা ছিল না। সেই কথাটাই মজা করে অপূর্বভাবে বলল জহরদা।

আর একবার কলকাতার কাছাকাছিই একজনের বাড়িতে আমরা সবাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছি। আমি, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর জহর রায় ছিলাম একটি গাড়িতে। গৃহস্বামী আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। পানাহারের সুব্যবস্থা ছিল। জহরদা বসে গেল। গৃহস্বামী ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই গায়ের রং বেশ কৃষ্ণবর্ণ। এমন সময় জহরদা এক প্লেট চানাচুরের কথা বলল। গৃহস্বামী ওঁর ছেলের নাম ধরে ডেকে বললেন, এই এখুনি এক প্লেট চানাচুর দিয়ে যা।

ছেলেটি এল। গৃহস্বামী গদগদ কণ্ঠে বললেন, আমার ছেলে। ক্লাস ফাইভে পড়ে। ভাল গান গায়, নাচে, ফুটবল খেলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

জহরদা ও সব শুনছিলই না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল ধবধবে ফরসা ছেলেটিকে। গৃহস্বামী, ওঁর স্ত্রী এবং ছেলে অন্যান্য অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য অন্য ঘরে চলে যেতেই জহরদা একমুঠো চানাচুর মুখে পুরে এক চুমুকে অনেকটা মদিরা গলায় ঢেলে বলল, পুলক, তরুণ তোমরা দেখলে তো। বাবা মা দুজনেই কুচকুচে কালো অথচ ছেলেটা ওরকম ধবধবে ফরসা হল কেমন করে?

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললে, এর প্রকৃত কারণ একমাত্র ওই ভদ্রলোকের স্ত্রীই বলতে পারবেন। জহরদা শব্দ করে হেসে উঠে তরুণকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, ধুস, তোদের একটুও বুদ্ধি নেই। তোরা গানের শিল্পী হয়েছিস একটুও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিসনি। এরপর পরম দার্শনিকের ভঙ্গিমায় জহরদা বলল, শ্লেট আর পেন্সিল দুটোই কালো কুচকুচে হয়। অথচ কালো শ্লেটে কালো পেন্সিলের দাগ দাও দেখবে ধবধবে ফরসা লেখা। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। পাটনার জহর রায় প্রসঙ্গ শেষ করল 'জয় বাবা বজরঙ্গবলী জয়' বলে।

প্রযোজকদের অংশীদার জহর রায়ের 'আলেয়ার আলো' ছবির একটি গান জহরদার খুব পছন্দ ছিল। যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল জহরদার। মেস বাড়ির ঘরটা ঠাসা ছিল নানারকম বইতে। মেঝেতেও বই-এর পাহাড়। বই সরিয়ে বসতাম আমরা। ওই ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'তুমি নিজেই আকাশে জমো/নিজেই ঝরো ওগো বৃষ্টি'। আমার লেখা এ গানটা শুনেই জহরদা চেঁচিয়ে বলে উঠল, পুলক, আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে তুমিও পার্টনার হবে।

ওখানেই জহরদা এক জলসার উদ্যোক্তাকে সরাসরি বলেছিলেন, তোমাদের জলসা ক্যানসেল হচ্ছে তার জন্য আমি কেন অ্যাডভান্সের টাকা ফেরত দেব। উদ্যোক্তা ছেলেটি মুখ কাঁচুমাচু করে তাকাল। জহরদা উঠে গিয়ে একটু টুথপেস্ট নিয়ে এসে ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল, এটা টেপো। ছেলেটি টিপল। বেরিয়ে গেল খানিকটা পেস্ট। জহরদা বলল, এবার এটা ভিতরে ঢোকাও তো। ছেলেটি বলল, অসম্ভব। কেউই এটা পারবে না। জহরদাও বলল, তাই। কেউ পারবে না অ্যাডভান্সটা ফেরত নিতে। অতএব চা খেয়ে বাড়ি যাও।

ওই ছবির সুরকার গোপেন মল্লিক সম্পর্কেও অনেক তথ্যও আজও অনেকেরই

অজানা। গোপেনদা যেমন সতীনাথের প্রথম গানের সুর করেছিলেন তেমনি করেছিলেন আরও অনেকেরই গান। সেই সময় এইচ. এম. ভি.-র একটি কম দামি রেকর্ড ছিল যার নাম ছিল টুইন রেকর্ড। এই টুইন রেকর্ডে কিন্তু অনেক বিখ্যাত গানের জন্ম হয়েছিল। যেমন মিস লাইটের গাওয়া আমার পিতৃবন্ধু হীরেন বসুর কথা এবং সুরে 'শেফালি তোমার আঁচলখানি/বিছাও শারদ প্রাতে'। এই টুইন রেকর্ডে গোপেনদার সুরে প্রণব রায়ের রচনা 'হে বলাকা দূরের যাত্রী...' প্রকাশ মাত্রই হিট হয়েছিল। ও গানের গায়ক ছিলেন রীতেন চৌধুরি। রীতেন চৌধুরি আর কেউ নন বিখ্যাত সত্য চৌধুরীর ছদ্মনাম। সত্য চৌধুরীকে আজ কেউ আর মনে রাখেন না এটা খুবই দুঃখের। সত্যি, ওঁর প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হয়নি। ওঁরই গাওয়া গোপেনদার সুরে আরও একটি বিখ্যাত গান 'ভাল যদি লেগে থাকে/আমার এ গান খানি...'। খুবই জনপ্রিয় ছিল।

গোপেনদার সুরে সত্যদার আর একটি গান 'তোমারে যে গান শোনাব' বেশ কিছু দিন কলকাতা বেতারের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'অনুরোধের আসর'-এর সিগনেচার টিউন হিসাবে প্রথম পঙ্‌ক্তি বাজানো হত। অনেকেরই সে কথা নিশ্চয় স্মরণে আছে। সত্যদার সব থেকে সুপারহিট গান কমল দাশগুপ্তের সুরে এবং মোহিনী চৌধুরির রচনায় 'পৃথিবী আমারে চায়...' এ গানের জাদুমন্ত্রে সলিল চৌধুরী পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। উনি লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে নিজের রচনা রেকর্ড করিয়েছিলেন 'আর নয় গুন গুন গুঞ্জন...' 'ওগো সাথী মোর/খোলো বাহু ডোর/পৃথিবী যে তোমারে চায়।' বাংলা গানের এমন অনুলিপি খুবই দুষ্প্রাপ্য।

সত্য চৌধুরীর আরও দুটি অসাধারণ গান কমল দাশগুপ্তেরই সুরে। একটি প্রণব রায়ের রচনা 'যেথা গান থেমে যায়...' আর একটি মোহিনী চৌধুরির লেখা 'জেগে আছি একা জেগে আছি কারাগারে'।

দেশকে ভালবাসার অপরাধে কারাবন্দি একটি মানুষের এই মর্মবেদনার বিষয় নিয়ে প্রেমের গান আজও কেউ লেখেননি। মোহিনী চৌধুরী এখানে সত্যিই অদ্বিতীয়। সবাই মোহিনী চৌধুরীর 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে...' গানটির জয়গান করেন। কিন্তু কেন এ ধরনের আরও দু-একটি গানের কথা উল্লেখ করেন না, আমি ভেবে পাই না। সত্য চৌধুরীর গাওয়া আর একটি বিখ্যাত রেকর্ড কাজী নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু...'। ওই সময়টায় সত্যদা কৃষ্ণচন্দ্রের মতো ভাব আর রস এনে গেয়েছিলেন গানটি। সেই গান ঘরে ঘরে আদৃত ছিল।

অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায়, মোহিনী চৌধুরি, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত এবং আমি সবাই ছায়াচিত্রের গল্প লিখেছি চিত্রনাট্যও লিখেছি। কিন্তু ছায়াচিত্রের পরিচালক হয়েছেন গীতিকারদের মধ্যে অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায় ও মোহিনী চৌধুরি।

'না', 'প্রশ্ন' 'ঘুম', 'রাতের অন্ধকার' ইত্যাদি ছবিতে আমি অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই শ্রীতারাশঙ্কর, নারায়ণ ঘোষ ও চন্দ্রশেখর বসুর সহকারী পরিচালক হিসাবে হাতেনাতে চিত্রপরিচালনার কাজও শিখেছিলাম। পরবর্তীকালে চিত্রপরিচালনার সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু ওই প্রস্তাবে সায় দিইনি। স্বয়ং সুচিত্রা সেন, আমায় অসীম

পাল মারফত আমার লেখা একটি উপন্যাসের চিত্রনাট্য চেয়েছিলেন, যদি আমি পরিচালনা করতে রাজি হই তবেই। কিন্তু 'জ্যাক অফ অল ট্রেডস...' আমি হতে চাইনি। ভয় পেয়েছিলাম। অজয় ভট্টাচার্যের 'অশোক', 'ছদ্মবেশী' সুপার ডুপার হিট। প্রণব রায়ের 'মন্দির' অবশ্য তেমন চলেনি তবুও এটি স্মরণীয় এ কারণে যে এই 'মন্দির' ছবিতে এবং প্রণব রায় পরিচালিত আরও একটি ছবি 'রাঙামাটি'তে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গায়ক সত্য চৌধুরী। এর সুরশিল্পী ছিলেন সম্ভবত কমল দাশগুপ্ত। এর একটি গান আমি আজও ভুলিনি। গানটি ছিল প্রণব রায়েরই রচনা 'এ মহাক্ষুধার শ্মশানে আজি'। কী করে জানি না সত্য চৌধুরী হঠাৎ হারিয়ে গেলেন। মানুষ খুব দ্রুত ভুলে গেল এই অসাধারণ শিল্পীকে।

শেষ বয়সে গায়ক সত্য চৌধুরী, বেতারে ঘোষকের ভূমিকায় কিছুদিন কাজ করেছিলেন। এক দিন ঘোষণা করেছিলেন এবারে...শিল্পীর রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান। গান দুটি রচনা করেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ জন্য আমায় অজস্র টেলিফোন পেতে হয়েছিল । স্বয়ং রেডিয়ো অধিকর্তা আমায় ফোন করেছিলেন এ ধরনের ঘোষণা আমি শুনেছি কি না। আমি শুনেছিলাম তবুও সত্যদার স্বার্থে মিথ্যা বলতে হয়েছিল। বলেছিলাম, না আমি শুনিনি। তখন টেপে আজকের মতো কোনও কাজ হত না। তাই কোনও রেকর্ড মিলল না। তাই রেহাই পেলেন কণ্ঠশিল্পী সত্য চৌধুরী। একবার আমার ভাগ্নে সুশীল চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন উনি। আমার বাবাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন । বাবা আমাদের নিয়ে এখানে বাঁধাঘাট থেকে একটা নৌকো ভাড়া করে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর। গঙ্গা দিয়ে যেতে যেতে সারাক্ষণ গান গেয়ে গিয়েছিলেন সত্যদা। আমায় হয়তো তখন থেকেই ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিলেন সত্যদা। দুঃখের কথা, আমার একটা গানও রেকর্ডে গাইতে পারেননি উনি। আমি যখন গানের জগতে প্রতিষ্ঠা পেলাম তখন উনি এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন বেতারে ঘোষকের কাজে। একেবারে অন্য ভূমিকায়। গায়ক থেকে নায়ক, নায়ক থেকে ঘোষক।

তারপর আর কেউই ওঁর খবর রাখল না। আশ্চর্য উদাসীন আমরা!

শিল্পীর এই উত্থান, এই পতন সবই মহাকালের হাতের সুতোয়। কেউ জানে না, কে কখন উঠবে কে কখন তলিয়ে যাবে। তবু সবাই আসে শিল্পী হতে। বুকে আশা আকাঙ্ক্ষা আর চোখে স্বপ্ন। আমি বহু আসা-যাওয়ার নীরব সাক্ষী। মনে পড়ছে কি সেই মেয়েটিকে? খুব চটকদারি চেহারা ছিল। ভালবাসত একটু সাজগোজ করে থাকতে। কলকাতায় তখন বিচিত্রানুষ্ঠানে, পান্না কাওয়াল এনেছিলেন কাওয়ালি গানের বন্যা। শ্রোতারা শুধু হিন্দি নয়, পান্নাবাবুর বাংলা কাওয়ালি গানও রাতের পর রাত, অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে শুনত। সংগীত জগতে পদার্পণ করেছিল সে তার মধ্যেই। তার মুখেই আমি প্রথম শুনি সেই সময়কার খুবই লোকপ্রিয় গান, যে গানটির রেকর্ড না হয়েও শুধু অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে সুপার হিট হয়ে গিয়েছিল। সেই যে—'বাঁশির যে কথা প্রকাশ হল না/আমি যে বেদনা তার'। তখন মানিকতলা অঞ্চলের এক সংগীত সাধক আপন মনে গান রচনা করতেন, সুর করতেন এবং শেখাতেন। ওঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ হাজরা। ওঁরই সৃষ্টি এই গানটি। ওঁর সুর-করা অনেক গানই তখন জনপ্রিয় ছিল। 'আজ

নিশিভোরে/ডাকে পাপিয়া/পিয়া পিয়া বোলে' তখন বোম্বে থেকে সদ্য আগত 'নাল' ও 'ঢোলকি'র সঙ্গে ওই গানটি গেয়ে একটি কিশোরী মেয়ে মাত করে দিত আসরের পর আসর। এবার সেই মেয়েটিকে আপনাদের মনে পড়ছে তো? হ্যাঁ, ওর নাম ইলা বসু। বিশিষ্ট প্রেস ফটোগ্রাফার অশোক বসুর স্ত্রী। তার তরুণী কন্যার অকাল প্রয়াণে, ওর শোক সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ পৃথিবী থেকে চলে গেল ইলা বসু। এই ক'বছরের ব্যবধানে ওকে আমরা ভুলতে বসেছি। ইলা বসুর গান আমার কিন্তু দারুণ ভাল লাগত। প্রথম ও আমার গান গায় দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত ও খগেন দাশগুপ্ত সুরারোপিত 'স্বপ্ন ও সমাধি' ছবিতে। পুজোর রেকর্ডেও নচিকেতা ঘোষের সুরে আমার গান হয়েছে। ওই রেকর্ডটিতে আমার একটি গান লেখার পেছনে, একটা সুন্দর ঘটনা আছে।

৪১

আমার এক বন্ধু প্রচুর পড়াশোনা নিয়ে মেতে থাকত। অনেকগুলো ভাষাও জানত। চেক ভাষাটাও ওর জানা ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায়, ওর বাড়িতে ওর পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটিয়েই আমি আড্ডা দিচ্ছি। ও হঠাৎ বলল, লিখছিস তো বাংলা গান। 'থট'-তো সব উর্দু না হয় ইংরাজি নয়তো পুরনো বাংলা গান থেকে নিস। চেক ভাষার একটা কবিতা বলছি শোন। এটা নিয়ে গান লেখ, সুপারহিট হবে। বলে ও একটা চেক কবিতা বাংলাতে অনুবাদ করে আমায় শোনাতে লাগল। 'ওই লাল ফুলগুলো কী সুন্দর/আকাশটা লাল হয়ে গেছে।/মনে হচ্ছে আকাশটাকে কেউ খুন করে গেছে। ঝরে পড়ছে লাল রক্ত।'

ধ্যাত, আকাশকে কখনও খুন করা যায় নাকি? আকাশের বুক চিরে কখনও লাল রক্ত ঝরে পড়তে পারে? আশ্চর্য, একটা কবিতাকে সুন্দর করতে হলে কত মিথ্যা কথা বলতে হয়।

চেক কবিতাটির ভাবার্থ শুনেই বন্ধুবরকে দুপ্যাকেট সিগারেটের দাম দিয়ে ওখানে লিখে ফেললাম 'ওই কোকিল শোনায় চৈতি হাওয়ার কথকতা। ওই সবুজ পান্না পরেছে শ্যামল বনলতা। তবু তাই কি কখনও হয়? কোকিল কখনও কথা কয়?/লতা কি পান্না পরে রয়?/আহা গানের লিপিকা সুন্দর করে/কতনা মধুর মিছে কথা।' নচিকেতা ঘোষের সুরে ইলা বসুর কণ্ঠে আমার এই গানটি সেবার পুজোর একটা হিট গান হয়ে গেল। ওরই উল্টোপিঠে লিখেছিলাম—এতো কাছে পেয়েছি তোমায়/এতো ছবি নয়ন কোনায়/এতো পাখি গীতালি শোনায়/এতো সুখ মোর সইবে কি!'

ইলা বসুর দুটি সুপার হিট গান নিশ্চয় মনে পড়ছে। দুটিই ছিল শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুর। একটি রাখালিয়া সুর আনে মৃদু সমীরণ', অন্যটি 'কত রাজপথ জনপথ ঘুরেছি'। যখন আলপনা শ্যামলকে নিয়ে এইচ. এম. ভি.-তে খুব গণ্ডগোল তখন পুরুষ কণ্ঠে এবং মহিলা কণ্ঠে মানবেন্দ্র ও ইলা বসুকে দিয়ে ছায়াছবির গানগুলো এইচ. এম. ভি. নতুন করে রেকর্ড করে প্রকাশ করত। যদিও মানবেন্দ্র আর ইলা দুজনেই এতে খুশি ছিল না। তবুও তখনকার গানের জগতে প্রায় মনোপলি এইচ. এম. ভি.-কে কেউ

চটাতে সাহস করত না।

সেই সময় আমি ভি. বালসারার জীবনে প্রথম বাংলা ছবিতে সুর দেওয়া 'রাতের অন্ধকারে' ছবির গান লিখছি। আগেই বলেছি যে ছবিতে আশা ভোঁসলে কলকাতায় এসে টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের সাউন্ড ট্রাকে জীবনে প্রথম বাংলা গান রেকর্ড করেছিলেন। শব্দযন্ত্রটি সেট করা ছিল ভ্যান গাড়িতে। সৌভাগ্যক্রমে আশাজির জীবনে প্রথম বাংলা গান আমিই লিখেছিলাম। ওই ছবিতে অনেক গান ছিল। বাকি গানগুলো আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়ার কথা। খবরটা শুনতে পেয়ে এইচ. এম. ভি.-র পবিত্র মিত্র আমায় জানালেন, আলপনা গাইলে আমরা রেকর্ড করব না। ওই ছবিতে হেমন্তদাও মুম্বই থেকে কলকাতায় এসে, আমার লেখা গান গেয়েছিলেন। রেকর্ড প্রকাশ না হওয়ার আশঙ্কায় অগত্যা বাকি গানগুলো ইলা বসুকে দিয়ে গাওয়ানো ঠিক হল। ইলা বসু পপ ঢঙের গান এবং রোমান্টিক গান দুটোই ভাল গাইল। প্রযোজক পক্ষ স্বভাবতই খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, জানতামই না এ মেয়েটি এত ভাল কমার্শিয়াল গান গায়। আর একবার, পুজোর জন্য নচিকেতা ঘোষের শ্যামবাজারের বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত সিটিং করে ইলার দুখানি গান আমরা তৈরি করেছিলাম। একটি ছিল 'আর ডেকো না/ও কালো কোকিল তুমি আর কেঁদো না'। অন্য গানটি একটি বিখ্যাত বিদেশি লিম্বো রকের স্টাইলে গান। অপূর্ব সুর করেছিলেন নচিকেতা ঘোষ।

আর একবার পুজোয় ইলার গানে সুর দিয়েছিল শ্যামল মিত্র। গান লিখেছিলাম আমি। সেটিও খুব জনপ্রিয়। 'ছোট্ট করে বলতে গেলে গল্প সে/কথা আমার অল্প যে'। এরপর আরও বহু রেকর্ডে বহু ছবিতে ইলার গান লিখেছিলাম। তার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য একবার পুজোর গান। আমার লেখা গানে সুর করেছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। গানের একপিঠে ছিল 'কথা কইতে জানা নয়ন আমার ছিল'। উল্টো পিঠের গানটির বেলায় রবিদা আমায় বললেন, দেখ, ইলা আসরে ঠুমরি, গজল, কাওয়ালি দারুণ গায়। এই ধারণাটা মাথায় নিয়ে একটা গান লেখ তো, সুর করি।

তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলাম, রবিদা কী বলতে চাইছেন। ওঁর চাহিদা বুঝে লিখে ফেললাম 'গান ফুরানো জলসাঘরে'। ইলা বসুর এই গানটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। শুধু বার বার মনে হয় ইলা গান ফুরানোর জলসাঘরে আমাদের মতো মানুষদের সঙ্গে আরও কিছু বছর থেকে গেলে হয়তো লাভ হত আমাদেরই।

ইলা বসুর দুটি দ্বৈত গান নিশ্চয় অনেকেরই মনে আছে। একটি 'শেষ পর্যন্ত' ছবিতে হেমন্তদার সঙ্গে আর একটি কিশোরদার সঙ্গে 'সবরমতী' ছবিতে। তখনকার স্বাভাবিক নিয়মেই, হেমন্তদার গান রেকর্ড হয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তখন কিশোরদার গানও রেকর্ড করা হয়েছিল কলকাতাতেই। একটা জলসা উপলক্ষে কিশোরদা তখন কলকাতায়, সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে নিয়েছিলেন এই ছবির সুরকার গোপেন মল্লিক। খেয়ালি কিশোরদা এক কথায় রাজিও হয়েছিলেন কলকাতায় রেকর্ড করতে। সেই সময়টায় কিশোরদা কলকাতায় এলেই দক্ষিণ কলকাতার এক হোটেলে উঠতেন। ওই হোটেলের সবুজ ঘাসের লনটা এখনকার থেকে আরও বড় ছিল।

মুম্বইয়ের অনেকেই এই লনটার আকর্ষণে ওই হোটেলটা পছন্দ করতেন। এমনকী মান্না দেও যখন স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় আসতেন, তখন তিনিও উত্তর কলকাতার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে মাঝে মাঝে উঠতেন ওই হোটেলেই। একবার কিশোরদা কলকাতায় হঠাৎ এসেছেন খবর পেয়ে, ওঁকে দিয়ে গান করাবার দুরাশায় (দুরাশা বললাম এই কারণেই যে সেই সময় কিশোরদাকে দিয়ে গান করানো দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল) হাজির হলাম ওই হোটেলে। তখন সবে সন্ধে নেমেছে। চমৎকার হাওয়া বইছে। বেশ মন মাতানো পরিবেশ। কিশোরদার দরজার সামনে এসে দেখলাম সেখানে ঝুলছে 'প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব'। মনটা ভেঙে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। চেনাপরিচিত এক বেয়ারা আমার খুব কাছে এসে গলা নামিয়ে বললে, কিশোরদা হোটেলেই আছেন। লনে বেড়াচ্ছেন। বলবেন না যেন আমরা বলেছি। বলবেন হোটেলের এদিকটায় এসে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

আমি বললাম পাগল। এও আবার কেউ বলে নাকি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি কালবিলম্ব না করে দোতলা থেকে নামলাম সোজা লনে। দেখি আবছা আলো আঁধারিতে কিশোরদা খুব দ্রুত হাঁটছেন। চট করে কেউ বুঝতেই পারবেন না, উনি আর কেউ নন কিশোরকুমার। যাই হোক আমি চিনে ফেললাম। ধরে ফেললাম ওঁকে। পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম, কিশোরদা আমাকে দেখে শুধু বললেন, এই যে পুলকবাবু, কখন এলেন। আর কোনও কথা নয়। কিশোরদার সঙ্গে হোটেলের লনটায় দুপাক ঘুরতেই আমার অবস্থা কাহিল। রীতিমতো হাঁফাতে লাগলাম আমি। তবুও কাজের খাতিরে ঘুরতে হল। হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, কিশোরদা, আপনি মুম্বইতে বললেন কলকাতায় গিয়ে বাংলা গান নিয়ে বসবেন। তাই এসেছি। কিশোরদা আমার দিকে না চেয়েই সেই একই গতিতে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, নতুন গানের সুর চাইছেন তো? শুনুন নতুন সুর। এ একবারে লেটেস্ট। ঠিক এই রকমই মুখড়া চাই। শুনে নিন। বলেই গলায় কোনও সুর না দিয়ে আবৃত্তির ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, 'ইনকাম ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স...'

আজকে হলে হয়তো এই মুখড়া দিয়ে গান বানাতে পারতাম। এই প্রজন্ম তাকে র‍্যাপ বলে তা আনন্দে লুফে নিতে পারত। সুপারহিট গান। কিন্তু তখন তো এ সব আমার মগজে আসেনি। আমি বোকার হাসি হেসে বললাম, তা হলে পরে দেখা করব।

কিশোরদা কোনও উত্তর দিলেন না। আরও একবার ঘুরে গিয়ে বলতে লাগলেন সেই একই কথা, ইনকাম ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স...'।

আমি শুনেছি ইনকাম ট্যাক্স থেকে বাঁচবার জন্যই নাকি কিশোরদা 'লুকোচুরি' ছবি তৈরি করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যা খুশি করে ছবি বানাব। ছবি ফ্লপ করবে। লস হবে। বাঁচবে আমার ইনকাম ট্যাক্স।

'লুকোচুরি' ছবি কলকাতায় মুক্তি পেতেই মুম্বইতে যখন ফোন গেল, ছবি সুপারহিট হয়ে যাবে, কিশোরদা তখন ফ্লোরে শুটিং করছিলেন। ম্যাটিনি শোর রেজাল্ট শুনেই তিনি ধপাস করে শুয়ে পড়লেন স্টুডিয়োর মেঝেতে। চেঁচিয়ে বললেন পানি। ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে বললেন, আবার ইনকাম ট্যাক্স।

এই 'লুকোচুরি'-র শুটিংয়েই একদিন ইচ্ছে করে কিশোরদা স্টুডিয়োতে এলেন না। শুটিং বন্ধ রইল। ওঁকে যখন সে কথা জানানো হল শুনে বললেন, প্রডিউসরকে টাইট দিতে কী যে আরাম লাগে কী বলব। ওঁকে বোঝানো হল, এটা বাইরের প্রডিউসরের ছবি নয়। আপনার নিজের ছবি 'লুকোচুরি'। আপনি, আপনাকেই টাইট দিয়েছেন। কথাটা শুনে কিশোরদা সাধকের ভঙ্গিতে দম বন্ধ করে বসে রইলেন।

আমার যতদূর স্মরণে আছে বিখ্যাত সুরকার ও গায়ক শচীন গুপ্তের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন অভিনেতা বিপিন গুপ্ত। বিপিন গুপ্তের ছেলে রবি গুপ্তের মাধ্যমে মুম্বইতে কিশোরদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। কিশোরদা তখন কেবলমাত্র নিজের অভিনীত চরিত্রেই প্লে-ব্যাক করেন। রাহুল দেববর্মণ তখনও ওঁকে আনতে পারেননি অন্য শিল্পীদের নেপথ্য গায়ক হিসাবে। মুম্বইয়ের একটা স্টুডিয়োতে সেই রবির সঙ্গে দেখা। রবি নিয়ে গেল সে দিনের চিত্রাভিনেতা কিশোরদার সঙ্গে আলাপ করাতে। তখন শুটিংয়ের বিরতি। কিশোরদা, মেকআপ করা অবস্থাতেই, একপাশে চুপচাপ বসে আছেন। রবিকে দেখেই বলে উঠলেন, এই যে রবি ঠাকুর, তোমার গান আমার দারুণ ভাল লাগে। বলেই গাইতে লাগলেন 'এদিন আজি কোন ঘরে গো/খুলে দিল দ্বার'। আমি শুনলাম কিশোরদার কণ্ঠ আর কে এল সায়গলের কণ্ঠ একেবারে একাকার। কোনও পার্থক্য ধরা পড়ল না।

এবার কিশোরদা আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। রবি সঙ্গে সঙ্গে বলল, কলকাতার গান-লেখক পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিশোরদা বললেন, ও হো, মান্নাদার কাছ শুনেছি আপনার নাম। আপনি নাকি ফাটাফাটি প্রেম সংগীত লেখেন? ও সব আমার আসেটাসে না। এই বলেই গলায় ইয়ার্লিং করে একলাইন একটা হিন্দি গান গেয়ে বললেন, কী জানেন পুলকবাবু। আমি ভাগলপুর ছাগলপুরে জন্মালে কী হবে. একেবারে গাঁইয়া বনে গেছি।

প্রথম দিন থেকে উনি আমায় প্রায় মুড এলে 'পুলক' না বলে 'পোলাও' বলে ডাকতেন। আমার ধারণা, যেহেতু কিশোরদা খুবই ভোজন রসিক ছিলেন তাই সব সময় খাবারের নামগুলো ওঁর জিভের ডগায় থাকত।

আমি বললাম, কে বললে আপনি গাঁইয়া বনেছেন? দারুণ তো গাইলেন দুলাইনের রবীন্দ্রসংগীত। সেদিন বোধহয় দারুণ মুডে ছিলেন কিশোরকুমার। আমার কথাটা শুনেই বললেন, ও গান আমার কেন খারাপ হবে? সামনে বসা রবি গুপ্তকে দেখিয়ে বললেন, ও যে ওই রবি ঠাকুরের গান। সায়গলের গাওয়া রবি ঠাকুরের সব গান আমার মুখস্থ। একটুও ভুল হয় না। এই মুখস্থ বিদ্যেটা যদি স্কুলে কাজে লাগাতে পারতাম তা হলে আজ আর আমায় এ রং টং মেখে বসতে হত না। আঃ। দিব্যি আরামসে অফিসার বনে গিয়ে অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে পারতাম। হল না পোলাওবাবু, তা হল না। এরপর ওপরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, সবই ওই ভদ্রলোকের হাত যশ। ওই সময় সহকারী পরিচালক এসে ডাকলেন। বললেন, দাদা লাইট রেডি।

কিশোরদা গাইতে গাইতেই উঠে দাঁড়ালেন 'আমি তোমায় যত/শুনিয়েছিলাম গান'।

আমি দুচোখ বুজে শুনতে লাগলাম। আমার মনে হল কে এল সায়গল আবার যেন জীবন্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। আমি যেন ওঁরই গান শুনছি।

৪২

কিশোরকুমারের সঙ্গে এখানে ওখানে অনেক বারই আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবার মতো দেখা হল সেবার, কিশোরদা যখন অভিনয় ছেড়ে পুরোপুরি প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট হয়ে গেছেন। সেইসময় কিশোরদা একদিন আমায় বললেন, পোলাওবাবু ওই 'এক যে ছিল রাজপুত্তুর' গানটার মিউজিক ডিরেক্টর বীরেশ্বর সেন—আমি কিশোরদাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, সেন নয় সরকার।

কিশোরদা বললেন, ওই হল। উনি চমৎকারভাবে ইংরাজি 'ওভার দ্য ওয়েভস' টিউন থেকে না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙালি একটা দারুণ কথা ব্যবহার করে 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড় ধরা'। জবাব নেই বাঙালির। আপনি মিউজিক ডিরেক্টরকে আমার কনগ্র্যাচুলেশন জানাবেন। এবার আমি বললাম, আপনিও কিন্তু গানগুলো দারুণ গেয়েছেন। আর ওই যে একটা গান 'কী দারুণ দেখতে' গানটা তো শুধু আপনার ইন্ট্রোডাকশনে 'আ-হা'-তে সুপারহিট। কিশোরদা জবাবে বললেন, গাইবার সময় আমি কী ভাবলাম জানেন, ভাবলাম আমি যেন (কিশোরদা ইচ্ছে করেই তালব্য 'শ'কে দন্ত 'স' করে উচ্চারণ করে বললেন) স্যাম্‌বাজারের সসিবাবু হয়ে বসে আছি, স্যামবাজারের একটা রকে। সামনে দিয়ে এক ঝাঁক মেয়ে কলেজ যাচ্ছে। একটা মেয়েকে দারুণ লাগল। দেখেই বলে উঠলাম 'আহা! কী দারুণ দেখতে/চোখ দুটো টানা টানা।'

আমি বললাম, কিশোরদা আপনার গান এত প্রাণবন্ত হয় কেন জানেন? আপনি তো প্রথমে একজন অভিনেতা, তারপর একজন গায়ক, তাই। গানের কথা যদি সুর ভরা প্রাণের কথা না হয়, তা কি কোনওদিন শুনতে ভাল লাগে? সুরেলা অভিনয়ই তো আধুনিক গানের সর্বস্ব।

একটু চুপ করে থেকে কিশোরদা বললেন, আমি কিন্তু ও সব সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা-র কিছুই জানি না। গান শিখেছি শ্রেফ রেডিয়ো আর রেকর্ড শুনে। আমার কোনও গুরু নেই। কারও কাছে আমি নাড়াটারা বাঁধিনি। আমার গুরু ওই রেডিয়ো আর রেকর্ডের আর্টিস্টরাই। যিনি ভাল গান করেন আমি তারই চেলা। তবে সায়গলসাহেব হলেন আমার গুরু গুরু মহাগুরু।

এরপর কিশোরদা আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, কী? চা তো হল এবার একটা সিগারেট চলবে না কি? সবাই তো বলে চায়ের পর সিগারেট নাকি দারুণ জমে। আমি চমকে উঠলাম। সিগারেট? আপনি তো সিগারেট ছোঁন না। এই বাড়িতে, এই গৌরীকুঞ্জে, হঠাৎ সিগারেট এল কী করে? কিশোরদা হেসে বললেন, আমার নয়, আমার সেক্রেটারি-কাম-ড্রাইভার আবদুলের স্টক। ওকে এক মক্কেল দিয়ে গেছে আমেরিকান সিগারেট। আমি বলছি, ও আপনাকে দেবে। আমি বললাম, মাফ করবেন। আমিও আপনারই মতো সিগারেট খাই না।

সিগারেট আর মদিরা সারাজীবনে স্পর্শ করেননি কিশোরদা। মাকে ভীষণ ভালবাসতেন উনি। শুনেছি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা ছিল ওঁর। আর একজন বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ছিলেন এই গোত্রের, তিনি মহঃ রফি। রফি সাহেবও জীবনে কখনও মদ্যপান করেননি এবং সিগারেট খাননি।

এরপর উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রত্না চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত 'প্রতিশোধ' ছবির সময়কার ঘটনা। আগে এই প্রযোজিকা অর্থাৎ রত্না যথার্থই 'কাজল নয়না হরিণী' ছিলেন। তাই ওঁকে নিয়ে লিখেছিলাম 'মন নিয়ে' ছবির হিট গান 'ওগো কাজল নয়না হরিণী'। এবার মওকা মতো ওঁরই প্রযোজিত কোনও ছবিতে ওই মুখড়ার একটা সুপারহিট গান লিখব। মুখড়াটা হবে 'ওগো খপিস নয়না বাঘিনী'। সে কথা এখন থাক।

'প্রতিশোধ' ছবির পরিচালক ছিল সুখেন দাশ। সংগীত পরিচালক ছিল অজয় দাশ। মান্না দে-র 'কি বিষের ছোবল দিলি', আর অরুন্ধতীর 'ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা' এই গান দুটিতে সুর হয়ে যাওয়ার পর আমাদের আরও দুটি গান ছিল যেমন 'হয়তো আমাকে কারও মনে নেই' এবং 'আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ'। এ গান দুটির জন্য প্রযোজিকা আর পরিবেশক প্রণব বসুকে অনুরোধ করলাম কিশোরকুমারকে দিয়ে গাওয়াতে। আগেই বলেছি তখন কিশোরকুমারকে দিয়ে গাওয়ানোটা ছিল একটা বিরাট ব্যাপার। প্রথমত ওঁর কাছে সবাই তখন নিষ্প্রভ। এমনকী মহঃ রফি পর্যন্ত। কিশোরকুমারের জয়জয়কার তখন সর্বত্র। একে উনি ব্যস্ত। তার ওপর খেয়ালি। ওঁর সময় আর মেজাজ খুঁজে পাওয়া তখন একটা বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। আমাদের সবার অনুরোধে প্রযোজিকা এবং পরিবেশক রাজি হলেন। কন্ডিশন হল আমাকেও মুম্বই যেতে হবে। টেলিফোনে কিশোরদার একটা ডেট নিয়ে, আমরা শুভযাত্রা করলাম মুম্বইতে দুর্গা নাম জপতে জপতে। অবশ্যই যাওয়ার আগে আবদুলকে ফোন করে জানানো হল অমুক দিন আমরা যাচ্ছি।

মুম্বইতে পৌঁছে ফোন করা হল কিশোরদাকে, আমরা এসে গেছি। ফোন ধরল আবদুল। যথারীতি গম্ভীর গলায় বলল, উনি তো এখানে নেই। বাঙ্গালোরে চলে গেছেন। পনেরোদিন পর ফিরবেন। তখন ফোন করবেন।

কথা শেষ করে লাইনটা কেটে দিল। স্বাভাবিকভাবেই সবারই মুখ শুকিয়ে গেল। হঠাৎ একটা আলোর ইশারা দেখতে পেলাম আমি। রত্নাকে বললাম, আপনি ফোন করুন তো। মহিলা কণ্ঠ শুনলে আবদুল একটু বদলিয়ে যায়। ডাকুন ওকে আজকের ডিনারে।

মন্ত্রের মতো কাজ হল। আবদুল যথাসময়ে এসে গেল ডিনারে। তখনই কথা হল। আমরা তো কলকাতা থেকে আপনার ডেট নিয়ে আসছি। তা হলে আবার বাঙ্গালোরটা ঢুকছে কী করে? উত্তরে আবদুল জানাল, কিশোরকুমারের বাঙ্গালোর আর লতাজির কোলাপুর, মুম্বইতে যখন তখন ঢুকে পড়ে। ও সব ভেবে লাভ নেই। ধরে নিন, কিশোরদা বাঙ্গালোর গেছেন। তবে পনেরো দিন না করে ফেরাটা আমি দু দিনে করে দেব। দু দিন বাদে গানের অ্যাডভান্স নয় পুরো টাকাটা নিয়ে আপনারা অমুক সময়ে গৌরীকুঞ্জে আসুন। আর হ্যাঁ, গান দুটোর টেপও সঙ্গে আনবেন। কিশোরদার পছন্দ হলেই তবে গাইবেন।

এরপর ডিনার খেয়ে আবদুল চলে গেল। আমাদেরও দুর্ভাবনা অনেকটা ঘুচল। জমজমাট হয়ে উঠল সে রাতের মজলিশ। ওখানেই কিশোরদার দুর্বলতার একটা টিপস দিলাম। বললাম, যে করেই হোক একদম কড়কড়ে নতুন টাকা নিয়ে যেতে হবে।

পরদিন মুম্বইতে, সব রকম সোর্স কাজে লাগিয়ে, জোগাড় করা হল চকচকে নোটের বাণ্ডিল। দেখে বুঝলাম, এবার আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। লোকমুখে শুনেছি কিশোরদা নাকি কৈশোরে টাকা পয়সা একদম হাতে পেতেন না। বোধহয় সেই কারণে পরবর্তীকালে অর্থ উপার্জন তাই একটা নেশাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। টাকা ছাড়া এক পাও নড়তেন না। পুরো পারিশ্রমিকটি আগে না পেলে, কোনওদিনই কারও রেকর্ডিং-এ আসতেন না। সে যত বড় প্রোডিউসরই হোক আর যত বড় মিউজিক ডিরেক্টরই হোক। কাউকে কোনওদিন তোয়াক্কা করেননি কিশোরকুমার।

নির্দিষ্ট দিনে গৌরীকুঞ্জে যাওয়া গেল। গৌরীকুঞ্জের বাইরের গেটে একটা ছোট ফোঁকর আছে। ওকে ঠিক জানালা বলা যায় না। ওখানে গিয়ে ডাকাডাকি করলে দারোয়ান মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করত, আপনি কে? কী পরিচয়? কেন এসেছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব জেনে নিয়ে ওই ফোকরের জানালাটি বন্ধ করে ভেতরে চলে যেত। ভেতরে ঢোকার অনুমোদন এলে বড় গেটটা একটু ফাঁক করে দিত। ভেতরে ঢুকেই মনে হত এটা একটা ছোটখাটো স্থায়ী স্টুডিয়ো। এপাশে ফুল বাগান। ওদিকটায় একটা ছোট্ট নদীর মতো। তার ওপরে ব্রিজ। অন্যদিকে খড়ের চালাঘর। তার ভেতরে ইলেকট্রিকের বাল্ব লাগানো কেরোসিনের হ্যারিকেন ঝুলছে। আর একদিকে টার্জেনের বাড়ির মতো একটা কাঠ আর গাছের পাতার ছোট বাড়ি। কিশোরদা খুশি মতো একদিন, এক এক জায়গায় বসতেন। প্রথম যে গৌরীকুঞ্জের ভেতরে ঢুকবে তারই একটু ধাঁধা লেগে যাবে। তবে ওই দারোয়ানের আনুকূল্য, গৃহস্বামীর অনুমোদন আর ছেড়ে রাখা দুটো ডোভারম্যান কুকুরকে না সরানো পর্যন্ত কারও গৌরীকুঞ্জের ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তারপর একটু এগিয়ে এলে বাড়ি। কার্পেটে মোড়া ড্রইংরুম। ড্রইংরুমে কিশোরদার প্রিয়জনদের ছবি, আর বিরাট ছবি কুন্দনলাল সায়গলের।

আমি কিশোরদার মুখোমুখি হয়েই বললাম, কিশোরদা বাঙ্গালোর থেকে কবে ফিরলেন?

আবদুলের ইশারা বোধহয় উনি লক্ষ করেননি। তাই বলে উঠলেন, বাঙ্গালোর তো গিয়েছিলাম মাসখানেক আগে। এখন তো এখানেই আছি।

আমাদের অভিজ্ঞ পরিবেশক, এ ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে না দিয়ে নতুন নোটের বাণ্ডিল তুলে দিলেন কিশোরদার হাতে। কিশোরদা কিন্তু নোটগুলো গুনলেন না। নোটের বাণ্ডিলটা নাকের সামনে নিয়ে গিয়ে শুকলেন। তারপর নির্বিকারভাবে বললেন, নতুন কারেন্সি নোটের গন্ধটা আমার কাছে এক্সেলেন্ট লাগে। এ গন্ধটা আর কোনও কিছুতেই পাই না। কথাটা বললেন কিন্তু গম্ভীরভাবে।

মেহবুব স্টুডিয়োতে রেকর্ডিং হয়েছিল 'প্রতিশোধ' ছবির গান। যতদূর মনে পড়ে তখন চিফ রেকর্ডিস্ট ছিলেন বিখ্যাত রবীন চট্টোপাধ্যায়। তখন যিনি ওঁর সহকারী ছিলেন তিনি আজকের মেহবুব স্টুডিয়োর চিফ রেকর্ডিস্ট অভি ঠাকুর। বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রশিল্পী

দক্ষিণামোহন ঠাকুরের পুত্র।

মেহবুবের রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে এসে রত্নাকে চুপি চুপি বললাম, একদিনে কিশোরদাকে দিয়ে দুখানা গান করানো খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যে করেই হোক আমাদের তা করিয়ে নিতেই হবে। নইলে কবে কোন মাসে আবার ডেট পাওয়া যাবে তা স্বয়ং ভগবানও বলতে পারবেন না।

রত্নাকে একটু নিরিবিলিতে সরিয়ে এনে বললাম, প্রথম গানটা রেকর্ড হয়ে গেলে (তখন ট্র্যাক রেকর্ডিং ছিল না) সবাই যখন মশগুল হয়ে গানটা শুনবেন আর কিশোরদাকে বাহবা দেবেন, সেই ফাঁকে কিশোরদা খুঁজে দেখবেন মেহবুবের দুটো সিঁড়ির কোনটা ফাঁকা। যেটা ফাঁকা পাবেন সেই সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গিয়ে সোজা পালিয়ে যাবেন। আর ধরতে পারবেন না ওঁকে। তাই প্রথম গানটা যখন সবাই শুনবেন, আমরা দু জনের কেউই তা শুনব না। একটা সিঁড়ি পাহারা দেব আমি আর অন্যটা পাহারা দেবেন আপনি। ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না। শুধু আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাক। কিশোরদার কানে পৌঁছে গেলে, উনি পালাবার কী যে ফন্দি বার করবেন, কেউ তা ভাবতে পারবে না।

প্রথম রেকর্ডিং হল 'হয়তো আমাকে কারও মনে নেই'। কিশোরদা প্রথমে আমার কাছেই বাংলা কথাগুলো শুনে নিয়ে, একটা কাগজে হিন্দিতে লিখে নিলেন পুরো গানটা। বাংলা উচ্চারণগুলো আমার কাছে ঠিক করে নিলেন। অজয়ের কাছ থেকে তুলে নিলেন গানটা। বুঝতে পারলাম, অগ্রিম গানের ক্যাসেট দেওয়াই সার। কিশোরদা এক লাইনও শোনেননি। অর্কেস্ট্রার রিহার্সাল ফাইনাল হওয়ার পর ডাইরেক্ট টেক করতে রেকর্ডিং বুথে ঢুকলেন কিশোরদা। ঢুকে কিন্তু একটা লাইনও গাইলেন না। এদিকে ওদিকে কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন। এদিকে বাজনা বেজেই চলেছে। কিশোরদা নীরব। হঠাৎ সেখানে এল সেক্রেটারি আবদুল। আবদুল থামস আপের ভঙ্গিতে বুড়ো আঙুলটা তুলে দেখাতেই সরব হয়ে গেলেন কিশোরদা। গাইতে লাগলেন 'হয়তো আমাকে কারও মনে নেই।'

আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমার মতো কিশোরদার কাছের মানুষও, আগে এ-ব্যাপারটা জানতাম না। জেনেছিলাম এই ঘটনার পরে।

কিশোরদা রোজই বহু পার্টির কাছ থেকে পুরো টাকা অগ্রিম নিচ্ছেন। তার সব হিসেব থাকত আবদুলের কাছে। গানের সময় কিশোরদা মনে করতে পারতেন না কে পুরো টাকা দিয়েছে, কে দেয়নি। তাই আবদুল ঠিক রেকর্ড করার পূর্ব মুহূর্তেই কিশোরদাকে ওই সাংকেতিক চিহ্ন থামস আপ দেখাতেন। ওই চিহ্ন দেখে কিশোরদা নিশ্চিন্ত মনে রেকর্ডিং-এ ওই কণ্ঠস্বর দিতেন।

প্রথম গানটা রেকর্ড হয়ে গেল। সবাই শুনতে লাগল। আমি এসে দাঁড়ালাম মেহবুবের কাঠের সিঁড়ির মুখে কিশোরদাকে ধরব বলে। কিশোরদা পালাবার জন্য সিঁড়িতে এলেন না। যাক ফাঁড়া কেটে গেল। খুশি মনে থিয়েটারে ঢুকতেই আমাকে দেখে রত্না হেসে গড়িয়ে পড়লেন। আমি বললাম, কী হল? রত্না হাসতে হাসতে বললেন, ওই সিঁড়ি দিয়ে কিশোরদা পালাচ্ছিলেন। একেবারে হাতেনাতে ধরেছি। বলছিলেন, জল খেতে যাব।

আবদুলকে বলেছি গাড়ি থেকে জল এনে দিতে।

দ্বিতীয় গান মানে 'মিলনতিথির পূর্ণিমা চাঁদ' রেকর্ড করার জন্য আর্টিস্ট বুথে ঢুকে গম্ভীরভাবে বললেন, পোলাওবাবু এ আপনারই কাজ। না হলে ভদ্রমহিলা কী করে জানবেন আমি ওই সিঁড়ি দিয়ে কেটে পড়ব? গানটা শেখানো শেষ হতে দেখলাম ওঁর রাগটা কেটে গেছে।

বললেন, গানটা আপনি দারুণ লিখেছেন। একেবারে তাল মিছরির মতো মিষ্টি।

'মিলনতিথির পূর্ণিমা চাঁদ' গানটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ছিল 'অনেক দিনের হারানো সুখ পেলাম যে আবার'। কিন্তু কিশোরদা রিহার্সালে গাইতে লাগলেন, 'অনেক দিনের হারানো সুর পেলাম যে আবার'। রেকর্ডিং মাইক দিয়ে যতবার বলি ওটা 'সুর' নয় 'সুখ' হবে, কিশোরদা ততবারই 'সুর'টাই বলে বসেন। শেষে বুথে ঢুকে গিয়ে বললাম, ওটা হবে হারানো সুখ। কিশোরদা গানের কাগজে সেটা লিখে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, উত্তমকুমারের 'হারানো সুর' দেখে ওই সুরটাই মুখে এসে যাচ্ছিল। আপনি উত্তমকুমারকে আমার কনগ্র্যাচুলেশন জানাবেন।

৪৩

কিশোরদাকে নিয়ে কথা শুরু করলে সে আর শেষ হওয়ার নয়। এবার কলকাতার একটা ঘটনা বলি। এই কলকাতায় কিশোরদাকে দেখলাম নতুন রূপে। লোকমুখে কত কী কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম কিশোরকুমার, রুমা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ বিচ্ছেদের পর রুমাদেবী নাকি কিশোরদার ফিয়াট গাড়িটা নিয়ে এবং সুটকেশ ভর্তি নোটের তাড়া নিয়ে কলকাতায় এসে উঠেছিলেন। এরকম কত আজগুবি রটনা। কলকাতায় এসে রুমাদেবী মুদিয়ালির যে ফ্ল্যাটে উঠেছিলেন, সেই ফ্ল্যাটে আমি আর ভূপেন হাজারিকা গিয়েছিলাম রুমাদেবীকে দিয়ে প্রথম আধুনিক গান রেকর্ডের জন্য গান তোলাতে। লোকমুখে শুনেছিলাম রুমাদেবী বিয়ে করছেন অরূপ গুহঠাকুরতাকে। এবং রুমাদেবীর টাকায় তৈরি হচ্ছে বাংলা ছবি 'বেনারসী'। তারপর সত্যিই ওঁদের বিয়ে হল। রুমাদেবী চলে গেলেন অরূপ গুহঠাকুরতার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে। স্বভাবতই ওইসব রটনা শুনে ধারণা হয়েছিল রুমাদেবী আর কিশোরদার সম্পর্ক খুব তিক্ত। কিশোরদা তখন বিয়ে করেছেন মধুবালাকে।

যাই হোক সেবার আমাদের পাড়ার ক্লাবের জলসায় রুমাদেবীকে শিল্পী হিসেবে নিয়েছিলাম। সেদিন আমি গিয়েছিলাম পারিশ্রমিকটা রুমাদেবীর হাতে পৌঁছে দিতে। নীচেই অরূপবাবুর সঙ্গে দেখা। ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল আমাদের মধ্যে। আমি বললাম, রুমাদেবী আছেন তো?

অরূপবাবু বললেন, হ্যাঁ। আপনার টেলিফোন পেয়ে অপেক্ষা করছে। সিঁড়ি দিয়ে সোজা চলে যান ওপরে।

আমি ওপরে গেলাম। রুমাদেবীর দরজায় টোকা দিলাম। রুমাদেবী নিজেই দরজা খুলে দিলেন। আমি ঘরের ভেতরে এসে অবাক! দেখি ঘরে বসে আছেন কিশোরদা।

চমকে উঠতে হল। এমনটি দেখব ভাবতে পারিনি। আসলে কিশোরদা পৃথিবীতে সবথেকে ভালবাসতেন ওঁর প্রথম সন্তান, রুমাদেবীর পুত্র অমিতকুমারকে। ছোট অমিত তখন থাকত রুমাদেবীর কাছে। পড়াশোনা করত কলকাতাতেই পাঠভবনে। শুধু অমিতকে দেখতে, ওর খোঁজ-খবর নিতেই যখন তখন কিশোরদা চলে আসতেন কলকাতায়। সেদিন কিশোরকুমারের মধ্যে একটা নতুন রূপ আমার চোখে ধরা পড়ল। গায়ক, অভিনেতা, পরিচালক, এসব নয়। আমি দেখলাম পিতা কিশোরকুমারকে। ছেলেকে দেখবার জন্য তিনি নির্দ্বিধায় চলে এসেছেন প্রাক্তন স্ত্রীর বাড়িতে।

এরকম আর একটা ঘটনা দেখেছিলাম উত্তমকুমারের ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে। সেদিন সন্ধ্যায় ওখানে গিয়ে দেখি, উত্তম-সুপ্রিয়ার সঙ্গে আড্ডায় মশগুল সুপ্রিয়ার প্রাক্তন স্বামী বিশু চৌধুরী। বিশু চৌধুরীর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। উনি আমাকে আন্তরিকভাবেই সহাস্য মুখে বসতে বললেন। উত্তম আমায় বলল, মামা (উত্তম আমাকে মামা বলত। সুপ্রিয়া আমাকে এখনও মামা-ই বলে) আজ রাতটা থেকে যাও। অনেকদিন বাদে জমিয়ে আজ আড্ডা হবে।

সুপ্রিয়াকে উত্তম বলল, বেণু, মামাকে আমার একটা ধুতি দাও। আর বিশুবাবুও থাকবেন, ওঁকে আমার একটা পায়জামা দাও। আমি অবাক হয়ে এক পলকের জন্য উত্তমের দিকে তাকিয়ে রইলাম শুধু। তারপরই এগিয়ে গেলাম বাড়িতে ফোন করে আমার রাত্রিবাসের কথা জানাতে।

সেবার সম্ভবত সুজিত গুহের 'দাদামণি' ছবিতে আমার লেখা কিশোরদার কণ্ঠে 'এই তো এসেছি আমি/তোমার দাদামণি' গানটা করতে সুরকার অজয় দাশ মুম্বই যাবে ঠিক হল। আমি অন্য কী একটা কাজে ব্যস্ত থাকায় বললাম, আমি পরে যাব। তখনই এসে গেল দীপ্তি পাল। ওঁদের প্রোডাকসনসের প্রথম ছবির পরিচালক দীপরঞ্জন বসুর পরিচালনায় 'পারাবত প্রিয়া' ছবিতে গান লেখার জন্য। প্রযোজক দিলীপ পাল চিত্রনাট্য শোনালেন। চিত্রনাট্য শোনাবার পর আজ এক সংগীত পরিচালকের নাম বলেন, পরের দিন আবার অন্য এক সংগীত পরিচালকের নাম বলেন। শেষ পর্যন্ত উনি সংগীত পরিচালক নিলেন বেহালাবাদক দিলীপ রায়কে। যথাসময়ে দিলীপ রায়ের সুরে ছবির একটা গান আমি লিখেও ফেললাম। সে গানটি কলকাতাতে রেকর্ড হয়ে গেল। গাইল অমিতকুমার। তারপরই দিলীপ পালের সঙ্গে দিলীপ রায়ের বোধহয় মতানৈক্য হল। উনি আমায় জানালেন দিলীপবাবুকে দিয়ে বাকি গান আর করাব না। করবেন 'অমুক' মিউজিক ডিরেক্টর। পরদিন আর এক মিউজিক ডিরেক্টরের নাম করে বললেন, আসুন আজ ওঁর সঙ্গে ফাইনাল করব। গেলাম ওঁর বাড়ি। গাড়িতে উঠেই বললেন, আচ্ছা অমুককে নিলে কেমন হয়? আমি কোনও উত্তর না দিয়ে ড্রাইভারকে সোজা যেতে বললাম বৌবাজার। অজয় দাশ তখন বৌবাজারে থাকত।

দিলীপবাবু আমার অনুরোধে অজয় দাশকে নিলেন 'পারাবত প্রিয়া' ছবির সংগীত পরিচালক হিসাবে। 'পারাবত প্রিয়া'র গান আমি অজয়ের সঙ্গে বসে তৈরি করেছিলাম রাসবিহারী রোডের বাণীচক্রের চারতলায় বসে। আমরা তিনটে গান বানিয়েছিলাম। ঠিক হল, একটি গাইবেন আরতি মুখোপাধ্যায়। আর একটি গান গাইবেন আশা ভোঁসলে।

আর তিন নম্বর গানটি গাইবেন কিশোরকুমার। কিশোরদার গানটি ছিল 'অনেক জমানো ব্যথা বেদনা/কী করে গান হল জানি না'। অজয় দাশকে বললাম, ভালই হল, তুমি তো আমাদের 'দাদামণি'র গান করতে মুম্বইতে যাচ্ছই তখনই কিশোরদার একটা ডেট নিয়ে আমায় ফোন করো। দিলীপবাবু, দীপ্তিদেবী, আমরা হাজির হয়ে যাব।

যথাসময়ে আমরা হাজির হলাম। 'পারাবত প্রিয়া'-র রেকর্ডিং-এর সময় কিশোরদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার লেখা 'দাদামণি'র গান কেমন লাগল। কিশোরদা ভ্রু কুঁচকে বললেন, দাদামণি আবার নতুন গান গেয়েছেন নাকি? শুনিনি তো! বুঝলাম 'দাদামণি' কথাটা বলতে উনি বুঝেছেন ওঁর অগ্রজ অশোককুমারকে। আমি সেটা বুঝে নিয়ে বললাম, না না। দাদামণি ছবির গানের কথা বলছি। কিশোরদা বললেন, ও তাই বলুন। বেশ ভাল।

এই দাদামণিকে নিয়ে কিশোরদার দারুণ একটা কাহিনী আছে। একবার দাদামণি অর্থাৎ অশোককুমারের খুবই পরিচিত এক প্রযোজক, কিশোরদাকে একটা ডেট এবং কম টাকার পারিশ্রমিকের জন্য দাদামণিকে অনুরোধ উপরোধ করেন। দাদামণি জানতেন কিশোরকুমার ওঁর কথায় একটা ডেট খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবেন। কিন্তু টাকা পয়সা? পারিশ্রমিকের বেলায়, কিশোরদা যে অনড় অটল সেটা চিত্র জগতের সবারই জানা ছিল। তাই দাদামণি এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হলেন না। কিন্তু প্রযোজক কিছুতেই শুনবেন না। একেবারে নাছোড়বান্দা। অগত্যা দাদামণি বাধ্য হয়ে ভদ্রলোককে বললেন, আচ্ছা আমি কিশোরকে হাফ প্রাইসে গাইবার জন্য বলব। ভদ্রলোক তাতে মহাখুশি।

অনতিবিলম্বে কিশোরদার সেক্রেটারি আবদুল দিয়ে দিলেন কিশোরদার একটি মহামূল্যবান ডেট। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে কিশোরদা গান গাইতে ঢুকলেন স্কোরিং থিয়েটারে। প্রযোজক ভদ্রলোক সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। গর্বে আনন্দে উনি আর কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

কিশোরদা সংগীত পরিচালকের কাছ থেকে গান তুললেন। রিহার্সাল করলেন। রেকর্ডিং শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অভ্যাসমতো আবদুলের আঙুলের দিকে তাকালেন। দেখলেন থামস আপের আঙুল সবটা ওঠেনি। অর্ধেকটা উঠেছে। তার মানে গানের টাকা আবদুল পেয়েছে অর্ধেক। কিশোরদা তো নির্দ্বিধায় গান গাওয়া শুরু করলেন। প্রযোজক ভদ্রলোক দুহাত জোড় করে মুম্বইয়ের জাগ্রত দেবতা, সিদ্ধি বিনায়ক গণেশকে প্রণামও সেরে ফেললেন। ফাইনাল টেক শুরু হল। অপূর্ব গাইলেন কিশোরদা, কিন্তু ও কী! সবাই সবিস্ময়ে দেখলেন, কিশোরদা অর্ধেকটা গান গেয়ে গান বন্ধ করে দিয়েছেন। হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল স্কোরিং থিয়েটার। কাউকে কিছু বলার বা প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে কিশোরদা বলে উঠলেন, আমার গান শেষ। আমি অর্ধেকটা গেয়েছি। বাকিটা গাইবেন দাদামণি।

এই ছিলেন কিশোরকুমার। এখন আবার ফিরে আসি 'পারাবত প্রিয়া'-র ওই 'অনেক জমানো ব্যথা বেদনা' গানের প্রসঙ্গে। যথারীতি আমার কাছ থেকে গান লিখে নিলেন কিশোরদা। সুর তুললেন অজয়ের কাছে। কিন্তু গাইবার সময় গাইতে লাগলেন 'অনেক/জমানো ব্যথা বেদনা'। অর্থাৎ 'অনেক'-এর পর ছেদ তারপর আবার জমানো

ব্যথা বেদনা। অজয় আর আমি দুজনেই আপত্তি জানাতে ঢুকে পড়লাম রেকর্ডিং বুথে। বললাম, না। অনেক জমানো ব্যথা বেদনা একসঙ্গে বলতে হবে।

কিশোরদা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, কেন? আমি তো গেয়েছি, 'এক দিন/পাখি উড়ে...'। অজয় দাশ একগাল হেসে স্মার্টলি জবাব দিল, ও গানটা সুপারহিট হলেও ও গানের পাখিটা উড়িষ্যার পাখি হয়ে গেছে।

আমি বললাম, ঠিক তাই। আপনি তো গেয়েছেন 'এ মুকন্দর/কা সিকন্দর'। পারফেক্ট স্ক্যানিং-এ যা হওয়া উচিত ছিল 'এ মুকন্দর কা/সিকন্দর'। এবং এটাও হয়তো সুপারহিট।

এবার কিশোরদা হেসে ফেললেন। আমি বললাম, লাভ কী? রবীন্দ্রনাথের বাংলা গানের দেশে শুধু শুধু স্ক্যানিং-এর এই ভুলটা রেখে।

কিশোরদা মেনে নিলেন। সামনে ঝোলানো গানের কাগজটাতে একটা আঁচড় কাটলেন। রেকর্ডিং শুরু হওয়ার আগে কিশোরদা আর একটা রিহার্সাল চাইলেন। আবার গাইলেন গানটা। আমি তখনও বুথের ভেতরে দাঁড়িয়ে। সুরের কী একটা ভুল হতে, অজয় রেকর্ডিং মেশিনের কাছ থেকে মাইক্রোফোনে সেটা গেয়ে দেখিয়ে দিল সেটা কেমন হবে। কিশোরদা বলে উঠলেন, বার বার এ জায়গাটাতে আমার ভুল হচ্ছে। দাঁড়ান। লিখে নি।

কিশোরদা আমার কলমটা চেয়ে নিয়ে গানের কথার উপর সেটা লিখে নিলেন। মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম আমি। কিশোরদা একদিন বলেছিলেন, গান শুধু গাইতে জানি। গানের ও-সব গ্রামার ট্রামার, ওই সব সারে গামা টামা আমি কিছুই জানি না।

অথচ আমি স্বচক্ষে দেখছি কিশোরদা হুবহু মান্নাদার মতো গানের কথার ওপর শর্টহ্যান্ড স্বরলিপি লিখে রাখলেন। কিশোরদা তা হলে মুম্বইয়ের চলতি কথায় ছুপা রুস্তাম! আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম। কিশোরদা আমার দিকে তাকিয়েই একমুখ হেসে বলে উঠলেন, না না। আমি ওসব শর্ট হ্যান্ড নোটেশন ফোটেশন জানি না। ওসব মান্নাদা জানেন। আমি শুধু লিখে নিলাম। আপনার এই ব্যথা বেদনার শেষ লাইনটাতে 'বুঝেও কেন বুঝল না সে/কী আমার শুভ কামনা।' এই 'শুভ কামনা'-য় আমার গলাটা কেমন ঘুরবে, এই দেখুন কোনও নোটেশন আমি লিখিনি, শুধু 'শুধু কামনা' শব্দটার নীচে একটা গোল দাগ টেনে দিয়েছি। আমি ভাই ও-সব ব্যাকরণ শিখিনি কোনওদিন। দেখলাম গানের কাগজে মান্নাদা যেমনভাবে স্বরলিপির আঁচড় দেন, কিশোরদাও তেমনি আঁচড় দিয়েছেন। তবে সেগুলো ওঁর নিজস্ব আঁকিবুকি। সেবার গানের কাগজটা আনতে পারিনি। পরের বার দীপ্তি পালের 'অনুরাগের ছোঁয়া' ছবির 'আমি যে কে তোমার' গানের সময় শ্রীমতি দীপ্তি পাল ওই গানের কাগজটা নিয়ে এসেছিলেন।

এবার মনে আসছে 'জীবন মরণ' ছবির সময়কার ঘটনা। অজয়ের সুরে আমার লেখা গান (১) ওপারে থাকব আমি তুমি রইবে এপারে' (২) আমার এ কণ্ঠ ভরে/বাজে গো যে সুর বাহার' ইত্যাদি গান শুনে সবাইকে চা খাইয়ে দিলেন।

কিশোরদাও ছিলেন খানিকটা শচীনদেব বর্মণের মতো। খুব বেশি আপনজন না ভাবলে চট করে কাউকে চা খাওয়াবার খরচাটা করতেন না। কিশোরদা নিজেও খুব

খেতে ভালবাসতেন। বিশেষ করে বাঙালি রান্না। একবার কমল ঘোষের বালিগঞ্জের বাড়িতে কিশোরদা নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। বন্ধুবর কমল ঘোষও খেতে এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। কিশোরদার জন্য অনেকগুলো বাঙালি পদের রান্না হল। তার মধ্যে ছিল কিশোরদার অতি প্রিয় মাগুর মাছ। খেতে বসে বিশাল পর্ব দেখে কিশোরদা একটু থমকে গেলেন। কমল বলল, না না, কিশোরদা। খাওয়াতে জোর করব না। যেটা পারবেন, যতটা পারবেন, তাই খাবেন। বাকিটা পড়ে থাকবে। কিশোরদা বেশ রাগত চোখে কমলেব দিকে তাকালেন। ওইভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, পড়ে থাকবে মানে? কিচ্ছু পড়ে থাকবে না। কিচ্ছু পড়ে থাকতে দেব না। ভারতবর্ষে খাবার নষ্ট করা মহা পাপ। এই পাপ আমাদের করা উচিত নয়।

৪৪

কিশোরদাকে নিয়ে বলতে শুরু করলে সে বলা সহজে শেষ হওয়ার নয়। এবার শুনুন 'মিলন তিথি' ছবির সময়কার ঘটনা। কিছুদিন আগেই আমি অন্য একটা কাজে মুম্বই গিয়েছিলাম। কিশোরদার তো গানের জন্য ডেট নেওয়া হয়েই গিয়েছিল। তবুও ভাবলাম আর একবার ঝালিয়ে নিই। বলে যাই, আমরা সদলবলে অমুক তারিখে আসছি। দারুণ দাঁড়িয়েছে 'মিলন তিথির' গান, আপনার ভাল লাগবে।

সকালে ফোন করলাম। ও প্রান্ত থেকে মহিলা কণ্ঠে প্রশ্ন এল, আপনি কে?

আমি নাম বললাম।

মহিলা বললেন, দাদা এখন ফরেনে। ভারতবর্ষের বাইরে। ফিরতে দেরি হবে।

স্বাভাবিকভাবেই মনটা ভেঙে গেল। তা হলে আমার গানের রেকর্ডিংটা কি হবে না। অন্য কেউ গাইলে এ গান যে মোটেই দাঁড়াবে না। কী করা যায়?

ভাগ্যের ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে আবার বিকেলবেলা কিশোরদাকে ফোন করলাম। এবার খুব ভারী গলায় চোস্ত উর্দুতে প্রশ্ন এল, আপনি কে?

আমি নাম বললাম।

এবার উত্তর এল, উনি এখন ব্যাঙ্গালোরে। কবে ফিরবেন বলতে পারছি না।

প্রথমবার শুনলাম ফরেন। আর এবার শুনলাম ব্যাঙ্গালোর। মনের মধ্যে খটকা লাগলেও মেনে নিতে হল। সত্যি হয়তো কিশোরদা 'মিলন তিথি' রেকর্ডিং-এর সময় মুম্বইতে থাকবেন না।

ঘটনাচক্রে সেই সন্ধ্যাতেই বাপি লাহিড়ির সঙ্গে একটা বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে গেলাম সানি স্টুডিয়োতে। গিয়ে দেখি বাপি লাহিড়ির কী একটা হিন্দি ছবির রেকর্ডিং চলছে। গায়ক আর কেউ নন স্বয়ং কিশোরকুমার। আনন্দ উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে গেল আমার মন। কিশোরদাকে একটু ফ্রি পেতেই বললাম, আজ দু-দুবার আপনাকে বাড়িতে ফোন করেছি। একজন বললেন, আপনি ফরেনে। আর একজন বললেন, আপনি ব্যাঙ্গালোরে। অথচ আপনি তো এখানেই রয়েছেন।

আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। কিশোরদা অম্লানবদনে বললেন, দুবারই আমি

ফোন ধরেছিলাম। দুবারই শুনেছিলাম আপনার নাম। কিন্তু টেলিফোনে তো ছবি দেখা যায় না। কী করে জানব আপনিই আসল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়? আচ্ছা বলুন তো, কোনও রামহরি সমাদ্দার বা আপনার বাড়ির রাস্তা শ্রীরাম ঢ্যাং রোডের কোনও জড়ভরত ঢ্যাংও তো পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বলে ফোনটা করতে পারেন। আমি কি এতই বোকা। ওইসব দু নম্বরিদের সঙ্গে কথা কইব?

আমি তখন বাধ্য হয়ে কিশোরদাকে বললাম, তা হলে আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব কেমন করে?

কিশোরদা গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, আবদুল ফোন ধরলে কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু ব্যাপারটা আমি নিজে ধরলে। আচ্ছা একটা 'কোড' আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি। এদিক থেকে হ্যালো শুনলেই আপনি টেলিফোনের মাউথপিসে তিনবার হাততালির আওয়াজ দেবেন। তা হলেই বুঝব আপনিই সত্যিকারের পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাই হোক, যথাসময়ে কিশোরদা গাইলেন আমার লেখা এবং অজয় দাশের সুর দেওয়া 'মিলন তিথি' ছবির গান। ওই ছবিতে কিশোরদা কেমন অপূর্ব গেয়েছিলেন তা আপনারা সকলেই জানেন। এ ছবিতে আশা ভোঁসলে এবং আরতি ছাড়াও কলকাতার একটি নতুন ছেলে বেশ ভাল গেয়েছিল।

ছেলেটির নাম পরিমল ভট্টাচার্য। গানটি ছিল 'চেনাতে কি আর দেরি লাগে— ঝিকমিকে হীরে ফুল কোনটি? মোর বোনটি' পরিমলের গানটা হিট করেছিল ঠিকই কিন্তু কেন জানি না ও আর তেমন সুযোগ পেল না।

হেমন্তদা যেমন বলতেন সবই উপরওয়ালার হাত। হয়তো তাই।

সেদিন কিশোরদাকে নিয়ে আরও একটি ঘটনার কথা শোনাল বাপি লাহিড়ি। বাপির সুরে একটি হিন্দি ছবিতে কিশোরদা গান গাইবেন ঠিক হল। প্রযোজক মাদ্রাজের। ওই প্রযোজকের আগের ছবিতেও কিশোরদা গান গেয়েছেন। ওই প্রযোজক ভদ্রলোক বাপিকে বললেন, কিশোরদার টাকাটা আমি একটু কমিয়ে ম্যানেজ করে নেব। আমার সঙ্গে ওঁর দারুণ টার্মস। উনি নিশ্চয় সস্তায় করবেন।

রেকর্ডিং-এর দিন যখন বাপি দেখল সময় গড়িয়ে যাচ্ছে অথচ কিশোরদা আসছেন না তখন প্রযোজক কিশোরদাকে ফোন করে শুনতে পেলেন কিশোরদা মুম্বইতে নেই। প্রযোজক মশাই বুঝলেন এটা কিশোরদার তথাকথিত একটা বাংলা 'গুল'। উনি আর কালবিলম্ব না করে গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন কিশোরদার বাড়ি গৌরীকুঞ্জে। ঘটনাচক্রে তখনই কিশোরদাকে নিয়ে আবদুলের গাড়ি গেট দিয়ে বার হচ্ছিল। দুটো গাড়িতে মুখোমুখি দেখা। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে চেঁচিয়ে উঠলেন, নমস্কার কিশোরকুমারজি। কিশোরদা গাড়ির ভেতর থেকে জবাব দিলেন, জি সাব, আমি কিশোরকুমার নই, অনুপকুমার।

এবার উপায়ান্তর না দেখে বাকি পুরো টাকাটা আবদুলের হাতে দিয়ে দিলেন প্রযোজক ভদ্রলোক। আবদুল গুনে নিয়ে যথারীতি আঙুলের মুদ্রায় 'থামস আপ' করল। কিশোরদা সংকেত দেখে নিয়ে ভদ্রলোককে বললেন, দেখুন পি সি সরকার মশাই, কী কাণ্ডটা করলেন। আমি এখন আর অনুপকুমার নই। আমি কিশোরকুমার। চলুন রেকর্ডিং

থিয়েটারে।

এরপর আমার যে গান কিশোরদার কণ্ঠে খুবই জনপ্রিয়, সেটি হল মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' ছবির গান। ওই ছবিতে আমি অনুপ জলোটাকে প্রথম বাংলা গান গাইতে রাজি করিয়েছিলাম। গানটি ছিল—'হে মহাদ্যুতিং দিবাকর/সর্ব পাপ তাপ হর!'

কিশোরদার গানটি লেখার সময় ওই ছবির চিত্রনাট্যকার অঞ্জন চৌধুরী আমায় বলেছিল, এ গানটি লিখতে আপনার গান আপনাকেই চুরি করতে হবে। অঞ্জনের কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। অঞ্জন পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়ে আমায় বলল, আপনার লেখা মান্নাদার ওই গানটি 'তুমি অনেক যত্ন করে আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছো/ দিতে পারনি'-র মতোই একটা গান লিখে দিতে হবে। আমি লিখেছিলাম 'মুখেতে বললে তুমি যে কথা/সেকথাই শেষ কথা কি...'

ওই ছবিতে আরও একটি রেকর্ড, চিত্রা সিংহের প্রথম বাংলা প্লে-ব্যাক। চিত্রা-জগজিৎকে নিয়ে পরে অনেক কথা বলব।

এই ছবিতে চিত্রার গানটি ছিল 'আমি তোমার চিরদিনের'। অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়ে আমার অনেক গানই কিশোরদা গেয়েছেন। কিন্তু এখন মনে আসছে আমার লেখা ওই সুপার ডুপার হিট গানটির কথা 'চিরদিনই তুমি যে আমার/যুগে যুগে আমি তোমারই...'। 'অমরসঙ্গী' ছবিতে বাপি লাহিড়ির সুরে কিশোরদার মতো ও গানটি আশা ভোঁসলেও গেয়েছেন। উনি এখনও ও গানটি ভুলতে পারেননি। তাই বোধহয় এবারে ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, ইডেনের স্টেডিয়ামে আমার ওই বাংলা গান সারা পৃথিবীকে শুনিয়ে দিলেন আশা। এজন্য ও গানের গীতিকার হিসাবে নিশ্চয়ই আমি ধন্য। 'অমরসঙ্গী'র ওই গানটা গাওয়ার পর কিশোরদা আমার কানের কাছে মুখটা নামিয়ে এনে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই খুব লভ টভ করেন। নইলে এমন লভ সঙ লিখলেন কী করে।

অজয় দাশের সুর করা, কিশোরদার আমার আরও কিছু প্রিয় গানের কথা এখন মনে পড়ছে। যেমন 'দেনা-পাওনা' ছবির 'তুমি স্বর্গের দেশ থেকে পাঠানো একটা ফুল'। 'অভিমান' ছবির 'দুজনাতে লেখা গান', 'পাপ-পুণ্য' ছবির 'ভালবাসা ছাড়া আর আছে কি'। এ গানটি লিখেছিলাম একজন নামী শিল্পীর পুজোর গান হিসেবে। শিল্পীর এটি অপছন্দ হওয়াতে এই ছবিতে লাগিয়ে দিলাম। এ গানটি লিখেও কিশোরদার কাছ থেকে আমি এক নম্বর প্রেমিকের অলিখিত সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। বাপির সুরে 'আশা ভালবাসা' ছবিতে কিশোরদার জন্য দুটি গান লিখেছিলাম। ওতে একটি গান ছিল 'নটবর নাগর তুমি/আর করোনা মস্করা'। আর একটি গান ছিল 'আমায় ফুলের বাগান দিয়ে নিয়ে যেও না'। এ গানটি গাইবার সময় আমি এক বিপর্যস্ত কিশোরকুমারকে দেখেছিলাম।

রেকর্ডিং-এর সময় কিছুতেই ঠিকভাবে গাইতে পারছিলেন না কিশোরদা। প্রায় দু ঘণ্টা ওভারটাইম হয়ে গেল। তবুও গানটা হল না। আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। শেষটায় কিশোরদা বললেন, বাপি আমি পারব না। গানটা দারুণ। নষ্ট করে লাভ নেই। তুই নিজেই গেয়ে দে।

বাপি বলল, তা হতে পারে না কিশোরমামা। কালকে আমারই রেকর্ডিং ডেট আছে। কাল আবার আপনি ট্রাই করবেন।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বাপিকে বললাম, তুমি বরং মিউজিকট্র্যাকের উপরেই এ গানটা গেয়ে দাও। কিশোরদা বাড়িতে যাওয়ার সময় গাড়িতে শুনুন। বাড়িতে গিয়ে আবার শুনুন। ঠিক গলায় বসে যাবে গানটা। কিশোরদা সায় দিয়ে বললেন, তাই করে দে বাপি। তারপর বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, কেন এমন হল কে জানে। দেখা যাক কাল কী হয়!

পরের দিনই দুর্দান্তভাবে গেয়ে দিলেন সেই গানটি। আমি দেখলাম বিজয়ী বীরের অভিব্যক্তিতে রেকর্ডিং রুমে দাঁড়িয়ে গানটি শুনছেন কিশোরদা। সে সময়টা কিশোরদা শুধু পঞ্চমের গানের জন্য, জুহু থেকে অনেক দূরে তারদেও-র ফিল্ম সেন্টার স্টুডিয়োতে যেতেন। নইলে বান্দ্রা পেরিয়ে মুম্বইতে যেতে চাইতেন না কিশোরদা। কী একটা রেকর্ডিং-এ কোথাও স্টুডিয়ো পাওয়া যাচ্ছিল না। কিশোরদাকে বলা হল এইচ. এম. ভি. স্টুডিয়োতে রেকর্ডিং করবেন? কোলাবায় দারুণ স্টুডিয়ো বানিয়েছেন ওরা।

কথাটা শুনেই ভ্রূ কোঁচকালেন কিশোরদা। বললেন, কোলাবা? না না, অতদূরে আমি যেতে পারব না। আমার অসুবিধা হবে।

প্রযোজক পক্ষ অনুনয় করলেন, কী আর অসুবিধা হবে। আমাদের গাড়িতে উঠবেন আর সোজা স্টুডিয়োতে গিয়ে নামবেন।

বিরক্ত কণ্ঠে কিশোরদা বললেন, অসুবিধা হবে না মানে? আমার বাড়ি এই জুহু তারা থেকে দাড়ি কামিয়ে গাড়িতে উঠে যখন এইচ. এম. ভি.-তে নামব তখন দেখব আমার আবার দাড়ি গজিয়ে গেছে।

কিশোরদার আরও দুটো উল্লেখযোগ্য গান আমি লিখেছিলাম 'দোলন চাঁপা' ছবিতে কানু ভট্টাচার্যের সুরে 'আমারও তো গান ছিল/সাধ ছিল মনে' আর গৌতম বসুর সুরে 'হীরক জয়ন্তী' ছবিতে 'বহু দূর থেকে এ কথা/দিতে এলাম উপহার'।

আরও অনেক গান লিখেছি কিশোরদার জন্য। এই মুহূর্তে সেসব ঘটনা মনে আসছে না। মনে এলে অবশ্যই বলব।

এখন বলি, আমার লেখা যে গানটি গেয়ে কিশোরদা সংগীত জগতে বিশাল আলোড়ন তুলেছিলেন আর আমার লেখা গানটি শুনে, আমারই চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়েছিল। সে গানটি 'তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে/আমার মরণ যাত্রা যে দিন যাবে'। এ গানটিও আমি লিখেছিলাম আর একজন বিশিষ্ট শিল্পীর পুজোর গানের জন্য। উনি মরণ যাত্রা নিয়ে গানটি গাইতে অনিচ্ছা জানালেন। গানটির সুর করেছিল মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি ভবিষ্যতে কোথাও গানটি লাগিয়ে দেব মনস্থ করে ওই বিশিষ্ট শিল্পীকে অন্য একটা গান দিয়ে দিই।

'তুমি কত সুন্দর' ছবির গান লেখার সময় পরিচালক মনোজবাবুর সঙ্গে সিটিং চলছিল। উনি মৃণালের মুখে এই গানটি শুনে তৎক্ষণাৎ ওঁর নির্মীয়মাণ ছবির জন্য চাইলেন। আমি বলেছিলাম, গানটা আমি দিতে পারি যদি কিশোরদাকে দিয়ে গাওয়ানো হয়। উনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন। ওই গানটি গাওয়ার পর কিশোরদা আমাকে

বলেছিলেন, কী পোলাওবাবু একেবারে আমার মরণ যাত্রা করে দিলেন?

উত্তরে মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, দেখবেন। সুপার ডুপার হিট হবে গানটা। দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি কিশোরদা নিজের মৃত্যু দিয়ে আমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করে দেবেন।

এরপরও একটা মর্মান্তিক ঘটনা আছে। সেদিন অন্য আর এক ছবির ডেট নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিলাম। বলেছিলাম, কলকাতায় গিয়ে প্রযোজকের সঙ্গে ফাইনাল করে আপনাকে ডেটটি কনফার্ম করব টেলিফোনে। ওই মাউথপিসে তিনবার হাততালির শব্দ করে। যথাসময়ে ফোন করেছিলাম। যিনি ধরলেন, তিনি আমায় বললেন, ও তো চলা গিয়া।

আমি আমার হিন্দিতে বললাম, আমি কলকাতা থেকে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছি। কিশোরদা এলে বলবেন ওই তারিখটা কনফার্মড, আমরা মুম্বই আসছি।

এবার আর একজন ভদ্রলোকের গলা পেলাম। তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কিশোরদা খানিকক্ষণ আগেই দেহ রেখেছেন।

আমি চমকে উঠলাম। ফোনটা রেখে দিলাম। হঠাৎ মনে হল রং নাম্বার হয়নি তো। কেউ মিথ্যে কথা বলছে না তো।

তৎক্ষণাৎ ফোন করলাম বাপি লাহিড়ির স্ত্রী চিত্রাণীর বড় বোন গায়িকা চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়কে। চন্দ্রানী আমার ফোনটা ধরেই বলল, চলে গেলেন কিশোরবাবু। আমরা এখনই ওখান থেকে আসছি। কে যে কী করে! অমিত তো ফরেনে। বাপি ওখানে থাকবে বলেছে।

আমি বোধহয় কলকাতার প্রথম মানুষ যে দুঃসংবাদটি প্রথম শুনেছিলাম। এই মুহূর্তে আর কিছু লিখতে পারছি না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।

৪৫

আমার আজও মনে আছে। তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। একটু আগেই কিশোরদার মৃত্যুসংবাদটা শুনেছি। কী করব ভেবে না পেয়ে প্রথমেই রেডিয়োতে ফোন করে অসীমা ভট্টাচার্যকে খবরটা জানালাম। অসীমাই বোধহয় ওই খবর নিউজ রুমে জানিয়েছিল। রেডিয়োতে খবরটা সবাই শুনলেন। টিভিতেও ফোন করেছিলাম কিন্তু কিছুতেই লাইন পেলাম না। যাঁদের স্মরণশক্তি একটু প্রখর তাঁরা নিশ্চয় মনে করতে পারবেন, কেন টিভির সংবাদে এমন একটি খবর জানানো হয়নি, তা নিয়ে সেই সময় প্রচুর কথাবার্তা হয়েছিল। আমি তখন দিশেহারা। পরিচিত মহলে যাঁকে যাঁকে পেরেছি, সবাইকে ফোন করে খবরটা জানিয়েছি। তারপর নিজের ঘরে বসে বাজাতে লাগলাম আমার লেখা কিশোরদারই গাওয়া গান 'আমার মরণ যাত্রা যেদিন যাবে...।'

গানে যতবারই 'মরণ যাত্রা' কথাটা শুনতে লাগলাম ততবারই বুক ভেঙে কান্না আসতে লাগল। মনে পড়তে লাগল কিশোরদার হাসিমুখে বলা কথাটা, কী পোলাওবাবু। একেবারে আমার মরণ যাত্রা করে দিলেন? অনেকবার রেকর্ডটা বাজিয়েছিলাম। কিছুই

ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, কেন এমন গান কিশোরদাকে আমি লিখে দিলাম? রাত বেড়ে যেতে লাগল। তবুও আমার গান শোনা বন্ধ হল না। একসময় রাত ভোর হল। আমার সঙ্গে একই ঘরে আমার স্ত্রীও গান শুনছিলেন। উনি হঠাৎ বললেন, 'তুমি কত সুন্দর' ছবিতেই তো তুমি কিশোরদার আর একটা গান লিখেছ। এবার সে গানটা বাজাও।

বাজালাম সে গানটা—'জানি যেখানেই থাক/ এখনও তুমি যে/মোর গান ভালবাসো।' ভোরের আলোয় সে গান আমায় দিল আশ্চর্য প্রত্যয়। আমি তো অজান্তেই লিখে ফেলেছি এই সত্য কথা।

কিশোরদা যেখানেই থাকুন সেখান থেকেই গান শোনাবেন। শুধু আমি নই। আমরা সবাই যে গান শুনে তাঁর কাছে ছুটে যাব।

এই আত্মবিশ্বাসেই বোধহয়, কিছুদিন পরে লিখেছিলাম বাবুল বোসের সুরে কুমার শানুর গান 'অমরশিল্পী তুমি কিশোরকুমার/তোমাকে জানাই প্রণাম'।

কিশোরদা চলে গেলেন। ওঁর চলে যাওয়ার পরেই নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল কলকাতার অনেক সুরকার। যাঁরা কিশোরদাকে দিয়ে গান গাইয়ে বহু গান সুপারহিট করিয়ে ছিলেন। ইতিহাস প্রমাণ করল, কিশোরদা শুধু হিন্দি গানেই নয় বাংলা গানেও কত অপরিহার্য ছিলেন।

উত্তমকুমার চলে যাওয়ার পর যেমন বহু চিত্রপরিচালকই নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটল কিছু সুরকারদের মধ্যে কিশোরকুমার চলে যাওয়ার পর।

এই ঘটনা অতিরঞ্জিত নয়। এটা ইতিহাস, এটা সত্য। কিশোরকুমার এসেছিলেন, ওঁর প্রাণ যৌবনের প্রাচুর্যে মাতিয়ে রেখেছিলেন জগৎকে। নিঃসংকোচে বলতে পারি, ওঁর চলে যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সিনেমায় কোনও পুরুষ কণ্ঠের গান তেমন সুপারহিট করেনি। সত্যিই কিশোরকুমার এক অমরশিল্পী।

এবার প্রসঙ্গ বদলাই। কিছুদিন আগে সত্য চৌধুরী সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিছু কিছু কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন সেকথা বলতে মন চাইছে। সে সময়ে গানের জগতে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, মান্না দে, যশোদাদুলাল মণ্ডল, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এরকম কয়েকজন শিল্পী ছাড়া গ্র্যাজুয়েট শিল্পী প্রায় ছিলেনই না। সত্যদা গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। তাই রেকর্ড কোম্পানি ওঁর সেই কৃতিত্বটাকে রেকর্ডেও ব্যবহার করতেন। ওঁর সব রেকর্ডে লেখা থাকত সত্য চৌধুরী, বি এ।

পরবর্তীকালে 'মন্দির' ও 'রাঙামাটি' ছবির চিত্রনায়ক সত্য চৌধুরী বিদেশি চা চা চা সুরের স্টাইলে গেয়েছিলেন 'সেই চম্পা বকুল তলে...।'

নিজের বিদেশি সুরের স্টাইলে ওঁর আর একটা বিখ্যাত গান 'পথে পথে ওই বকুল পড়িছে ঝরিয়া।'

গ্র্যাজুয়েট হওয়াটা কণ্ঠশিল্পীদের অবশ্য যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয় না। তবুও এখনও কলকাতায় খুব বেশি গ্র্যাজুয়েট শিল্পী নেই। মুম্বইতেও অনিল বিশ্বাস, মান্না দে ছাড়া খুব বেশি শিল্পীর কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

বহু পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে অনুরোধ আসছে। যদিও আমার স্মৃতিতে অনেক মানুষই এখনও অম্লান আছেন। তবুও অনেকেই চাইছেন, আমি যেন সেইসব মানুষদের

নিয়েই কিছু লিখি, যাঁদের নিয়ে খুব বেশি লেখা হয়নি।

মনে পড়ছে এক শিল্পীর কথা, তিনি সুপ্রীতি ঘোষ। তখন শচীন গুপ্ত আমার বহু গান ওঁর গানের ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাতেন। অনেকেই সে সব গান নিয়মিত বেতারে পরিবেশন করতেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যা ছিলেন আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় আর এই সুপ্রীতি ঘোষ। অত্যন্ত স্বাভাবিক নিজস্ব কণ্ঠের অধিকারিণী ছিলেন উনি। আমরা সংগীত যাকে 'ফল্‌স ভয়েস' বলি উনি তার ত্রিসীমানায় ছিলেন না। ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল সেবার, যেবার শচীন গুপ্তের সুরে উনি আমার লেখা মাদুর্গার আগমনী নিয়ে বড় একটি গান এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে পুজোর সময় পরিবেশন করলেন।

গানটি ছিল 'বরষ পরে পুজোর ঘণ্টা বাজল রে দেশ জুড়ে...'।

আমাদের ছেলেবেলায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী হিট ছবি ছিল বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে'। এই ছবিতে 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' এই রবীন্দ্রগীতিটি গেয়েছিলেন চিত্রনায়িকা বিনতা রায় স্বয়ং। তার কিছুদিন আগেই পরিবেশিত হয় সুপ্রীতি মজুমদারের গাওয়া (উনি তখনও সম্ভবত ঘোষ হননি) 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে...।' পাইওনিয়ার রেকর্ডে গানটি প্রকাশ হওয়া মাত্র সুপারহিট হয়। 'উদয়ের পথে' ছবিতে আবার এই গানটি শুনে, শ্রোতারা আরও সমাদরে গ্রহণ করেন এই গানটি।

সে সময় এই রেকর্ডটি, রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বিক্রির সেরা তালিকায় ছিল।

চিরদিনই মহিলা শিল্পীরা বিবাহের পর সব মেয়েদের মতোই স্বামীর পদবিতেই পরিচিতা হতেন। সুপ্রীতি মজুমদার হলেন সুপ্রীতি ঘোষ। উৎপলা ঘোষ হলেন উৎপলা সেন। সুপ্রভা ঘোষ হলেন সুপ্রভা সরকার। ইলা চক্রবর্তী হলেন ইলা বসু। আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন আলপনা মুখোপাধ্যায়। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

বাঙালি কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে স্বামীর পদবি গ্রহণের এই চিরাচরিত প্রথা প্রথম ভেঙে দিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। স্বামী শ্যামল গুপ্তের, গুপ্ত পদবিটি গানের জগতে ব্যবহার না করে উনি মুখোপাধ্যায়ই রয়ে গেলেন।

একই ঘটনা ঘটল আরতি মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও। প্রথম বিবাহে, সুবীর হাজরার হাজরা পদবিটি যেমন ব্যবহার করেননি, দ্বিতীয় বিবাহেও স্বামীর পদবি গানের জগতে ব্যবহার না করেও মুখোপাধ্যায় রয়ে গেলেন।

আমার ধারণা, পদবি পরিবর্তন করলে শ্রোতাদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আসতে পারে। চেনা শিল্পীটিকে হয়তো অচেনা মনে হতে পারে। সেই ভেবেই অনেকে পদবি পরিবর্তন করেননি। যদিও এটা আমার ধারণা, এগুলো সম্পূর্ণই ওঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

যেমন মুম্বইতেও আশা মঙ্গেশকর মি. ভোসলেকে বিয়ে করে হয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। কিন্তু রাহুল দেববর্মণকে বিয়ে করে পদবি বদলাননি। অন্যদিকে সুমন কল্যাণপুর এবং গীতা দত্ত বিয়ের পর পদবি বদলে ছিলেন। গীতা রায় থেকে গীতা দত্ত হয়েছিলেন। অলকা ইয়াগনিকও বিয়ের পর পদবি পাল্টাননি। আগের পদবিতেই রয়ে গেলেন।

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে এইচ. এম.

ভি· তে সুপ্রীতি ঘোষের গাওয়া সেই গানটি। শ্যামল গুপ্তের লেখা গানে সুর·
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'যেথায় গেলে হারায় সবাই ফেরার ঠিকানা গো'।

সেই সঙ্গে মনে পড়ছে 'এই বসন্ত জানালে বিদায়' গানটির কথা। ওঁর সুপারহিট গানের তালিকায় আরও একটি গান, নচিকেতা ঘোষের সুরে গাওয়া 'কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন ঝরা'। সুপ্রীতিদির আরও অনেক ভাল বাংলা আধুনিক গান আছে। কিন্তু কেন জানি না উনি খুব বেশি প্লে-ব্যাক করেননি। আমার ভগ্নিপতি প্রযোজক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের 'অলকানন্দা' ছবিতে উনি গেয়েছিলেন একটি রবীন্দ্রসংগীত, গানটি ছিল 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও'। অপূর্ব গেয়েছিলেন গানটি।

যে সব শিল্পী যে যে রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, সেই শিল্পীর রেকর্ড করানোর দায় সেই কোম্পানির ওপর। তাই কণ্ঠশিল্পীরা 'বেসিক রেকর্ডে' সহজেই গান গাইতে পারেন। কিন্তু প্লে-ব্যাক তো প্রযোজকের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। অতএব ওটা অনেকটা নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর। কোনও শিল্পী ইচ্ছা করলেই প্লে-ব্যাক গাইতে পারেন না। যদি না কোনও পরিচালক প্রযোজক তাঁকে গ্রহণ না করেন।

সুপ্রীতিদির হয়তো এদিকে তেমন যাতায়াত বা যোগাযোগ অল্প ছিল। তবুও অত্যন্ত আনন্দের কথা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'লাল দরজা' ছবিতে বাপি লাহিড়ির সুরে সম্প্রতি উনি একটি গান গেয়েছেন। গানটিতে কোনও বাজনা নেই। খালি গলায় সেই নিজস্ব স্টাইলে অকৃত্রিম কণ্ঠে গেয়েছেন সুপ্রীতিদি। গানটি আমার দারুণ লেগেছে। আমার ধারণা, অনেকেই এই গানটিতে হারিয়ে যাওয়া সুপ্রীতিদিকে আবার নতুন করে ফিরে পাবেন।

আগেই বলেছি আমার লেখা গান প্রথম রেকর্ড করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মুম্বইয়ের বিখ্যাত রামচন্দ্র পালের সুরে। আমার দ্বিতীয় গানটি রেকর্ড করেন সুপ্রভা সরকার অর্থাৎ চিত্রজগতের বড়দি। গানটি ছিল 'শুধু গান আরও গান'।

প্রথম জীবনে যখন গান শোনা শুরু করলাম তখন থেকেই শুনতে থাকি ওঁর গান। সেই সময় সুপ্রভা সরকারকে বলা হত 'বাংলা চিত্রজগতের চির কুহরিত বুলবুল'। ছেলেবেলায় শোনা ওঁর 'দিদি' ছবির সেই গান 'কভু যে আশায়/কভু নিরাশায়...'। 'শাপমুক্তি' ছবির গান 'বাংলার বধূ বুকে তার মধু' সেই অন্তরার সংযোজন—'বৈশাখে তার উদাস নয়ন/আমের ছায়ায় বিছায় শয়ন' এখনও আমার কানে বাজে। এই গানটির কথা উঠলেই আমি চলে যেতে চাই, চিত্রনাট্যকার পরিচালক সলিল সেনের কাছে। তাঁর মুখে শোনা একটি কথায়।

গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য যখন 'শাপমুক্তি' ছবির এই গানটি চিত্রপরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়াকে দিয়ে চলে যান, তখন বড়ুয়া সাহেব গানটি পেয়ে অভিভূত হয়ে তাঁর সহকারীদের নিয়ে নাকি একটি আলোচনাসভা শুরু করেন। বড়ুয়া সাহেব গানটি পড়তে পড়তে বলেন 'বৈশাখে তার উদাস নয়ন/আমের ছায়ায় বিছায় শয়ন'—এই 'আমের ছায়াটা' আপনাদের কেমন লাগছে বলুন তো?

নতুন আসা বড়ুয়া সাহেবের এক সহকারী, বলা ভাল ওভারস্মার্ট সহকারী, অন্য সবাইকে বলতে না দিয়ে সবার আগে বলে ওঠেন, স্যার, এটা ভুল। এটা রীতিমতো

কষ্টকল্পনা। আম ফল তো এইটুকু-টুকু। তার আর কতটুকু ছায়া হবে যে সে ছায়ায় শয়ন করা সম্ভব? অজয় ভট্টাচার্যকে বলুন, আমের ছায়ার বদলে আম গাছের ছায়ায় শব্দটা লিখতে।

খুশি হয়ে বড়ুয়া সাহেব বললেন, ঠিক বলেছ। তুমি কাল স্টুডিয়োতে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করো।

ওই সহকারী ভদ্রলোক পরদিন স্টুডিয়োতে এসেই বড়ুয়া সাহেবের অফিস থেকে পেলেন একটা মোটা খাম। প্রবল উৎসাহে খামটি খুলে সহকারীটি দেখলেন তাতে লেখা 'ইয়োর সার্ভিস ইজ নো মোর রিকোয়ার্ড'।

সুপ্রভা সরকার অর্থাৎ বড়দির একটা মজার গানের কথা স্মরণে আসছে। গানটি ছিল মধু বসুর 'রাজ নর্তকী' ছবিতে। কীর্তনের সুরে সে গানটি, একদিন বাঙালি মনপ্রাণ দিয়ে হাসতে হাসতে উপভোগ করত। গানটি ছিল 'রাধা আর শ্যাম যেথা করে খেলা/তারে কহে রাসমঞ্চ'।

কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি ছিল অ্যান্টি ক্লাইমেক্স। এবং গানটি অদ্বিতীয় হওয়ার আসল উৎস—'তুমি আর আমি তেমতি করিলে/হবে তাহা ফাঁসি মঞ্চ'।

বড়দির গাওয়া অসাধারণ গান, শৈলেন রায়ের রচনা আর রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর সংযোজনায় অগ্রদূতের 'স্বপ্ন ও সাধনা' ছবির দুটি গান। একটি হল ' গানের সুরে জ্বালব তারার দীপগুলি'। দ্বিতীয় গান হল 'সে যেন দখিন হাওয়ার সাথী'। 'স্বপ্ন ও সাধনা' আরও একদিক দিয়ে স্মরণীয়। এই ছবিটি স্বাধীন ভারতে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম বাংলা ছবি। মধ্য রাতের বিশেষ প্রদর্শনীতে, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যারানি অভিনীত এই ছবিটি মুক্তিলাভ করে।

৪৬

রায়চাঁদ বড়ালের সুরে বিমল রায়ের 'অঞ্জনগড়' ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় চিত্রজগতে সামনে আসেন। ওই ছবিতে সন্ধ্যার হিট গানটি ছিল 'গুন গুন গুন মোর গান...'। তার আগে ছায়াছবিতে বেশি গান গাইতেন শৈলদেবী। শৈলদেবীর পর বাংলা নব্বুই ভাগ ছবিতে কণ্ঠদান করতেন আমাদের বড়দি। অর্থাৎ সুপ্রভা সরকার। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা বড়দি, আপনাকে সবাই বড়দি বলেন কেন?

বড়দি উত্তরে বলেছিলেন, আমি তো ছিলাম হিন্দুস্থান রেকর্ডের শিল্পী। একদিন ওখানে একজন এমন একটা বাঁকা কথা বলেছিলেন যে আমার চোখে ফেটে জল এসে গিয়েছিল। অভিমানে আমি ভেঙে পড়েছিলাম। তখন হিন্দুস্থানের বিশেষ অধিকর্তা যামিনী মতিলাল বড়দিকে বুঝিয়েছিলেন ছিঃ, তোমার কি এত অভিমান সাজে। তুমি সবার বড়। সবার বড়দি। ওরা সব কত ছোট। ওদের কথায় কান দিতে আছে? এই 'বড়দি' কথাটা জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। চোখ মুছে ফেলেন বড়দি। সেই ঘটনা সংগীতজগতের সর্বত্র রটে যায়। সেই থেকে উনি হয়ে যান 'বড়দি'।

আমার এখনও মনে আছে ভবানীপুরে আমার দিদির বাড়িতে শুনেছিলাম হেমন্তদা

বললেন, আজ আমার দারুণ দিন। আজ আমার সুরে 'প্রিয়তমা' ছবিতে বড়দি গাইলেন 'আমলকী বন পেরিয়ে হাওয়া...।'

বড়দির আর একটি উল্লেখযোগ্য কণ্ঠদান আমার পিতৃবন্ধু সুশীল মজুমদারের 'অভিযোগ' ছবিতে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা আর শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে গাওয়া 'পথিক হেথা বারেক যদি থামতে/ছায়াবিহীন ধূসর মরুপ্রান্তে'।

বড়দির আরও একটি সাফল্য নরেশ মিত্রের 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবির গান। এ ছবির সুরকার ছিলেন নিতাই মতিলাল। এখনকার চিত্রপ্রযোজিকা রত্না চট্টোপাধ্যায়ের পিতা। রত্নার মা লেখিকা বারিদেবীর নাম তো সবাই জানেন।

রবীন্দ্রসংগীতে বড়দি কিছু না করতে পারলেও নজরুলগীতি গেয়ে সাফল্য পেয়েছেন। আজও 'কাবেরী নদীজলে/কে গো বালিকা' শুনে থমকে দাঁড়ান না এমন শ্রোতা আছেন কে?

বড়দি এপার বাংলার মানুষ। হাওড়া জেলার আমতার মেয়ে। কিন্তু চমৎকার পূর্ব বাংলার কথা বলতে পারতেন। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে উনি একদিন বলেছিলেন, আমি কী করে এত ভাল বাঙাল কথা বলতে পারি জানো?

আমি নেতিবাচক ঘাড় নাড়লাম। বড়দি বললেন, আমি সংগীত জগতে ঢুকে দেখি এখানে পূর্ব বাংলার লোকেরাই সংখ্যাধিক্য। তখনকার দিনে ওপার বাংলাব অনেকেই বেশ কষ্ট করে কলকাত্তাইয়া ভাষা ব্যবহার করতেন। স্বচ্ছন্দ ছিলেন পূর্ব বাংলার ভঙ্গিতে কথাবার্তায়। ওরা নিজেদের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই ওই বাঙাল কথা বলতেন। আমি ওদের মধ্যে থেকে থেকে সহজে রপ্ত করে নিয়েছিলাম ওই বাঙাল ভাষায় কথা বলা।

কথা শেষ করেই, গড় গড় করে একটু বাঙাল ভাষা বলে নিয়ে পূর্ব বাংলার গ্রাম্যগীতির একটি কলি শুনিয়ে দিলেন।

পঙ্ক্তিটি হচ্ছে 'মাওড়া ভাতের লাইগ্যা আমার পরাণ কান্দেরে'।

আধুনিক বাংলা গানও অনেক অনেক হিট করিয়েছেন বড়দি। আমার মনে হয় ওঁর সব থেকে হিট বাংলা আধুনিক গান অনিল ভট্টাচার্যের কথায় আর নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে ১। এ পথে যখনি যাবে/বারেক দাঁড়ায়ো ফুলবনে। ২। যে ব্যথা দিয়ে গেলে। ৩। স্মরণের এই সোনার পাতায়...।

কুন্দনলাল সায়গল বড়দির গানে মুগ্ধ হয়ে ওঁকে উপহার দিয়েছিলেন একটি চমৎকার হারমোনিয়াম। সেই হারমোনিয়াম বাজিয়েই বড়দি আজীবন আমাদের গান শুনিয়ে গেছেন।

আজ উনি নেই। জানি না সেই হারমোনিয়ামটি আজও আছে কি না।

বড়দির কাছেই শুনেছি তখন একটি মাত্র মাইক্রোফোনে রেকর্ডিং হত। এখনকার মতো সুবিধাজনক চ্যানেল সিসটেম ছিল না। স্টুডিয়োর ফ্লোরে শব্দযন্ত্রী খড়ি দিয়ে দাগ দিয়ে দিতেন। সেই দাগ দেখে দেখে বাদ্যযন্ত্রীরা এগিয়ে পিছিয়ে বাজনা বাজিয়ে অর্কেস্ট্রার ব্যালেন্স করতেন। এখনকার মতো চাবি ঘুরিয়ে ইচ্ছেমতো কণ্ঠস্বরকে কমানো বাড়ানো যেত না। এই জন্যই এক-একটি গানের রিহার্সালে লাগত আট দশ দিন। তারপর সে গান শুনে প্রত্যেকে যখন খুশি হতেন, সে গান তখন লাগানো হত ছবিতে।

গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য আবার নতুন করে একইভাবে গ্রামোফোন স্টুডিয়োতে রেকর্ড করতে হত সে সব গান। এত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সে সব গান আজও আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি। বলতে দ্বিধা নেই গানের এই অধ্যবসায় আজ হারিয়ে গেছে। আধুনিক যন্ত্র আমাদের যতই এগিয়ে দিক। শিল্পীদের আন্তরিকতাকে কমিয়ে দিয়েছে।

যূথিকা রায় আমার গান না গাইলেও ওঁর প্রচুর গান আমি শুনেছি। আর ওঁর সম্পর্কে প্রচুর শুনেছি কমল দাশগুপ্তের কাছে। কমলদা একদিন আমাকে বললেন, বুঝলি পুলক, একদিন নম্র জড়সড় একটি মেয়ে এইচ. এম. ভি.-র রিহার্সাল রুমে আমার ঘরে আমাকে গান শোনাতে এল। মেয়েটির অডিশন নিলাম। গান শুনলাম। গান শেষ হয়ে গেলেও যে সুরের রেশ থাকে, যা নাকি তোরা গানের কথায় লিখিস, সেটা সেই মুহূর্তেই আমি অনুভব করলাম। গান শুনিয়ে চলে গেল মেয়েটি। কিন্তু রেখে দিয়ে গেল এক অতুলনীয় সুরের মূর্ছনা। সেদিন আমার ঘরে ছিলেন প্রণববাবু অর্থাৎ প্রণব রায়। তুই তো ছিলি না, তখন তো হামাগুড়ি দিচ্ছিস। তাই প্রণববাবুকে বললাম, লিখুন প্রণববাবু। প্রণববাবু বললেন, আপনি বলার আগেই লিখে ফেলেছি। কথাটা বলেই সামনে রাখা গানের কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। লিখেছেন দুটি পঙ্‌ক্তি। গানেতে ব্যবহার করেছেন মেয়েটির নাম। 'আমি ভোরের যূথিকা/কনকথালায় সাজায় রাখি কানন বীথিকা।'

এ গান আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনছি। কমলদাকে তৎক্ষণাৎ বললাম, এরই উল্টো পিঠে ছিল 'সাঁঝের তারকা আমি'। একটি ভোরের রূপকথা আর একটি সন্ধ্যার। একটি রেকর্ডের এপিঠ ওপিঠ। সত্যি অসাধারণ গীতিকার এই প্রণব রায়। কমল দাশগুপ্তের সুরে যূথিকা রায়ের কত হিট গান আছে তা শুনে শেষ করা যায় না। মনে পড়ছে 'চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়/আমার সমাধি পরে', 'জানি বাহিরে আমার তুমি অন্তরে নও', 'এমনই বরষা ছিল সেদিন', 'স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর', এরকম বহু কালজয়ী গান ওঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়েছে।

যূথিকা রায়ের বাংলা আধুনিক গান যত হিট ঠিক তেমনই হিট হিন্দি গীত আর ভজন। অধিকাংশ গানই কমল দাশগুপ্তের সৃষ্টি। তখনকার দিনে ওঁর গাওয়া বেসিক গান অর্থাৎ নন-ফিল্মি হিন্দি গান সারা ভারতে যা বিক্রি হত কোনও হিন্দিভাষী গায়িকার বেসিক গানের বিক্রি তার ধারেকাছেও আসতে পারত না। কিন্তু আশ্চর্য জেদি ছিলেন প্লে-ব্যাকের বেলায়। ফিল্মে গান গাইতে কিছুতেই উনি রাজি হননি। কমলদাকে কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। কোনও দিনই উত্তর দেননি, এড়িয়ে গেছেন। হয়তো কোনও একান্ত ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। থাকতে পারে সিনেমার ওপর ক্ষোভ। তখন কমল দাশগুপ্ত থাকলেই, কি ছবিতে কি রেকর্ডে যে কোনও শিল্পীই চমৎকার উতরে যেতেন। তবুও যূথিকা রায় কমলদার এত কাছের শিল্পী হয়েও কেন যে এত নির্বিকার রইলেন জানি না।

পরবর্তীকালে রাজেন সরকার অসাধ্য সাধন করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'ঢুলি' ছবিতে। 'ঢুলি' ছবিতেই উনি জীবনে প্রথম প্লে-ব্যাক করেন। সে গান বিশেষ জনপ্রিয়তাও লাভ করে। এখনও হিন্দি বলয়ের একটু বয়স্ক শ্রোতাদের মুখে শুনি যূথিকা রায়ের জয়গান।

মাদ্রাজেও ওঁর প্রশংসা শুনেছি। লোকমুখে শুনেছি, সাঁইবাবা ওঁর আশ্রমে ওঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ওঁকে হাত ঘুরিয়ে শূন্য থেকে একটি স্বর্ণহার উপহার দেন সবার সামনে। একটিও হিন্দি ছবিতে প্লে-ব্যাক না করেও শুধু বেসিক গান গেয়ে এত জনপ্রিয়তা, আমার মনে হয় সারা ভারতে কোনও কণ্ঠশিল্পী কখনও পায়নি। এ দিক দিয়ে বাঙালি যূথিকা রায়ের ভারত জয়ের এটি একটি রেকর্ড।

আর একজনের কথা মনে আসছে। তিনি গৌরীকেদার ভট্টাচার্য। সতীনাথ, শ্যামলের আগের যুগে প্রেম সংগীতে এইচ. এম. ভি.-র একজন টপ সেলার সিঙ্গার ছিলেন উনি। বিশেষ এক ধরনের আধুনিক গানে ওঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। এখানেও সেই কমল দাশগুপ্ত।

দেবকী বসু পরিচালিত 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে ওঁকে দিয়ে উনি একটি গ্রাম্য গীতি গাওয়ান। প্রতিভা যাকে স্পর্শ করে সেই জীবন্ত হয় এর প্রমাণ পাওয়া যায় ওই গানটিতে। ছবিটির পরিচালক অপূর্ব একটি রোমান্টিক মুহূর্তে কমলদার গানটি আরোপ করেন। আজও বুকের মধ্যে ডুকরে ওঠে সেই নীরব কান্নার আকুতি 'বন্ধুরে আমার মনের বনে বাউরি বাতাস/কান্দিয়া লুটায়রে কান্দিয়া লুটায়...।' রেকর্ডে তখনকার প্রথামতো কণ্ঠশিল্পীর নাম না থাকায় খুব ঘনিষ্ঠ জন ছাড়া কেউই জানল না এ গানটি ওঁরই গাওয়া। ভাগ্যের বিচিত্র খেলায় এই শিল্পীও বেশি দিন সংগীতজগতে রইলেন না। আজ অনেকেই ভুলে গেছেন এই দরদীয়া কণ্ঠশিল্পী গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের নাম।

এর পরবর্তী প্রজন্মের একজন গায়িকার কথা মনে আসছে। বেতারের কী একটা গীতিআলেখ্য নিয়ে সে রাতে সুরকার বন্ধু শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আমার বসার কথা। শৈলেন যে সময় যেতে বলেছিল আমি তার অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছিলাম।

ঘড়িতে দেখি তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বাকি। এতক্ষণ সময় কোথায় ঘুরব? তাই ভাবলাম শৈলেনেরই বাড়ি যাই। ও না থাকলে ওর বউ রানুর সঙ্গে আড্ডা দেব, চা খাব, সময় কেটে যাবে। আর শৈলেন যদি থাকে তা হলে আমরা আমাদের বেতারের গীতিআলেখ্য নিয়ে বসে যাব। আমি লিখতে থাকব। শৈলেন সুর করতে থাকবে।

শৈলেনের বাড়িতে ঢুকে দেখি শৈলেন রয়েছে। আমাকে দেখে শৈলেন জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার। এত আর্লি? তুমি তো দেখছি খুব ঘড়ি মেনে চল? উত্তরে আমি বললাম, এটা আমি শিখেছি চিত্রপরিচালক চিত্ত বসু আর হেমন্তদার কাছে। একটু দেরি হলে হেমন্তদার মধ্যে যে উৎকণ্ঠা আমি স্বচক্ষে দেখেছি তা নিয়ে অনেক ঘটনা আছে। সেগুলো পরে বলব যখন হেমন্তদা প্রসঙ্গে আসব।

এখন চিত্ত বসুর ব্যাপারটা বলি। চিত্তদা 'জয়া' ছবির সময় আমায় বললেন, তুমি সকাল দশটার সময় আমার ভবানীপুরের বাড়িতে এসো। আমার ঘরে আমার সামনে বসে গান লিখবে। সে গান আমি সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।

ঠিক হিসেব করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। ভবানীপুরে এসে দেখি মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে। চিত্তদার বাড়ির কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি। ভাবলাম আধ ঘণ্টা ওখানে কাটিয়ে তারপর ঠিক সময়ে চিত্তদার কাছে পৌঁছে যাব।

আমায় দেখে আমার বন্ধু তো খুবই খুশি। আমায় বলল, আগে চা জলখাবার খা, তারপর ওখানে যাবি। দুজনার আড্ডা জমে গেল। ঘড়িতে দেখি দশটা বাজতে দশ। এবার আমায় উঠতে হয়।

বললাম, এ বাড়িতে আসা-যাওয়ার পথে আর একদিন আসব। আজ উঠি।

বন্ধু ছাড়ল না। সে বলল, অত ভাবছিস কেন? কলকাতার রাস্তায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় রাখা সম্ভব নাকি? সবাই আধ ঘন্টা গ্রেস দিয়ে রাখে। চিত্তবাবুও তাই রাখবেন।

যখন আমি চিত্তদার বাড়ি পৌঁছলাম তখন দশটা বেজে সতেরো। দরজার ঘন্টি বাজালাম। একটু বাদে দরজা খুলে একজন বেরিয়ে এলেন তার হাতে একটা চিরকূট। তাতে লেখা 'কলকাতার রাস্তায় জ্যাম লেগেই থাকতে পারে। তাই একটু সময় হাতে রেখে চলাফেরার অভ্যেস করো। সময় পেলে কাল সকালে ঠিক দশটায় এসো। এখন আমি অন্য কাজ নিয়ে বসেছি। আজ তুমি বাড়ি ফিরে যাও। ভবদীয় চিত্ত বসু।'

মাত্র সতেরো মিনিটের জন্য খেসারত দিতে হল। ভবানীপুর থেকে সালকিয়াতে ফিরতে হল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে।

সারাটা পথ বন্ধুর বাড়ির চা জলখাবারের ঢেকুর উঠতে লাগল। তবে সুফল হল একটা, বাকি জীবনে চিত্তদার সঙ্গে আর কোনও ছবিতে আর কখনও সময়ের একটুও হেরফের হয়নি। এ শিক্ষাটা আজীবন আমার কাজে লেগেছে। শুধু একবার ঘটনাচক্রে আমি আবার এই ব্যাপারে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিল রফি সাহেবকে নিয়ে।

৪৭

সেবার রফি সাহেবের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বিকাল সাড়ে পাঁচটায়। দাদারের কাছে একটা হোটেলে উঠেছিলাম। দাদার থেকে বান্দ্রায় রফি সাহেবের বাড়ি যেতে যে সময় লাগতে পারে সেটা মনে মনে হিসাব করে ট্যাক্সিতে উঠলাম। বান্দ্রায় এসে ড্রাইভারকে নিউ টকিজের রাস্তা নিতে বললাম। আমায় বাঙালি দেখেই বোধ হয় ড্রাইভার সাহেব একটা বেশ বড় চক্কর দিয়ে গাড়ি চালালেন। যখন বুঝলাম তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে। যা হোক রফি সাহেবের বাড়ি পৌঁছে ছিলাম মিনিট পনেরো পরে। আমি ট্যাক্সি ছেড়েই দেখি রফি সাহেবের শ্যালক জাহেদ সাহেব, যিনি ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করতেন তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমায় দেখেই জাহেদ সাহেব বললেন, আজ আর হবে না। দাদা এখনি বের হচ্ছেন আপনি কাল সকালে ফোন করুন। নতুন টাইম দেব।

রীতিমতো বিমর্ষ হয়ে গেলেও আর একবার লাস্ট ট্রাই নিতে রফি সাহেবের দরজায় নাড়া দিলাম। দরজায় খুললেন শিল্পী স্বয়ং। আমাকে দেখে বললেন, আরে আপনি! আমি তো ভাবলাম আপনি আর এলেন না। বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

সেদিন বোধ হয় ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল আমার। তাই বললেন, আসুন, আসুন। আমার স্ত্রী কাবাব বানিয়েছেন। আগে একটু মুখে দিন তার পরে কাজের কথা হবে।

সেদিন রফি সাহেবের বাড়িতে সুগন্ধি ওই কাবাব খেয়ে এত ভাল লেগেছিল যে, আর কোথাও খেয়ে এত ভাল লাগেনি। রফি সাহেব নিজে খেতে যতটা ভালবাসতেন, খাওয়াতে ভালবাসতেন তার চেয়ে অনেক বেশি।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শৈলেন মুখোপাধ্যায় এই দুটো ঘটনাই, আমার কাছে শুনেছিল। তাই বলল, বোস, চা বলি।

জাঁকিয়ে বসলাম ওর ফ্ল্যাটের ড্রইং রুমে। তখনও চা আসেনি। এসে গেল বেশ রোগা একটা কমবয়েসি মেয়ে। শৈলেন ওকে দেখেই বলল, আজ তোমার ক্লাস হবে না। পুলক এসে গেছে। পুলকের সঙ্গে অন্য কাজে বসব। তুমি আজ বাড়ি যাও।

মেয়েটি হাসি মুখে সেই আদেশ মেনে নিয়ে, হাসি মুখেই আমাকে প্রণাম করে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করল। আমি স্বাভাবিক ভদ্রতায় জিজ্ঞাসা করলাম, কী নাম তোমার? খুব দূরে থাক নাকি?

রোগা মেয়েটি উত্তর দিল, আমার নাম হৈমন্তী শুক্লা। বাগবাজারের দিকে থাকি।

আমি নিজেও দূরে থাকি। দূর থেকে আসা যাওয়ার কষ্ট বুঝি। তাই আমি বললাম, না, তুমি যেয়ো না বোসো।

শৈলেনকে অনুরোধ করলাম, মেয়েটি অত দূর থেকে এসেছে। ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন? আমি আগে এসেছি। আমিই তো দোষী, ও তো নয়। নাও ক্লাস করো। ও গান শিখে বাড়ি চলে যাক। আবার এক রাউন্ড চা খেয়ে আমরা কাজে বসব।

অগত্যা শৈলেন আমার সামনেই গান শেখানো শুরু করল। আমি বসে বসে শুনতে লাগলাম। একসময় গান শেখানো শেষ হল। আমাকে আর শৈলেনকে প্রণাম করে চলে গেল অনামী অপরিচিতা হৈমন্তী শুক্লা। ও চলে যাওয়ার পর আমি শৈলেনকে বললাম, এতো ভাল গলা। ওকে দিয়ে রেকর্ড করাও। ও দারুণ গাইবে।

শৈলেন বলল, এইচ. এম. ভি.-কে তো বলেছি। কিন্তু ওরা বলল, ওদের এ বছরের সব প্রোগ্রাম কমপ্লিট। নেকস্ট ইয়ারে ভেবে দেখবেন।

এইচ. এম. ভি.-র একথাটা অন্যায় নয়। তখন সম্ভবত জুলাই মাস। পুজোর সব কিছু রেডি হয়ে গেছে। আমার মধ্যে একটা জেদ এসে গেল। সেটা শৈলেনকে না জানিয়ে আমাদের কাজে বসে গেলাম। কাজে বসেই শৈলেন বলল, লক্ষ করলি ওর গলার সূক্ষ্ম মোচড়গুলো? কেন থাকবে না বল। ওর রক্তে যে রাগাশ্রয়ী গান। ও যে বিখ্যাত রাগ সংগীত শিল্পী হরিহর শুক্লার মেয়ে।

শৈলেনের মুখে একথা শুনে আমার যেন আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল।

বোধ হয় পরদিনই আমি গিয়েছিলাম অক্রুর দত্ত লেনে হিন্দুস্থান রেকর্ডের অফিসে। হিন্দুস্থান রেকর্ডের অধিকর্তা যামিনী মতিলাল আমাকে দেখে একটু টিপ্পনী দিয়ে বললেন, কী ব্যাপার পুলক? তুমি এইচ এম ভি ছেড়ে এখানে?

আমি কোনও ভণিতা না করে যামিনীদাকে বললাম, এসেছি একটা অনুরোধ নিয়ে।

যামিনীদা গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি তো কখনও কোনও অনুরোধ নিয়ে আস না। আমরাই তো অনুরোধ করে তোমাকে ডেকে এনে গান লেখাই। এবার বলো অনুরোধটা কী?

এবার ভরসা পেয়ে বললাম, এবারের পুজোতে একটি নতুন মেয়ের গান রেকর্ড করতে হবে।

মেয়ে শুনেই যামিনীদা রসিক হয়ে উঠলেন। বললেন, মেয়ে! কেমন দেখতে? ক'দিন ওকে নিয়ে সিনেমা দেখেছ?

আমিও রসিকতা করে উত্তর দিলাম, দারুণ দেখতে। মোট উনিশটা ছবি ওকে নিয়ে দেখেছি। হল তো? আপনি ওর রেকর্ড করবেন কি না বলুন।

যামিনীদা এ রসিকতার সূত্র ধরেই বললেন, দাঁড়া দাঁড়া। আমি আগে ওকে চাক্ষুষ দেখি। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, আগে ওর গান একটু ভাল করে শুনি।

আমি বললাম, আমি শুনেছি। আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। দারুণ গলা ওর। দারুণ গায়। হরিহর শুক্লার মেয়ে ও।

হরিহর শুক্লার নামটা শুনেই রাজি হয়ে গেলেন যামিনীদা। বললেন, তা হলে তো করতেই হয়। কে ট্রেনিং করবে?

আমি বললাম, শৈলেন মুখোপাধ্যায়। যামিনীদা খুশি হয়ে বললেন, ভাল সুর করে গন্ধা (শৈলেনের ডাক নাম গন্ধা)। আমি আগেই বলেছি, হেমন্তদার সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত। ভাগ্যের একটা ভূমিকা থাকে। যেটা হৈমন্তীর ক্ষেত্রে পুরোপুরি সত্য। যামিনীদা প্রায় রাজি হয়ে গেলেন। পাছে আবার কখনও ওঁর মত বদলে যায় তাই ওঁর টেবিল থেকেই তৎক্ষণাৎ ফোন করলাম শৈলেনকে। পেয়েও গেলাম। ওরা দুজনে কথা বলে নিল। খুব তাড়াতাড়ি রেকর্ডটা করতে হবে।

রেকর্ড তো করতেই হবে। কিন্তু গান কোথায়?

পরের দিন শৈলেন বলল, হৈমন্তীকে গান শিখিয়ে যামিনীদাকে শোনাব। উনি সংগীতবোদ্ধা। কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু কোথায় সিটিংটা করা যায় বলো তো? আমার বাড়িতে এত লোক আসে যে মনোযোগ দেওয়া যায় না। আর তোমার সালকিয়ার বাড়ি নিরিবিলি হলেও জ্যাম এড়িয়ে যাওয়া-আসা দুঃসাধ্য। বরং মণ্টুদিকে ফোন করি। মণ্টুদির যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটে বসব। মণ্টুদি বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা পাহাড়ী সান্যালের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। উত্তমকুমারের বাড়িতে ছিল ওঁর নিত্য আনাগোনা। উত্তম ওঁকে বোন বলে ডাকত।

শৈলেন তখনই ফোন করল মণ্টুদিকে। মণ্টুদি এক কথায় রাজি। উনি আরও বললেন, গান তৈরি করে পালিয়ে গেলে চলবে না। আমার এখানে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরতে পারবে।

আমাদের জীবনে এমন অনেক মানুষকে পেয়েছি যাঁরা নিজের কোনও স্বার্থে নয়, শুধু আমাদের গানকে ভালবেসে আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। যাই হোক নির্দিষ্ট দিনে মণ্টুদির বাড়িতে আমরা দুজন হাজির হলাম। উনি ওঁর এসি রুমটা আমাদের ছেড়ে দিলেন।

কোথায় একটা আনন্দ উচ্ছ্বাসের গান বানাব তা নয়, কী কারণে জানি না বানিয়ে ফেললাম হৈমন্তীর জীবনের প্রথম গান, মান্না দে'র ভাষায় কান্নাকাটির গান। গানটি ছিল 'এতো কান্না নয় আমার/এ যে চোখের জলের মুক্তা হার/আমার পরতে ভাল লাগে। বঁধু তোমারই পথ চেয়ে।'

গানটি প্রকাশ মাত্রই জনপ্রিয়তা লাভ করল। এসে গেল বাংলা সংগীত জগতে আর

একজন প্রকৃত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা।

শৈলেন আর আমি আড়াল থেকে সার্থকতার আনন্দে ভরপুর হয়ে রইলাম।

এরপরই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন 'দুষ্টু মিষ্টি' এবং 'বালক শরৎচন্দ্র' ছবির জন্য গান লিখছি তখন অভিজিৎবাবুকে অনুরোধ করেছিলাম হৈমন্তীকে দিয়ে প্লে-ব্যাক করাবার জন্য। এক্ষেত্রেও হৈমন্তীর ভাগ্য প্রসন্ন। একটা ছবিতে নতুন শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ানোর জন্য যে কটা দিক থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়, সব দিক থেকে তৎক্ষণাৎ তা এসে গেল। সংগীত পরিচালক, চিত্র পরিচালক, চিত্র প্রযোজক সকলেই শুধু আমার কথাতে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু এমনটা সচরাচর হয় না।

সবাই যেন মনে না করেন আমি বললেই সব ক্ষেত্রেই সুফল ফলে। ভাগ্যই সুফল ফলায়। যা হোক, হৈমন্তী খুবই আত্মবিশ্বাসে টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে এসে কৃতী শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের মাইকের সামনে দাঁড়াল।

অভিজিৎবাবুর সুরে আমার লেখা 'শিব ঠাকুরের গলায় দোলে/ বৈঁচি ফলের মালিকা' গানটা হিট হয়ে গেল। অর্থাৎ প্লে-ব্যাকেও সাফল্য লাভ করল হৈমন্তী। ওকে নিয়ে আমার স্মৃতি বিশাল। তাই অনেক কথা মনে আসছে।

এরপর হিন্দুস্থান রেকর্ডে শৈলেন আর আমি পর পর ওর অনেক রেকর্ড করালাম। তার মধ্যে একটি গান খুব সুন্দর হয়েছিল 'পেলাম সাত মহলা ঘর/ঘর তো পেলাম না।'

হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানিতে মহিলা গায়িকাদের মধ্যে তখন হৈমন্তীর স্থান অনেক উঁচুতে। সেই সময় বিমান ঘোষ রেডিয়ো ছেড়ে এইচ. এম. ভি.-তে যোগ দিলেন। বিমানদা হৈমন্তীকে এইচ. এম. ভি.-তে আসতে বললেন। ব্যাপারটা জানতে পেরে আমি সরাসরি হৈমন্তীকে বলেছিলাম, তুমি হিন্দুস্থানে প্রায় রানির মতো আছ। এইচ এম ভিতে যেয়ো না। ওখানে ভিড়ে হারিয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার এইচ. এম. ভি.-র আকর্ষণ এড়াতে পারল না হৈমন্তী। হিন্দুস্থান ছেড়ে চলে এল।

বিমানদা অনেক শিল্পী তৈরি করেছেন। উনি ছিলেন প্রকৃত সংগীতবোদ্ধা, রেডিয়োর মানুষ, রেকর্ডের বাণিজ্যিক মানুষ নন। উনি যে সব গান হৈমন্তীকে দিয়ে এইচ. এম. ভি.-তে রেকর্ড করালেন, তার একটা গানও চলল না। শেষটায় বাধ্য হয়ে হৈমন্তীর মতোই আরও কিছু শিল্পীকে দিয়ে সবাইকে দুখানা করে গান দিয়ে একটা এল পি রেকর্ড সেবার পুজোতে বার করবেন বলে ঠিক করলেন। স্বভাবতই এই ব্যাপারটা হৈমন্তীকে দারুণ আঘাত দিল। ও আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, পুলকদা এইচ. এম. ভি.-তে এসে অবধি আপনি তো আমার একটা গানও লেখেননি। এবারের দুটো গান আপনি লিখুন।

আমি বিমানদার সঙ্গে কথা বললাম। বললাম, এ কী করছেন। এল পি তে গাইলে তো হৈমন্তীর কেরিয়ার শেষ। বিমানদা বললেন, কী করব? ওর গান যদি বিক্রি না হয় আমি কী করে ওর গান রেকর্ড করি? এ তো রেডিয়ো নয়। এখানে বিক্রিটা বলতে গেলে শিল্পীর আসল পরিচয়।

সবিনয়ে বললাম, আপনার যুক্তি মেনেই বলছি বিমানদা। এই একটা শেষ সুযোগ ওকে আপনি দিন। আমি মান্না দেকে অনুরোধ করব, আমার লেখায় ওর গান তৈরি করে দিন।

বিমানদা আর মান্না দে আমার বেশ কিছুদিন আগে একই সঙ্গে ওই স্কটিশ চার্চ কলেজেই পড়তেন। মান্নাদার কথা শুনে বিমানদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উনি বললেন, বেশ তুমি যদি রাজি করাতে পারো তবে আমি ওকে শেষ সুযোগ দিতে রাজি।

পর দিনই হৈমন্তীকে বললাম, মান্নাদা এখন কলকাতায় আছেন। তুমি সক্কাল বেলাতেই ওঁর বাড়ি চলে যাও। আমার একটা গান দারুণ সুর করেছেন। অনুনয়-বিনয় করে সেটা আদায় করো। আমিও মান্নাদাকে বলে রাখব।

পরদিন সকালেই মান্নাদার ফোন এল। 'হ্যাঁ মশাই, একটা ইয়াং মেয়েকে পাঠিয়েছেন। তার জন্য ও রকম একটা কান্নাকাটির গান কেন? ওর যদি ট্রেনিংই করি তা হলে খুশি আনন্দের গানই করব।'

তখন ই পি রেকর্ডের যুগ। আমি বললাম, একটা গান তো নয়, আরও তিনটে গান করতে হবে। সেগুলো না হয় তাই করব। কিন্তু যে গানটা আমি ওকে দিতে বলছি অনুগ্রহ করে ওটাই ওকে দিয়ে দিন।

মান্নাদার প্রশ্ন: ওই কান্নাকাটির গানই ওকে দিতে হবে? আমি বললাম, দিয়েই দেখুন না। আমাকে নাছোড় দেখে মান্নাদা গানটি ওকে দিয়ে দিলেন। যে গানটি উনি নিজে গাইবার জন্য বানিয়েছিলেন সেই দুর্লভ গানটি। স্বার্থত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত সংগীত জগতে বিরল।

৪৮

' গানটি ছিল 'আমার বলার কিছু ছিল না/চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে।' যে শিল্পী এইচ. এম. ভি.-র করুণার পাত্রী হয়ে সেবার সুযোগ পেল, রাতারাতি সে চলে গেল অনেক উঁচুতে। ওই একটা গানেই হয়ে গেল তার গল্ফ গ্রিনের ফ্ল্যাট আর গাড়ি। তারপর আর একবছর মান্নাদা ওকে দিয়ে গাওয়ালেন আমার আর একটা গান 'ঠিকানা না রেখে ভালই করেছ বন্ধু'। সে গানও হিট করে গেল। ইতিমধ্যে চিত্রশিল্পী বিকাশ রায়ের অনুরোধে আমি লেকের অ্যান্ডারসন ক্লাবের জন্য একটি জল-নাটিকা রচনা করি। নাটিকাটির নাম দিয়েছিলাম 'সমুদ্র মন্থন'। বিকাশ রায় ছিলেন ওটির পরিচালক। সুর দিয়েছিলেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়। ওখানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শুনেছিলেন হৈমন্তীর গান। হেমন্তদা আমায় বললেন, মেয়েটিব গানে বেশ একটা স্টাইল আছে। সে সময় উনি আমার কাহিনী ও গানের 'রাগ অনুরাগ' ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন। ওই ছবির 'কী গান শোনাব বল/ওগো সুচরিতা' গানটিতে একটি সরগম ও তান ওকে দিয়েছিলেন। চমৎকার গাইল হৈমন্তী। এরপর হেমন্তদা বানালেন, আমার কথায় ওর পুজোর গান 'ওগো বৃষ্টি আমার চোখের পাতা ছুঁয়ো না ...'।

হেমন্তদা অনেক ছবিতে হৈমন্তীকে গাওয়ালেন। গাওয়ালেন অভিজিৎবাবু 'সন্ধি' ছবিতে। আমার কথায় আরও অনেক আধুনিক গান মান্নাদা ওকে দিয়ে রেকর্ড করালেন।

হৈমন্তীর জীবনের আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও উস্তাদ আলি আকবরের সুরে গাওয়া বাংলা গান। ওই এল পি রেকর্ডটিরও গীতিকার ছিলাম আমি।

সব সময়ই একটা ভাল নতুন কিছু করার আগ্রহ আছে ওর মধ্যে। তাই একবার ভারত

বিখ্যাত নৌশাদ আলির সুরেও বাংলা গান গেয়েছিল।

সেখানেও গান লিখেছিলাম আমি। সম্প্রতি ও গাইল সুমন চট্টোপাধ্যায়ের কথায় ও সুরে 'জীবনমুখী' ধরনের আধুনিক গান 'সবুজের প্রতিশোধ'। হয়তো এ ধরনের গান ওর স্টাইল নয়, তাই সেটা জনপ্রিয়তা পেল না। তবু ওর এই নতুন কিছু করাব প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না।

পরেও একবার পুজোয় করেছে আমার লেখা আটখানি গান। ক্যাসেটটির নাম 'তোমার মন দিয়েছি'।

মনে পড়ছে ওই ওস্তাদ আলি আকবর আর পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুরে আমাব গান লেখার সময়কার ঘটনা। এই দুজন বিশ্ববরেণ্য সুরশিল্পীকে বাংলা আধুনিক গান করাতে রাজি করানোর পেছনে তখন বিশু চক্রবর্তীর ভূমিকাও কম ছিল না। ও আর হৈমন্তী দুজনেই প্রথম এই দুঃসাহসিক কাজটা করতে তৎপর হল। বিশু হঠাৎ একদিন আমায় বলেই ফেলল—পুলকদা, এখন কাউকে বলবেন না—এবাব পুজোয় আলি আকবর আর রবিশঙ্কর বোধহয় হৈমন্তীর লং প্লেয়িং-এ সুর দেবেন। ব্যাপারটা অনেকটা এগিয়েছে। আপনি প্রস্তুত থাকুন। যথা সময়ে আপনাকে জানাব।

এই বিশু এখন সংগীতজগৎ থেকে সরে এলেও ওর অনেক আশ্চর্য ঘটনা আমার স্মরণে আসছে। আমার যতদূর ধারণা, ওরই উদ্দীপনায় নৌসাদ আলিও জীবনে প্রথম বাংলা গান করতে সম্মতি দিয়েছিল । ওঁর সুরের ওই এল.পি-তেই আমি লিখেছিলাম 'আমার জলকে যাবার পথে কেন/দাঁড়ায় এসে শ্যাম' এবং 'প্রেমকে প্রণাম' ইত্যাদি অনেক ভাল গান।

যা হোক, হঠাৎ একদিন হৈমন্তীর টেলিফোন এল। আলি আকবর এসেছেন কলকাতায়, রয়েছেন ওঁর হিন্দুস্থান মার্টের পুরনো বসতিতেই। যথা সময়ে হাজির হলাম। আলি আকবর যখন এমন পাকাপাকিভাবে বিদেশে চলে যাননি তখন কলকাতায় এলে ওইখানেই থাকতেন। অনেক বাংলা ছবিতে উনি সুরও দিয়েছেন, তার মধ্যে উত্তম অঞ্জনা ভৌমিক অভিনীত ছবিও ছিল । আমিও ওঁর অনেক ছবিতে গান লিখেছিলাম। কিন্তু 'বেসিক সঙ' অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিক গান ওঁর সুরে লেখা আমার এই প্রথম। হৈমন্তীর সঙ্গে আমাকে দেখেই আমায় খুশি মনে অভ্যর্থনা জানালেন উনি। যতদূর মনে পড়ছে প্রথমে সরোদে কী একটা সুর বাজিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, এ রাগটা আমারই সৃষ্টি। লিখুন এই রাগে। ওঁর ছবিতে যখন গান লিখেছিলাম তখন উনি আমাকে লেখা গান পড়ে শোনাতে বলতেন। আর সুর করতেন। আমার অসুবিধা হবার কথা নয়। এবারে আগে সুর পরে কথা। কিন্তু আলি আকবর সাহেব অস্পষ্ট কণ্ঠে কী যে গাইছেন তা অনুধাবন করা সত্যিই কষ্টকর। তবু লেগে গেলাম। ওঁর ওই সুরের ওপরই লিখে ফেললাম প্রথম গানটির মুখড়া। হৈমন্তী আমার কানে কানে বললে, পুলকদা, বুঝতে পারছেন কিছু? আমি তো কিছুই বুঝছি না। আমি ফিসফিস করলাম, মনে হচ্ছে, ধরে ফেলেছি। একটা কাগজে লেখা সেই মুখড়াটি এগিয়ে দিলাম ওকে। আবার গাইলেন খাঁ সাহেব। হৈমন্তী ওই সুরটা শুনে আমার কাগজটি মিলিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠল, 'স্মৃতিই শুধু থাকে/স্মৃতিই শুধু থাকে।' আমাকে কমপ্লিমেন্ট দিল হৈমন্তী, সত্যিই

পুলকদা, সুরের ওপর গান লেখার আশ্চর্য গুণটা আপনার আছে। এইভাবেই পরপর বেশ কয়েকটি গান সেবার লিখেছিলাম আলি আকবরের সুরে।

পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুরে লতাজির গাওয়া একটি বিখ্যাত হিন্দি গানের সুরে বাংলা কথা আমি আগে থেকেই লিখে রেখেছিলাম। রবিশঙ্করের কাছে গিয়ে শুনলাম ওই গানটিই হৈমন্তীর অ্যালবামে উনি করতে চান। কী মনে করে সঙ্গে গানটি নিয়েই গিয়েছিলাম। ওঁর প্রস্তাব শুনেই দেখালাম ওই গানটি। হৈমন্তী সুর জানত। গেয়ে শোনাল—'আর যেন সেদিন ফিরে না আসে।' সুপুরুষ রবিশঙ্কর অপরূপ হাসি দিয়ে অনুমোদন করলেন সে গানের কথা। পরের গান উনি কিন্তু সেতার বাজিয়ে সুর দিলেন না, হারমোনিয়াম বাজিয়ে দিলেন। আমি অবশ্য বিভিন্ন সুরশিল্পীর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রাখি। জীবনে অনেক গানই সেতার, সরোদ, বাঁশি, পিয়ানো, কি-বোর্ডের ওপর লিখেছি। কিন্তু হারমোনিয়ামে গান লেখায় আজও নিজেকে সবচেয়ে সহজ, সরল ও সাবলীল লাগে।

অনেকেরই ধারণা মুম্বইয়ের কবিতা কৃষ্ণমূর্তি মান্না দের আত্মীয়া। ধারণাটির মূল কারণ হয়তো যেহেতু মান্না দের স্ত্রী সাউথ ইন্ডিয়ান। অতএব ওঁর স্ত্রীর সম্পর্কেই কবিতা মান্না দের আত্মীয়া। গানের সূত্রে অবশ্যই কবিতা মান্নাদার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া কিন্তু অন্য প্রচলিত সূত্রে নয়। কবিতারই এক আত্মীয়া বাঙালি। ওঁর কাছেই ছোটবেলা থেকে কবিতা বাংলা শিখে এসেছে। তাই এত স্বচ্ছন্দে বাংলা বলতে পারে। মান্নাদার কাছে কিন্তু নিয়মিত গান শিখেছে কবিতা। ওর আজকের এই এত বড় সাফল্যের পিছনে মান্নাদার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মান্নাদাই একদিন হঠাৎ বললেন—পুলকবাবু, একটি সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়ে, নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি আজকাল দারুণ গাইছে। তখন কবিতা সবে উঠতি। অবশ্য ইতিমধ্যেই আমি ওর নাম শুনছিলাম। তার ওপর মান্নাদা স্বয়ং যাকে ভাল বলছেন—স্বাভাবিকভাবেই তার ওপর আস্থা আমার বেড়েই গেল। মান্নাদাই বললেন ওকে দিয়ে বাংলা গান করাব। আপনি গান ভাবুন।

আগেই বলেছি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে আমার উৎসাহ অদম্য। সেই সময় মান্নাদাকে সবসময়েই ওই গানের সুর সৃষ্টি নিয়ে মগ্ন থাকতে দেখেছি।

তখন অবশ্য ই পি-র যুগ। আজকের মতো ক্যাসেটের দিন নয়। তাই চারখানি গানই যথেষ্ট ছিল । মনে আছে সম্ভবত ওই ই পি রেকর্ডের 'শঙ্খ নদীর বাঁধা ঘাটে' গানটি মান্নাদা চার রকম সুর করে আমায় শুনিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাদের এত পরিশ্রম বিফল হল। রেকর্ডটি বাণিজ্যিক সাফল্য পেল না। তারপর দিনে দিনে কবিতা অনেক অনেক জনপ্রিয়তা পেল। বিভিন্ন ধরনের গান অনায়াসে গেয়ে অনেক নাম করল। কিন্তু মান্নাদার সুরে ওর আধুনিক গান করার যোগাযোগ হল খুবই সম্প্রতি। ওর জন্য আবার আমরা আটটি গানের ক্যাসেট বানাতে পেরেছি।

কিছুদিন আগেই কবিতার আর একটি অ্যালবাম আমি করতে পেরেছি—একটু ভক্তিভাবের ওপর, যার নাম দিয়েছি পূজারিণী। সুর দিয়েছেন নবীন চট্টোপাধ্যায়।

এই পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে মাঠে ঘাটে বিভিন্ন অফিসে যত্রতত্র যত ফাংশন হয় সারা

ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে কোথাও তত হয় না। এ কালের শিল্পীদের অনেক শিল্পীকেই আজকাল বলতে শুনি, বাংলা ছবির সিংহভাগ গানই তো এখন গাইছেন মুম্বইয়ের কণ্ঠশিল্পীরা। আমাদের প্লে-ব্যাক কোথায়? তাই অর্থ উপার্জনের জন্য ফাংশনের দিকে জোর দিতেই হয়। এ বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিযুক্ত এবং এও মানি গানের জগতে কে কখন কোথায় আছেন তা জানেন ওই ওপরওয়ালা। তা-ই নিশ্চয়ই সময় থাকতে কিছু গুছিয়ে নেওয়া একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু এ কথাটাও নির্মম সত্য, পরপর ফাংশন করলে কণ্ঠস্বরের ক্ষতি হয়। এই কথাটি স্মরণে রেখেছেন বলেই মুম্বইতে লতা মঙ্গেশকর আর কলকাতার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, এই বয়সেও এত ভাল গান গাইতে পারছেন। ওঁরা সারা বছরে তিন-চারটের বেশি ফাংশন করেন না। বেশি ফাংশন করলে অবশ্যই বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু ওঁরা সে ফাঁদে পা দেননি। এড়িয়ে গেছেন যখন তখন মোটা টাকার হাতছানি।

আজকালকার তথাকথিত শিল্পীরা আগের ক্যাসেট জনপ্রিয়তা না পেলেও, ওরা যে আবার নতুন ক্যাসেটে গান গেয়েছেন এর বিজ্ঞাপন দেখেই আবার নতুন ফাংশনের ডাক আসবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকেন। ফাংশনের এই প্রলোভন না থাকলে আমার ধারণা আজকালকার অনেক শিল্পী ক্যাসেট করা থেকে বিরত থাকতেন। ওঁরা বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না যে ভাল করে বানাতে পারলে একটা ক্যাসেট কতটা ভাল হতে পারে। আর স্বভাবতই ওই ভাল গানের ক্যাসেট যদি ভাল বিক্রি হয় তার রয়ালটিও যে বিরাট হতে পারে ওঁরা নিশ্চয় প্রত্যেকে তা জানেন। জানি না কীসের অভাবে হারিয়ে ফেলেন নিজেদের আত্মবিশ্বাস। যূথিকা রায়, হাতে গুনে বলা যায় জীবনে কটা ফাংশন করেছেন। প্লে-ব্যাক তো সম্ভবত 'ঢুলি' ছাড়া করেনইনি অথচ ওঁর রেকর্ড রয়াল্টি সে সময় একটা বিস্ময়কর মাত্রা ছুঁয়ে গিয়েছিল।

রমা দেবীর কথা আজ হয়তো কারও মনে নেই। উনি অবশ্য হাতে গোনা ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রযোজিত এবং সুরারোপিত 'পূরবী' ছবির গান, শৈলেন রায়ের লেখা 'ফুলে ফুলে মধু কাঁদে', ফাংশন উনি প্রায়ই করেনইনি। গেয়েছেন বেসিক গান। রমাদেবীর আশ্চর্য বিক্রি ছিল হিন্দি হিট গানের বাংলা রূপান্তর। প্রায় সবকটি ছিল বিক্রিতে সুপারহিট। একসময় এইচ. এম. ভি.-র তিনি মহারানি ছিলেন। সেই বিখ্যাত গান, হিন্দি গান 'চলে যানা নেহি নয়না মিলাকে'—বাংলা ভাষান্তর 'চলে যেও না গো' গানটি আমরা আমাদের হাফ প্যান্ট পরা ছেলেবেলায় যত্রতত্র শুনতাম। ওই সব বেসিক হিট গানের রেকর্ড বিক্রির রয়াল্টিতে উনি সেই সময় কিনতে পেরেছিলেন দেওদার স্ট্রিটে একটি বাড়ি।

৪৯

ওই রমাদেবীর সময়েই এইচ. এম. ভি.-তে আরও একজন জনপ্রিয় গায়িকা ছিলেন কল্যাণী দাশ। শৈলজানন্দের অনেক ছবিতে উনি বিখ্যাত সব গান গেয়েছেন। একেবারে ভিন্ন ধরনের কণ্ঠস্বর ছিল ওঁর। আমাদের স্কুল জীবনে সুপারহিট ছিল শৈলজানন্দের

'মানে না মানা' ছবিটি। ওই ছবিতে মোহিনী চৌধুরীর লেখা শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুর দেওয়া 'মানে না মানে না মানে না মানা/চাঁদের আলোয় কোথা/এল রে জোয়ার/ও চাঁদ জানে না।' গানটি গেয়েছিলেন কল্যাণী দাশ।

ছেলেবেলায় এই গানটি আমি প্রচুর শুনেছি। জগন্ময় মিত্রের সঙ্গে কল্যাণী দাশের দ্বৈতকণ্ঠে একটি সুপারহিট গান ছিল, 'জয় হবে জয় হবে জয় হবে হবে জয়/মানবের তরে মাটির পৃথিবী দানবের তরে নয়।' এই গানটিরও সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্ত। এবং গীতিকার মোহিনী চৌধুরী।

ছবির নাম দিয়ে গান লেখা সম্ভবত মোহিনীদাই প্রথম শুরু করেন। শৈলজানন্দের সঙ্গে সহকারী চিত্রপরিচালকের কাজ করতেন উনি। এবং গানও লিখতেন। ওঁদের সব ছবিতেই থাকত ছবির নাম দিয়ে একটি গান। 'মানে না মানা', 'রং বেরং', 'অভিনয় নয়', এ ধরনের সব ছবিতেই ছবির নাম দিয়ে একটা গান থাকত।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 'আনারকলি' ছবির গান, 'এ জিন্দেগী উসি কি হ্যায়' গানটির বাংলা ভার্সান গেয়েছিলেন। বাংলা রূপান্তর ও রচনা মোহিনী চৌধুরীর। বাংলায় কথা ছিল, 'সে দিনগুলি ফিরিয়ে দাও'। খুবই হিট ছিল গানটি। আরও একটি এরকম ভাষান্তরিত গান ছিল যেমন 'বড়ে আরমান সে রাখা/হ্যায় বালম তেরি কসম'।

বেচু দত্তের গাওয়া এবং প্রণব রায়ের লেখা এই গানটির কথা ছিল 'হৃদয়ের নবীন আশা/দুই নয়নে নতুন স্বপন...'

কল্যাণী দাশেরও হিট গান ছিল 'বরসাত' ছবির 'লাল দুপাট্টা মলমল'-এর বাংলা রূপান্তর 'ও আমার অন্তর ঝলমল ঝলমল করে গো'।

ফাংশনের প্রসঙ্গে মনে আসছে, আমাদের অতি জনপ্রিয় গায়িকা কাননদেবীও কিন্তু কোনওদিন ফাংশনে গান করেননি। বিশেষ কারণে একটি বার ছাড়া আজকালকার চিত্রনায়িকাদের মতো যখন তখন ফাংশনে দাঁড়িয়ে গান না শেখা গলায় গান শোনাননি সুচিত্রা সেন।

হঠাৎ আমার হাতটা ধরে কে যেন টানল। অন্যমনস্ক ছিলাম, চমকে গেলাম। দেখি সুধীন দাশগুপ্ত। ওঁরই ডোভার কোর্টের বাড়ির মিউজিক রুমে আমাদের গান সৃষ্টির তখন একটু বিরতি ছিল। তখনই ঘটল এই ঘটনাটা।

সুধীনবাবুর সর্বসময়ের সঙ্গী ছিল একটি ছোট অ্যাটাচি। তাতে থাকত একটা ছোট কাঁচি। কিছু ওষুধ। দুটো কলম। ওঁর সাইনাসের জন্য ন্যাজাল ড্রপ ইত্যাদি। ওর মধ্যে যে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসও থাকত তা জানতাম না। ওই অ্যাটাচিটা থেকে ওটি বার করে সুধীনবাবু ওঁর চিরাচরিত গম্ভীর কণ্ঠে আমায় বললেন, ডান হাতটা পাতুন। প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় এখনকার সুরশিল্পী সুধীন দাশগুপ্ত রীতিমতো হস্তরেখাবিদের ভঙ্গিমায় আমার ডান হাতটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, আপনি একটা বড় হিরে পরুন। কী ফল হয় তা দেখবেন।

আমতা আমতা করে বললাম, এতেই রক্ষা নেই। দামি হিরে আঙুলে দেখলে তথাকথিত দুষ্কৃতিরা তো আমার আঙুলটিই কেটে নেবেন।

এবার হাসতে হাসতে সুধীনবাবু বললেন, আজকে হয়তো আপনার আঙুল কাটবে। কিন্তু কালকেই পেয়ে যাবেন পাঁচ লক্ষ টাকা। হাতজোড় করে বললাম, আমার আঙুলটা থাক। চাই না পাঁচ লক্ষ টাকা।

এই জ্যোতিষবিদ্যা শেখার বা চর্চা করার অভ্যাস একটা সময়ে গানের জগতের অনেকেরই ছিল। অনেকেই কিন্তু ঠিকঠাক বলেও দিতে পারতেন। অতীতটা সঠিক হলেই স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস এসে যেত ভবিষ্যৎবাণীটাও ঠিক হবে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে কণ্ঠশিল্পী বিমলভূষণের কথা। ওঁর অভ্রান্ত উক্তি অনেকের জীবনে সঠিক মিলে গেছে। তারপরে মনে আসে গীতিকার শ্যামল গুপ্তের কথা। এই চর্চাতে উনিও মশগুল। ওঁরও অনেক উক্তি অনেকের জীবনে মিলে গেছে। এমনকী আমিও হাতে হাতে তার প্রমাণ পেয়েছি। বাংলা ছবিতে আগে যিনি ছিলেন নায়ক এখন হয়েছেন খলনায়ক, সেই দীপঙ্কর দে-ও কিন্তু দারুণ জ্যোতিষ জানেন। হাত দেখে কুষ্ঠির ছক দেখে চমৎকার বলে দিতে পারেন অনেক কিছু। আমাকে শুধু নয়, আমার স্ত্রীর ছক দেখে উনি বলেছেন। আমার গোটা পরিবারের অনেক কিছু মিলেও গেছে। আপনাদের কিছু জানবার থাকলে যোগাযোগ করুন না ওঁর সঙ্গে। ভয় নেই, ব্যক্তিগত জীবনে টিটো অর্থাৎ দীপঙ্কর মোটেই খলনায়ক নন। একান্ত ভদ্রলোক।

আরও একজন হস্তরেখাবিদ বিখ্যাত গায়িকার কথা পরে বলব। এখন বলেনি সুধীনবাবুর হিরে পরানোর কথাটি।

সেদিন বাড়িতে এসেই মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। কে না চায় উন্নতি? দেখাই যাক না একটা বড় হিরে পরে কী সুফল হয়। কয়েকদিন সাবধানে চলাফেরা করে তারপর না হয় সেটা খুলে ফেললেই হবে।

পরদিন মাকে বললাম, মা, একটা বড় হিরের আংটি যদি থাকে দাও না। কয়েকদিন পরব।

হিরের আংটি পরার কারণটা শুনে আমার নাস্তিক মা বললেন, ওর জন্য দেব না। তবে তোমার যদি বড় হিরে পরার শখ হয় আমার আছে, আমি দেব। ফেলে রেখে আর কী হবে।

আংটিটা সুধীনবাবুর কথামতো এক মঙ্গলবার স্নান করে পরলাম। দেখা যাক কতটা মঙ্গল হয় আমার।

সুধীনবাবু প্রথম যৌবনে পাথরের দোকানে কাজ করতেন। কমলহিরে চিনতেন। আমার আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, ভালই। পাথরটা আরও একটু বড় হলে কাটিংটা আরও ভাল হলে, আরও ভাল হত।

কয়েকদিন পরেই সুধীনবাবুর সুরে আমার লেখা গানে 'হংসরাজ' মুক্তিলাভ করল। সুপারহিট হল ছবি আর তার গান। সে সময় মুক্তিলাভ করল আমার কাহিনীতে এবং আমার গানে হেমন্তদা সুরারোপিত 'রাগ অনুরাগ' ছবি। এ ছবিও হিট করল। গানও হল সুপারহিট। এমনই বিস্ময়কর আরও অনেক সুঘটনা পর পর আমার জীবনে ঘটে যেতে লাগল। আংটিটাকে আমি যখন তখন প্রণাম করতে লাগলাম। এর কিছুদিন পরেই পরিচালক স্বদেশ সরকার আমাকে ওঁর নির্মীয়মাণ 'নন্দিতা' ছবির চিত্রনাট্য রচনা করতে এবং লোকেশন দেখাতে নিয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গের একটি গ্রামে ওঁর পরিচিত একজনের বাড়িতে। রাতের ট্রেনে যাচ্ছিলাম। চারজনের বার্থের একটিতে আমরা। আমি ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম।

মাঝরাতে কে যেন আমার আঙুলটা ধরে টানল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখি অপরিচিত এক ভদ্রলোক, কামরার নীল আলোয় আমার দিকে ভর্ৎসনা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

আমাকে উঠে বসতে দেখে আমাকে রীতিমতো ধমক দিয়ে বললেন, এত দামি হিরে পরে কেউ ট্রেনে ওঠে? দেখে তো মনে হচ্ছে খুব চালাকচতুর। কিন্তু এমন বোকা মানুষ আমার জ্ঞানে আমি তো দেখিনি। খুন হয়ে যাবেন মশাই, খুন হয়ে যাবেন।

আমি বিনীত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ বলে ফেলেছিলাম, সুধীনবাবু বলেছেন আঙুল কেটে নিলেও পাঁচ লাখ টাকা পাব।

সেই ভদ্রলোক প্রচণ্ড রাগ আর বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আমিও তো খুনি ডাকাত হতে পারতাম। আমারও তো পকেটে থাকতে পারত রিভলবার।

কথাটা বলেই ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢোকালেন। আমি বিদ্যুৎগতিতে সরে বসলাম। ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে মুখ মুছে নিয়ে আবার বললেন, খুন হয়ে গেলে না হয় পনেরো লাখ টাকা আপনার লাভ হবে। কিন্তু স্বর্গ থেকে নেমে এসে ওই টাকাটা কেমন করে নেবেন, তা কি বলেছেন আপনার ওই সুধীনবাবু?

আর উত্তর এল না আমার মুখে। ভদ্রলোক ধমকের সুরেই বললেন, আংটিটা খুলে সুটকেসে ভরে রাখুন। ওটা পরে আর জীবনে এভাবে রাত বিরেতে পথেঘাটে বার হবেন না।

বাড়ি এসে মাকে বললাম ঘটনাটা। মাও একই কথা বললেন। বললেন, ঠাকুরের পা ছুঁয়ে ওটা ব্যাঙ্কের লকারে তুলে রেখে দাও। ওখান থেকে তোমার হিরে তোমায় আশীর্বাদ করবে। সুফল পাবে।

পণ্ডিতিয়াতে থাকতেন এক গায়িকা। ওঁরও সুনাম ছিল হাত দেখার। গানের জগতে মহিলাদের মধ্যে উনি ছিলেন হাত দেখাতে সর্বোত্তমা। একদিন ও পাড়াতে যাচ্ছিলাম। দেখলাম উনি বাড়িতে। ব্যস, কোনও কথা না বাড়িয়ে মেলে দিলাম হাতটা। উনি বিব্রত হয়ে বললেন, আরে বোসো। চা খাও। তারপর ওসব হবে এখন।

আমি বললাম, সাবিত্রী ঘোষকে হাত দেখাবার ইচ্ছা আমার বহুদিন ছিল। আজ সামনাসামনি সুযোগ পেয়ে গেলাম। উনিও কিন্তু হাত দেখে অনেক কথাই বলেছেন যা আমার জীবনে আগে ঘটেছে এবং ওঁর বলার পর প্রায় অভ্রান্তভাবে ঘটেছে। এই সাবিত্রী ঘোষের ডাকনাম চামেলী। ওঁর গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের অনেক গানেও লেখা আছে শিল্পী সাবিত্রী ঘোষ (চামেলী)। লোকমুখে শুনেছি সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, ওঁর নাম দিয়ে প্রচুর গান বানিয়েছিলেন। হারানো দিনের সে সব বিখ্যাত গানের মধ্যে আমার মনে পড়ছে সম্ভবত সুপ্রভা সরকারের গাওয়া 'চাঁদ ভোলে নাই চামেলীরে তার/ চামেলী ভোলেনি চাঁদে।'

আরও অনেক শিল্পীই সে সব গান গেয়েছেন, যেমন একটি গান 'বনের চামেলী ফিরে আয়।' আর একটি গান গীতা দাশের গাওয়া 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে'। এই গানের দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল 'চামেলী কহিল তবে।'

শচীন দেববর্মণের 'প্রেমের সমাধি তীরে তাজমহল' গানটিতে ছিল এই চামেলী শব্দটি।

আগেকার 'পরশমণি' চিত্রে শৈলদেবীর গাওয়া শৈলেন রায়ের লেখা এবং হিমাংশু দত্তের সুরে একটি সুপারহিট গান ছিল 'রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা/আকাশের নীল গায়/তুমি কোথায়।' এই গানের সুরে অনুপ্রাণিত হয়ে শচীন দেববর্মণ বানিয়েছিলেন 'তুম না জানে/কিস যাহা মে খো গয়ে তুম কাহা, তুম কাহা...'। এর মূল বাংলা গানের অন্তরাতেও চামেলী শব্দটা ছিল। 'তারার আঁখির কোলে/স্বপনে শিশির দোলে/চামেলী যে হায় চাঁদের পরশ চায়/তুমি কোথায়'। শুনেছি সে সময়ের প্রায় প্রত্যেক গীতিকারকেই হিমাংশু দত্তকে গান দিতে গেলে, গানে ওই 'চামেলী' শব্দের প্রয়োগ করে তবেই গান দিতে হত। তাই হিমাংশু দত্তের 'চামেলী' যুক্ত বহু গান একটু ভাবলেই মনে আসা সম্ভব।

৫০

আমি যখন প্রথম সাবিত্রীদিকে দেখি তখন উনি রাইচাঁদ বড়ালের তত্ত্বাবধানে অক্রুর দত্ত লেনে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির স্টুডিয়োতে রেকর্ড করছিলেন। প্রয়াত হিমাংশু দত্তের বিখ্যাত বিদেশি 'রেমোনা' সুরের স্টাইলে 'বনের কুহু কেকা সনে/মনের বেণু বীণা গায়' গানটির অনুলিপিতে 'তোমারই মুখ পানে চাহি/আমারই পাখি গান গায়'। গানটি মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম আমি। সেখানেও ওঁকে প্রণাম করি। ওঁর আর একটি গান আমার বিশেষ প্রিয় 'আমার বসন্ত যে যায়।' সাবিত্রী ঘোষের বাংলা আধুনিক হিট গানের সংখ্যা বেশ বড়। দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক আগে এবং পরে বাংলা সংগীতজগতে একটা অন্য ধরনের গান সংযোজিত হচ্ছিল।

সত্য চৌধুরী গেয়েছিলেন মোহিনী চৌধুরীর কথায় কমল দাশগুপ্তের সুরে 'পৃথিবী আমারে চায়'। তারপর 'জেগে আছি একা/জেগে আছি কারাগারে' এবং 'আজ যত দূরে চাই/আছে শুধু এক/ক্ষুধিত জনতা প্রেম নাই প্রিয়া নাই' রেকর্ডের গায়ক শ্যামল গুপ্ত তখন গীতিকার হয়ে জগন্ময় মিত্রের জন্য লিখলেন দেশাত্মবোধক গান 'অন্তবিহীন নহেতো অন্ধকার', এবং 'প্রণাম তোমায় হে নির্ভয় প্রাণ।' এ প্রসঙ্গে একটু অন্য কথা সেরে নিই। একদিন শ্যামল গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রেকর্ডের গান গাওয়া ছেড়ে দিয়ে গীতিকার হয়ে গেলেন কেন? চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন উনি। বলেছিলেন, দেখলাম আমার চেয়ে অনেকেই ভাল গান করেন। কিন্তু অনেকেই আমার থেকে ভাল লেখেন না। সে জন্য। যাই হোক, সেই সময় সাবিত্রী ঘোষ গেয়েছিলেন, অনুপম ঘটকের সুরে অপূর্ব একটি গান 'কাঙালের অশ্রুতে যে রক্ত ঝরে/ও ভগবান দেখেও তুমি দেখ না।'

এই সাবিত্রী ঘোষের গান লিখতে পরবর্তীকালে ওই হিন্দুস্থান থেকে আহ্বান পেয়েছিলাম। ভি. বালসারার সুরে আমার দুটি গান তৈরি হল। তার একটি এখনও ...ি। যেমন, 'না হয় ভুলেই যেও।' কিন্তু আজও জানি না, কেন সে গান অনুমোদিত

হওয়া সত্ত্বেও সাবিত্রীদির কণ্ঠে রেকর্ড করা হল না। সাবিত্রীদি এখন নিশ্চিন্তে অবসর জীবনযাপন করছেন। প্রায়ই ফোন করেন। ওঁর ফোন এলে সব কাজ ফেলে সে ফোন ধরি। নানা গল্প করেন। দারুণ ভাল লাগে।

আমরা ছোটবেলায় হিন্দি বা বাংলা ফিল্মের যে গান শুনতাম তখন কিন্তু পর্দায় নেপথ্য শিল্পীদের নাম দেখানোর রেওয়াজ ছিল না। রেকর্ডেও থাকত না শিল্পীদের নাম। ফিল্মের যে সব নায়ক নায়িকা বা পার্শ্বচরিত্রাভিনেতা বা অভিনেত্রী যাদের মুখে গান থাকত, ছবির কাহিনীতে তাদের যে নাম, গ্রামাফোন রেকর্ডেও সে নাম মুদ্রিত হত। যেমন 'রেখার গান', 'সীমার গান' ইত্যাদি।

যে সব শিল্পীরা স্বকণ্ঠে গান গাইতেন তাঁদের নাম অবশ্য রেকর্ডে সব সময় লেখা থাকত। কারণ তাঁরা ছিলেন বিশেষ রেকর্ড কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ শিল্পী। যেমন অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, কে এল সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, কাননদেবী, সুরাইয়া, খুরশিদ, অশোককুমার প্রমুখ। তখন যে ছায়াচিত্র শিল্পী গান গাইতে জানতেন না, তাঁদের জনপ্রিয়তার যোগ্যতা বেশ কম বলেই গণ্য করা হত। বাংলা ছবিতে অনেক পুরুষ শিল্পীরা গান গাইতে জানলেও অনেক মহিলা শিল্পীই গান গাইতে পারতেন না। সে জন্য তাঁদের কণ্ঠে দেওয়া হত অন্য শিল্পীর গান। প্রযোজকরা কিন্তু সে সব শিল্পীদের নাম পর্দায় বা রেকর্ডে দিতেন না। ওঁদের আশঙ্কা ছিল এই সব শিল্পীরা যে নিজের কণ্ঠে গাইছেন না এটা জানতে পারলে দর্শকরা সেগুলো একটা বিরাট মাইনাস পয়েন্ট হিসাবে গণ্য করবেন। ছবির বক্স অফিস মার খাবে।

গানের প্রেফারেন্স ছিল তখন সর্বাধিক। কে এল সায়গল মোটেই সুদর্শন ছিলেন না কিন্তু গানের গুণে ওঁকে প্রথমেই দেওয়া হয়েছিল নায়কের সুযোগ। শুনেছি প্রমথেশ বড়ুয়া সাহেব নাকি রবীন মজুমদারের গান শুনেই ছায়াচিত্রে সুযোগ দেন। রেডিয়োর তবলা বাদক অসিতবরণও নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর হিরো হয়ে গেলেন কারণ ওঁর গান কর্তৃপক্ষের ভাল লেগেছিল বলে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে এমন অনেক উদাহরণ আছে। যেমন বিনতা বসু, যিনি খুব একটা সুদর্শন না হয়েও নিউ থিয়েটার্সের 'উদয়ের পথে' ছবির নায়িকা হয়েছিলেন, প্রধানত চমৎকার গানের গলার গুণে। পরবর্তীকালে উনি 'উদয়ের পথে'-র কাহিনীকার জ্যোতির্ময় রায়কে বিয়ে করে বিনতা রায় হন। শুনেছি সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বিজয়া রায়ও সুন্দর গানের জন্য নায়িকা নির্বাচিত হন 'শেষরক্ষা' ছবিতে। তখনকার বিজয়া দাশের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের 'আমায় বাঁধবে যদি' গানটি এখনও আমার কানে বাজে।

ছায়াচিত্রে রবীন মজুমদারের প্রচুর গান সুপারহিট। উনি আধুনিক গানেও সার্থকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে হীরেন বসুর রচনায় 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাই বা জ্বলে'। রবীন চট্টোপাধ্যায়েরই সুরে কমল ঘোষের রচনায় 'তারে চিনি চিনি' এবং 'এ রাঙা গোধূলি হলে অবসান' এক সময়ে হিট গান ছিল। গায়ক রবীন মজুমদার প্রায় শেষ জীবনে নচিকেতা ঘোষের সুরে আমার লেখা 'এই তো এলাম শঙ্খ নদীর তীরে' এবং 'আমার নানা রংয়ের দিনগুলি' গান দুটি রেকর্ড করে গেছেন। এ আমার পরম সৌভাগ্য। নচিকেতা ঘোষ ডাক্তার ছিলেন।

রবিদাকে প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন উনি। আটকে রেখেছিলেন শ্যামবাজারের বাড়ির ওই চিলেকোঠার ঘরে। মনে আছে সেদিন বিকালে রেকর্ডিং ছিল রবিদার। আমার লেখা উনি গাইবেন। নচিবাবু আমায় বলেছিলেন, পুলক তুমি ভোরবেলায় রবিদাকে গাড়িতে তুলে নেবে। রবিদার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে সারাদিন। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে। তুমিই ওঁকে স্টুডিয়োতে নিয়ে আসবে। একমুহূর্তও অসতর্ক হবে না। একটুও যেন বেসামাল না হয় রবিদা।

রবিদার গাওয়া 'গরমিল' ছবির 'এই কি গো শেষ দান', 'সমাধান', ছবির 'দেখা হল কোন লগনে', 'যোগাযোগ' ছবির 'এই জীবনের যতই মধুর ভুলগুলি', 'নন্দিতা' ছবির 'কী যেন কহিতে চায়।' প্রণব রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা কমল দাশগুপ্ত এবং রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ওই সব গান, শুধু আমার কেন একসময় সব বাঙালিরই কণ্ঠস্থ ছিল।

এ ছাড়া 'নারীর রূপ' 'শাপমুক্তি', 'নিরুদ্দেশ' এই ছবিগুলির গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। (বাংলা 'নিরুদ্দেশ' ছবির কাহিনীর সঙ্গে পরবর্তীকালের সুপারহিট হিন্দি ছবি 'ইয়াঁদো কি বরাত' ছবির মিল সাঙ্ঘাতিক।) সুতরাং রবিদার প্রতি আমার দারুণ শ্রদ্ধা ছিল। আমি তখন প্রতি সপ্তাহে বোধহয় দুদিন নিয়ম করে শুনতাম রবিদার গাওয়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের গান 'বালুকা বেলায় মিছে/কী গড়িস খেলাঘর।'

সে জন্য মহা উৎসাহে সাত সকালে রবিদাকে তুলে নিয়ে ঘুরতে লাগলাম। রবিদাই আমায় বললেন, পুলক এসেছ যখন, চলো তোমায় অমুক প্রযোজকের কাছে নিয়ে যাই। যাতে ওঁর ছবিতে তুমি গান লেখ সে ব্যবস্থা করে আসি।

রবিদাকে সামলাতে এসে আমিই পেয়ে গেলাম ওঁর কাছ থেকে অনেক উপহার। দুপুরবেলাতে আমরা একসঙ্গে খেলাম। সম্ভবত পাঁচটাতে রেকর্ডিং ছিল। আমরা দমদম স্টুডিয়োর দিকে যাচ্ছি। রবিদা এক জায়গায় হঠাৎ গাড়িটা থামাতে বললেন। থামালাম। আমাকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে উনি 'এখনই আসছি' এইটুকু বলে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন।

কিন্তু যখন ফিরে এলেন তখন বুঝলাম, সারাদিন বালুকাবেলায় আমি মিছেই খেলাঘর রচনা করে এসেছি। মহাসাগরের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে আমার সব কিছু। রবিদা খুব অল্প কথা বলতেন। এবার যেন আরও নিশ্চুপ হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বললেন, চলো।

নচিকেতা ঘোষের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। স্টুডিয়োতে রবিদাকে এভাবে দেখে উনি আমাকেই দোষারোপ করবেন, রবিদাকে নয়। দমদমের গেটে নেমেই রবিদা নচিকেতাবাবুকে সামনে দেখে বললেন, চল নচি, আমি রেডি। গান আমার মুখস্থ। মোটেই দেরি হবে না।

নচিকেতা শুধু বললেন, আসুন রবিদা। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, পুলক, পারলে না, রবিদাকে সামলাতে? কথাটা শুনে একটু যেন বিরক্ত হয়ে রবিদা বলে উঠলেন, সায়গল সাহেব কোন গানটা না খেয়ে রেকর্ড করেছিলেন বল তো নচি? ও সব তোদের ভুল ধারণা। পুলক ফাটিয়ে দিয়েছে। তুই ফাটিয়ে দিয়েছিস। দেখা যাক আমি কী করি।

রবিদা সবসময় ভাল কিছু করাকে বলতেন 'ফাটিয়ে দেওয়া'। আমার কোনও গান

ভাল লাগলে বলে উঠতেন, পুলক, তুমি তো ফাটিয়ে দিয়েছ।

নচিবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করেই এবার হিরোর ভঙ্গিমায় হেঁটে গিয়ে সোজা মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন হিরো রবীন মজুমদার। আমরা অবশ্য প্রার্থিত রবিদার কণ্ঠস্বরটি পেলাম না।

পরবর্তীকালে সুখেন দাশের 'সিংহদুয়ার' ছবিতে অজয় দাশের সুরে গান লিখলাম ১। 'বেঁধেছি প্রাণের ডোরে' ২। 'গলা ছেড়ে গান গেয়ে যাই', ৩। 'ও মন থাকতে সময়', ৪। 'তোর চোখ মুছে ফেল' ইত্যাদি। এই ছবিতে রবীন মজুমদার বাউলকাকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন ঠিক হল। এদিকে সুখেন বলল, এই ছবিতে সব পুরুষ চরিত্রের লিপে সব গানই মান্না দে গাইবেন। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় থেকে রবীন মজুমদার পর্যন্ত। আমি চমকে উঠে বললাম, কী বলছ সুখেন? রবীন মজুমদারের ঠোঁটে গাইবেন মান্না দে?

সুখেন বলল, আমি রবিদাকে বলে নিয়েছি। রবিদা মান্না দের নাম শুনে সানন্দে মত দিয়েছেন।

আমার কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি নিজে এ ব্যাপারটা নিয়ে রবিদার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। রবিদার চোখে একটু জল চিকচিক করে উঠলেও হাসি মুখে বললেন, আরে, আমি কি আর তোমাদের সেই রোমান্টিক হিরো রবীন মজুমদার আছি না কি? চেহারা বদলে গেছে। এখন ভাল গান আর গাইতে পারি না। ভালই হবে। তুমি আমার জন্য বেশ ফাটিয়ে দিয়ে লিখেছ তো?

গান রেকর্ড হয়ে গেল। পিকচারাইজেশনও হয়ে গেল। 'সিংহদুয়ার'-এর মুক্তির দিন এগিয়ে এল। আমার বুকটা ছম ছম করতে লাগল। রবিদার লিপে মান্না দের গান লোকে হয়তো যা তা বলবে।

মনে পড়ে গেল আমাদের কলেজ জীবনে উৎপল দত্তের প্রথম ছবি 'মাইকেল মধুসূদন'-এর কথা।

নামী পরিচালক মধু বসু, মাইকেলের মুখে প্রণব রায়ের লেখা গান দিয়েছিলেন 'মোর কথার ফুল বনে তুমি যে মধু ঋতু/তুমি যে আমার কবিতা'। তখনকার বিখ্যাত 'অচলপত্র' পত্রিকার সম্পাদক দীপ্তেন সান্যাল বলেছিলেন, মাইকেল মধুসূদন কেন প্রণব রায়ের লেখা গান গাইলেন? রবীন্দ্রনাথের লেখা গান কেন গাওয়ালেন না মধু বসু? তা হলে পরিবেশটা আরও জমজমাট হত। অদ্ভুত রসিকতার সূক্ষ্ম কষাঘাত করতে পারতেন এই দীপ্তেন সান্যাল। কিন্তু আমার প্রিয় দীপ্তেন সান্যাল ছাড়া আর কেউই এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। লোকেরা হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। এবং হেমন্তদার গাওয়া এই গানটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'সিংহদুয়ার' মুক্তির পরেও দেখলাম রবীন মজুমদারের মুখে আমার তৈরি মান্না দে'র গান লোকেরা সুন্দরভাবে মেনে নিলেন। হিট হয়ে গেল মান্নাদার গাওয়া ওই গানগুলো। লোকেরা কত দ্রুত ভুলে যান, কীভাবে অনেক কিছু মেনে নেন, ভাবলে সত্যি বিস্ময় লাগে।

ইতিপূর্বে গানের জগতের অনেককে নিয়েই আলোচনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজনের কথাও ছিল, যাঁরা জ্যোতিষচর্চা করে আনন্দ পেতেন। এই গোষ্ঠীর আর একজনের নাম হঠাৎ মনে এল, তিনি সংগীতশিল্পী ও সুরকার সরোজ কুশারী। প্রতিবন্ধী এই সুরকার গানের জগতে অনেকেরই ছক দেখেছেন। আমিও তার মধ্যে একজন।

সরোজ কুশারী সুরারোপিত 'জন্মান্তর' ছবির গান সে সময় খুবই হিট করেছিল। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'তোমারই এ পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসি' এখনও আগের দিনের অনেকেরই মনে পড়ছে। ওঁর সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দুটি আধুনিক গানও রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। গান দুটি আমারই লেখা। একটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, 'হাতে কোনও কাজ নেই/টেবিলেতে একরাশ বই'। অন্য গানটি ছিল 'ঘুম নামে গাছের পাতায়'।

যাই হোক, আবার সেই রবিদার কথায় আসি। অনেক কষ্টে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটালেও মুখের হাসিটি শেষ পর্যন্ত অমলিন ছিল রবিদার। রবিদার সাহচর্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরা, তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার আস্বাদ পেয়েছেন। আমি সেই ভালবাসা পেয়েছি বলেই তারাশঙ্করের কবি চিত্রের সেই অসাধারণ গানটি যখন তখন শুনতে পাই 'এই খেদ মোর জীবনে/ভালবেসে মিটিল না সাধ/জীবন এত ছোট কেনে?'

অসিতবরণের গাওয়া এবং পঙ্কজ মল্লিকের সুরে ও প্রণব রায়ের লেখায় নিউ থিয়েটার্সের 'কাশীনাথ' ছবির গান খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'জানি গো জানি/এই গহন রাতে তুমি ডেকেছ মোরে'। ওই ছবিতেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গাওয়া ওঁদের সুপারহিট দ্বৈত সংগীতটি ছিল 'মোর মালঞ্চে ডাকল কুহু কুহু'। ওই ছবিতে বেলা বউদির একক কণ্ঠের সুপারহিট গান 'ও বনের পাখি'। এ ছাড়াও অসিতবরণ ও বেলা মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈত কণ্ঠে আর একটি গানও হিট 'এবার তবে করব শুরু'।

তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী সম্ভবত রেকর্ড বা পর্দায় বেলা মুখোপাধ্যায়ের নাম ছিল না। তাই এখনকার মতো কোনও মিডিয়া ওই সুপারহিট গানের গায়িকার পিছনে ধাওয়া করেননি। বেলা মুখোপাধ্যায় এর আগেও গেয়েছিলেন প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' ছবিতে। ওই ছবিতে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে একটি হিট গান 'বলতে মানা/ কাজের কথা দূর থেকে বলতে মানা'।

সম্ভবত সে গানের ক্রেডিট টাইটেলে গায়িকা হিসাবে রেকর্ডে বা পর্দায় ওঁর নাম ছিল না। বেলা মুখোপাধ্যায় রেকর্ডে আধুনিক গান অনেক গেয়েছিলেন। কিন্তু হেমন্তদার সুরের 'স্বপ্নের আঙিনায়/এক রাজারকুমার এসেছিল' এই গানটি ছাড়া কোনও গানই তেমন হিট করেনি। আমার ব্যক্তিগত পর্যালোচনায় দেখতে পাই 'ও বনের পাখি'-র মতো সুপার ডুপার হিট গানের গায়িকা বেলা মুখোপাধ্যায় কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ঘরণী হওয়ার পর থেকেই, অমন সুরশিল্পীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন। পরবর্তী জীবনে গায়িকা বেলা মুখোপাধ্যায় হয়ে গেছেন, আদর্শ

ঘরণী বেলা মুখোপাধ্যায়। যদিও হেমন্তদা শ্রাবন্তী মজুমদারের কণ্ঠে আমার রচনা 'আয় খুকু আয়' এবং এবং অসীমা মুখোপাধ্যায়ের (ভট্টাচার্য) সঙ্গে আমার লেখা 'স্বপ্নের দেশ' রেকর্ড করার পর আমাকে দিয়ে বেলাবউদির সঙ্গে গাইবেন বলে লিখিয়েছিলেন 'অনেক দীর্ঘ পথ এক সাথে পার হয়ে এলাম'। কিন্তু সে গান কেন রেকর্ড হল না তা আমার জানা নেই। হেমন্তদার পুরনো টেপ খুঁজলে হয়তো সে গান আজও খুঁজে পাওয়া যাবে।

আবার অসিতবরণ প্রসঙ্গে আসি। অসিতবরণ একদা তাঁর গানে সারা ভারতবর্ষ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। রাইচাঁদ বড়ালের সুরে হিন্দি 'ওয়াপাস' ছবিতে 'হম কোচুয়ান/হম কোচুয়ান/হম কোচুয়ান/পেয়ারে' গানটি একদিন পথে ঘাটে ঘুরত।

অনেক ছবিতে অনেক হিট গান গেয়ে কিন্তু এই গায়ক নায়ক হিন্দুস্থান রেকর্ডে গেয়েছেন অনেক আধুনিক গান এবং অনেক শ্যামাসংগীত। কিন্তু খুব একটা জমাতে পারেননি। বেসিক গান ওঁর খুব হিট নেই। অসিতবরণ অর্থাৎ কালোদার জীবনেও ঘটল ওই ধরনের ঘটনা। অন্য কোনও গান আমার মনে আসছে না তবে আমার লেখা গানে 'বিলম্বিত লয়' ছবিতে সংগীত শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কালোদা।

ছবিতে ছিল উনি সুপ্রিয়াকে গান শেখাচ্ছেন। গানটি আমারই লেখা 'বেঁধো না ফুল মালা ডোরে'। মান্না দে আর আরতি মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈত গীতি। যেদিন গান পিকচারাইজেশন হয় সেদিন স্টুডিয়োতে আমি ছিলাম। কালোদাকে একটু নিরিবিলিতে পেয়ে বলেছিলাম, কালোদা, কিছু মনে করবেন না। এটা একটু ক্লাসিকাল অঙ্গের গান ছিল বলেই মান্না দেকে দিয়ে সুরকার নচিকেতা ঘোষ, পরিচালক সরোজ দে, আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে গাইয়েছি। নইলে আপনার লিপে অন্যের গান! আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে কালোদা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, দূর দূর। কবে আমি গান ছেড়ে দিয়েছি। আর মান্নাবাবু তো দারুণ গেয়েছেন এ গান। এককালে তো গান গাইতাম। তাই ওঁকে ধন্যবাদ দিতে দিতেই ওঁর গানে ঠোঁট মেলাচ্ছি।

কালোদা গান গাইতেন বলেই ছবির পরিচালক সরোজ দে ওঁকে ওই সংগীত শিক্ষকের ভূমিকাটা দিয়েছিলেন। আমি দেখছিলাম অসিতবরণের অভিনয়। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না উনি স্বকণ্ঠে গান গাইতে পারছিলেন না সেটা ভুলে হাসি মুখেই অন্যের গানে লিপ দিচ্ছিলেন। সেটা ওঁর অভিনয়! নাকি যে চরিত্রটি অভিনয় করছিলেন সেটাই অভিনয়! বড় অভিনয় কোনটা?

অসিতবরণ উত্তমকুমার অভিনীত 'দুটি মন' ছবিতেও ঠিক এইভাবে আমার লেখা দুটি গানে লিপ দিয়েছিলেন। দুটি গানই গেয়েছিলেন মান্না দে আর সুর দিয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। দুটি গানই খুব জনপ্রিয় হয়। একটি গান ছিল 'জাগো নতুন প্রভাত জাগো/সময় হলো'। অন্যটি ছিল—'কেন ব্যথা দাও/তাও বুঝি না'।

এবার কিন্তু অন্য একটা ঘটনার কথা মনে আসছে, সেটা খুবই দুঃখের। রবীন মজুমদার এবং অসিতবরণ দুজনেই গায়ক অভিনেতা। অনিবার্য কারণে ওঁরা গান গাওয়া ছেড়ে দিয়ে অভিনয় করেই সারাজীবন কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু রাগপ্রধান গায়ক প্রসূন

বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি 'ঢুলি' ছবিতে প্লে-ব্যাক করে তোলপাড় করে দিয়েছিলেন সংগীতজগৎ, ওঁকে যেদিন স্টুডিয়োতে দেখলাম আমার লেখা গান 'ভেবে কে আর ভাব করেছে/ভাব করে স্বভাবে' এই গানটির পিকচারাইজেশন করছেন সেদিন বিস্মিতই হয়েছিলাম। আশু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'নিশিকন্যা' ছবির জন্য গানটি লিখেছিলাম। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে গেয়েছিলেন সেই মান্না দে। শুটিং চলার সময় সবাই প্রসূনবাবুকে চমৎকার লিপ দেওয়ার জন্য বাহবা দিচ্ছিলেন। আমি কিন্তু দিইনি।

প্রসূনবাবুর মতো বিশাল এক কণ্ঠশিল্পী, যিনি কোনওকালেও অভিনেতা নন, কেন তিনি মান্না দে-র গাওয়া এই গানটিতে লিপ দিচ্ছেন তার কোনও কারণ বা সদুত্তর সেদিন খুঁজে পাইনি। আজও সেই কারণ আমার অজ্ঞাত।

একটু আগে বলছিলাম তখন ছবির গানের রেকর্ডে বা পর্দায় নেপথ্য গায়ক গায়িকাদের নাম না দেওয়ার জন্য যাঁরা আধুনিক গানে হিট তাঁরা ছাড়া কত শিল্পী যে অকালে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন তার ঠিকানা নেই। এ প্রসঙ্গে চারজন শিল্পীর নাম মনে আসছে ১। অণিমা দাশগুপ্ত ২। তৃপ্তি সিংহ ৩। কল্যাণী দাশ ৪। অণিমা ঘোষ। 'শেষ উত্তর' ছবির 'আমি বনফুল গো' বা 'যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে' কিংবা 'তুফান মেল যায়' ইত্যাদি হিট গান মনে এলেই যে কোনও মানুষের মনে পড়বে গানগুলি গেয়েছেন কাননদেবী। কিন্তু কেউই বাকি হিট গানগুলি মনে করেও বলতে পারবেন না এসব গানের গায়িকা কে? বিভিন্ন ছবির গান থেকে আমিই প্রশ্ন রাখছি। বলুন তো সেই সারা দেশ মাতানো 'হৃদয় আমার হারালো/বুঝি হারালো হারালো'-র গায়িকা কে? কারও স্মরণে আসবে না অণিমা দাশগুপ্তের নাম। অথবা যদি জানতে চাই 'তুমি দুঃখ দিতে ভালোবাসো/তাইতো নিলাম দুঃখের ব্রত'-র গায়িকা কে?

অনেকেই ঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। অনেকেই বলতে পারবেন না কমল দাশগুপ্তের সুরে 'দোলে পিয়ালশাখে ঝুলোনা'-র গায়িকার নাম। যে গানকে অনুলিপি করে পরবর্তীকালে বানানো হয়েছিল 'দেয়া নেয়া' ছবিতে 'দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা'। ক'জন জানেন বিখ্যাত গান 'ভালবাসা এল জীবনে/ তাই তারে ভালবাসিরে' এই গানের গায়িকার নাম? অথবা শৈলজারঞ্জনের 'শহর থেকে দূরে' ছবির 'ও পরদেশি কোকিলা'-র গায়িকা অণিমা ঘোষের নাম?

অনেকেই জানেন না কমল দাশগুপ্তের সুরে প্রণব রায়ের কথায় 'মোর অনেক দিনের আশা' অথবা 'দম্পতি' ছবির 'কী যেন কহিতে চায়' অথবা 'গরমিল' ছবির 'এল হারানো দিনের সেই/চৈতি রাতি' ইত্যাদি দ্বৈত সংগীতগুলিতে রবীন মজুমদারের সঙ্গে মহিলা কণ্ঠটি কার?

অপরিচয়ের অন্ধকারেই আলোককণ্ঠী অণিমা দাশগুপ্তের মতো শিল্পীরা জীবনযাপন করলেন।

সুন্দরী নায়িকা সুমিত্রাদেবীর প্রথম অভিনীত হিট ছবি শৈলজানন্দের কাহিনী নিয়ে 'সন্ধি'-তে একটি গান ছিল 'কোন অজানার ঢেউ এসে লাগল'। এই গানের জন্য বি এফ জে পুরস্কার পেয়েছিলেন সুরকার অনিল বাগচি। কিন্তু কজন জানেন সেই অপূর্ব গানটির গায়িকার নাম? সত্যি এ এক আশ্চর্য ভাগ্যের পরিহাস। এঁদের সত্যিকারের যোগ্যতা

থাকলেও এখনকার বাংলা গানের বেশ কিছু অযোগ্য শিল্পীদের তুলনায় কি অর্থে, কি নামে চিরদিনই ছোট হয়ে রইলেন। তথাকথিত এ পাড়া ও পাড়া ফাংশনের মঞ্চে কবার ওঠবার আমন্ত্রণ পেলেন ওঁরা?

৫২

আমার এই লেখায় ইতিপূর্বে অনেকবারই বলেছি এবং আবারও বলছি আমি অনেকদিন থেকেই শচীন দেববর্মণের ভক্ত ছিলাম এবং আজও আছি। উনি যখন মুম্বই গিয়ে ছবিতে সুর করতে লাগলেন তখন সামসাদ, নূরজাহান প্রমুখের খুবই নামডাক। এ ভি এম-এর বৈজয়ন্তীমালা অভিনীত 'বাহার' ছবির 'কসুর আপ কা/হুজুর আপ কা', 'দুনিয়াকা মজা লে লো', 'সাঁইয়া দিল মে আনা রে' এই ধরনের সুপারহিট গানে ওঁরাই কণ্ঠ দিতেন।

যতদূর মনে পড়ছে লতাজিকে দিয়ে আশ্চর্য মেলোডি সৃষ্টি করলেন শচীনদা এরপরেই 'ঠাণ্ডি হাওয়া' গান দিয়ে। এ গানের নেপথ্য কাহিনী শুনেছি—শচীনদা প্রথম দিকে মুম্বই-তে ঠিক ততটা বাণিজ্যিক সাফল্য পাচ্ছিলেন না যতটা সবাই আশা করেছিল।

তখন বড় বড় সুরকারদের মিউজিক রুম থাকত ফিল্মি স্টুডিয়োতে। চেন্নাইতে অর্থাৎ মাদ্রাজে অবশ্য দেখেছি কিছু নামীদামি সুরকারদের আজও ফিল্ম স্টুডিয়োতে মিউজিক রুম আছে। শুধু মিউজিক রুম নয়, ইলিয়া রাজা সহ কিছু সুরকারের রয়েছে আলাদা রেকর্ডিং থিয়েটার। যেখানে শুধু ওঁদেরই গান রেকর্ডিং করা হয়, অন্য কারও নয়। তার সামনে রয়েছে সুরকারের নির্দিষ্ট পার্কিং প্লেস। এমনটি মুম্বই-তেও দেখিনি।

শচীনদার আমলের যে সময়ের কথা বলছি তখন মুম্বই-এর মতো এরকম মিউজিক রুম নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতেও ছিল। একদিন মুম্বই-তে স্টুডিয়োর মিউজিক রুমে অসময়ে এসে গিয়েছিলেন শচীনদা। হঠাৎ দেখলেন ওঁর স্টুডিয়োর কাজের লোকটি আপন মনে গাইছে নৌসাদের 'রতন' ছবির গান 'যব তুমহে চলে পরদেশ'। শচীনদার সাড়া পেতেই ছেলেটি ওর গান গাওয়ার জন্য শচীনদার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করল। শচীনদা ওকে চা আনতে বলে এক অদ্ভুত সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। ওঁর মিউজিক রুমে ছেলেটি নৌসাদের গান গাইছে কেন? রোজ কত নতুন গান উনি সৃষ্টি করে চলেছেন, ছেলেটি রোজই শুনছে। সেই সব গানের এক দু' লাইন তো গাইতে পারত, কিন্তু ও তা গায়নি। কেন গায়নি?

নিশ্চয় সে গান ওর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। যে গান ওর ভাল লেগেছে ছেলেটি তাই গেয়েছে। যে গান ওর ভাল লাগেনি তা গায়নি, তা হলে রোজ ওঁর বাদ্যযন্ত্রীরা, সহযোগীরা যে গানকে তারিফ দিয়ে আসছেন তা আসলে জনসাধারণের তারিফ নয়। কিছু বিদগ্ধ মানুষ অথবা কিছু স্তাবকের তারিফ।

শচীনদা নিজে বলেছিলেন, তার পরেই আমার চক্ষু খুইল্যা গেল ভাই। আমি কারও কথা শুনলাম না। নতুন রাস্তায় গান বানাইতে লাগলাম।

তারপরেই শচীনদার 'বাহার' ইত্যাদি জনপ্রিয় ছবির গানের সৃষ্টি। সারা দেশের

সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হয়ে গেল সে সব গান শুনে। শচীনদার মতে সেই ছেলেটি ওঁর ঘরে বসে অন্যের গান না গাইলে ওঁর সত্যিকারের চেতনা আসত না।

ওই মিউজিক রুমের আর একটি ঘটনা—

লতাজির বিখ্যাত মেলোডি ঠাণ্ডি হাওয়ার সৃষ্টি।

একদিন হঠাৎ মিউজিক রুমে সবার আগে উনি এসে পড়লেন। ঘরে চা জল দেওয়ার জন্য আরও একটি ছেলে ছিল। সেই ছেলেটি পিয়ানোটার রিডে আঙুল বোলাচ্ছিল।

আপন মনে পিয়ানো নিয়ে খেলা করছে কিশোর ছেলেটি। শচীনদা তার পিছন থেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই সুরটি শুনতে লাগলেন। সেই সুরটির নোটেশন মনে মনে মুখস্থ করে লিখে নিয়ে বললেন, এই তুই আবার বাজা!

ছেলেটি চমকে উঠে পিয়ানোর সামনের টুল থেকে নেমে উপুড় হয়ে পড়ল শচীনদার পায়ে। সাহেব কসুর মাপ করে দিন। শচীনদা ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে বলেছিলেন, তোকে তো মাপ করে দিলামই, কিন্তু তুই যে আমাকে কী দিয়ে গেলি তা তুই নিজেই জানিস না।

ওই চা দেওয়া ছেলেটির খালি মিউজিক রুমে পিয়ানো রিডে ছেলেমানুষি এলোমেলো বাজনার সুরের মুখড়া নিয়েই তৈরি হয়েছিল 'ঠাণ্ডি হাওয়া'-র মতো বিখ্যাত হিট গান। যে সুরের তুলনা আজও এদেশের সংগীতজগতে চট করে খুঁজে বার করা মুশকিল। ওই গানের এই নেপথ্য কাহিনীটি আমায় শুনিয়েছিলেন স্বয়ং শচীন দেববর্মণ।

এর পরেই শুনলাম 'বাজি' ছবির গান। গীতা রায়ের গাওয়া শচীনদার সুরে 'তগদীর সে বিগড়ি হুয়ে...'। আমি ছাত্রজীবনে যার সুপারহিট ভার্সান করেছিলাম 'স্বপ্নেরই লগ্নে কে/স্বপন রাঙালে।' স্নিগ্ধ সুরেলা ব্যঞ্জনাময় মধুর কণ্ঠস্বর ছিল গীতা রায়ের। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম ওঁর গান। ওই 'বাজী' ছবিতেই শচীন দেববর্মণ ওঁকে পাশাপাশি গাওয়ালেন অপূর্ব মেলোডি রোমান্টিক গান 'আজিকে রাত পিয়া/দিল না তোড়ো।'

এদেশের গানের জগতে আর সব মহিলা শিল্পীদের নাম স্তিমিত হয়ে এলেও এখনও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে দুটি নাম, লতা মঙ্গেশকর এবং গীতা রায়।

গীতাদির নিজের মুখেই একদিন শুনেছিলাম, বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর গ্রামে এক জমিদার বংশে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাড়িতে সংগীতের সমাদর ছিল। ছোটবেলাতেই গীতাদির গানের অনুরাগ দেখে মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই ওঁকে কলকাতার হরেন্দ্রনাথ নন্দীর কাছে গান শেখানো শুরু করেন ওঁর অভিভাবকেরা। ১৯৪১ সালে ওঁর দাদারা যখন মুম্বই-তে নিজেদের কাজের জন্য চলে আসেন, উনিও তখন ওঁদের সঙ্গে চলে আসেন মুম্বই-তে। ১৯৪৬ সালে মাত্র পনেরো বছর বয়সে উনি হিন্দি ছবিতে প্লে-ব্যাক করেন। তারপর থেকে সম্ভবত ওঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

গীতা রায়ের অপূর্ব দুটি চোখ আর শ্যামলা সৌন্দর্য দেখে অনেকেই ওঁকে ছবিতে অভিনয়ের জন্য অফার দিয়েছিলেন। লতা মঙ্গেশকর প্রথম জীবনে ছায়াচিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু গায়িকা গীতা রায়, নায়িকা হয়েছিলেন অনেক পরে, যখন উনি গুরু দত্তকে বিয়ে করে গীতা দত্ত হয়েছিলেন। ছবিটি ছিল গুরু দত্ত পরিচালিত বাংলা ছবি

'গৌরী'। ওই ছবিটির জন্য শচীন দেববর্মণ বানিয়েছিলেন 'বাঁশী শুনে আর কাজ নাই।'

কিন্তু খেয়ালি গুরু দত্ত ছবিটি অনেকটা শুটিং করে হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন। বললেন, না, ঠিক জমছে না।

পরবর্তীকালে গীতাদি অজয় বিশ্বাসের 'প্রথম প্রেম' ছবিতে অভিনয় করেন।

এখন চুপি চুপি একটা কথা বলছি। দোহাই আপনাদের, আপনারা কথাটা পাঁচ কান করবেন না। গীতা রায়ের সঙ্গে মান্না দে-র নাম জড়িয়ে বেশ একটা রোমান্টিক মিষ্টি মধুর গুঞ্জন তখনকার মুম্বই-তে কিছুদিন যত্রতত্র শোনা গিয়েছিল। একদিন এ প্রসঙ্গে স্বয়ং মান্না দেকে ওঁর 'আনন্দম' বাংলোর বারান্দায় বসে আড্ডা মারতে মারতে একটু মেজাজে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মান্নাদা প্রথমটায় একটু হেসে উঠেছিলেন। তারপর প্রিয়তমা পত্নীর নিজের হাতের বানানো বাগানের লনটার চারপাশে বিভিন্ন গোলাপফুলের গাছগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে উনি বলে উঠেছিলেন, প্রথম যৌবনে সবারই এসব একটু আধটু হয়ে থাকে। অস্বীকার করছি না আমাদেরও হয়তো কিছুটা হয়েছিল। আপনারও যে হয়েছিল সে তো সেই প্রথম দিন আপনার গানের ভাষা দেখে মনে মনে বুঝেছিলাম। তা না হলে লিখতে পারতেন 'দরদি গো কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম,' 'এই তো সেদিন তুমি আমারে বোঝালে', 'তুমি নিজের মুখে বললে যে দিন' কিংবা 'ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলেছো যে' নাকি আমিই গাইতে পারতাম ও সব গান? এর একটু পরে শিশুর মতো সরল হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন মান্না দে। এরপরই প্রসঙ্গ ঘুরে গেল।

বন্ধুবর সুধীন দাশগুপ্তকে কলকাতা থেকে মুম্বইতে নিয়ে গিয়েছিলেন গুরু দত্ত। মূলত গীতা দত্তেরই সার্টিফিকেটে। মাস মাহিনাতে কাজ করতেন সুধীনবাবু গুরু দত্ত ফিল্মসে। সুর করতেন। প্রতীক্ষা করতেন কবে রেকর্ডিং হবে।

কিন্তু খেয়ালি গুরু দত্তের রোজই গানের সিচুয়েশন পাল্টাত। রেকর্ডিং আর হত না। সুধীনবাবু একবার হঠাৎ কলকাতায় উড়ে এলেন। দেখা হল আমাদের। হাসতে হাসতে বললেন, সপ্তাহে তিনদিন রাত একটাতে গুরু দত্তের কাছ থেকে গাড়ি আসে। যেতে হয় ওখানে। পৌঁছলেই গুরু দত্ত বলেন, আসুন সুধীনবাবু। এখনই গীতা রাঁধল খিচুড়িটা। খেয়ে দেখলাম অপূর্ব। বাঙালি না হলে খিচুড়ির মর্ম কে বুঝবে। তাই আপনাকে ডাকলাম। আমি কিন্তু অবাঙালি হলেও এই খিচুড়ির খুব ভক্ত। কালকেও এক ঘটনা ঘটল। ভরপেট ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লেও আবার ঘুম থেকে উঠে ওখানে গিয়ে গীতাদির রান্না খেতে হল সুধীনবাবুকে। চলল পানাহার। কথায় কথায় কয়েকটি বাংলা হিট ছবির গল্প শুনলেন গুরুজি সুধীন বাবুর কাছ থেকে। তারপরেই শেষ রাতে বললেন, সুধীনবাবু, প্লিজ কালকেই চলে যান, কলকাতায় খোঁজখবর করুন ওই গল্পের হিন্দি রাইটটা খালি আছে কি না। সে জন্য আবার কলকাতায় এসেছি। ফিরে গিয়ে হয়তো শুনব এর থেকে আরও একটা ভাল গল্প পেয়ে গেছেন স্থানীয় মারাঠি সাহিত্য থেকে।

গীতাদি এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে আমার লেখা বেশ কিছু আধুনিক বাংলা গান গেয়েছেন বিনোদ চট্টোপাধ্যায় এবং কানু ঘোষের সুরে। ছায়াছবিতেও বিভিন্ন সুরকারের সুরে উনি আমার গান গেয়েছেন। শুধু আমার গান কেন গীতাজির গাওয়া যে গানই

শুনেছি, মনে হয়েছে উনি একটা নিজস্ব ঘরানা একটা নিজস্ব স্টাইল। অবশ্য সব দিকপাল কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যেই এই গুণটি আছে। গীতাদি যখন সাফল্যের তুঙ্গে তখন লতা মঙ্গেশকর নয় গীতাদির স্টাইল অনুসরণ করেই গানের জগতে পদার্পণ করেছেন আশা ভোঁসলে। ক্যাবারে অঙ্গের আবেদনপূর্ণ গান বা একান্ত আপন ভালবাসার গানে গীতাদি ছিলেন অদ্বিতীয়া।

মনে আছে 'হারানো সুর' ছবির সিটিং হয়েছিল ভবানীপুরে আমার বড়দির বাড়িতে। ওখানে প্রযোজক-নায়ক উত্তম, পরিচালক অজয় কর এঁরা ছিলেন। সুরকার হেমন্তদা তখন মুম্বই-তে ভীষণ ব্যস্ত। কলকাতায় দিন গুনে ঘড়ি ধরে আসতেন। সে সময় 'হারানো সুর' ছবির সুর করার দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। হেমন্তদা গেয়ে শোনালেন 'তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার।'

উপস্থিত শ্রোতাদের অভিব্যক্তি দেখে মনে হল কারও সে গান পছন্দ হয়নি। হেমন্তদা হারমোনিয়াম বন্ধ করে ঘড়ি দেখলেন। বললেন, আমার ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছে। বলো উত্তম ঠিক আছে তো?

উত্তম শুধু বলল, বাঃ!

হেমন্তদা বললেন, তা হলে এ গানটা মুম্বই-তেই রেকর্ড করছি। মিনু কর্তাকের স্টুডিয়োতে ইকো চেম্বার রেকর্ডিং এসে গেছে। কলকাতায় ইকো তো নেই। ওখানে খুব ভাল হবে।

সবাই সায় দিলেন।

এবার হেমন্তদা বললেন, গাইবে কিন্তু গীতা।

সবাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, সুচিত্রা সেনের লিপে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নয় গীতা দত্ত?

হেমন্তদা বললেন, এ গানটা গীতার মতো ভারতবর্ষে কেউই গাইতে পারবে না। কথাটা বলেই হেমন্তদা ঘর থেকে চলে গেলেন।

উনি চলে যেতে সবাই আলোচনায় বসলেন। বোঝা গেল গানটি সত্যি কারও পছন্দ হয়নি। এবং গায়িকা গীতা দত্তকেও নয়। শেষটায় উত্তম বলল, শুনেই দেখি না গানটা কেমন দাঁড়ায়। ভাল না লাগলে একটা রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে দেব। কিন্তু সে গান যে শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়াল তা কি আর বলার প্রয়োজন আছে? গানের জগতে গীতাদির এই গান আজও ইতিহাস। হেমন্তদার সার্থক দূরদৃষ্টিতে, এই একটি গানেই শ্রোতাদের হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন গীতাদি।

পরবর্তীকালে গীতাদির গাওয়া এ ধরনের গানগুলো আজও তো সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছেন। গীতাদির গান রি-মেক করে আজকে যে সব শিল্পী প্রশংসা পাচ্ছেন, তাঁরা ভেবে দেখছেন না এই গানে গীতাদির ছায়াটুকু আছে। এই ছায়াতেই তৃপ্তি। কায়াতো আজ ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কথায় আছে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না। কিন্তু আজকের শ্রোতাদের ঘোলেই তৃপ্তি জুটছে। বিভিন্ন ক্যাসেট কোম্পানিতে খোঁজ করলেই দেখা যাবে তার কপি করা গানের ক্যাসেটের বিক্রি কত বেশি।

'হারানো সুর' ছবির প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাদের জানাতে ইচ্ছা করছে। কথাটা হয়তো অনেকেই জানেন। তবু আবার বলি। 'হারানো সুর' ছবির অন্তিম দৃশ্যে উত্তমের মুখে 'রমা' ডাকটি কিন্তু হেমন্তদার কণ্ঠে, উত্তমের নয়। ঘটনাটা হল মুম্বইতে এই ছবির কিছু টেকনিকাল কাজ করার সময় পরিচালক অজয় কর এবং হেমন্তদা দুজনেরই মনে হল, ওই রমা ডাকটি ইকোর মাধ্যমে হলে নাট্যরস আরও জমবে। কিন্তু তখন ওই মুম্বই-তে উত্তমকে কোথায় পাবেন? তাই হেমন্তদাকে দিয়েই ওই ইকোর মাধ্যমে ডাকটা রেকর্ড করা হল। কারণ আগেই বলেছি কলকাতায় তখন ইকো মেশিন আসেনি।

যাক আবার গীতাদির প্রসঙ্গে আসি। গুরু দত্তকেই মন প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে ভাল বেসেছিলেন গীতাদি। ওঁর জন্য অনেক কিছুই মেনে নিয়েছিলেন। আমার ধারণা, গুরু দত্তের কাছেই গীতাদি গুরু দত্তের বিখ্যাত ছবি 'সাহেব বিবি গোলাম'—এর জীবনযাপন করতে শুরু করেন। তার প্রমাণ পেয়েছিলাম আমাদের পাড়ার ক্লাবের জলসায় ওঁকে গাওয়াবার জন্য যখন মুম্বই গিয়ে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। টেলিফোনে কথা বলে নিয়ে হেমন্তদাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম ওঁর বাড়ি। সঙ্গে অগ্রিমের সব টাকাটা ছিল না। তাই হেমন্তদাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। হেমন্তদা যেন বলেন, আমি আছি গীতা। তুমি পেমেন্টের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো। গীতাদির ভাই মুকুল রায়ের বাড়িতে, মুকুলবাবু ও গীতাদির সঙ্গে সব পাকাপাকি হয়ে গেল। ওঁরা শুধু বললেন, আমাদের সালকিয়ার অনুষ্ঠানের পরদিনই ওঁরা হায়দ্রাবাদের অনুষ্ঠানে যাবেন। সুতরাং পরদিন হায়দ্রাবাদ ফ্লাইটের সময় অনুযায়ী আমাদের, ওঁদের কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে হবে। এই দায়িত্বটা আমাকে নিতে হবে।

আমি বললাম নিশ্চয়। এ তো আমাদের কর্তব্য, আমাদের ভদ্রতা।

হেমন্তদা আমাদের সামনেই বেশ জোর দিয়েই বলে ফেললেন, না পুলক, তথাকথিত কোনও ছেলে টেলে নয়, তুমি নিজে সকালে গ্রান্ড হোটেলে যাবে। মুকুল আর গীতাকে নিয়ে তুমি নিজে ছেড়ে আসবে দমদমে।

হেমন্তদা কেন ও কথাটা তখন অত জোর দিয়ে বললেন, সেটা বুঝেছিলাম আমাদের জলসার পরদিন সকালে গ্রান্ড হোটেলে গীতাদিকে গাড়িতে তুলতে গিয়ে। তখনকার ঘটনাটা একটু বাদে বলব। এখন একটু অন্য কথা বলি।

হেমন্তদা আর মান্নাদার জয়গান তো আমি যখন তখন গাই। এই ফাঁকে আবার একটু গেয়ে নিই। সেবার আমাদের পাড়ার ক্লাবের রজত জয়ন্তী উৎসব ছিল। তখনকার ভাষায় সারারাত্রিব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান। কলকাতাতেই হেমন্তদা আর সন্ধ্যার সঙ্গে কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় আরও অনেক শিল্পী। হেমন্তদার পারিশ্রমিক হেমন্তদার কথামতোই ধার্য হয়েছিল। এরপর সভ্যদের উৎসাহে ওখানে এলেন মুকেশ, মান্না দে, তালাত মাহমুদ। এরপর আবার মুম্বই-তে গিয়ে ঠিক করতে হল গীতাদিকে। বলতে দ্বিধা নেই গীতাদির পারিশ্রমিক হেমন্তদার থেকে একটু বেশিই ছিল। যখন গীতাদির সঙ্গে আমার পাকাপাকি কথা হল, তখন টাকার অঙ্কটা পরিষ্কার জেনে

গেলেন হেমন্তদা। ওঁর গাড়িতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হেমন্তদা শুধু একবার হাসতে হাসতে বললেন, কী পুলক। আমার বেলাতে কি পুরনোটাই থাকবে?

আমি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললাম, বলুন কী হবে? আমি ক্লাবকে বলব।

হেমন্তদা বললেন, না, এখন আর এটা ভাল দেখায় না। কিন্তু মনে রেখো গান লিখতে লিখতে যখন পাড়ার ফাংশনের দায়িত্ব নিয়েছ, তখন সব থেকে আগে দায়িত্ব নিতে হবে তোমার গীতাদিকে ফেরত পাঠানো। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, গীতাকে কলকাতায় পাঠাবার দায়িত্বটা আমি নিলাম। আমি তখন কলকাতায় থাকলেও আমার লোক ওকে ঠিক সময় সান্তাক্রুজে ছেড়ে আসবে।

প্রায় সব কণ্ঠশিল্পীই কোনও অনুষ্ঠানে সম্মতি দেবার আগে জেনে নেন আর কে কে আছেন। হেমন্তদা কখনওই এ সব জিজ্ঞাসাই করতেন না। শুধু ঠিক করে নিতেন নিজের পারিশ্রমিক আর কটা নাগাদ কোন সময়ে ওঁকে গাইতে হবে, ব্যস।

এমন মানুষ ছিলেন বলেই গীতাদিকে আমি অনেক বেশি দিচ্ছি জেনেও ক্ষোভ তো করলেনই না, বরং ওঁর দিক থেকে গভীর সহযোগিতা পাওয়া গেল। সত্যি এমন বড় মাপের ভদ্র মানুষ পৃথিবীতে খুব কম এসেছেন।

আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠানে সাজিয়ে রেখেছিলাম, গভীর রাতে হেমন্তদার পরে গীতাদি গাইবেন। হেমন্তদা ওঁর অপূর্ব কণ্ঠের গান শেষ করে দর্শকদের সঙ্গে সামনের সারিতে বসে গেলেন। কিন্তু আমি দেখেছি সব জায়গাতেই ওঁর গান হয়ে গেলেই উনি চলে যেতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রয়ে গেলেন। ভাবলাম হয়তো গীতাদির প্রোগ্রাম শুনতে ইচ্ছে হয়েছে তাই থেকে গেলেন। কিন্তু আসল কারণটা বুঝলাম একটু পরে। গীতাদি প্রথম গানটা দারুণ গাইলেন। পরেরটাও ভাল। তার পরের গানটা শুনেই লক্ষ করলাম আমার পাশে বসা হেমন্তদা যেন একটু অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন। পরের গানটা গীতাদি বাছলেন খুবই রোমান্টিক একটি হিন্দি লোরি স্টাইলের গান। ওই সেই স্বভাব-প্রসিদ্ধ সুন্দর কণ্ঠে ঘুম ঘুম মাদকতা দিয়ে সেই গানটি এমন স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দিয়ে পরিবেশন করতে লাগলেন যে শ্রোতাদের মনে হল, উনি সত্যি যেন গাইতে গাইতে ঘুমিয়ে পড়ছেন। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছেন। আবার যেন আচমকা ঘুম ভেঙে গান ধরছেন। এই গানটি শেষ হতেই, আমাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ হেমন্তদা বিনা ঘোষণায় বিনা পূর্ব প্রস্তুতিতে সোজা উঠে এলেন মঞ্চে। নিজেই ঘোষণা করলেন এবার আমার আর গীতার ডুয়েট গান। অনুষ্ঠানে ডুয়েট গানের কোনও কথাই ছিল না। এই হঠাৎ প্রাপ্তিতে সমবেত শ্রোতারা হাততালিতে ভরিয়ে দিলেন অনুষ্ঠানস্থল। গীতাদি গাইতে গাইতে যে ঘুমিয়ে পড়ছেন এটা যে গানের অভিনয় নয় সত্যিকারের ঘুমের ঘটনা, সেটা কিন্তু আমিও বুঝিনি। মুহূর্তে বুঝেছিলেন হেমন্তদা। এমন কিছু হতে পারে এই আশঙ্কাতেই গীতাদির খুবই ঘনিষ্ঠ হেমন্তদা ওঁর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও থেকে গিয়েছিলেন। গীতাদির সেই গান যে চার্লি চ্যাপলিনের 'লাইম লাইট'-এর সেই আহত ক্লাউনের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, তৎক্ষণাৎ এটা আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম। আর দেখলাম হেমন্তদাকে। কীভাবে একজন শিল্পী আর একজন শিল্পীকে অসম্মান আর লোক জানাজানির গঞ্জনা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। পরে এই নিয়ে কথা বলেছি হেমন্তদার সঙ্গে। উনি বেশি কথা বলেননি। শুধু

বলেছিলেন, গীতা এখন সে গীতা নেই। বদলে গেছে। এখন ওর গানটাই শুধু শোনো। অন্য কিছুর আলোচনায় থেকো না।

সেদিন রাতে পর পর চার-পাঁচটা ডুয়েট গান গেয়ে গেলেন হেমন্তদা ও গীতাদি। বলা যায় হেমন্তদাই গাইয়ে নিলেন গীতাদিকে। হেমন্তদার কণ্ঠের সঙ্গে ঢাকা বা চাপা পড়ে গেল গীতাদির নেশাতুর স্টাইলে গাওয়া মদির কণ্ঠস্বরের সব কিছু ভুল ত্রুটি। অনুষ্ঠান শেষে সবাই অজস্র করতালিতে অভিনন্দন জানালেন শিল্পীদের। হাততালি আমিও দিলাম। তবে সবটা হেমন্তদাকে উদ্দেশ করে। এবার বাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠলেন হেমন্তদা। যাওয়ার বেলায় বলে গেলেন, পুলক, কাল গীতাকে প্লেনে তুলে দিয়ো।

পর দিন সকালে যথাসময়ে হোটেলে গিয়ে দেখি গীতাদির ঘরের দরজাতে ঝুলছে 'প্লিজ, ডোন্ট ডিসটার্ব!'

ঘড়ি দেখলাম, এখনও যদি না ওঠেন তবে দমদমে পৌঁছবেন কী করে? তখনও ভি আই পি রোড হয়নি। যশোর রোড ধরে যেতে হত এয়ারপোর্টে। নীচে নেমে এলাম। রিসেপশনে বললাম, একটু টেলিফোনে ডেকে দিন। প্লেন ধরতে হবে যে। ওঁরা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমাদের বলেছেন কোনও টেলিফোন না দিতে। ওঁর আদেশ উপেক্ষা করে আমরা কী করে ফোন দিই। উনি যদি আমাদের নামে কমপ্লেন করে দেন। তা হলে তো আমাদের চাকুরি থাকবে না।

অগত্যা আবার আমি ওপরে গেলাম। ঘড়ি দেখে অধৈর্য হয়ে দরজাতে ঘুষি মারতে লাগলাম। কোনও ফলই হল না। আমার হাতের ধাক্কায় শুধু জোরে জোরে দুলতে লাগল দরজাতে ঝোলানো 'প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব' বোর্ডটা।

আবার নেমে এলাম। কী করি ভেবে পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে এল আমার এক পরিচিত জন এয়ারপোর্টে বড় পোস্টে কাজ করে। তাকে বলে রাখি। উনি হয়তো টিকিট দুটো (গীতাদি ও মুকুল রায়ের) রিফান্ড সবটা পেতে সাহায্য করতে পারেন। ওঁকে ফোন করলাম। ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেলাম। বললাম, আমার অবস্থাটা। গীতা দত্ত যাবেন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি পৌঁছতে চেষ্টা করছি। আপনি একটু কাছাকাছি থাকবেন।

আবার ওপরে গেলাম। আবার দরজাতে ঘুষি। একজন বেয়ারা ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, আমার আচরণ দেখে আমাকে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, এ কী করছেন? পাশের ঘরের লোকেরা কমপ্লেন করবেন যে?

আমার হাতে ব্যথা লাগছিল। ওর কথায় কর্ণপাত না করে ওকে টিপস দিয়ে বললাম, আমাকে হেল্প করো ভাই।

ওদের এ সব অভ্যাস থাকাটা স্বাভাবিক। ও দরজাটার বিশেষ একটা জায়গায় আঘাত করতে লাগল। দু-চারবার আঘাতের পরই খুলে গেল দরজা। সে দিন মনে হল চাক্ষুষ দেখলাম আলিবাবার চিচিং ফাঁক। বন্ধ দরজা খোলার এত স্বস্তি জীবনে আর কখনও পাইনি। দেখলাম ঘুম জড়ানো চোখে সামনে দাঁড়িয়ে মুকুল রায়। মুকুল রায় হাই তুলে বললেন, ও, আপনি এসে গেছেন? কিন্তু গীতু তো এখনও ওঠেনি। ও তো ভেতরের ঘরে এখনও ঘুমুচ্ছে।

বাইরে তখনও সেই বেয়ারাটা দাঁড়িয়েছিল। আমি উৎকণ্ঠায় কাঁপছিলাম। ওকেই বলে বসলাম, ভাই, রুম সার্ভিসকে বলে দাও দুকাপ হট কফি। যাতে এখনই ঘুম ভাঙে। এবার একটু কড়া গলায় মুকুল রায়কে বলতে হল, গীতাদিকে ডাকুন। ফ্লাইট মিস করবেন যে? কিন্তু ওঁর তখনও যেন কোনও গা দেখলাম না। এদিকে আমার কানে তখন বেজে চলেছে হেমন্তদার নির্দেশ, পুলক, তুমি কিন্তু নিজে গীতাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।' দরজায় পর্দা ঢাকা ভেতরের ঘরটাতে গীতাদি ছিলেন। আমি সব সভ্যতা ভদ্রতা ভুলে রীতিমতো চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, গীতাদি উঠুন। কফি এসে গেছে। আর দেরি করলে ফ্লাইট মিস করবেন। আপনার হায়দ্রাবাদের ফাংশনে আগুন জ্বলবে।

আমার চেঁচামেচিতে কাজ হল। তখনই চোখ ভর্তি ঘুম নিয়ে পর্দা সরিয়ে আমার সামনে দাঁড়ালেন গীতাদি। এক চিলতে হাসি দিয়ে বললেন, গুড মর্নিং। ক'টা বাজে? বলতে হল, অনেক বেজে গেছে। এই যে কফি এসে গেছে। নিন তৈরি হয়ে নিন। আমি নীচে যাচ্ছি। আপনার চেক আউটের ব্যবস্থাগুলো সেরে নি।

কিন্তু গীতাদি গীতাদিই। আমার ওই টেনশনের মধ্যেই দেখলাম ওঁর সেই চিরন্তন মমতাময়ী নারীর রূপ। কপালের ওপর ঝুলে পড়া চুলগুলো আঙুলে সরিয়ে বললেন, না। এমনি যাওয়া হবে না। কফি খেয়ে যান। ভুলে গেলেন এটা ওঁর মুম্বই-এর বাড়ি নয়। কলকাতার হোটেল। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই জেনে গাল জিভ পুড়িয়ে গরম কফি কোনও রকমে গলায় ঢেলে মুকুলবাবু গীতাদিকে আবার তাগাদা দিয়ে এক দৌড়ে নীচে নেমে গেলাম।

নীচে থেকে দু-চার বার তাগাদা দেওয়ার পর অবশেষে গীতাদি নামলেন লাগেজ সমেত। গাড়িতে উঠে বসা হল। গাড়ি যখন ছাড়তে যাচ্ছে সেই সময় গীতাদি বললেন, এই যাঃ। আমার একটা ছোট হ্যান্ডব্যাগ ফেলে এসেছি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁর করুণা হল কিনা জানি না, বললেন, না, তেমন কিছু জিনিস নেই। এই টুকিটাকি রুমাল-টুমাল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, চিন্তা করবেন না। আপনাকে দমদমে ছেড়ে আবার আসব হোটেলে। ওদের ওখানে নিশ্চয় জমা থাকবে। ওটা নিয়ে গিয়ে হেমন্তদাকে দিয়ে দেব। উনি বোম্বে ফিরেই আপনাকে পৌঁছে দেবেন।

শ্যামবাজার পেরিয়ে কত জোরে যে দমদম পৌঁছে ছিলাম তা ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে এখন আমার বুক ধড়ফড় করে। এয়ারপোর্টে ঢুকতেই, সবার সামনেই আমার সেই পরিচিত ব্যক্তিটি আমাকে গালমন্দ করতে লাগল। আমি বলে রাখলেও সব জিনিসেরই তো একটা সীমা আছে। প্লেন বোধহয় ছেড়ে গেল। দাঁড়াও। ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলে আমায় বলল, আর একটু দেরি হলেই সিঁড়িটা সরিয়ে নিত। গীতা দত্ত যেতে পারেন, কিন্তু ওঁর লাগেজ যাবে না। গীতাদি ওই কথা শুনে অপরূপ চোখ দুটি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ও ব্যস্ত হয়ে শুধু বলল, যা যা দরকার বাক্স খুলে হাতে করে নিয়ে নিন। পুলক আপনার বাক্স পরে বুক করে মুম্বইতে পাঠিয়ে দেবে।

বাক্স খুলে প্রয়োজনীয় সমস্ত জামা কাপড় নিয়ে নিলেন গীতাদি আর মুকুল রায়। হঠাৎ মুকুলকে দেখে আমার পরিচিত অফিসারটি বলল, উনিও যাবেন নাকি? তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি তো শুধু গীতা দত্তর নাম বলেছিলে। সঙ্গে যে আর

একজন আছেন তা তো বলনি। মুশকিলে ফেললে আমাকে। দেখি কী করা যায়!

আবার শুরু হল আর এক ঝামেলা। তবুও সে বিপদটা আমরা পার হয়ে গেলাম। তখন এখনকার মতো সিকিউরিটির এত কড়াকড়ি ছিল না। পড়ে রইল গীতাদির লাগেজ।

এয়ারপোর্টের ওই উচ্চপদস্থ অফিসার, আমি, গীতাদি আর মুকুল রায় ছুটলাম রানওয়ের কাছে। পাইলট দেখলেন কি দেখলেন না জানি না, আমি ছুটতে ছুটতে পাইলটের উদ্দেশে দু হাত জোড় করে অনুনয় বিনয় করতে লাগলাম। দ্রুত সিঁড়িতে উঠতে উঠতে গীতাদির হাতের শাড়ি জামা নীচের কংক্রিটের মেঝের ওপর পড়ে গেল। ওখানকার লোকেরা তৎক্ষণাৎ তুলে নিয়ে সিঁড়িতে উঠে গেল। শেষটায় স্বচক্ষে দেখলাম গীতাদি মুকুল রায় দুজনেই প্লেনের ভেতরে ঢুকে গেলেন। বন্ধ হয়ে গেল প্লেনের দরজা। এবার সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া শুরু হবে। তখনই দমদমে আমার উপকারী অফিসার বন্ধুটির হুঁশ এল। আমায় দেখে বলল, আরে তুমি এখানে? এই রানওয়েতে এলে কী করে! তাড়াতাড়ি চলে যাও, আমি আসছি।

আবার প্রায় দৌড়ে লাউঞ্জে এসে হাঁপাতে লাগলাম। এদিকে তখন আর এক কাণ্ড। আর একজন দেরি করা যাত্রীকে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেননি প্লেনে ওঠবার জন্য। তিনি রীতিমতো হই হট্টগোল শুরু করে দিয়েছেন। বলছেন, ফিল্মের নামেই সব লাল ঝোল পড়ে আপনাদের। ফিল্মের লোকেরা সব সময় ভি আই পি হয়ে যায়, আর বাকি লোকেরা বুঝি সব ভেড়া ছাগল, ইত্যাদি ইত্যাদি সব নানা কথা। আমি ওই চেঁচামেচি শুনতে শুনতে গীতাদির সুটকেস দুটো এক জায়গায় সরিয়ে রাখতে লাগলাম। দেখি দুটো বাক্সই খোলা। গীতাদি চাবি দেওয়ার সময়টুকুও পাননি। একটা সুটকেসের খোলা ডালা থেকে সোনার চুড়ি, কাঁকন ও আরও কিছু গয়না আমার চোখে পড়ল। বাক্স দুটো ভাল করে বন্ধ করে মনস্থির করলাম, এগুলো প্লেনে পাঠাব না। হেমন্তদার হাত দিয়েই ওই হোটেলে ছেড়ে আসা গীতাদির আর একটা ছোট হ্যান্ডব্যাগের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব মুম্বই-তে।

ইতিমধ্যে আমার পরিচিত ব্যক্তিটি রানওয়ে থেকে ফিরে এসেছে। মড়া পুড়িয়ে বাড়িতে ঢুকলে যেমন আবার নতুন করে আর এক দফা কান্নার রোল ওঠে, প্লেনে না উঠতে পারা যাত্রীটি ওকে দেখেই আবার সজোরে ওঁর অভিযোগ জানাতে লাগলেন। আমার বন্ধু অফিসারটি ওঁকে নিমেষে থামিয়ে দিল একটি কথায়। বলল, গীতা দত্তর প্রিভিয়াস ইনফরমেশন ছিল। উনি আগে খবর পাঠিয়েছিলেন। আপনি যদি তা পাঠাতেন, তা হলে নিশ্চয় আপনার কেসটা আমরা বিবেচনা করতাম। এরপর ও আমায় ডাকল, পুলক, আমার ঘরে এসো, কফি খেয়ে যাবে।

একজনকে বাক্স দুটোর ওপর নজর রাখতে বলে ও আমায় ওর ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগল, যে চেঁচামেচি করছে সে হয়তো কোটিপতি। কিন্তু অমন কোটিপতি সারা ভারতে অজস্র আছে। কিন্তু গীতা দত্ত আছেন সারা ভারতে কেবল একটাই। ওঁর জন্য কিছু করতে পেরে আমি নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি। কী পুলক, কিছু ভুল বলেছি? আমার ওই পরিচিত পদস্থ অফিসারটি এখন কোথায় আছে জানি না। আমার

এ লেখা ও পড়েছে কি না তাও জানি না। যদি কখনও এ লেখা চোখে পড়ে তাই ওকে এক শিল্পীকে সম্মান জানানোর জন্য আমার পক্ষ থেকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

ভবানীপুরে শান্তুদার বাড়িতে, গীতাদির খোলা বাক্স পেয়ে আর সব শুনে হেমন্তদা শুধু বললেন, আমি এটা আন্দাজ করেছিলাম বলেই তোমায় এয়ারপোর্টে যেতে বলেছিলাম।

গুরু দত্তের আত্মহত্যার পর থেকেই, গীতাদিও যেন দিনে দিনে ধীরে ধীরে আত্মহননের দিকে এগিয়ে চললেন। এ বিষয়ে অনেক কথা আমাদের কানে আসতে লাগল। কিন্তু কিছু তো করার নেই। এটাই ওঁর অদৃষ্ট। কোনও কিছুতেই আর মন বসাতে পারলেন না। মাঝে মাঝে প্লে-ব্যাক করতেন। অনুষ্ঠানও করতেন। কিন্তু সবই যেন এলোমেলো পরিকল্পনাহীন।

৫৪

বন্ধুবর বারীন ধরের পর পর তিন-চার দিনের অনুষ্ঠানের জন্য সেবার সপ্তাহখানেক থাকবেন বলে গীতাদি কলকাতায় এলেন। বিনোদ চট্টোপাধ্যায়ের সুরে আমার লেখা 'হৃদয় আমার কিছু যদি বলে' এবং 'শুধু একবার বলে যাও' গানদুটি রেকর্ড করার পর, গীতাদি আমার লেখা কানুরঞ্জন ঘোষের সুরে শেষবারের মতো দুটি গান রেকর্ড করেছিলেন সম্ভবত ১৯৬৪ সালে। গান দুটি ছিল 'কবে কোন তারা জ্বলা' এবং 'তোমার আসার পথ চেয়ে'।

গীতাদির কলকাতায় আসার খবর পেয়ে রতু মুখোপাধ্যায়ের সুরে নতুন আধুনিক গান রেকর্ড করার জন্য রতুকে নিয়ে গেলাম হোটেলে। গীতাদি এক কথায় রাজি হলেন। খুব খুশি হয়ে আমার লেখা ও রতুর সুরে গান তুললেন 'স্বপ্ন স্বপ্ন সব কিছু আজ লাগছে।

হোটেল থেকেই এইচ. এম. ভি-কে ফোন করলাম গীতাদি রেকর্ড করতে রাজি। দু-তিন দিন আছেন। আমাদের গান তৈরি। আপনারা একটা ডেট দিন। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এইচ. এম. ভি. তৎক্ষণাৎ নির্মমভাবে জানিয়ে দিলেন, না। গীতা দত্তের বাংলা গানে আমরা ইন্টারেস্টেড নই।

রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে গেল। গীতাদিকে মিথ্যা বলতে হল এখন পনেরো দিন এইচ. এম. ভি.-র স্টুডিয়োর ডেট নেই। পরে যখন আসবেন, একটু আগে থেকে জানিয়ে এলে ব্যবস্থা করে রাখব। রতু, আমি একসঙ্গে গীতাদির ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

করিডোরে দেখা হল সদ্য আইন পাশ করা সুদর্শন এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে। আমার কাছে যেই শুনল আমি গীতাদির কাছ থেকে আসছি, তখনই আমায় অনুনয় বিনয় করতে লাগল, গীতা দত্তের গান আমার দারুণ লাগে। আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দাও।

রতু চলে গেল। অগত্যা ওকে নিয়ে আবার এলাম গীতাদির ঘরে। সেদিন সন্ধ্যায় গীতাদির অনুষ্ঠান ছিল না। নব্য উকিলটি কথাবার্তা ভীষণ ভাল বলে, জমে উঠল আড্ডা। সময় কেটে যেতে লাগল। যতবার উঠতে চাই ততবারই গীতাদি উঠতে দেন না। শেষটাতে বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হল, গীতাদি মাফ করবেন। আমাকে উঠতেই হবে।

উকিল বন্ধু বলল, তা হলে আমিও উঠি।

গীতাদি আমায় বললেন, আমিও একটু ঘুরে আসি। জীবনের সব কিছুই যেন বদলে গেছে। কোনও কিছুতেই একঘেয়েমি আমার ভাল লাগে না। হোটেলের এই বন্ধ ঘরটাতে যেন আমার দম আটকে আসছে।

আমার গাড়িতে উঠলেন গীতাদি। গঙ্গার ধারে খানিকটা ঘুরলাম। গীতাদি হঠাৎ আমায় বললেন, আপনি তো ভাই ঘোরতর সংসারী। বউ আছে। শুনেছি ছেলেও হয়েছে। এবার উকিল বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কে কে আছে ভাই?

বন্ধু বলল, মা নেই। বাবা আছেন। বোনেরা আছে। আর আছে ছোট্ট একটা ভাই।

গীতাদি বললেন, চলো, তোমার বাড়ি যাই।

অগত্যা যেতে হল। ওরা তো গীতাদিকে বাড়িতে পেয়ে স্বর্গ হাতে পেল। স্বাভাবিকভাবেই আদর আপ্যায়ন চলল। রাত বাড়তে লাগল। বললাম, গীতাদি চলুন এবার হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যাই। বারীন ধর হয়তো এতক্ষণ হোটেলে ছটফট করছে।

গীতাদি ওঠেনই না। হঠাৎ আমায় বললেন, রাত বেশি মনে হলে কোলের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যাক। আমি আজ এখানেই থাকব।

চমকে উঠলাম। এখানে থাকবেন? বউবাজারের এই সরু বাঁকা রায় স্ট্রিটের একতলার এই ছোট বাড়িতে? না, গীতাদি। চলুন আপনাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে আসি।

গীতাদি বললেন, না যাব না। ওদের এই ছোট্ট ঘরটা আমার দারুণ পছন্দ হয়েছে। কত দিন কত কাল এই ধরনের পুরোপুরি বাঙালির ঘরে থাকিনি। পুলকবাবু দোহাই। আমাকে এখানে থাকতে দিন। আমি আজ খুব পরিতৃপ্তিতে রাত কাটাব। অনুনয়ে ভেঙে পড়লেন গীতাদি। অগত্যা চলে এলাম। বন্ধুকে আড়ালে বললাম, কিছু অসুবিধা হলেই আমায় ফোন করবে। চলে আসব। বাড়ির ছোট্ট সদর দরজাটি আটকালেন গীতাদি। বললেন, কথা দিতে হবে। কেউ যেন না জানে আমি এখানে আছি। এমনকী বারীন ধরও যেন না জানে। কিন্তু গীতাদিকে দেওয়া সে কথা আমি রাখতে পারিনি। বাঁকা রায় স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে এসে সোজা চলে এলাম হোটেলে। যা ভেবেছিলাম দেখলাম ঠিক তাই। দেখি বারীন ধর অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করছে।

খুলে বললাম সব কিছু। দিলাম ওকে বাঁকা রায় স্ট্রিটের ঠিকানা। বললাম, কিছুতেই বলবে না আমিই তোমাকে ঠিকানাটা দিয়েছি। বারীন শুধু বললে, তুমি যখন হোটেলে এলে ওঁর ঘরে তখন কে ছিল? আমি বললাম, কেউই তো ছিল না। গীতাদি তো একাই ছিলেন। বারীন বললে, তা হলে বোধহয় তখনি ওরা গেছে। 'ওরা' যে কারা তা আমি আজও জানি না। শুধু বারীনের সঙ্গে লিফটে নামতে নামতে শুনলাম বারীন আপনমনেই বলছে, না. কতবড় একজন শিল্পী যে ভবিষ্যতে জন্মাবে না, তাকে আর সুস্থ করা যাবে না।

সত্যিই সুস্থ করা গেল না শিল্পীকে। এইভাবে এলোমেলো বিশৃঙ্খল জীবন কাটিয়ে চলে গেলেন একদিন। জীবনে অর্থ, যশ, মান-সম্মান, প্রতিপত্তি সবই উনি পর্যাপ্ত পরিমাণে পেলেন। কিন্তু বোধহয় পেলেন না বুকভরা সুখ আর শান্তি। এ হয়তো বিধাতারই ভাগ্য লিখন। এমনধারা কিছু যে হবে তা ওঁর অবচেতন মন আগেই জেনে

গিয়েছিল। তাই অমন প্রাণঢালা অভিব্যক্তিতে গাইতে পেরেছিলেন, 'শচীমাতা গো, আমি চার যুগে হই জনম দুঃখিনী'।

জানি না চলে যাওয়ার সময় কাকে কী অভিযোগ জানালেন। জানালেন কার কাছে কী অভিযোগ কিংবা অভিমান। আমার কানে শুধু বাজতে লাগল ওঁর গাওয়া আমার লেখা একটি গান 'শুধু একবার বলে যাও/যদি তুমি চলে যাও/কোন আশা বুকে নিয়ে থাকব'।

একজন যায় আর একজন আসে। এই হয়তো পৃথিবীর নিয়ম। তবু একজন চলে না গেলে আর একজন যে আসতে পারতেন না, তার প্রমাণ তিন-তিনবার পাওয়া গিয়েছে সংগীত জগতে। গীতা দত্ত চলে যেতেই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠলেন আশা ভোঁসলে, তার আগে নয়। কিশোরকুমার চলে যেতেই মানুষ চিনল কুমার শানুকে, তার আগে নয়। আর মহম্মদ রফি চলে যেতেই মানুষ জানল মহম্মদ আজিজকে (মুন্না), তার আগে নয়।

৫৫

এবারে নতুন কথা বলার আগে একজন অসাধারণ সংগীতগুণী মানুষের বিয়োগ ব্যথার কথা বার বার মনে আসছে। আমি সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথাই বলছি। উনি যখন চলে গেলেন সেইসময় আমি ছিলাম মুম্বই-তে। দুঃখে মনটা ভারী হয়ে আসছে একবার ওঁকে শেষ বারের মতো দেখতে পেলাম না বলে। উনি নেই খবরটা আমি শুনলাম মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরে দমদম এয়ারপোর্টে। খবরটা দিলেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক। তিনি হয়তো আমায় চেনেন। খবরটা শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। মুম্বই-তে বাংলা সংবাদপত্র সকালের দিকে পেতাম না। যে সব পেতাম তাও ভাল করে পড়ার সময় পাইনি। কিন্তু ছিলাম তো মুম্বই-এর সংগীতমহলে। কেউ একজনও আমাকে এই সংবাদের কথা জানাতে পারেননি। ওঁরা ভুলে গেছে, নীতীন বসুর 'বিচার' ছবির সেই ব্যতিক্রমী সুরকার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে। আমরা ছোটবেলায় যে গান মন ভরে শুনেছি হিন্দিতে 'মুঝে লাগি লগন'—যার বাংলাটা ছিল 'বধূ খোল দুয়ার'। এ এক অদ্ভুত হৃদয়হীন জায়গা মুম্বই। বছর কয়েক আগে সানি রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে আমার লেখা একটি বাংলা গান রেকর্ডিং হচ্ছিল। স্বভাবতই ওখানে আমি হাজির ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, অতীত দিনের প্রখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীরামচন্দ্র কোনও কারণে থিয়েটারে ঢুকলেন। আশ্চর্য কেউ ওঁকে চিনলেন না। আমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন আগে কোথায় যেন একবার আলাপ হয়েছিল। আমি একবার দেখাতেই চিনলাম। কেউ ওঁকে বসবার জন্য চেয়ার ছাড়লেন না দেখে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওঁকে বসতে বললাম আমার চেয়ারটাতে, প্রবীণ সুরশিল্পী আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বসলেন। উনি আমাকে চেনেননি, চেনার কথাও নয়। আমি পরিচয় দিলাম। বললাম, আপনার সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছিল। হাসিমুখে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। আমার আচরণ দেখার পর, ওখানকার উপস্থিত লোকেরা ওঁর কাছে এগিয়ে এলেন।

হাসিমুখে কথা বললেন। তা না হলে হয়তো শ্রীরামচন্দ্রজিকে আত্মপরিচয় দিয়ে কাজ সারতে হত। যেহেতু এখন আর শ্রীরামচন্দ্র কোনও কাজ করছেন না অতএব কোনও চিত্রপরিচালক, সুরকার, বাদ্যযন্ত্রী, শব্দযন্ত্রী কারও ওঁকে আর চেনার প্রয়োজন নেই। এরকমই অর্থ এবং আত্মসর্বস্ব মুম্বইয়ের চিত্রজগতে।

মুম্বই-তে যিনি যখন হিট তখন তাঁর পায়ে পড়তেও কেউ কুণ্ঠা করেন না। যেই তিনি ভাগ্যের বিপর্যয়ে ফ্লপ তখন আর কেউই তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না। একদা কেউ কৃতী ছিলেন। অনেক কিছু দিয়েছেন চিত্র জগৎকে। তাতে কী? এখন তো বিশেষভাবে তিনি বাণিজ্যিক জগতে নেই। অতএব তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এমনকী মনে রাখাও তাঁরা সময়ের অপব্যয় মনে করেন। এমনকী নির্মম হাসি হাসতে হাসতেও সোজাসুজি বলেন, কলকাতায় কাজ কম, সময় বেশি। তাই আপনারা ও সব করতে পারেন। আমরা পারি না।

সুরকার কালীপদ সেন 'মেজদিদি' 'রাত্রি' ছাড়া কোনও ছবির গান হিট করাতে না পারলেও আজীবন কিছু না কিছু ছবির কাজ পেয়েছেন। ওঁর দুঃসময়ে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিয়োর বন্ধুরা ওঁর বাসস্থানের জন্য স্টুডিয়োতে একটি ঘর দিয়েছেন। সেইসঙ্গে নিয়মিত আহারের ব্যবস্থা। মহা বিত্তবান মুম্বই-তে এমন একটা দৃষ্টান্ত কেউ কোনওদিন দেখাতে পারবেন কি?

ও সব কথা ছেড়ে জ্ঞানদার কথাতে আসি। জ্ঞানদা নেই ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। আমার কত গান জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সুর করেছেন। ওঁর স্ত্রী ললিতা ঘোষের রেকর্ডের কত গান আমি লিখেছি। লিখেছি বেগম আখতারের বিখ্যাত গান 'ফিরায়ে দিয়ো না মোরে শূন্য হাতে'। বেতারের রম্যগীতির কত অজস্র গান। জ্ঞানদার মহৎ প্রাণের অনেক উদাহরণও পেয়েছি। একবার সুর করার জন্য জ্ঞানদাকে আমি একটা গান দিয়েছিলাম। গানটা ছিল 'আমায় তুমি জড়িয়ে দিলে বন্ধনে/মালাতে নয়, দুই নয়নের ক্রন্দনে'। রেডিয়োর স্টুডিয়োতে গানটি পড়েই বললেন, চমৎকার লিখেছেন গানটি। সামনের পিয়ানোটাই একটু বাজিয়ে নিলেন। সহযোগী দক্ষিণামোহন ঠাকুরকে ডাকলেন। দক্ষিণাদাও বললেন, বাঃ পুলক! চমৎকার!

তারপরেই কিন্তু জ্ঞানদা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলেন, না। আমি করব না। এটা দুনিচাঁদ বড়াল করুক। উনি সত্যিকারের ভাল গান খুঁজছেন। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ গানটা দারুণ গাইবেন। সত্যি সেই জ্ঞানদা চলে গেলেন। 'আমায় উনি জড়িয়ে গেলেন বন্ধনে/অনেক দিনের সুখের স্মৃতির ক্রন্দনে'।

এই সরল এবং সংগীত-পণ্ডিত মানুষটিকে আমি আমার প্রণাম জানাই।

এবার আসি অন্য প্রসঙ্গে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যখন তখন বলতেন, ভাগ্য ছাড়া কিছুই হয় না। আমার মতো অনেকেই হয়তো এই কথাটা স্বীকার করবেন। আমি আজীবন দেখেছি যোগ্যতা এবং সৌভাগ্য যাঁদের আছে বা ছিল তাঁরা ঠিকই বড় হয়ে উঠেছেন। আমার দেখা এবং আমার জানা এমন অনেক প্রতিভাই ছিল এবং আছে, অনেকটা ভাগ্যের বঞ্চনাতেই তাঁরা তেমন বিকশিত হতে পারেননি। এটা অবশ্য আমার ধারণা। এই তালিকায় প্রচুর নাম মনে আসছে। প্রথমেই মনে আসছে হেমন্তদার ভাই অমল

মুখোপাধ্যায়ের কথা। অমল তেমন বড় মাপের গায়ক না হলেও সুরকার হিসাবে ছিল দারুণ ভাল। হেমন্তদা নিজে এ কথাটা মানতেন। কোনও নতুন সুরকার যদি হেমন্তদাকে কিছু করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন তখন হেমন্তদা হাসিমুখে বলে দিতেন, আমার ভাই অমল এত ভাল সুর করছে জেনেও আমি তার জন্য কিছু করতে পারছি না। আপনার জন্য আমি কী করব?

উত্তমের ভাই তরুণকুমারের খুবই বন্ধু ছিল অমল। ওঁরা যখন 'অবাক পৃথিবী' ছবি করল তখন সেই ছবির সংগীত পরিচালনার সুযোগ দিল অমলাকে। মনে পড়ছে ওই ছবির আমার লেখা হেমন্তদার গাওয়া উত্তমের ঠোঁটে দুখানা গান 'সুর্পণখার নাক কাটা যায়' এবং 'এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে'। গান দুটি খুবই হিট করেছিল।

এরপর অমল সুযোগ পেল সুশীল মজুমদার পরিচালিত উত্তম সুচিত্রার 'হসপিটাল' ছবিতে। পরে অবশ্য অন্য কারণে ওই ছবিতে উত্তম অভিনয় করেনি। করেছিলেন অশোককুমার। কিন্তু উত্তম সুচিত্রাকে নিয়েই খুব ধুমধামের সঙ্গে মহরত হয়েছিল। এই ছবিতে গীতা দত্তর গাওয়া 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়' গানটি অমলের সুরে সুপার ডুপার হিট হল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এরপরে তেমন উল্লখযোগ্য ছবি পেল না অমল। আমি ওর সঙ্গে পরে যে সব ছবিতে কাজ করেছি তার মধ্যে মনে আসছে পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়ের ছবি। ছবিটির নাম সম্ভবত 'এই তো সংসার'। এই ছবিতে এখনকার ভারতখ্যাত আর তখনকার কলকাতার নিউ আলিপুরের বাসিন্দা কিশোরী অলকা ইয়াগনিকের, বাংলা গানেই প্রথম প্লে-ব্যাক করা। তারপর রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী পরিচালিত 'রেঞ্জার সাহেব' ছবিতে কাজ করেছিলাম। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'ও পাখি আজ তুই যাসনে উড়ে' এই গানটিও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তবুও কিন্তু অমলকে তেমনভাবে ছবিতে সংগীত পরিচালনার জন্য কেউ ডাকল না। নিজের সুরে অমলের গাওয়া রেকর্ডে কিছু বেসিক গানও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। আমার খুবই প্রিয় ওর গাওয়া 'চুপ চুপ লক্ষ্মীটি/শুনবে যদি গল্পটি'। কেন অমল যোগ্যতা প্রমাণ করেও নিষ্প্রভ হয়ে গেল তার কারণ খুঁজে হতাশ হয়ে ওই ওপরের দিকে আঙুল তুলে বলতে হবে, সব ওই ওপরওয়ালার ইচ্ছে।

আর একজনের নাম মনে আসছে সে সুধীন সরকার। প্রকৃত গায়কের সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও এবং নীতা সেনের সুরে গাওয়া, কিছু গান হিট করার পরও কেউ তাকে তেমন সুযোগ দিলেন না। আমার ধারণা সুধীন সরকার প্রকৃত সুযোগ পেলে এখনও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবেন।

আপনাদের মনে আছে কি, জলসা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান গায়ক মলয় মুখোপাধ্যায়। ওই দুর্ঘটনার জেরেই কিছু দিন পর প্রাণ হারান মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ অরুণাভ মজুমদার।

ওরই অনুজ দীপক মজুমদার। সত্যিকারের সুরুচিসম্পন্ন অনেক সংগীতানুষ্ঠানেই গান গেয়ে উনি নিয়মিত অজস্র সমঝদার শ্রোতাদের অনাবিল আনন্দ দিয়ে আসছেন।

দীপকের গান শুনে তারিফ করছেন অনেকেই। সমাদরে নিয়ে যাচ্ছেন নতুন সংগীতানুষ্ঠানে। এই চলছে দিনের পর দিন। সত্যিকারের রসসমৃদ্ধ গানের পরিবেশন

করার ক্ষমতার প্রমাণ পাচ্ছেন প্রচুর সুধীজন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই কোনও ক্যাসেট প্রতিষ্ঠানে অথবা ছায়াছবির নেপথ্য গানে ওকে আহ্বান জানাচ্ছেন না। একে ভাগ্য ছাড়া আর কী বলবেন।

আর একজন সংগীতশিল্পী নীলাঞ্জন রায়। নীলরোহিত নামে যিনি গান করেন। চমৎকার ভরাট গলা। শ্রোতাদের মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন। তাঁরও তো সেই একই অবস্থা।

এমনই আর একজনের নাম দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। একটি কলেজের অধ্যাপক হয়েও গান রচনা, গানের সুর করা এবং গান গাওয়াতে বহুদিন মনোনিবেশ করে আসছেন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা এবং সুরে, ওঁর গাওয়া রেকর্ডের একটি গান আমার দারুণ প্রিয়, 'যে আকাশে নামে বাদল'। উনি কিছু ভাল গানও রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে, দ্বিজেনবাবুরই গাওয়া 'যদি বলি তোমার দু চোখ' এবং দীপঙ্করের সুরে রচনায় মান্না দের গাওয়া 'জবাব চেও না এই প্রশ্নের'। এরপর দীপঙ্করকে পেয়েছিলাম আর এক উজ্জ্বল ভূমিকায়। ওরই বন্ধু তখন শুনেছিলাম প্রযোজনার এক অংশীদার অভিনেতা অসীম বর্মণের এবং অসীমা ভট্টাচার্যের 'বাঘবন্দি খেলা' ছবিতে। পীযূষ বসু পরিচালিত এই ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। গান লিখেছিলাম আমি। এই ছবির দুটি গানই সুপারহিট হয়েছিল। একটি ছিল হেমন্তদার গাওয়া, 'আয় আয় আসমানী কবুতর', অন্য গানটি মান্নাদার গাওয়া, 'টুকরো হাসির তোল ফোয়ারা'। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এরপর দীপঙ্কর যতদূর স্মরণে আসছে আর কোনও ছায়াছবিতে সুযোগ পাননি। কেন পাননি তার উত্তর ওপরওয়ালারাই জানেন।

আবার আমার শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের নাম মনে আসছে। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখতেন অসীমা ভট্টাচার্য। শৈলেনের বাড়িতেই এঁদের সঙ্গে আমার আলাপ। একদিন এঁদের যোধপুর পার্কের বাড়িতে কথা প্রসঙ্গে অসীমার আগের স্বামী দিলীপবাবু আমায় বললেন, শৈলেনবাবুর সুরে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বারে বারে কে যেন ডাকে আমারে', ইলা বসুর 'কত রাজপথ জনপথ', আপনার লেখা আলপনা মুখোপাধ্যায়ের (বন্দ্যোপাধায়) 'যদি তোমার জীবনে সাথী না হয়ে' গায়ত্রী বসুর 'আজ মালঞ্চে মৌসুমী হাওয়া লাগল', প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তোমার দীপের আলোতে নয়', শৈলেনবাবুরই গাওয়া 'কি তুমি দেখ বল আমার চোখে'—এমন অজস্র ভাল ভাল গান আছে। অথচ ফিল্মে ওঁর কোনও সুর নেই কেন? সম্ভবত অসীমা দেবী উত্তর করলেন, কোনও ছবিতে চান্স পাননি তাই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ দিলীপবাবু বলেছিলেন, আমি যদি ছবি করি আর আমিই যদি শৈলেনবাবুকে চান্স দিই? এইভাবেই তনুজা অভিনীত 'দোলনা' ছবির সূচনা। যে ছবিতে, আমার লেখা লতা মুঙ্গেশকরের গাওয়া 'আমার কথা শিশির ধোয়া...' গানটিতে অপূর্ব সুর করেছিল শৈলেন। তারপর দিলীপবাবুর যোগাযোগে, আরও কিছু ছবিতে সুর করেছিল শৈলেন। ঠিক কী কারণে জানি না পরের ছবি 'চৌরঙ্গী' থেকে সরে এলেন শৈলেন। অসীমা ভট্টাচার্য নিজেই হলেন সুরকার। 'চৌরঙ্গী' ছবি আগে পরিচালনা

করার কথা ছিল অগ্রগামী গোষ্ঠীর সরোজ দে'র। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন উত্তমকুমার। সমস্ত শিল্পী নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ সরোজবাবুর সঙ্গে অনিবার্য কারণে বনিবনা হল না দিলীপবাবুর। উত্তমকুমারের মধ্যস্থতায় সে ছবি ছেড়ে দিলেন অগ্রগামী। এবার পরিচালক হয়ে এলেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়।

এই ঘটনার পর ওই ছবির অন্তরঙ্গ কার মুখে যেন শুনেছিলাম, বাংলা সিনেমা আর্টিস্টদের তুমি চেনো না। জেনে রেখো, উত্তমকুমার অবশ্য থাকছেনই কিন্তু উত্তম ছাড়া অগ্রগামী নির্বাচিত অন্য কোনও শিল্পী পানুদার এই ছবিতে অভিনয় করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। অন্য শিল্পীদের নিয়ে 'চৌরঙ্গী'-র কাজ করতে হবে পানুদাকে।

৫৬

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একমাত্র মাধবী মুখোপাধ্যায় ছাড়া, সব শিল্পীই অগ্রগামী অর্থাৎ কালোদাকে, কোনও না কোনও অজুহাত দেখিয়ে এবং ভদ্রতা বজায় রেখে অনুমতি নিয়েই পানুদার ছবিতে হাসিমুখে কাজ করলেন। যাই হোক 'চৌরঙ্গী' ছবিতে চমৎকার সুর করেছিলেন অসীমা ভট্টাচার্য। হেমন্তদার গাওয়া 'কাছে রবে/জানি কোনও দিনই হবে না সুদূর' এবং মান্নাদার গাওয়া 'বড় একা লাগে এই আঁধারে' দু'টি গানই খুব জনপ্রিয় গান। পরে অসীমাদেবী করলেন 'মেমসাহেব'। এর গান কিন্তু তেমন জমল না। তারপর অনেক ছবিতে সুর করলেন অসীমাদেবী। প্রথমেই মনে আসছে 'শুভরজনী' ছবিতে আমার লেখা মান্না দে-র গাওয়া 'ঈশ্বর বললেন......' গানটির কথা। এ ছাড়া আর যে সব ছবিতে ওঁর গান লিখেছিলাম তার মধ্যে 'ফুলশয্যা' ছবির গান আমার খুবই প্রিয়। বিশেষ করে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিণ্টু ভট্টাচার্যের গাওয়া 'সাত সাতশো মেয়ে দেখে একে এনেছি ঘরে' এবং দীনেন গুপ্তের 'আজকের নায়ক' ছবির গানগুলির মধ্যে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'যদি আমার এ-মন আমি না হারাতাম'। এই ছবিতেই সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম অভিনয়। এরপরেই দিলীপ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় এবং অভিনেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন অসীমাদেবী। সেই সময় উনি যোগ দিলেন কলকাতার বেতারে। স্বভাবতই গানের অন্য বাণিজ্যিক জগৎটায় উনি আর বেশি সময় দিতে পারলেন না। তবু মনে আছে ওঁর পরের কিছু কিছু ছবিতে আমি গান লিখেছিলাম। আধুনিক গানে ওঁর স্মরণীয় সৃষ্টি আমার লেখা মান্নাদার গাওয়া 'দুঃখ আমার তোমায় যে আমি ভালবেসেছি' এবং 'গোলাপে কাঁটা বলে'।

এই অসীমাদেবীর চমৎকার সুরেই হেমন্তদার আধুনিক গানের প্রথম এল পি রেকর্ডে আমি লিখেছিলাম আমার একটি অতি প্রিয় রচনা 'যখন জমেছে মেঘ আকাশে'। বেতারে মাসের গানে এবং রম্যগীতিতে উনিই প্রথম মান্না দেকে দিয়ে গান গাইয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত সেই গানগুলির গীতিকার ছিলাম আমি।

গায়িকা অসীমাদেবী আমার লেখা অনেক গান গেয়েছেন। তবুও বলতে দুঃখ লাগছে, অজ্ঞাত কারণে অসময়েই নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন উনি। ওঁর পূর্ণ প্রত্যাবর্তন কামনা করছি।

জয়ন্ত বসু পরিচালিত 'পুনর্মিলন' ছবিতে আমার লেখা একটি গান ছিল। কানু ভট্টাচার্যের সুরে গানটি গেয়েছিলেন অনুপ জলোটা। গানটি হচ্ছে 'কার ভাগ্যে কী আছে তা/কে বলিতে পারে'? এ সব কথা মনে পড়লেই আমার কানে এই গানটি বাজতে থাকে।

এবার একেবারে অন্য প্রসঙ্গে আসি। হঠাৎ শুনতে পেলাম মুনমুন সেনের রাগী কণ্ঠস্বর। তাপস পালকে বলছে মুনমুন 'কলেজ যাচ্ছি। হাতে বই খাতা। তাতেও নিস্তার নেই? ভগবান না হয় একটু সুন্দরী করেই আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তা বলে কি সবাইকে পাগল হয়ে যেতে হবে নাকি?'

ও কথায় কর্ণপাত না করে তাপস পাল হিন্দির 'শ্বশুরাল' ছবির 'তেরি প্যায়ারে প্যায়ারে সুরত কো'-র সুরের ওপর বাংলা গান গেয়ে উঠল 'তোমার পাগল করা ওই রূপেতে/নজর না কারও লাগে/টিপ কপালে দাও'।

গানটি শুনে স্বভাবতই মুনমুন প্রচণ্ড উষ্মায় ফেটে পড়ল, 'ইউ নটি'। তাপস ম্যানেজ মাস্টার।

মুনমুনকে ঠাণ্ডা করতে বলল, 'আহা হা। রাগ করবেন না। এটা আমার হবি, অন্তাক্ষরি খেলার একটা লেটেস্ট অ্যাপ্রোচ।'

মুহূর্তে মুনমুন গলে জল। সেও অবাক হয়ে বলল, ইজ ইট? এটা তো আমারও হবি। বেশ, এখনই অন্তাক্ষরি খেলা শুরু হোক। আপনি তো শুরু করেছেন 'টিপ কপালে দাও' দিয়ে। অর্থাৎ আমাকে ও দিয়ে শুরু করতে হবে এই তো। মুনমুন গাইল হিন্দি 'জিস দেশমে গঙ্গা বহতি হ্যায়' ছবির 'ও বসন্তী পবন পাগল'-এর সুরে বাংলা গান 'এ বসন্তের পবন পাগল।'

এভাবেই বিভিন্ন গানের আদান প্রদানে জমে উঠল ওদের খেলা। এই অন্তাক্ষরি খেলতে খেলতে খেলার শেষ দিকে মুনমুন তাপস একসময় বুঝল আজকের এই খেলায় কেউ হারেনি কেউ জেতেনি। কী করে যেন ওরা দুজনে একাকার হয়ে গেছে। তাই ক্লাইমেক্সটা শেষ করল হিন্দি ছবি 'চলতি কা নাম গাড়ি'-র দ্বৈতগীতি 'হাল ক্যায়সা হ্যায় জনাব কা'-র সুরের ওপর বাংলায় দ্বৈতগীতি গেয়ে 'মিলে গেল যদি মনটা'।

এইচ. এম. ভি. ক্যাসেটে আমার রচনা ও পরিচালনায় সে বার পুজোয় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অভিনব একটা ব্যাপার করেছিলাম তা হল এই অন্তাক্ষরি গীতিনাট্য। যার নাম দিয়েছিলাম 'খেলতে খেলতে'। এইচ. এম. ভি. কর্তৃপক্ষ আমায় অনুরোধ করেছিলেন হিন্দির বাংলা ভার্সান গান দিয়ে একটা অন্তাক্ষরি ক্যাসেট বানাতে। তখন দু-একটা হিন্দি ছবিতে অন্তাক্ষরি খুবই হিট হয়েছিল । এমনকী তরুণ মজুমদারের 'সজনী গো সজনী' ছবিতেও এই ধরনের একটি অন্তাক্ষরি গানের আসর আমাকে বানাতে হয়েছিল। বুঝলাম, ওদের অনুপ্রেরণার কারণ এইটাই। আমি বললাম, ক্যাসেটে অন্তাক্ষরি করে কী হবে? একজন জিতবে একজন হেরে যাবে এই তো? প্রথমবার শুনলে শ্রোতারা হয়তো মজা পাবেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার শোনার আকর্ষণ আর থাকবে কেন? ওঁরা জেনেই যাবেন কে জিতবে কে হারবে। তার থেকে একটা গীতিনাট্য বানাই যার মধ্যে একটা গল্প থাকবে।

ওঁরা আমার প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ সানন্দে অনুমোদন করলেন। লেখা শোনানোর পর বললাম 'খেলতে খেলতে' গীতিনাট্যের নায়ক-নায়িকা হোক তাপস পাল আর মুনমুন সেন। ওঁরা রাজি হলেন।

আমি বললাম গায়ক গায়িকা কিন্তু আমার চাই কুমার শানু আর অলকা ইয়াগনিক।

ওঁরা বললেন, শানু তো এইচ. এম. ভি-তে আপনার লেখা পুজোর গান করছেনই, অন্য শিল্পী নিন।

এই মুহূর্তে সঠিক মনে পড়ছে না, সেই বছর শানু অরূপ-প্রণয়ের সুরে আমার লেখা ক্যাসেট 'সুরের রজনীগন্ধা' করেছিল? না কি করেছিল আমার লেখা 'প্রিয়তমা মনে রেখ'? কিন্তু গায়ক গায়িকা নির্বাচনের ভারটা ওঁদের ওপর ছেড়ে দিতেই ওঁরা যাঁদের নাম বললেন তা আমার পছন্দ হল না। তখন গভীর আত্মবিশ্বাসে বলেছিলাম, যদি শানু অলকা না পাই তা হলে নেব নাম না করা নতুন শিল্পী। এরই ফলে বাবুল সুপ্রিয় ও কেয়া আচারিয়ার এইচ. এম. ভি. ক্যাসেট ঘটল প্রথম আত্মপ্রকাশ। আমার এই 'খেলতে খেলতে' অন্তাক্ষরি গীতিনাট্যের সব গানগুলো গেয়েছিল ওরা দুজনে। যতদূর জানি বাবুলের পিতামহ ছিলেন আগের যুগের একজন গীতিকার এবং সুরকার। নাম সম্ভবত নির্মলকুমার বড়াল। মূলত আমারই অনুপ্রেরণাতে নামী ব্যাঙ্কের দামি চাকরি ছেড়ে মুম্বই-তে স্ট্রাগল করতে শুরু করল। বলতে দ্বিধা নেই, ও নামী হয়েছে কিন্তু গানের আইডেনটিটি এখনও আসেনি। আমি সাগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছি।

তবে একদিন বাবুল আমায় মারাত্মক একটা কথা বলেছিল। সেটাই সম্ভবত ওর এখনও লাইম লাইটে না আসার কারণ। আমায় দুঃখ করে ও জানাল, আপনি আমায় বার বার বলছেন এক বিখ্যাত গায়কের কপি কণ্ঠ না হতে। আমি তো প্রাণপণে ওই অক্টোপাসের হাত থেকে মুক্তি চাইছি। কিন্তু সুরকারেরা আমায় মুক্তি দিচ্ছেন কই? ওই শিল্পীর সঙ্গে যখন নাদিম শ্রাবণের মনোমালিন্য হয়েছিল ওঁরা আমায় দিয়ে গান গাওয়াচ্ছিলেন। যে গানটাই আমি নিজস্বভাবে গাইতে গেছি, ওঁরা বলেছেন—না। তোমাকে ওরই কপি কণ্ঠ হয়ে গাইতে হবে। প্রযোজকরা তোমায় নিতে রাজি হয়েছেন, তুমি হুবহু ওই কণ্ঠের ধ্বনিটা আনতে পার বলেই। যদি তা না পার তোমার গান থাকবে না। অন্য শিল্পী ডাব করে দেবে। নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে এবং অত বড় সুরকারদের না চটাতে বাধ্য হয়ে আমাকে ওই শিল্পীর অনুকরণ করতে হয়েছে। বলুন তো এতে আমার কী অপরাধ?

বাবুলের ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা বলি। বাবুল যখন আমার অনুপ্রেরণায় ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে মুম্বই-তে স্ট্রাগল করবে মনস্থ করল, তখন বাবুলের পিতৃদেব ওই ব্যাঙ্কেরই বড় অফিসার। একদিন আমার বাড়ি এলেন, অনুযোগ করলেন—আমিই নাকি ওর মাথা খাচ্ছি। আমি শুধু বলেছিলাম—মাথা ঠাণ্ডা করে অপেক্ষা করুন। সেবার বাবুলের মুম্বই-এর বিলাসবহুল লখনওয়ালার ফ্ল্যাটে দেখি উনি রয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, ছুটিতে বেড়াতে? উত্তর দিলে বাবুল, না, না। বাবাতো ব্যাঙ্ক থেকে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন। প্রায়ই মুম্বই আসেন। বললাম, কী মশাই, আমি আপনার ছেলের মাথা খেয়েছি তো? ভদ্রলোক উত্তরের কথা খুঁজে পেলেন না। শুধু হাসলেন।

কেয়া আচারিয়ার কাহিনী একটু ভিন্ন। ও মুম্বই-তে বেশ কিছুদিন স্ট্রাগল করল। বাপি লাহিড়ি, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা সুরকারের সুরে প্লে-ব্যাক করল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হিট হল না সে সব গান। ইতিমধ্যে ও বিয়ে করল। সন্তানের জননী হল। সংসারের টানেই ফিরে আসতে হল কলকাতায়। বাবুল বোস, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপম দত্ত চন্দন রায়চৌধুরী প্রমুখ সুরকারের বিভিন্ন হিন্দি বাংলা ওড়িশি ছবিতে এখন নিয়মিত গান গেয়ে চলেছে কেয়া। কিন্তু বাবুলের মতো কেয়ারও এখনও সে সাফল্য আসেনি। আমি কেয়ার শুভদিনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছি।

আগেকার লোকেদের কাছে গল্প শুনেছি, মফস্বল শহরে বা শহর থেকে কিছু দূরে যেখানে তখনকার জমিদার বা ওই শ্রেণীর বর্ধিষ্ণু উচ্চবিত্ত মানুষরা থাকতেন, তাঁদের চোঙাওয়ালা কলের গানের রেকর্ড জোগান দিতেন শহরের রেকর্ড ডিলাররা তাদের লোক মারফত। এই ফেরিওয়ালার চাকরি পেতে গেলে তার প্রধান গুণ হবে, তাকে অবশ্যই গাইয়ে হতে হবে। দ্বিতীয় গুণ, তার চেহারাও ভাল হওয়া চাই। মনে করুন ঢাকা জেলার এক জমিদার বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলেন একজন রেকর্ডের ফেরিওয়ালা। যার সঙ্গে রয়েছে এক মালবাহক। যার কাঁধের শক্ত বাঁশের বাঁকের দুধারে ঝোলানো রয়েছে বেশ কয়েক বাক্স গ্রামাফোন রেকর্ড। কলের গানের ফেরিওয়ালা এসেছে খবর পেয়ে, যে ঘরে জমিদারবাবু বসবেন সেই ঘরেরই চিকের আড়ালে আশপাশের বারান্দায় এসে জমায়েত হবেন সেই বাড়ির পর্দানশীন মেয়ে বউরা।

ফেরিওয়ালাকে প্রশ্ন করা হবে কী গান এনেছ?

ফেরিওয়ালা সবিনয়ে বলবেন, বাবুমশাই, ঠাকুর দেবতার গান। ভাটিয়ালি গান। আর অন্য গানও আছে। আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনটিই পাবেন।

বাবুমশাই আরামকেদারায় টানা পাখার বাতাস খেতে খেতে বলবেন, বেশ তো, প্রথমেই শোনাও ঠাকুর দেবতার গান।

আপনারা ভাবছেন রেকর্ডের ফেরিওয়ালা নিশ্চয় তখন বাবুমশাইয়ের চোঙাওয়ালা কলের গানে ঠাকুর দেবতার গান বাজিয়ে শোনাবেন। তা কিন্তু নয়। ফেরিওয়ালা তখন স্বকণ্ঠে গেয়ে শোনাবেন ওই নতুন গানের রেকর্ডের খানিকটা।

বাবুমশাই বলবেন, আরও একটা শোনাও। ফেরিওয়ালা গেয়ে শোনাবেন আরও একটা গান। এ এইভাবে শুনতে শুনতে যে গানগুলো বাবুমশাইয়ের পছন্দ হবে, সেই রেকর্ডগুলো বাক্স থেকে বার করে বাবুমশাইয়ের চরণে রেখে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াবেন রেকর্ডের ফেরিওয়ালা।

এ বার বাবুমশাই-এর প্রধান মোসাহেব বা তাঁর প্রধান খিদ্‌মতগার খুশিমতো রেকর্ডগুলোর কিছু কিছু অংশ ওই কলের গানে বাজাবেন। তরপর জমিদারের উদ্দেশে বলবেন, সত্যি আপনার কান আছে। যে সব গান কিনলেন সে সব গান এই জেলায় আর কারও ঘরে নেই। কথাটা বলেই রেকর্ডের ফেরিওয়ালার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মোসাহেব বলবেন, এই, আর কাউকে এই রেকর্ডের গানগুলো বেচবি না। খবর পেলে লাঠিয়াল লাগিয়ে দেব। ফেরিওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে কান ধরে জিভ কেটে বলবেন, কী যে বলেন বাবু। গান তো কলকাতা থেকে একটা করেই এসেছিল। আপনাদের কৃপাদৃষ্টি

পেল। তাই এগুলো এখানেই রয়ে গেল। আর কোথায় পাব যে এই জেলায় ফেরি করব?

এ বার বাবুমশাই বলে বসবেন, যাও নায়েবের কাছ থেকে পাওনা গণ্ডা বুঝে নাও।

এ বার তাঁর খাস চাকরকে বলবেন, এই, নায়েবকে বলে দে তো একে বিদায় দিতে।

আবার এক দফা প্রণাম করে চলে যাবেন রেকর্ডের ফেরিওয়ালা। যাবার আগে ফাউ হিসাবে প্রণামী দিয়ে যাবেন একটা ছোট অর্থাৎ পরবর্তীকালে ই পি রেকর্ডের মাপের ওই গালারই একটা রেকর্ড। যে রেকর্ড তখন খুব অল্প দামে বিক্রি হত।

এই রকম রেকর্ডের ফেরিওয়ালারা তখন ভারতবর্ষের সর্বত্র ছিল। প্রথম জীবনে নাকি এমন কাজই করতেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত গায়ক তালাত মামুদ। এইচ. এম. ভি-র তখনকার এক অধিকর্তা পি কে সেন স্বয়ং তাঁর পার্ক সার্কাসের বাড়িতে সন্ধ্যার মজলিসে গল্প করতে করতে এই ঘটনা শুনিয়েছিলেন পি কে সেন স্বয়ং। উনি ইউ পি-র এইচ. এম. ভি-র এক নামী দোকানে দেখা পান সুপুরুষ তরুণ তালাত মামুদের। ডিলারই ওঁকে বলেন তালাতের গান শুনতে। ওই দোকানে বসেই তালাতের অপূর্ব কণ্ঠের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে পি কে সেন এইচ. এম. ভি.-তে গান রেকর্ড করার সুযোগ দেন। ওখানে রেকর্ডিং-এর সুফল দেখে পি কে সেন, তালাতকে তখনকার কলকাতার এইচ. এম ভি.-তে রেকর্ড করতে কলকাতার অধিকর্তা ইউরোপিয়ান মালিক গোষ্ঠীর কাছে পাঠান।

তখন সারা ভারতবর্ষে এইচ. এম. ভি-র সব কিছু বড় কাজই কলকাতা থেকে হত। এইচ. এম. ভি-র নিজের স্টুডিয়ো, নিজের মিউজিশিয়ান এবং সব থেকে বড় ব্যাপার এইচ. এম. ভি-র রেকর্ড প্রিন্টিং মেশিনটা ছিল দমদমে অর্থাৎ কলকাতাতেই। শুধু ভারতবর্ষেই নয় এইচ. এম. ভি-তে রেকর্ড প্রিন্ট করতে অর্ডার আসত এশিয়ার নানা জায়গা থেকে।

তালাত মামুদের গান শুনে মুগ্ধ হলেন কমল দাশগুপ্ত। ওঁকে দিয়ে বাংলা গাওয়ানো মনস্থ করলেন। কিন্তু তখনকার এইচ. এম. ভি. আশঙ্কা করলেন, তালাত মামুদের নাম থাকলে যদি রেকর্ড বাংলাতে না চলে। তাই তালাতের নতুন নাম রাখা হল তপনকুমার। সম্ভবত এই কারণেই একদা বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ কাশেম, শ্যামাসংগীত এবং ভক্তিমূলক গান রেকর্ড কবার সময় নাম বদলে হয়েছিলেন কে মল্লিক। যতদূর আমার স্মরণে আসছে কে মল্লিকের পর শ্যামাসংগীতের গানের আসরে অবতীর্ণ হন মৃণালকান্তি ঘোষ। উনি অনেক বাংলা ছায়াছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন, আবার গানও গেয়েছিলেন। ওঁর গাওয়া একটি গান আমাদের ছোটবেলায় সর্বত্র শুনতাম 'বল রে জবা বল/কোন সাধনায় পেলিরে তুই মায়ের চরণ তল'? যাই হোক কমল দাশগুপ্তের সুরে পর পর হিট হল তপনকুমারের বাংলা গান। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য গিরিন চক্রবর্তীর কথায় 'দুটি পাখি দু'টি তীরে/মাঝে নদী বহে ধীরে' এবং প্রণব রায়ের কথায় 'ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে'।

আগেই বলেছি তখনকার ছায়াচিত্রে প্রবেশ করার একটা বিরাট গুণ ছিল নায়কের

গান জানা। তালাত মামুদ ছিলেন সুদর্শন। তাই সহজেই কলকাতার নিউ থিয়েটার্সে মাস মাহিনাতে চুক্তিবদ্ধ শিল্পী হয়ে গেলেন। মনে অনেক আশা নিয়ে নিয়মিত স্টুডিয়োতে যান। শুটিং দেখেন। বহু লোকের সঙ্গে আলাপ করেন। কিন্তু তখনকার নিউ থিয়েটার্সে কোনও পরিচালকই ওঁকে কোনওদিন কোনও ছবিতে একদিনেরও কাজ দেন না। রোজ আসেন এবং সন্ধ্যার পর চলে যান। এই সব কথা তালাত অনেক পরে হাসতে হাসতে আমাকে শুনিয়ে ছিলেন।

সুদীর্ঘদিন নিউ থিয়েটার্সে চাকরি করেও একটা ছবিরও প্লে-ব্যাক ওখান থেকে পাননি। এদিকে বাংলা গানের জগতে ওঁর নাম দিন দিন বাড়তে থাকে। সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় এই তালাত মামুদকে ছবিতে কাজে লাগিয়েছিলেন ওঁর সুরে 'সাত নম্বর বাড়ি' ছবিতে। সুপারহিট সেই গানটি প্রণব রায়েরই লেখা 'কথা নয় আজি রাতে'।

তখনকার নিউ থিয়েটার্সে 'কাশীনাথ' ছবির নায়িকার নাম ছিল সম্ভবত লতিকা চট্টোপাধ্যায়। এই লতিকা দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয় তালাত মামুদের। তারপর উনি চলে যান মুম্বই-তে। ওখানে প্রচুর ছবিতে প্লে-ব্যাক করেন। রবীন্দ্রনাথের 'একদা তুমি প্রিয়ে'— গানের সুরের ছায়ায় গড়ে ওঠা শচীন দেববর্মণের সুরে বিমল রায়ের ছবির সেই বিখ্যাত গান 'জ্বলতে হ্যায় জিসকা লিয়ে' আজও অনেকের স্মরণে আছে।

মুম্বই-তে কিছু হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেন তালাত। কিন্তু ওঁর গান লোকে যেভাবে গ্রহণ করেছিল, ওঁর অভিনয় সেভাবে গ্রহণ করেনি। এদিকটাতে অসফল হন তালাত মামুদ।

মুম্বই-তে থাকলেও তালাত কিন্তু বাংলা গান ছাড়েননি। ভি. বালসারার সুরে শ্যামল গুপ্তের লেখা 'তুমি সুন্দর নাই যদি হও' এবং 'যেথা রামধনু ওঠে হেসে' গান দুটো আজও সবাই শোনেন। এই তালাতের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আত্মীয় রঞ্জিত সিংহ। রঞ্জিতের মাধ্যমেই তালাতের সঙ্গে আমাদের আলাপ।

এবার শোনাই, তালাতের গান নিয়ে আমার জীবনের এক অদ্ভুত ঘটনা। একবার পুজোতে ঠিক হল, আমি মুম্বইয়ের মান্না দে এবং তালাত দুজনেরই গান লিখব। মান্না দে নিজের সুরে গাইবেন। আর তালাত গাইবেন কানু ঘোষের সুরে।

সেইমতো আমি আমার গানের খাতা থেকে বাছাই করে দুটো দুটো চারটে গান পোস্টে মান্না দে এবং কানু ঘোষকে পাঠিয়ে দিলাম।

পুজো রেকর্ডিং-এর কিছুদিন আগেই, অন্য কী একটা ছবির কাজে আমাকে মুম্বই যেতে হল। গিয়েই দেখা করলাম মান্না দে'র সঙ্গে। উনি বললেন, আমার গান গত পরশু দিন রেকর্ডিং হয়ে গেছে। শুনুন না কেমন হয়েছে।

কথাটা বলেই উনি যেন কাকে টেলিফোনে এখনই আসতে বললেন। তারপর যথারীতি মুডি মান্নাদা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে শোনালেন, আমার লেখা গান দুটি 'আমার না যদি থাকে সুর' এবং 'জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই'। গান শেষ হওয়ার পরেই সেখানে এলেন সুরকার কানু ঘোষ। আমাকে দেখতে পেয়েই হাসি মুখে বলে উঠলেন, আপনি কী রকম ভুলো লোক মশাই। আপনাকে আজই কলকাতায় ফোন

করতাম।

কথাটা শুনেই খুবই ঘাবড়ে গেলাম। উত্তর দেওয়ার আগেই মান্নাদা বললেন, ভাগ্যিস তালাতের গান রেকর্ড হওয়ার আগেই কানুবাবু আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তা না হলে একটা কাণ্ড ঘটে যেত। এবার প্রশ্ন করলাম, কী হল বলুন না খুলে। মান্নাদাই হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, কানুবাবু একদিন আমার বাড়িতে এসে বললেন, মান্নাবাবু, পুজোর কী গান বানিয়েছেন শোনান। খুব মনযোগ দিয়ে গান শুনে কানুবাবু বললেন, দারুণ সুর করেছেন মান্নাবাবু। 'জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই' গানটা চমৎকার সুর। আমার সুরের থেকে অনেক ভাল। পুলকবাবু একই গান দুজনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কানুবাবুর কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম। বললাম, তাই নাকি? সত্যিই তাই। ভাগ্যিস তালাতের গান রেকর্ড হয়ে যায়নি। না হলে মুশকিলে পড়তাম। একই গান দুরকম সুরে তো আর প্রকাশিত হতে পারত না। আমার সৌভাগ্য যে সেদিন মান্নাদার বাড়িতে কানুবাবু এসে পড়েছিলেন।

আমি অসহায়ভাবে বললাম, এরকম ঘটনা আমার জীবনে আগে কখনও ঘটেনি। আশা করি আর ঘটবেও না। কিন্তু এখন কী করা উচিত?

মান্না দে বললেন, আব একটা গান লিখে দিন তালাতের জন্য। তা হলেই সমস্যা মিটে যাবে।

কানুবাবু বললেন, একটা পিঠ তো ঠিকই আছে। শুধু অন্য পিঠটা বদলে দিন।

আমি ওখানে বসেই লিখলাম 'বউ কথা কও গায় যে পাখি'। গানটা লেখা শেষ হতেই এক গ্লাস জল খেয়ে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

এর তিন-চার দিন পরেই পুজোর জন্য গান দুটি রেকর্ড করেছিলেন তালাত।

এর বেশ কিছু বছর পরে আবার এক পুজোয় কানু ঘোষ, আমি আর তালাত মামুদ মিলিত হয়েছিলাম। সেবার দুটি গান লিখেছিলাম তালাতের জন্য। তার একটি গানের লাইনে ছিল 'তুমি এসো ফিরে এসো/যদি আসে ছেলে বেলা'।

না। সেই হারানো ছেলেবেলা আর এ জীবনে ফিরে আসেনি। সেটা বুঝতে পেরেই হয়তো এর কিছুকাল পরেই, তালাত গানের জগৎ থেকে সসম্মানে অবসর নিয়ে সুখী জীবনযাপন করেছেন।

সেদিন আজকের তালাতের একটি উক্তি শুনলাম। আজকের হিন্দি গান কেমন হচ্ছে সে সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে বলেছেন, আজকের গান হচ্ছে ফার্স্ট ফুড। ফার্স্ট ফুডের দোকান তো আগে এ দেশে ছিল না। তেমনি এই ফার্স্ট ফুডের গানও আগে ছিল না। এ দেশে নতুন আবির্ভাব হয়েছে।

একটু আগেই উল্লেখ করেছি, তালাত মামুদ যেমন তপনকুমার হয়েছিলেন তেমনি মহম্মদ কাশেম রেকর্ডে নাম বদলে হয়েছিলেন কে মল্লিক। আবার আমার মনে পড়ছে অনেক বাঙালি শিল্পীও হিন্দি উর্দু রেকর্ড করার সময় নাম বদলেছিলেন। জগন্ময় মিত্র হলেন জগমোহন, গায়িকা হরিমতী হলেন রাবেয়া খাতুন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হলেন হেমনত্‌কুমার।

শুনেছি কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্তও গজল, গীত ও বিশেষ করে যখন কাওয়ালি

গান গাইতেন তখন নাম নিতেন চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ। এই প্রসঙ্গে মনে আসছে এই কাওয়ালি গানের সুরের স্টাইলেই কমল দাশগুপ্ত সৃষ্টি করেছিলেন কানন দেবীর সুপার হিট বাংলা গান 'আমি বনফুল গো'।

একই কণ্ঠশিল্পীর অন্য নামে রেকর্ড করার আরও নজির আছে। যেমন গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের ছদ্মনামে রেকর্ড আছে। হিন্দি সিনেমার গানের বাংলা ভার্সানে উনি নাম নিতেন গোলাম কাদের। সত্য চৌধুরীর রেকর্ড আছে রীতেন চৌধুরীর নামে। অপরেশ লাহিড়ির পল্লীগীতির রেকর্ড আছে ভোলা মাঝি নামে।

যখন শ্যামবাজারের নলিনী সরকার স্ট্রিটের পাশাপাশি দুটি আলাদা বাড়িতে এইচ. এম. ভি. এবং কলম্বিয়ার অফিস ছিল সেই সময় এইচ. এম. ভি বাংলা গানের দিকটা দেখাশোনা করতেন নিমেষ ঘোষ। সেই সময় আমার এইচ. এম. ভি-র রেকডিং এবং স্টুডিয়ো দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা হয়। তখন আমি স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। একদিন কোনও কারণে তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ছুটির পর আমি চলে গিয়েছিলাম, আমার ভগ্নিপতি প্রযোজক পরিচালক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের ধর্মতলা স্ট্রিটের অফিসে। ওখানেই আলাপ হয়েছিল নিমেষ ঘোষের সঙ্গে। এই নিমেষ ঘোষই পরবর্তীকালে উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত 'হার মানা হার' ছবির অন্যতম প্রযোজক হয়েছিলেন। আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন ছবির গান।

নিমেষবাবু ছিলেন তখনকার নামী প্রযোজক এবং পরিবেশক প্রতিষ্ঠান, অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের কর্তা নরেশ ঘোষের ছোট ভাই। এঁরা 'বন্দিতা', 'ভাবীকাল' ইত্যাদি বহু জনপ্রিয় ছবি করেছিলেন। নীরেন লাহিড়ি পরিচালিত 'ভাবীকাল' ছবির সুরকার ছিলেন বিখ্যাত কমল দাশগুপ্ত। অথচ ছবিতে একটাও গান ছিল না। এটা একটা বিরাট রেকর্ড।

যাই হোক, তখন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত সরোজদার ছবি 'মনে ছিল আশা'-র কমপ্লিমেনটারি গ্রামাফোন রেকর্ড আনতে গিয়েছিলাম নলিনী সরকার স্ট্রিটে এইচ. এম. ভি-র রিহার্সাল রুমে। ওখানেই দেখেছিলাম জগন্ময় মিত্র এবং সুরকার সুবল দাশগুপ্তকে। নিমেষবাবুকে অনুরোধ করলাম, একদিন ভাল শিল্পীর রেকর্ডিং দেখাবেন?

উনি বললেন, বেশ তো। অমুক তারিখে দমদমে আসুন। জগন্ময় মিত্রের রেকর্ডিং আছে। আমি আর আমার স্কুলজীবনে সংগীতে উৎসাহদাতা বন্ধু শৈলেন চট্টোপাধ্যায় দুজনে হাজির হলাম এইচ. এম. ভি.-র দমদমের স্টুডিয়োতে। এখন ফ্যাক্টরির যে অনেক উঁচু চিমনিটাকে উজ্জ্বল রং লাগিয়ে অতীত দিনের সাক্ষী একটি স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তখন সেটা দিয়ে অনবরত কালো ধোঁয়া বার হত। তখন রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে প্রধান গেট দিয়ে ঢুকতে হত না। যেতে হত পাঁচিলের পাশের গেটের রাস্তা দিয়ে।

আমাদের সালকিয়ার বসত বাড়ি 'সালকিয়া হাউস' যা দেখে আমি লিখেছিলাম 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার', আমিও কিন্তু ওই খিড়কির দরজা দিয়ে জীবনে প্রথম প্রবেশ করি রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে। তখন গালা দিয়ে রেকর্ড তৈরির যুগ। ক্যাসেট ফ্যাসেট তখন আসেইনি। যতদূর স্মরণে আসছে সম্ভবত তখনও একটা মাইকে রেকর্ডিং হত।

রেকর্ডিং-এর যে হলঘরটা ছিল তার দু দিকে দুটো কাচের জানালা। একটি জানালা এইচ. এম. ভি.-র অন্যটি কলম্বিয়ার। যে দিন এইচ. এম. ভি.-র শিল্পীরা ওখানে গান করবেন সেদিন এদিকের জানলাটা খোলা হবে। আবার কলম্বিয়ার রেকর্ডিং হলে উল্টো দিকের জানালাটা খুলে যাবে।

জগন্ময় মিত্রের সেদিনের গান দুটির সুরকার ছিলেন দুর্গা সেন। দুর্গা সেনের সুর আমার ভাল লাগত। নিমেষবাবু আলাপ করিয়ে দিতেই তাই ওঁকে সেদিন প্রণাম করেছিলাম। পরবর্তীকালে আমার ওঁর সুরে সবথেকে প্রিয় গান, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'ওরে ও বিজন রাতের পাখি।' জগন্ময় মিত্রকে দেখেছিলাম রিমলেস চশমা আর গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিতে। অপূর্ব গাইলেন জগন্ময় মিত্র।

পরবর্তীকালে দুর্গাদার সুরে আমি কিছু গান লিখেছিলাম। আমার 'আমার প্রিয় গান' নামের বাছাই করা গানের সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, জগন্ময় মিত্রের গাওয়া কোনও গান নেই কেন? সেটাই আমার দুর্ভাগ্য। এর প্রধান কারণ, আমি যখন বাংলা গান লিখতে শুরু করেছি তখন জগন্ময় মিত্র বাংলা গান গাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন মুম্বই-তে। একবার অবশ্য কলকাতা বেতারে 'রম্যগীতি'তে আর 'এ মাসের গান' পর্যায়ে নিখিল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ওঁর জন্য কিছু গান আমি লিখেছিলাম। আর কোনও গান লিখিনি। জানি না এ জীবনে আর কখনও আমাদের যোগাযোগ হবে কি না।

ওখানেই দেখলাম এইচ. এম. ভি.-র অর্কেস্ট্রার কর্ণধার অস্ট্রেলিয়ান নিউম্যান সাহেবকে। ওখানে দেখেছিলাম বংশীবাদক কমল মিত্রকে। আর ভারতবর্ষের প্রথম সারির স্যাক্সোফোন ও ইংলিশ-ফ্লুট প্লেয়ার সদ্য কলকাতায় আসা মনোহারিকে। এই মনোহারি যিনি পরবর্তীকালে এস ডি বর্মণ ও আর ডি বর্মণের সঙ্গে কাজ করে তোলপাড় করে দিয়েছিলেন ভারতীয় সংগীতের বাণিজ্যিক বাজার। যতদূর জানি ওই মনোহারিকে নেপাল থেকে নিয়ে এসেছিলেন ওই নিউম্যান সাহেব।

৫৮

এইচ. এম. ভি.-র পুরনো দিনের স্টুডিয়োর কথা বলছিলাম। পাখা চললে হাওয়ার শব্দ মাইকে গান-বাজনাকে ব্যাঘাত করে বলে পাখা বন্ধ করে রেকর্ডিং চলেছিল বহুদিন। পরে অবশ্য স্টুডিয়োর রূপান্তর হল। নতুন টেপ মেশিন এল। আস্তে আস্তে গোটাটাই ঠাণ্ডা ঘরে পরিণত হয়ে গেল। আমার এখনও মনে আছে, যে বার পুজোর গানের জন্য নচিকেতা ঘোষের সুরে আমি লিখেছিলাম 'লজ্জা/মরি মরি একি লজ্জা'। গানটি গাইছিল আরতি। আমরা দিব্যি ঠাণ্ডা ঘরে বসে আরতিকে বলছি এই করো। এই ভাবে কথাটা বলো। আর ও বেচারি দারুণ গ্রীষ্মকালে পাখা বন্ধ স্টুডিয়োতে বসে ঘামে স্নান করতে করতে গেয়ে চলেছে 'লজ্জা/ মরি মরি একি লজ্জা।'

আমি কী কাজে থিয়েটারের ভেতরে ঢুকতেই আরতি হাসতে হাসতে বলে উঠল, বেশ আছেন পুলকদা। আপনি তো লিখেই খালাস। এখন দেখুন তো গরমে আমার কী

অবস্থা। আমি দেখলাম, আরতি যেন বৃষ্টি ভেজা এক রমণী। গান লেখার আগে ভাবিনি ওর এমন অবস্থা হবে। পরের বছর ওর পুজোর গানের সময় অবশ্য এইচ. এম. ভি.-র স্টুডিয়োতে ঠাণ্ডা মেশিন বসে গেছে।

মনে আছে, প্রথম দিন এইচ. এম. ভি.-র স্টুডিয়োতে জগন্ময় মিত্রের একটা গান রেকর্ডিং শোনার পর নিমেষবাবু একজনকে নির্দেশ দিলেন, আমাদের গোটা ফ্যাক্টরিটা ঘুরিয়ে দেখাতে। ওঁর সঙ্গে ঘুরলাম। দেখলাম ওই উঁচু চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া ওঠার আসল কারণ হচ্ছে, গালার সঙ্গে অন্যান্য কেমিক্যাল দিয়ে বিশাল কয়লার আঁচে গলানো হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে শুধু নয়, এশিয়ারও অনেক দেশের গালার পিণ্ড থেকে রেকর্ডের গালার চাকতি তখন বানাতেন এইচ. এম. ভি। সেই কিশোর বয়সেই স্বচক্ষে রেকর্ড প্রিন্টিং দেখে বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। একটা মেশিনের দু-ধারে দুটো পিতল জাতীয় জিনিসের মাদার প্লেট। যাতে রেকর্ডের থ্রেড মুদ্রিত রয়েছে। একজন মাপ মতো একটা গরম এবং স্বাভাবিক কারণেই নরম গালার পিণ্ড ওই দুটি মাদার প্লেটের মাঝখানে রেখে দিচ্ছেন। দুদিকে দুটো কোম্পানির নাম, শিল্পী, সুরকার, গীতিকার প্রমুখের নাম মুদ্রিত বিশেষ কাগজের লেবেল উল্টো করে রেখে দিয়ে তারপরে মেশিনের একটা সুইচে চাপ দিচ্ছেন। দুদিকের প্লেট দুটো গ্রামোফোন রেকর্ডের উচ্চতার ব্যবধান রেখে এক হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে এসে যাচ্ছে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া। জুড়িয়ে যাচ্ছে গরম গালার চাকতি।

আবার উনি অন্য সুইচ টিপছেন। ফাঁক হয়ে গিয়ে আবার আগের স্থানে ফিরে যাচ্ছে মাদার প্লেট দুটো। তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে যাচ্ছে একটা রেডি রেকর্ড। অবশ্য রেকর্ডের মাপ থেকে বাড়তি কিছু গালা তার চারপাশে থাকছে। অন্য একজন অন্য মেশিনে ওই রেকর্ডটা রেখে তৎক্ষণাৎ সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। এবং পালিশ করে দিচ্ছে আর এক জন। আমার সামনেই এইভাবে বোধহয় দু-আড়াই মিনিটেই একটা রেকর্ড তৈরি হল। পাশে রাখা একটা গ্রামাফোনে তা বাজিয়ে শুনিয়ে দিলেন আর একজন লোক।

এ ধরনের মেশিন একটা শেডের নীচে অনেকগুলো দেখেছিলাম। এখন এইচ. এম. ভি.-তে সেই শেডও আর নেই, সেই প্রিন্টিং মেশিনও আর নেই।

সেদিন সেই সদ্য প্রসূত রেকর্ডটা নিয়ে বাড়ি ফেরবার দারুণ ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু ওঁরা অম্লানবদনে আমার মতো অবুঝকে বলেছিলেন, এখান থেকে কোনও রেকর্ড বিক্রিও করতে পারি না। উপহার দিতেও পারি না। সুতরাং রেকর্ড তৈরির স্মৃতিটুকু নিয়েই সেদিন বাড়ি ফিরতে হয়েছিল।

ঠিক এই রকমই পরবর্তীকালে দেখেছিলাম সুপার ক্যাসেট অর্থাৎ টি সিরিজের কর্ণধার গুলশন কুমারের নওদার ফ্যাক্টরিতে। সে বার পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমায় নিউদিল্লি পাঠিয়েছিলেন কলকাতা তিনশো বছরের ওপর পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুরে একটা সমবেত সংগীত রচনা করতে। 'সারে জাহাসে আচ্ছা', এশিয়াডের, গান্ধী, পথের পাঁচালি-র সুরকার পণ্ডিত রবিশঙ্কর মানে সত্যিকারের ব্যতিক্রমী স্রষ্টা।

পণ্ডিতজির সুরে আমি এর আগে কিছু বাংলা আধুনিক গান লিখেছিলাম গ্রামাফোন

রেকর্ডের জন্য। এর মধ্যে আমার সব থেকে প্রিয় গান হল হৈমন্তী শুক্লার গাওয়া 'আর যেন সেদিন ফিরে না আসে'। অতএব আমি এক কথাতে দিল্লি যেতে রাজি হয়ে গেলাম। গিয়ে উঠলাম নিউদিল্লির বঙ্গভবনে।

পণ্ডিতজির সুন্দর সবুজ ঘাসের লন, আর বাগানে ঘেরা সরকারি বাসভবনটিতে দেখতে পেলাম ওঁর ছ-সাত জন তরুণ বিদেশি শিষ্যকে। যাঁরা একেবারে ভারতীয় প্রথায় গুরু পণ্ডিতজির কাছে নাড়া বেঁধেছেন।

আমি যখন ওখানে পৌঁছালাম তখন ওঁরা শিক্ষা শেষ করে সবে বাদ্যযন্ত্র নামিয়েছেন। কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্তা বলে আমরা কাজে বসলাম। পণ্ডিতজি যথারীতি প্রথমে সেতারে তারপর হারমোনিয়ামে গানের সুর দিলেন। সুরের উপর লিখলাম 'কলকাতা/ কলকাতা/ কলকাতা/তিনশো বছর ধরে করলে লালন/স্নেহময়ী তুমি মা/মমতাময়ী জননী/সবার আপন/সবার স্বজন'।

বেশ অন্য ধরনের সুর হল। মুখড়াটা লিখতেই বেশ সময় নিলাম। পণ্ডিতজি বললেন, দারুণ হয়েছে। তবে আজ আর নয়। কাল আবার সন্ধ্যায় আমরা বসব। আপনি এখানেই আজ খেয়ে যাবেন। তবে অবশ্য নিরামিষ খাবার।

রবিশঙ্করের সেক্রেটারি রবীন বাবু আমার কানে কানে বললেন, খাবার সময় একটা নতুন জিনিস দেখবেন।

সত্যি খেতে বসে দেখলাম, পণ্ডিতজির বাড়িতে কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও আমার মতো একজন অভ্যাগতকে খাওয়াতে খাঁটি ভারতীয় আশ্রমের আদর্শে ওঁর বিদেশি শিষ্যরা নিজেরাই লুচি বেললেন। নিজেরাই ভাজলেন। নিজেরাই সবজি পরিবেশন করে আমাকে, রবীনবাবুকে আর এঁদের গুরুজিকে সমাদরে আহার করালেন।

একটু আগে যে আমেরিকান ছেলেটির হাতের আঙুল দিয়ে ঝরে পড়ছিল সেতারের তারের মীড়, গমক, মূর্চ্ছনা এখন তারই হাতের আঙুলে রয়েছে বেলনা। যা দিয়ে সে এখন লুচি বেলছে। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম এক শিক্ষাগুরুর শিক্ষালয়ে অনন্য আবাসিকদের।

আমি যে অবাক হয়ে গেছি পণ্ডিতজি বোধহয় সেটা লক্ষ করেছিলেন। ওঁর সেই অপরূপ মিষ্টি হাসিটি হেসে আমায় বলে উঠলেন, না বললে চলবে না। আর দুখানা গরম লুচি খেতেই হবে। সেদিনের সেই সুখস্মৃতি মনে নিয়েই বঙ্গভবনে ফিরলাম।

পরদিন ভাগ্যটা খুবই প্রসন্ন ছিল। সকালে আমার এক পরিচিত নিউদিল্লির বাসিন্দাকে ফোন করে, তার গাড়ি চেয়ে নিয়ে, দিল্লির চেনাজানাদের সঙ্গে একটু দেখাশোনা করার বাসনায় অপেক্ষা করছিলাম। গাড়ি বঙ্গভবনে এসেছে শুনেই আমি নীচে নামলাম। বেরিয়েই সামনেই দেখি আমাদের কলেজের সহপাঠী তখনকার মুখ্যসচিব তরুণ দত্ত। তরুণবাবু আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রথমেই বললেন, গাড়ি আছে তো? সঠিক রাস্তা জানা না থাকলে দিল্লির ট্যাক্সিওয়ালা কিন্তু চরকি পাক খাওয়াবে। গাড়ি না থাকলে বলুন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আমি বললাম, আমার বন্ধুর গাড়ি এসেছে। আমাদের কথার মধ্যেই সেখানে আসতে দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে। ওঁকে নমস্কার জানাবার সঙ্গে সঙ্গে উনিও একই প্রশ্ন

করলেন, গাড়ি আছে তো?

তরুণবাবু বললেন, হ্যাঁ স্যার। আছে।

দিল্লি ট্যাক্সিওয়ালাদের চরকি বাজি নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। নতুন আর কিছু বলতে চাই না।

সেদিন কলকাতা তিনশো বছরের গানটি লেখার জন্য সন্ধ্যায় পণ্ডিত রবিশঙ্করের বাড়িতে পৌঁছে শুনলাম পণ্ডিতজি আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলেছেন। কারও সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কিছু আলোচনা করছেন। চা খেতে খেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খানিক বাদেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন পণ্ডিতজি আর সুপার ক্যাসেটের প্রাণপুরুষ গুলশন কুমার। গুলশনের সঙ্গে মুম্বইতে শানুর জন্য 'অমর শিল্পী কিশোরকুমার' লেখার সময় পরিচয় হয়েছিল।

আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, কোথায় উঠেছেন? নিশ্চয় বঙ্গভবনে? চলে আসুন আমার এ সি গেস্ট হাউসে। দু-তিন দিন আরাম করুন। খুব ভাল লাগবে। আমার ওখানে অবশ্য নিরামিষ খাবার।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। এ বার আর হল না। পরের বার হবে। পরশুর ফ্লাইটেই ফিরতে হবে কলকাতায়।

গুলশন কুমার বললেন, তা হলে কালকে সকালেই বঙ্গভবনে গাড়ি পাঠিয়ে দিই। দেখে যান আমার কাজ কারবার।

আমি বললাম, আজই আপনার দিল্লির মিউজিক অ্যারেঞ্জার আর সুরকার গৌতম দাশগুপ্তের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। উনি কাল লাঞ্চে ডেকেছেন। কাল সকালে গাড়ি নিয়ে আসবেন।

গুলশনজি বললেন, ওঁর বাড়ি তো আমার অফিসের কাছেই। আমার ওখানে হয়ে ওঁর কাছে চলে যাবেন। আমি ওঁকে বলে রাখব যাতে আপনাকে উনি নিয়ে আসেন।

কথা শেষ করে গুলশন কুমার, লেটেস্ট মডেলের মার্সেডিজ চেপে চলে গেলেন। শুনেছি প্রথম জীবনে গুলশনজি দিল্লিতে সামান্য একজন ফলের রস বিক্রিতা ছিলেন। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় মানুষ কত উঁচুতে পৌঁছে যেতে পারে গুলশন কুমার তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

পণ্ডিতজির সঙ্গে গান নিয়ে বসলাম। লেখা হল গান। গান শেষ হতে সেই অপূর্ব হাসি হেসে বললেন, আপনাকে কিন্তু মুম্বই-তে রেকর্ডিং-এর সময় আসতে হবে। অনেক কোরাল অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে রেকর্ড করব।

বললাম, নিশ্চয় যাব। যখন বলবেন তখনই।

রেকর্ডিং-এর সময় গিয়েছিলাম মুম্বই-তে। ওবেরয় টাওয়ার হোটেলে সেদিন পণ্ডিতজি আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওপরের টাওয়ারের বারান্দায় ঘুরে ঘুরে শুনিয়েছিলেন ইহুদি মেনুহিনের জন্মদিনের ওঁরই বিদেশি বাজনাদারদের অসাধারণ বাজনা। সে বাজনা এখনও কানে বাজছে। আমার সৌভাগ্য ঠিক সেই সময় ওঁরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। মুম্বই-তে কি কলকাতায় কি নিউদিল্লিতে ঠিক স্মরণে নেই, একবার পাঠভবনের শিক্ষিকা আমার ভাগনি শম্পা রায়ের কন্যা রিঙ্কির অটোগ্রাফ খাতায় উনি যে কথাগুলি লিখে

দিয়েছিলেন শুধু ওই টুকুতেই রবিশঙ্করজির সরল সুন্দর আন্তরিক শিল্পমাধুর্যের মানসিকতাটি যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন। রিঙ্কির কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আজ তাই এটা এখানে সবার জন্য উপহার দিলাম।

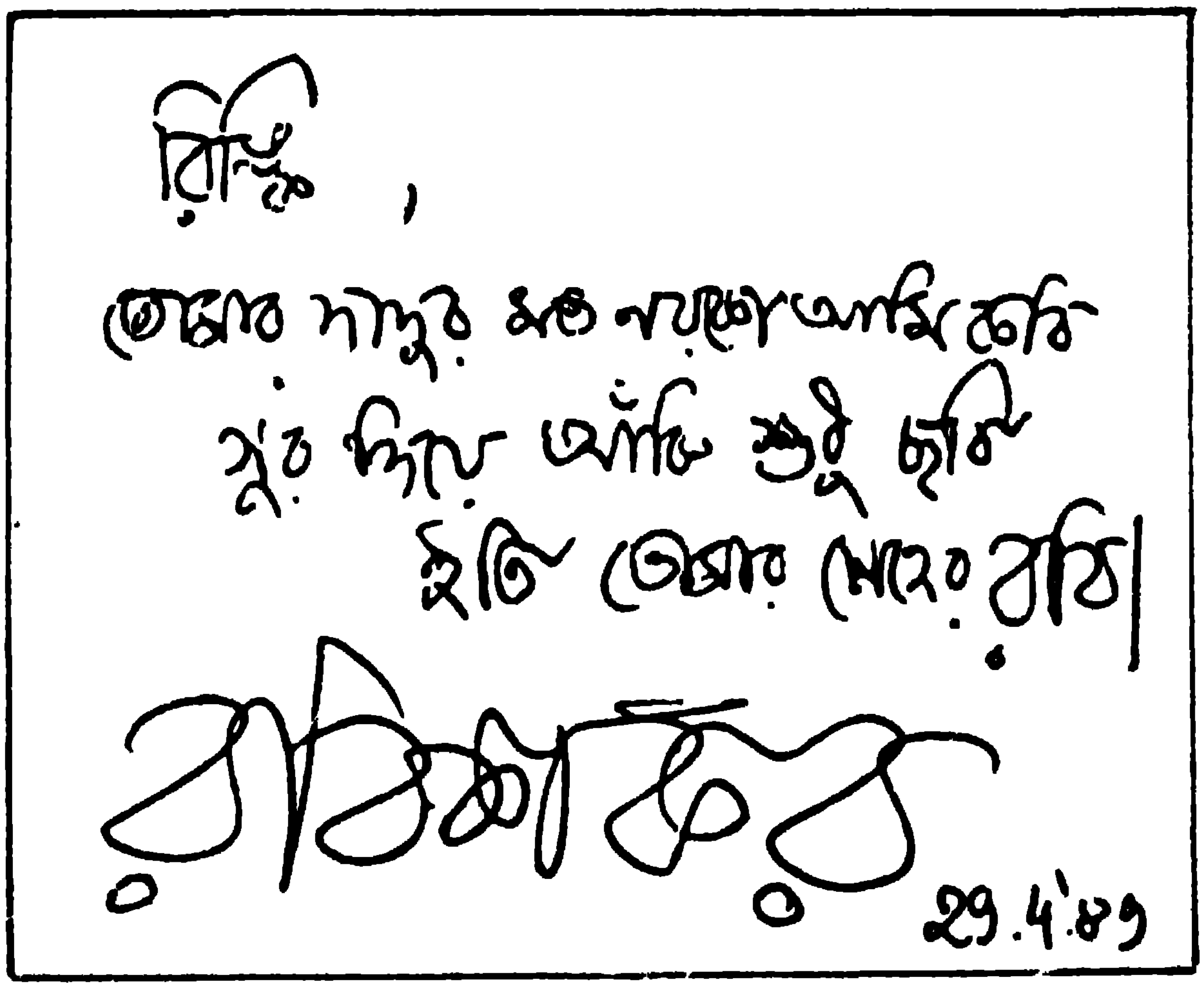
রিঙ্কি,
তোমার দাদুর মত নয় তো আমি তবে
সুর দিয়ে আঁকি শুধু ছবি
ইতি তোমার স্নেহের রবি।
রবিশঙ্কর
২৯.৪.৮৫

যা হোক, আবার দিল্লির প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। পরদিন সুরকার ও সংগীত আয়োজক গৌতম দাশগুপ্তের সঙ্গে এলাম দিল্লির কিছু দূরে ইউ. পি-র নয়দাতে। সত্যি, অকপটে বলছি, গুলশন কুমারের বিশাল কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ওঁর নিজস্ব অনেকগুলো ঝকঝকে বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুনলাম ওগুলো নিয়মিত শিফ্‌ট অনুযায়ী দিল্লির বিভিন্ন জায়গা থেকে গুলশনের কর্মীদের নিয়ে অফিসে আসে এবং ছুটির পর বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ওই রকম বাসের সংখ্যা নাকি উনিশ-কুড়িটা। অবশ্য ওখানে কেবল ক্যাসেট নয়, গুলশনের অনেক কিছুই রয়েছে, যেমন টিভি, ডিটারজেন্ট পাউডার, বিভিন্ন পত্রিকা ইত্যাদি অনেক কিছু। শুনেছি এখন নাকি সি ডি রেকর্ডেরও পরিস্থাপনা হয়েছে।

গুলশন আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং একজন লোক দিয়ে দিলেন কারখানা ঘুরে ঘুরে দেখাতে। এক জায়গায় দেখলাম ক্যাসেট কভারের মেটিরিয়াল রয়েছে। আর এক জায়গায় সেগুলো প্রিন্ট হয়ে ক্যাসেট কভার হয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি ঘুরে ঘুরে ক্যাসেট তৈরির পুরো ব্যাপারটা দেখালেন।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমি গেলাম গুলশনের চেম্বারে। সঙ্গী মানুষটি আমার সঙ্গে আসবার সময় একটি ক্যাসেট এনেছিলেন, সেই ক্যাসেটটি গুলশনকে দিলেন। গুলশন সেটি উপহার দিলেন আমায়।

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, শুধু স্টুডিয়ো ছাড়া সবই তো এখানে রয়েছে।

উত্তরে গুলশনজি বললেন, স্টুডিয়ো-ও আছে। এই গৌতম দাশগুপ্তের সুরে আপনি যে সব বাংলা গান লিখেছেন সেগুলো সবই তো দিল্লির সিংগারদের দিয়ে রেকর্ডিং হয়েছে এখানে। স্টুডিয়োর প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে, গুলশনের মুম্বই-এর খার অঞ্চলের সুদীপ স্টুডিয়োর আর পশ্চিম আন্ধেরির নিউ লিঙ্ক রোডের গোল্ডেন চ্যারিয়ট স্টুডিয়োর কথা। যেখানে ওঁর আর এক বিরাট অফিস।

চেন্নাইতে প্রসাদ স্টুডিয়োতে বালু সুব্রমনিয়াম আর চিত্রা যখন আমার লেখা বাংলা গান রেকর্ড করছিল সেই সময় দেখেছিলাম, এক সুদক্ষ বাঙালি চিপ রেকর্ডিস্ট বিরাট চওড়া টেপে মাল্টি চ্যানেলে গান রেকর্ড করলেন। ঠিক সেই ধরনের চওড়া টেপে মাল্টি চ্যানেলে রেকর্ডিং হয় এই গোল্ডেন চ্যারিয়টে। লোকমুখে শুনেছি সারা ভারতবর্ষে এ ধরনের রেকর্ডিং মেশিন খুব বেশি নেই।

৫৯

গুলশনের গোল্ডেন চ্যারিয়টেরিই এই একতলার প্রকাণ্ড বড় হলঘরে বহুবার দেখেছি অনুরাধা পড়োয়াল সাধিকা গায়িকার বেশে ভিডিও রেকর্ডিং-এ শুটিং করছেন। কোনও কোনও সময় গুলশন কুমারকে দেখেছি সাধকের ভূমিকায়, কিন্তু ভক্তিমূলক বা ভজনাঙ্গের গান ছাড়া কোনওবারই অন্য কোনও রকম গানের পিকচারাইজেশন দেখিনি। বছর দেড়েক আগে দিল্লি থেকে হরিদ্বারে গিয়েছিলাম। সেখানে হর কি পৌরীর গঙ্গা কিনারে সন্ধ্যা আরতির পরক্ষণেই প্রত্যেক দোকানেই বেজে উঠতে শুনেছি শুধু অনুরাধা পড়োয়ালের ভজন গান। সারা ভারতবর্ষের আর কোনও শিল্পীর গানই ওখানে আমি তেমন শুনিনি।

এই ধরনের কাজে গুলশনের সত্যিই কোনও জুড়ি নেই। আমার তো একবার মনেই হয়েছিল হরিদ্বারে ওঁর কোম্পানি ছাড়া অন্য কোনও কোম্পানির ভজন গান বোধহয় নিষিদ্ধ। বৈষ্ণ দেবীর মন্দিরে গুলশন কুমারের নিয়মিত অর্থদানের কথা তো অনেকেই জানেন।

নিউদিল্লির আর এক বাঙালি শিল্পীর নাম মনে আসছে। তিনি হলেন সেবন্তী সান্যাল। ওখানকার বেতার এবং টিভিতে নিয়মিত গান তো করেছেনেই, কলকাতা বেতারে অনেক সুন্দর অনুষ্ঠান করেছেন।

নিউদিল্লির বেতারের আর টিভির আর এক শিল্পী হলেন আমার বিশেষ বন্ধু অরুণ চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ অরুণকুমার। ওকে আমি 'ভবঘুরে অরুণ' বলি। অরুণ পৃথিবীর বহু জায়গায় বাংলা এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় গানের অনুষ্ঠান করেছে। সেই এল পি রেকর্ডের প্রথম যুগে সুদূর আমেরিকার এক রেকর্ড কোম্পানি থেকে আমার লেখা আর ওর নিজের সুরে গাওয়া একটি বাংলা আধুনিক গানের এল পি রেকর্ড প্রকাশ করে আমায় রীতিমতো চমকে দিয়েছিল।

এইচ. এম. ভি.-তেও আমার গান নিয়ে একটি ক্যাসেট করেছে। নিউদিল্লিতে থাকলে

রামকৃষ্ণ মিশনে সারা দিনে একবার আসবেই। ওখানেই ওর পাত্তা মেলে নইলে নয়। আমি যতবারই দিল্লি গেছি ততবারই ওর খোঁজ করেছি। তিন-চারবার ছাড়া ওকে ধরতে পারিনি। পৃথিবীর কোন দেশে কোনখানে তখন ওই ভবঘুরে বাঙালি শিল্পী অরুণকুমার ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন ভাষায় কোথায় তখন অনুষ্ঠান করছে এ-সব জানতে পারি ওর চিঠি পাওয়ার পর, তার আগে নয়।

দিল্লির হাউস খসের বাসিন্দা একজন মানুষের নাম মনে আসছে। তিনি হলেন পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট অভিনেত্রী এবং সুগায়িকা অরুন্ধতী দেবীর প্রাক্তন স্বামী। শুনেছিলাম উনি এককালে গার্স্টিন প্লেসের কলকাতা বেতারের খুবই প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। প্রযোজক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রশ্ন' ছবিতে আমি ছিলাম গীতিকার আর সহকারী পরিচালক। চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন পরিচালক। অরুন্ধতী দেবী ছিলেন সেই ছবির নায়িকা। তখন প্রভাতদা প্রায়ই স্টুডিয়োতে আসতেন। সেই সময়ই আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়, সুন্দর, উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত মানুষ। প্রভাতদা অসিত সেনের 'চলাচল' ছবির এক সার্থক অভিনেতাও ছিলেন। চিত্র পরিচালনাও করেছিলেন। তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছবিটি হল উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী দেবী অভিনীত তারাশঙ্করের 'বিচারক'।

প্রভাতদার কাহিনী এবং পরিচালনায় তৈরি হয়েছিল 'বন্দি বিধাতা'। প্রভাতদার ছবিতে সেই আমার প্রথম গান লেখা। সুরকার ছিলেন গোপেন মল্লিক। আমার অনুরোধে শ্রাবন্তী মজুমদারকে দিয়ে উনি গাইয়েছিলেন ছবির থিম সঙ। গানের প্রথম লাইনটি ছিল 'কোথায় পালাবে তুমি। কোথায় পালাবো আমি'। ওঁর দারুণ পছন্দ হয়েছিল এই গানটি। উচ্ছাসে বলে ফেলেছিলেন তোমায় কোনও দিনই পালাতে দেব না। ওই ছবিতে আরও একটি ভাল গান গেয়েছিলেন অভিনেতা মৃণাল মুখোপাধ্যায়।

এর পর প্রভাতদা করলেন প্রযোজক তারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে বেশ বড় মাপের একটি ছবি 'তুষার তীর্থ অমরনাথ'। প্রায় সারা ছবিটির শুটিং করেছিলেন কাশ্মীর ও অমরনাথ অঞ্চলে। এই ছবিরও সুরকার ছিলেন গোপেন মল্লিক। আমাকে উনি সত্যিই পালাতে দেননি। আমাকে দিয়েই ছবির গান লিখিয়েছিলেন। কিন্তু দুভার্গবশত ছবিটি জনপ্রিয় হল না। লম্বা ঋজু প্রাণচ্ছল মানুষটি স্বাভাবিকভাবেই একটু যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন।

অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদে উনি খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। মাঝেমধ্যে কথাবার্তায় সেটা একটু আধটু প্রকাশও করে ফেলতেন। মনে পড়ছে সেবার গড়িয়াহাটার হিন্দুস্থান মার্টে, উস্তাদ আলি আকবরের বাংলা গান লেখার সময় দেখেছিলাম অরুন্ধতী দেবীর কন্যাকে। মুখের ভাব অনেকটা ওঁরই মতো। উনি তখন বিদেশে আলি আকবর সম্বন্ধে গবেষণা গ্রন্থ রচনা করছিলেন। এ দেশে এসেছিলেন সেই সম্পর্কে শেষ কিছু প্রসঙ্গ রচনা করতে। যাই হোক, তারপর প্রভাতদার সঙ্গে কলকাতায় আর আমার দেখা হয়নি।

হঠাৎ হঠাৎ দিল্লি থেকে অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর সব চিঠি আসত। সেই সময় উনি 'ডিটেকটিভ' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওই পত্রিকায় নিজেই

লিখতেন একাধিক রচনা। কিন্তু সব লেখাই নিজের নামে লিখতেন না। আমার নাম দিয়ে অনেক ইংরেজি গল্প লিখেছেন ওই পত্রিকায়। যেগুলো একটাও আমার লেখা নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এই সব গল্পের প্রশংসা এবং সমালোচনায় ভরা কিছু কিছু চিঠি আমি পেতাম। আর অবাক হয়ে ভাবতাম নিঃসঙ্গ, উচ্চশিক্ষিত, গুণী এই অদ্ভুত শিল্পী মানুষটির কথা। একা একা কী করে উনি সময় কাটাচ্ছেন, এ ধরনের মানুষ আজ পর্যন্ত আমি জীবনে আর পাইনি।

'ডিটেকটিভ' পত্রিকার ব্যাপারে একটি চিঠিতে উনি আমায় লিখেছিলেন—'জীবনের মজা দেখ। কেউ একজন খুন করল, কাউকে। সেই গল্প লিখে আমার পেট চলল।' এবার আসি অন্য প্রসঙ্গে।

বাংলা গানে যে সব শিশু কণ্ঠশিল্পীরা একদা অসাধারণ সাফল্য পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসছে রাণু মুখোপাধ্যায়ের নাম। রাণু অগ্রদূতের 'বাদশা' ছবিতে হেমন্তদার সুরে 'লাল ঝুটি কাকাতুয়া' এবং 'শোন্ শোন্ মজার কথা ভাই' গেয়ে তোলপাড় করে দিয়েছিল সব বয়সের শ্রোতাদের মন।

তার আগে অবশ্য আর একজন গায়িকা রাণুর মতো অত কম বয়সে না হলেও প্রায় উত্তর কৈশোরের কাছাকাছি সময়ে কমল দাশগুপ্তের সুরে গেয়েছিলেন 'প্রজাপতি প্রজাপতি...'। এই সুপারহিট গানটির শিল্পী ছিলেন অসিতা মজুমদার। সম্ভবত তখন তিনি ছিলেন অসিতা বসু। যিনি পরবর্তীকালে নিউ থিয়েটার্সের 'রূপকথা' নামে প্রথম বাংলা ফ্যানটাসি ছবিতে অসিতবরণের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পরে বিয়ে করেছিলেন সে যুগের বিখ্যাত আর্ট ডিরেক্টর ও 'রূপকথা' ছবির পরিচালক সুধীর মজুমদারকে।

এরপর সলিল চৌধুরীর কন্যা অন্তরা চৌধুরীও ছোট বেলায় গেয়েছিল সলিলদার সুরে বেশ কিছু ছোটদের গান। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ও কোলা ব্যাঙ' গানটি।

আর একজন শিশু শিল্পী সুরকার অশোক রায়ের কন্যা চৈতি রায়। যে এখন কলকাতার অন্যতম বেহালাবাদক 'বাউল'-এর স্ত্রী। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে গেয়েছিল 'এক যে ছিল বাঘ' গানটি, সে সময় খুবই নাম করেছিল সে। বিখ্যাত ওয়েস্টার্ন রেকর্ড 'পিঙ্ক প্যানথার'-এর আদলে সুধীনবাবু এই গানটি তৈরি করেছিলেন। চৈতির কণ্ঠে 'ও বাঘ' তারপরে যন্ত্রসংগীতে বাঘের মতো হালুম ডাকটি সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল।

এরপর কিন্তু কোনও শিশু কণ্ঠশিল্পী আর তেমন কিছু করতে পারেনি।

সম্প্রতি উদিত নারায়ণের পুত্র আদিত্য নারায়ণ 'মাসুম' ছবিতে গান গেয়ে সারা ভারতবর্ষ মাতিয়ে দিল। উদিত নারায়ণ, দীপা নারায়ণ, কুমার শানু, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অলকা ইয়াগনিক, ঊষা উত্থুপ ও বাণী জয়রাম সহ বহু কণ্ঠশিল্পীর জীবনের প্রথম বাংলা গান আমি লিখেছি। সেই অনুপ্রেরণায় আমি মাসুমের গান শুনে আদিত্য নারায়ণের প্রথম বাংলা গান রেকর্ড করার যখন চেষ্টা করছি তখনই সৌভাগ্যক্রমে সুযোগ পেয়ে গেলাম। পরিচালক শচীন অধিকারীর 'দানব' ছবিতে নবীন সুরশিল্পী বি সুভায়ুর সুরে গান লিখলাম। একটি গান ছিল 'আল্লা জিসাস মা কালীর কসম'। এই ছবির অর্কেস্ট্রা অর্থাৎ মিউজিক ট্র্যাক হল এবং কিছু গান কলকাতায়, কিছু গান মুম্বই-তে ডাবিং হবে। এই

গানটি আদিত্য নারায়ণকে দিয়ে গাওয়াবার জন্য শচীনবাবুকে অনুরোধ করলাম। শচীন অধিকারীর আর আমার মানসিকতার মেলবন্ধন সাংঘাতিক। উনি এক কথায় রাজি হলেন। আদিত্যও ওর বাবা উদিত আর মা দীপার মতো তার জীবনের প্রথম বাংলা গান আমার লেখা কথায় রেকর্ড করল সেদিন।

আর একটা অদ্ভুত যোগাযোগের ঘটনা ঘটেছিল তখন। কলকাতার এক হোটেলে একদিন সপরিবারে বাঙালি খাবার খেতে গিয়ে লিফটের কাছে দেখা হয়ে গেল বাংলাদেশের বিখ্যাত গায়িকা সাবিনা ইয়াসিনের সঙ্গে। সাবিনার গান আমার দারুণ ভাল লাগে। এত বিশাল রেঞ্জের বাঙালি গায়িকা বিরল। যে কণ্ঠস্বর গানের অনেক অগম্য পর্দায় অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। ওঁকেও ছাড়লাম না। ছাড়লাম না ওঁর সঙ্গে আসা বাংলাদেশের আর এক গায়িকা সাকিলা জাফরকেও। ওঁরাও কণ্ঠ দিলেন 'দানব' ছবিতে।

সাবিনার কণ্ঠস্বরে শুধু নয়, ওঁর অহংকারহীন ব্যবহারেও আমি বরাবরই মুগ্ধ।

এবার আমাকে কণ্ঠে এবং আচার আচরণে মুগ্ধ করল সাকিলা জাফর। বাংলাদেশের এই উঠতি গায়িকা আরও বড় হোক এই আমার একান্ত কামনা।

সম্প্রতি আমার চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গানে তৈরি 'রাজা রানি বাদশা' ছবির গান রেকর্ডিং করতে বাংলাদেশের বুলিভাই আর এখানকার গৌতম সিংহরায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম মুম্বই। বাবুল বসুর সুর করা এই ছবিতে শিশু শিল্পীর দুটি গান প্রয়োজন ছিল। গেলাম আদিত্য নারায়ণের জন্য ওর পিতা উদিত নারায়ণের কাছে। জহু-ভার্সোভা লিঙ্ক রোডের নতুন ফ্ল্যাট অভিষেক অ্যাপার্টমেন্টে ওরা থাকে। মনে পড়ল 'কয়ামত সে কয়ামত তক' ছবির হিন্দি গান শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রযোজক অজয় বসুর 'মনে মনে' ছবিতে উদিত নারায়ণকে প্রথম বাংলা গান গাওয়াবার জন্য মুম্বই-তে ওর বাড়ি খুঁজতে প্রচুর ঘুরেছিলাম একদিন। শেষটায় উনি পাত্তা দিয়েছিলেন। গেয়েছিলেন কানু ভট্টাচার্যের সুরে আমার কথায় জীবনে প্রথম বাংলা গান—'বসলে এসে সাগর কূলে'।

যাই হোক এই 'রাজা রানি বাদশা'-তে উদিতেরও গান ছিল। উদিত যেদিন গাইলে তারপর দিন আদিত্য নারায়ণ গাইবে ঠিক হল। উদিত আমায় বললে, আমি আর আমার স্ত্রী দীপা দুজনেই কিন্তু অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি সিঙ্গাপুরে। আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, তা হলে কী হবে?

উদিত বললে, দাদা, ভাবনা করবেন না। ও আমার 'জেম বয়'। আমার লোক ঠিক সময় ওকে স্টুডিয়োতে নিয়ে যাবে। দেখবেন ওর সুরজ্ঞান, ওর এক্সপ্রেশন অর্থাৎ গানের অভিনয়, সুভাষ ঘাই-এর ছবিতে ও অভিনয়ও করছে। এমনি তো নয়, বিশেষ কিছু দেখেছেন বলেই তো ওকে ওঁরা ছবিতে সুযোগ দিয়েছেন। আর বাংলা উচ্চারণ? কথাটা বলেই হাসল উদিত। আমায় সোজাসুজি বললেন, দাদা, আপনি তো বার বার আমায় বলেন, আমার বউ দীপা আমার থেকে ভাল বাংলা বলে। দেখবেন আমরা না থাকলেও, ও আমাদের দুজনের থেকেও ভাল বাংলা বলছে। সবই দাদা আপনাদের আশীর্বাদ। বিনয়ী উদিত আমার কাছে মাথা নিচু করল।

মুম্বই-এর সংগীত জগতের খুবই প্রিয় স্টুডিয়ো হল জুহুর মিউজিশিয়ান স্টুডিয়ো। এই স্টুডিয়োর মালিক তিন জন। সৌভাগ্যক্রমে তিনজনেই বাঙালি, একজন বিখ্যাত

বেস গিটার বাদক সমীরবাবু। আর একজন নামী সংগীত শিল্পী কুমার শানু। আর একজন তাপস ঘোষ। স্টুডিয়োর গোটা বাড়িটির মালিক তাপসবাবু। রাজা সেনের 'দামু' ছবির কিছুটা মালিক এই তাপসবাবু। এবং 'রাজা রানি বাদশা'র সহ প্রযোজক।

নির্দিষ্ট দিনে ঘড়ির কাঁটায় সময় মিলিয়ে উদিতের লোকের সঙ্গে আদিত্য নারায়ণ এল আমাদের স্টুডিয়োতে। হাতে একটা অ্যাটাচি।

৬০

প্রাপ্তবয়স্ক শিল্পীর মতো নমস্কার জানিয়ে চেয়ারে বসল আদিত্য। অ্যাটাচি খুলে একটা খাতা আর কলম বার করল। ঠিক ওর বাবার মতোই বলল, বলুন দাদা কী গান? লিখে নি। আমি বলে চললাম গানটা। আমি লক্ষ করলাম ও লেফট হ্যান্ডার। বাঁ হাতে লিখে নিতে লাগল গানটা। তারপর বাবুল বোসের কাছে সুরটা তুলে নিল। এবার আমি ওকে 'রাজা রানি বাদশা'র এই বিশেষ সিচুয়েশনটা বোঝাতে লাগলাম। ও বড়দের মতো মনযোগ দিয়ে সব শুনে গেল। তারপরে কানে মিউজিক ট্র্যাকের হেডফোনটা লাগিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগল। শিখে নিতে লাগল নিখুঁত উচ্চারণ আর যথার্থ অভিব্যক্তি। একটু ভুল হতেই প্রাপ্তবয়স্ক শিল্পীদের মতোই সেই গানের সুরে গেয়ে উঠল গলতি হো গিয়া। মাফ কর দাদা।

উদিত বলেছিল ওর ছেলে 'জেম বয়'। আমিও তাই উপলব্ধি করলাম। জানি না, বড় হলে এই রত্নেই পালিশ লেগে লেগে তা কতটা উজ্জ্বল হবে। বা কতটা ক্ষয়ে যাবে। তবে এখনও পর্যন্ত এই রত্ন সন্তানের যে ঝলমলে ঝকমকে ছটা আছে, আলোর দ্যুতি আছে এবং তা যে চোখ মন ধাঁধিয়ে দেয় এ সত্য আমি অস্বীকার করতে পারছি না।

আগে বাংলাদেশের কথা বলছিলাম। এবার আবার বাংলাদেশের কথাই বলি। এই সেদিন গিয়েছিলাম ঢাকায়। ওখানে নামী হোটেল পূর্বাণীতে ছিলাম। কাজ শেষ হতেই প্রতিবারের মতো মাল্টিমোড গ্রুপের আবদুল আওয়াল মিন্টুকে ফোন করলাম। মিন্টু সাহেব ঢাকার এক বিলিওনিয়র। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। সাগর পাড়ি দেওয়া অনেকগুলো মালবাহী জাহাজের মালিক। ঢাকার বিখ্যাত চাইনিজ রেস্টুরেন্ট পাণ্ডা গার্ডেনেরও অংশীদার। যেখানে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে, প্রায় দোতলা সমান উঁচু চাইনিজ 'দাদু' পুতুলটি দেখে আমি আর মান্না দে প্রায় একসঙ্গে ভির্মি খেয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। আরও কত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে উনি যুক্ত তা বোধহয় নিজের ডায়েরি না দেখে চট করে বলতে পারবেন না। উনি এবং ওঁর স্ত্রী বেগম নাসরিন দুজনেই আমার লেখা গানের দারুণ অনুরাগী। ওঁদের বাড়িতে এবং ওঁদের প্রত্যেকটি গাড়িতে রয়েছে আমার লেখা মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আর জগজিৎ সিংহের গাওয়া প্রায় সব কটি গান। যে গানগুলো আমার সংগ্রহেও নেই।

একটা কথা মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি, গীতিকার হিসাবে আমাকে ওপার বাংলা যে ভালবাসা যে আপ্যায়ন যে সমাদর দেন তা ভু-ভারতে আর অন্য কোথাও পাই না।

মালয়েশিয়ার একটি গাড়ির বাংলাদেশের একমাত্র এজেন্ট এই মিন্টু সাহেব। তা সেই

মিন্টু সাহেবকে ফোন করতেই উনি বললেন, দাদা, এখনই চলে আসুন আমার গেস্ট হাউসে। ঢাকার সব থেকে পশ এলাকা গুলশনের বাসিন্দা মিন্টু সাহেব। ওঁর আহ্বান এড়াতে পারলাম না। হোটেল থেকে চেক আউট করে চলে এলাম ওখানে। ওঁরা বললেন, আপনাকে আর বউদিকে তো আমরা কয়েক বছর আগে আপনাদের জমিদারি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডুর 'আবুতারাফে' ঘুরিয়ে এনেছি। এবার চলুন কক্সবাজার। ওখান থেকে যাব আপনাদের বিখ্যাত নায়ক ও খলনায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য-এর টেকনাফে।

ধীরাজবাবুর লেখা আত্মজীবনী 'যখন পুলিশ ছিলাম'। বইটি তখন শুধু নয় এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলের পঞ্চাশ উর্ধ্ব বয়সি প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালির ঘরে ঘরে। আমি আমতা আমতা করে বললাম, আমার যে পরশু প্রসেনজিতের ছবির গানের সিটিং। মুম্বই থেকে ওর মিউজিক ডিরেক্টর যে কলকাতায় আসছেন। প্রসেনজিৎ আমায় বার বার ফোন করছে। মিন্টু বললেন, দাদা, আমি আর কী বলব। গান লেখা তো আছেই। আমার কাছে নেপাল থেকে দুজন গেস্ট এসেছেন। তাঁরা আর আপনি চলুন ওখান থেকে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড হয়ে আরাকান পাহাড়ের সামনে দিয়ে বর্মা মুলুকের তীরেও একটু ঘুরে আসব।

এবার আর আমাকে ঠেকায় কে? কলকাতার বাড়িতে ফোন করে দিলাম। পরদিন সকালেই চললাম পাঁচটি বিদেশি বিলাসবহুল গাড়ির একটি কনভয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে। চট্টগ্রামে আমি সস্ত্রীক আগেও এসেছি। সস্ত্রীক থেকেছি চট্টগ্রামের নামী ও দামি ফাইভ স্টার হোটেলে 'অগ্রবাদ'-এ, যে বার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে চট্টগ্রামের টিভি ও বেতারের জনপ্রিয় গায়িকা স্বপন লালা আমার গান রেকর্ড করে। সেই চট্টগ্রামে এসে মনে পড়তে লাগল, এবার যাব ধীরাজ ভট্টাচার্যের সেই জায়গায়, টেকনাফে—যেখানে উনি পুলিশের চাকুরিতে অনেকগুলো দিন কাটিয়ে গেছেন। ভাবতে লাগলাম আত্মজীবনী কজন লিখেছেন? চিত্র বা গানের জগতের? মনে এল অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম। ওঁর লেখা 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'। পণ্ডিত রবিশঙ্করের 'রাগ অনুরাগ', শুনেছি রবিশঙ্করের টেপে বলে যাওয়া কথার হুবহু অনুলিখন। পণ্ডিতজির এই 'রাগ অনুরাগ' সম্পর্কে অনেকেই অভিমত দিয়েছেন, এমন স্পষ্ট কথা বলা এমন ভাবে অকপটে সত্যকে প্রকাশ করা, এমন আত্মকথা খুব কমই আছে। জীবনের যা যা অনেকেই গোপন করেন বা করতেন, উনি তা করেননি। খোলাখুলি বলে গেছেন। আর যে সব আত্মকথা পড়েছি সবই একের জবানিতে অন্যের রচনা। যেগুলো এক হাত থেকে অন্য হাতে ঘোরানোতে বেশ কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে যেতে বাধ্য।

ধীরাজ ভট্টাচার্য নিজেই লিখেছেন নিজের কথা। হলিউডের বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা বব হোপের একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা পড়েছিলাম। যার পঙ্ক্তি ছিল 'মাই ফাদার ওয়াজ এ ম্যাজিসিয়ান, অ্যান্ড আই অ্যাম হিজ ফার্স্ট ম্যাজিক'।

ধীরাজবাবুর 'যখন পুলিশ ছিলাম'। এবং 'যখন নায়ক ছিলাম' দুটি রচনাতেই এই সরল সহজ বাস্তব স্বীকৃতি।

কক্সবাজারে রাত কাটিয়ে পরদিন আমরা কক্সবাজারের নামী হোটেল সাইমান হোটেলের মালিক মুজ্জেম হোসেন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চললাম নাফ নদীর উপকূলে

টেকনাফের দিকে। অবশ্য এখানে বলা দরকার পৃথিবীর সব থেকে লম্বা সাগর সৈকত কক্সবাজারের ভিজে বালির হার্ড বিচ দিয়ে জিপ গাড়িতে করে বেশ কয়েক কিলোমিটার ঘুরেছিলাম। ওখানেই হিম ছড়ির এক ঝর্নার ধারে হঠাৎ দেখা হল আমাদের কলকাতার শিল্পী শতাব্দী রায়ের সঙ্গে। শতাব্দী ওখানে তখন শুটিং করছিল।

যাই হোক কক্সবাজারে শুনলাম ওখানে 'ধীরাজ স্মৃতি সমাজ' বলে একটা সংস্থা আছে। কলকাতায় এমন একটাও আছে কি?

আরাকান পর্বতমালার ছায়া ঝরানো নাফ নদীর ধারে টেকনাফের একটা হোটেলে আমরা নামলাম। সহযাত্রী মুজ্জেম হোসেন সাহেবের কথাবার্তায় বুঝলাম, উনি বাংলা ছায়াচিত্রের অনেক খবরই রাখেন। ধীরাজ ভট্টাচার্যের সেই রোহাঙ্গি নামের আরাকানি প্রেমিকা যে কুয়ো থেকে জল তুলতেন সেটিও মুজ্জেম সাহেব দেখালেন। ধীরাজবাবুর জীবনের প্রথম প্রণয় ওই জল তোলা থেকে শুরু। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে, কুয়ার জলদানের জল পানের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম প্রেমের উপলব্ধির সূত্রপাত তেমনই একটি কুয়া আমার মনকে গভীর অতলে ডুবিয়ে দিল। এখনও এখানকার মানুষ সেই প্রেমকে ভোলেননি। সম্মানে ও ভালবাসায় সেই অসফল প্রেমকে মনে রেখেছেন।

ওই কুয়া দেখতে দেখতে আমারই লেখা 'মন্দিরা' ছবির একটি গান মনে পড়ল। গানটি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর, সুরকার বাপি লাহিড়ি। গানটির বাণী ছিল 'সব লাল পাথরই তো/চুনি হতে পারে না। সব প্রেম মিলনের/মালা পেতে পারে না'। আমি এ গান যখন লিখি তখন ধীরাজবাবুর অসফল প্রেমের কথা আমার মনে ছিল না। এবং ওই কুয়াও আমি দেখিনি। তবুও লিখে ফেলেছিলাম। যাই হোক, ওখানকারই জলের ঘাট থেকে উঠেছিলাম মটোর বোটে। অথৈ অকূল সমুদ্রের মধ্য দিয়ে সেই বোটে করে মিন্টু সাহেবের তদারকিতে এক সময় পৌঁছেছিলাম—বর্মার তীরে। ছোট্ট একটা দ্বীপ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড, ওখানে পা দিয়েই শুনলাম খুব কম ভারতীয়ই এই নির্জন দ্বীপে এসেছেন। এখানে অবশ্য বাংলাদেশের প্রচুর ছবির শুটিং হয়। বহু দূরের আরাকান পর্বতমালার কোলে এই সুন্দর ছোট্ট দ্বীপটি আমার স্মৃতিতে চিরদিনই অমব হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশে সবই বাংলা, হিন্দি নেই—এটা আমায় মুগ্ধ করত। কলকাতায় সবই তো প্রায় হিন্দি, বাংলা আর কতটুকু? এই বৈষম্য আমার বুকে আঘাত করত। বেশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশ টি ভির একটা লাইভ অনুষ্ঠানে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে ইন্টারভিউ দিতে দিতে বলেছিলাম 'এপার পদ্মা ওপার গঙ্গা/ বাংলা ভাষার দেশ। ওখানে শুধুই কাঙালি রয়েছে বাঙালি নিরুদ্দেশ।' কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এই প্রজন্মের সকলে ঘরে ঘরে শুনছেন টিভিতে হিন্দি অনুষ্ঠান। দুঃখ পেলাম। একুশে ফেব্রুয়ারির বাঙালিও এখন ক্রমশ বদলে যাচ্ছেন। হারিয়ে যাচ্ছে বাংলা ভাষার গর্ব। এই নিয়ে ঢাকার এক প্রতাপশালী বিত্তবানের বাড়িতে ডিনার খেতে খেতে আক্ষেপ করছিলাম। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, স্যাটালাইটকে কী করে আটকাব দাদা?

আমি বললাম, কেন? ওদের অনুষ্ঠান না দেখলেই তো ওটা আটকানো যায়। চেন্নাইয়ের তামিলভাষীরা, হায়দ্রাবাদের তেলেগুভাষীরা ওদের স্যাটেলাইট থেকে

পাওয়া কোনও হিন্দি অনুষ্ঠান এখনও দেখেন না। হয় ইংরাজি না হয় শুধু নিজেদেরই অনুষ্ঠান দেখেন। চেন্নাইতে এবং হায়দ্রাবাদে অনেকের ঘরেই টিভি দেখতে গিয়ে আমি এর প্রমাণ পেয়েছি।

কথাটা শুনে ঢাকার বাঙালি ভদ্রলোক পানপাত্রে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসে গভীর প্রত্যয়ে বলে উঠলেন, মাদ্রাজ হায়দ্রাবাদ যখন পারছে তা হলে আমরা পারব না কেন? আমরা আমাদের টিভিতে হয় শুধু ইংরাজি অনুষ্ঠান দেখব, না হয় শুধু দেখব আমাদের বাংলা অনুষ্ঠান।

আমাদের কথার মাঝখানেই ভদ্রলোকের জিনস আর ব্যাগি শার্ট পরা তরুণী কন্যা ছুটে এসে ঘরের টিভিটা চালিয়ে দিল।

পর্দায় ফুটে উঠল একটা বেসরকারি চ্যানেলে হিন্দি অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ফিল্মি নাচা গানা। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের প্রবল যন্ত্রণা।

ভদ্রলোক মুহূর্তে সব ভুলে ওই অনুষ্ঠান পরম আনন্দেই উপভোগ করতে লাগলেন। আমার শুধু মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল এবং মনে মনেই বললাম, হ্যাঁ, এপার-ওপার দুই বাংলার বাঙালিই আজ একই সূত্রে বাঁধা পড়তে চলেছে। অন্তত স্যাটেলাইটে দেওয়া এই অভূতপূর্ব হিন্দি অনুষ্ঠানের মায়াডোরে।

১৯৪৭-এ দেশ ভাগ হওয়ার কিছু পর ঢাকায় যখন ফিল্ম স্টুডিয়ো তৈরি হতে লাগল, ওখান থেকেই বানানো শুরু হল বাংলা ছবি। তখন এখানকার টালিগঞ্জের ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করা অনেক শিল্পীই নতুন সুযোগ পেয়ে প্রমাণ করে দিলেন ওঁদের কুশলতা। সেই সময় আমার এখানকার পরিচিত সুরকার ও গায়ক বন্ধু ঢাকায় চলে যান এবং ওঁর সুরের গানগুলো পর পব হিট হতে থাকে। আমার সেই বন্ধুর নাম সত্য সাহা। সেই থেকে ঢাকায় গেলেই ওঁর বাড়িতে আমার আড্ডার আসর জমে। যতদিন ঢাকায় যেতে পারব ততদিনই চলবে এই আসর। এখন এখানকার বেশ কিছু ছবিও উনি করেছেন যাতে আমি গান লিখেছি।

সেই সত্যই কিছুদিন আগেই কলকাতায় এসে আমাকে দিয়ে ওর জীবনের শেষ বাংলা ছবির গান লিখিয়ে রেকর্ড করে হঠাৎ চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে। ও-ছবির পরিচালক নারায়ণ বাবু ওকে এয়ারপোর্টে ছাড়তে এসে, নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন রুবি হসপিটালে। সত্য নেই, ভাবতে পারি না।

কলকাতা থেকে আরও একজন সুরশিল্পী ঢাকায় গিয়ে খুবই প্রতিষ্ঠা পান। তিনি তখনকার নামকরা নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী জয়শ্রী সেনের স্বামী কৃতী গিটারিস্ট সমর দাশ। আমার স্মৃতিতে সমর দাশ নামটাই মনে আসছে।

এ ছাড়া ঢাকায় আমি আর যাঁদের সুরে কাজ করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলাউদ্দিন আলি। আলাউদ্দিন ভাইয়ের সুরে রুনা লায়লার 'বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে....' এবং 'সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী...' এই গান দু বাংলাতেই সুপারহিট। সম্প্রতি আর একজন সুরকারের গান লিখে খুবই আনন্দ পেলাম, তাঁর নাম মহম্মদ আনোয়ার জাহান নান্টু।

ঢাকায় তৈরি আর যে সব ছবিতে আমার গান লেখার কথা স্মরণে আসছে তার মধ্যে

প্রথমেই আসে চিত্র সম্পাদক ও পরিচালক আওকাত হোসেনের নাম। ওঁর 'বন্ধু আমার' ছবির গান আমাকে দিয়েই লেখান। এ ছাড়াও আওকাত ভাইয়ের অন্য দুটি ছবি 'আশিফ প্রিয়া' এবং 'উচিত শিক্ষা' এই সব ছবির গানও লিখি।

৬১

আজ এই লেখাটা শুরু করতে গিয়েই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আমার এক প্রিয়জন। হিন্দি গানের বিখ্যাত গীতিকার ইন্দিবর। ইন্দিবরের সঙ্গে কবে কোথায় প্রথম আলাপ হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। তবে মুম্বই-এর জুহু ভিলে পার্লেতে বাপি লাহিড়ির 'লাহিড়ি হাউসে' আমাদের প্রায়ই আড্ডা জমত। আমি যেতাম বাপি লাহিড়ির বাংলা গান লিখতে। উনি আসতেন হিন্দি গান লিখতে। বাপি ঠাট্টা করে ওঁকে ডাকত 'কবিরাজ' বলে। ইন্দিবর বলতেন, পুলকজিকে কী নামে ডাকো?

বাপির পিতা অপরেশ লাহিড়ি হাসতে হাসতে জবাব দিতেন, কেন? 'কবিবর'।

মনে আছে বাপির মিউজিক রুমে আমি যখন এক সিটিং-এ লতাজির জন্য লিখলাম 'আমার তুমি' ছবির গান 'বলছি তোমার কানে কানে' আর পঙ্কজ উধাসের জন্য 'সে কেন আমাকে বুঝল না।'

খবর পেলাম ড্রইং রুমে ইন্দবরজি এসেছেন। তৎক্ষণাৎ বললাম, বাপি ওঁকে ভেতরে ডাকো। ইন্দবরজি এলেন। গান শুনলেন। বাপি হিন্দিতে মানে বুঝিয়ে দিল। এরপর বাপিই বলল, শুনুন। কবিরাজ কালকে কী গান লিখেছে। বাপি হিন্দিতে গাইল। তারপর বাংলায় বুঝিয়ে দিল তার অর্থ।

সরল সহজ স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তিতে ভরা ইন্দবরজির গান আমায় ভীষণ আকর্ষণ করত। গান শুনে জড়িয়ে ধরলাম ওঁর হাত। উনিও আমার গান সম্পর্কে ওঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন ওই একই ভাবে—উত্তপ্ত স্পর্শে।

বাপির ডাইনিং টেবিলে পাশাপাশি বসে আমি, ইন্দবরজি আর বাপি কতদিন যে আনন্দের সঙ্গে ভোজন পর্ব সমাধা করেছি তাই ইয়ত্তা নেই। কতবার এমনও হয়েছে সন্ধ্যায় ইন্দবরজির সিটিং, রাতে আমার সিটিং। আমি যখন বাপির মিউজিক রুম থেকে বেরিয়েছি তখনও দেখি ইন্দিবরজি, বাপির ড্রইং রুমে বসে অপরেশদা আর বাপির স্ত্রী চিত্রাণীর সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। অপরেশদা বলেছেন, পুলক, কবিরাজ তোমাকে তোমার হোটেলে ওঁর গাড়িতে ছেড়ে আসবে বলে এখনও বসে আছেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁর গাড়িতে উঠেছি। গাড়ি চালাতে চালাতে ইন্দিবরজি বলেছেন, চলুন আমার বাড়িতে ডিনার খেয়ে ফিরবেন। অবশ্য আইটেম খুব সামান্য। ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেছি ঘরভর্তি বই। বেশির ভাগই হিন্দি লোকগীতির সংকলন। ভজন গানের সংকলনও চোখে পড়ল।

দীর্ঘদিন উনি একাই স্ত্রী ছাড়া জীবন কাটিয়েছেন। স্ত্রী ওঁকে ছেড়ে আলাদা থাকতেন। এই আলাদা থাকার দুঃখ নিয়ে বেশ কিছু গানও লিখেছেন। অতএব ঘর সংসারের টান

অত প্রবল ছিল না। প্রবল ছিল পড়া, লেখা আর মদিরার প্রতি আসক্তি। আমি ওঁর কাছে প্রায়ই শুনতাম না জানা না শোনা কতসব হিন্দি লোকগীতি। মাঝে মাঝে সুর দিয়ে গেয়েও শোনাতেন। যেখানটার মানে বুঝতাম না সেখানটার মানে জিজ্ঞেস করলেই ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিতেন তার অর্থ। আমি শোনাতাম রবীন্দ্রনাথের গান। ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিতাম অর্থ। একদিন রবীন্দ্রনাথের 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না। হায় ভীরু প্রেম হায় রে' এই গানটা শোনাতেই বললেন, আরে এটা তো অলরেডি হিন্দি গানে লাগানো হয়ে গেছে। কথাটা শেষ করেই উনি গেয়ে উঠলেন 'তেরে মেরে ইতনা প্যায়ার। লেকিন কিস্‌সে লাগতা হ্যায় ডর' (আমার হিন্দি অনুলিপি ভুল হলে পাঠক পাঠিকারা মার্জনা করবেন)।

হঠাৎ একদিন খোলাখুলি আমায় বললেন, শুনেছি বিলিতি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে আছে? আমার এ ব্যাপারে কিছুই পড়াশোনা নেই। পুলকজি, আপনি দু-একটা উদাহরণ দিতে পারবেন?

আমি বললাম, যতটা শোনেন, ঠিক ততটা প্রভাব নেই। তবে কিছু নিশ্চয় আছে। যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'কাম দ্য ওয়াইল্ড ওয়েদার/কাম স্লিট্ অর স্নো/উই উইল স্ট্যান্ড বাই ইচ আদার/হাউ এভার ইট ব্লো।' এটার ভাবনাতেই লেখা হয়েছিল 'পাড়ি দিতে নদী/ হাল ভাঙে যদি/ছিন্ন পালের কাছি/মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব/তুমি আছ আমি আছি।'

এই গানটা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে গেলেন ইন্দিবরজি। পুরো কবিতাটি আমার কাছ থেকে যতবার শুনলেন ততবারই পানপাত্রে চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, টেগোর ইজ গ্রেট। পুলকজি আপনার কত সৌভাগ্য আপনি টেগোরের লেখাকে সোজাসুজি শোনেন। সোজাসুজি বোঝেন। আমাদের মতো অনুবাদের বাঁকা রাস্তায় শুনতে হয় না।

সদাহাস্যময় এই মানুষটিকে দেখেছি আনন্দে আর দুঃখে কোনও রূপান্তর নেই। একই স্মিত হাসি ওঁর চোখে মুখে। যতদূর স্মরণে আসছে মাস কয়েক আগে বাপির বাড়িতেই আমাদের শেষ দেখা। শেষ জীবনে অনেকগুলো বছর উনি একা কাটিয়ে গেলেন। কাজ অবশ্য প্রায় শেষ পর্যন্ত করে গেছেন। কিন্তু সুখ শান্তি কতটা পেয়েছেন আমি জানি না। তবু ওই বন্ধুবৎসল হাসিমুখের মানুষটি ছাড়া আমার ভবিষ্যতের মুম্বই প্রবাসের দিনগুলো যে তেমন আনন্দের হবে না, এ আমার কান্না ভেজা ঝাপসা চোখেও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কলকাতায় বসেই পরিচালক স্বপন সাহার মধ্যস্থতায় ঢাকায় আর একটি ছবির জন্য গান লিখলাম। সেই ছবির নাম 'টার্জন কন্যা'। সুরকার এখানকার অনুপম দত্ত। ঢাকার আর একজন নামী প্রযোজক ও পরিচালক মইনুর হুসেন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার আজ পর্যন্ত ওঁর কোনও ছবিতেই আমার গান লেখার সুযোগ হয়নি।

ঢাকার আর এক পরিচালক একবার আমায় খুব অবাক করে দিয়েছিলেন। ঢাকার স্টুডিয়োতেই শুটিং দেখতে দেখতে গল্প করছিলাম। বলছিলাম, দেখুন না ভাই, প্রযোজক ঢালী সাহেবের সুপারহিট ছবি 'রাধাকৃষ্ণ'-তে আমার লেখা 'ও দয়াল বিচার

কর' গানটি প্রায় হুবহু ব্যবহার করা হয়েছে আমার অজান্তে। এখানকার 'ফাদার'-এ আমার লেখা 'আয় খুকু আয়', গানটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটাতেও অনুমতি নেওয়া হয়নি। ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। সেদিন আমার সঙ্গে বসে আর যাঁরা গল্প করছিলেন, তাঁরা সকলেই আমার কথাটা মেনে নিলেন। এর কিছুদিন বাদেই ঢাকার এক চিত্র পরিচালক, নাম সম্ভবত আফতার কবীর আমায় ফোন করলেন। 'দাদা, আপনার সেদিনের কথাটা আমার বুকে বেজেছে। আপনি আমার ছবিতে গান লিখুন।' সত্যি এ ব্যবহার ভোলবার নয়। ঢাকার সিনেমা জগতের যে সব মানুষের ঐকান্তিক আত্মীয়তা পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আসছে চিত্র নায়ক ও পরিচালক আলমগিরের নাম। অমন সহজ, সরল, মিশুকে মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। ওঁর স্ত্রী খোসনূর কবি ও গীতিকার। ওঁর অনেক গদ্য রচনাও আমি পড়েছি। মনে আছে একবার আমাকে সস্ত্রীক আলমগির নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁদের উত্তরা মডেল টাউনের 'তসবির' নামে সুন্দর বাড়িটাতে। তসবির ওঁদের ছেলের নাম। ছেলের নামেই বাড়ির নাম। আর দুই মেয়ে তাদের নাম আঁখি আর তুলতুল। আলমগির এখানে ও কলকাতাতেও ছবি পরিচালনা এবং অভিনয় করেছেন। এপার ওপার দুপারেই ওঁর যথেষ্ট সুনাম। ওঁদের বড় মেয়ে আঁখি চমৎকার গান গায়। আঁখি ওর প্রথম ক্যাসেটের জন্য আমায় বলল, আঙ্কেল আমার ক্যাসেটে তোমার গান চাই। ওঁর অনুরোধ এড়ানো বড় কঠিন। আমি ক্যাসেটের জন্য গান লিখে দিলাম। ক্যাসেট রিলিজের সময়ও ঢাকায় ওদের নতুন বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। যে আঁখির গানের ব্যাপারে আলমগির খুবই আগ্রহী ছিল সেই আঁখির ক্যাসেট রিলিজে ওর বাবা আলমগিরকে অনুপস্থিত দেখলাম।

তসবির ওঁদের আর নেই। ধুয়ে মুছে গেছে ছবির সব রং। নিয়তির খেলায় ভেঙে গেছে খোসনূর-আলমগিরের সুখের সংসার। আমার স্ত্রীর চোখে খোসনূর আর আলমগির ছিল সব থেকে সুখী দম্পতি। আমি জানি আলমগির যখন বিদেশে চিকিৎসার জন্য ছিলেন তখন খোসনূর প্রায় প্রতিদিনই ওখানে ফোন করতেন। আর খোসনূর যখন লন্ডনে, আলমগির তখন কলকাতায় আমার সামনেই ওঁকে ঘন ঘন ফোন করতেন লন্ডনে। কিন্তু অত সুখ ওঁদের আর সইল না। আলমগিরের জীবনে এসে গেল বিখ্যাত গায়িকা রুণা লায়লা। খোসনূর একা হয়ে পড়লেন। সেই জন্যই কি না জানি না খোসনূর নতুন গদ্য গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'একান্ত নিঃসঙ্গতা'। আমি জানি আধুনিক জীবনে এমন ঘটনা অনেক ঘটে। সবই মেনে নিতে হয়। তবুও কেন জানিনা 'তসবির'-এর সেই দিনগুলোর কথা আজও সোনার অক্ষরে মনে লেখা রয়েছে।

খোসনূর প্রায়ই কবিতায় চিঠি লেখেন আমায়। ওঁর অনেক কবিতাই আমার ভাল লেগেছে। তবে একটা কবিতাতে উনি লিখেছিলেন 'দরজা যতই বন্ধ কর/আসব শব্দ হয়ে। অনুভবের কাগজ ছুঁয়ে/লেখার ছন্দ হয়ে/যখন তখন লিখব চিঠি/ অনুরাগে উষ্ণ প্রীতি/ভেঙেচুরে হাজার রীতি/মিষ্টি স্মৃতি দস্যি কথায়/দুঃখে স্তব্ধ হয়ে।' এই কবিতাটি ভুলতে পারি না।

এবার উত্তরা মডেল টাউনেই ওঁর নতুন বাড়িতে দেখলাম উনি দেওয়ালে বড় বড় করে লিখে রেখেছেন 'ভাগ্যে যা আছে তা ভাবব না/ নেই সুখ এই কথা মানব না।'

ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই জীবনের গতি। পুরনো সূর্য ডুবে যাবে উঠবে নতুন সূর্য। কেউ হয়তো নতুন সূর্যের সোনালি আলোয় প্রাণ ভরে দেখবে নতুন দিনকে। কেউ হয়তো ফেলে আসা দিনের কিছু অনুরাগ, কিছু রং তুলে রাখবে মনের মণিকোঠায়। কে কোন দলে জানি না।

আমি রুণা লায়লার গানের দারুণ অনুরাগী। আমার অনেক গান আশ্চর্য অভিব্যক্তিতে গেয়েছে ও। আলমগিরও আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ। আমি দুজনার সুখী জীবন কামনা করি!

আবার প্রসঙ্গান্তরে যাই। অপরেশ লাহিড়ির প্রথম গান আমি শুনি 'তুমি নাই চাঁদও নাই/রয়েছে যে খোলা স্মৃতির দুয়ার'। কুন্দনলাল সায়গলের মতো ভারী মিষ্টি গলা, আমার সেই উত্তর কৈশোরের দিনগুলো মাতিয়ে রাখত। যতদূর জানি রেকর্ডটির প্রিলিউড মিউজিকে গিটার বাজিয়েছিলেন বিখ্যাত সুজিত নাথ। কলকাতায় গিটার জনপ্রিয় করার মূলে এই মানুষটির অবদান সর্বাধিক। ওঁরই সার্থক শিষ্য, কাজী নজরুল ইসলামের পুত্র বিখ্যাত গিটার বাদক কাজী অনিরুদ্ধ। যাকে আমরা 'নিনি' বলে ডাকতাম। কাজী সাহেবের আর এক পুত্র ছিলেন বিখ্যাত আবৃত্তিকার। তাঁর নাম কাজী সব্যসাচী। সব্যসাচীর ডাক নাম ছিল 'সানি', কাজী নজরুল এক ছেলের নাম দিয়েছিলেন 'সানি' আর এক ছেলের নাম দিয়েছিলেন 'নিনি'। অপূর্ব সুন্দর দুটি ডাক নাম।

সলিল চৌধুরীও মেয়েদের নাম দিয়েছেন 'অন্তরা' 'সঞ্চারী'। সুরকার অনল চট্টোপাধ্যায় ছেলের নাম দিয়েছেন ইমনকল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। যে এখন চিত্র পরিচালক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে। সুরকার অজয় দাস ওঁর কন্যার নাম দিয়েছেন ঠুংরি। গিটারিস্ট সুজিত নাথের ছায়ায় গড়ে ওঠা আর এক গিটারিস্ট আমার খুবই ঘনিষ্ঠ। তাঁর নাম বটুক নন্দী। ওঁর সুরে আমি কিছু গানও রচনা করেছি। ওঁর পুত্র নীলাঞ্জন নন্দী, যার সঙ্গে সুরকার অসীমা মুখোপাধ্যায়ের (ভট্টাচার্য) মেয়ে পম্পির বিয়ে হয়েছে। নীলাঞ্জনও সুরকার ও যন্ত্রশিল্পী। ওর সুরে পলিডোরের এল পি রেকর্ডের 'সাহেব' নাটকে আমি গান লিখে খুবই খুশি হয়েছিলাম।

অপরেশ লাহিড়ির আর একটি সুপারহিট গানের কথা মনে আসছে। গানটি ছিল 'ভালবাসা যদি অপরাধ হয়। আমি অপরাধী তবে।' এই গানটি প্রসঙ্গে অপরেশদা একদিন আমায় একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। একদিন উনি দেশপ্রিয় পার্কের এক রাজনৈতিক সভায় হাজির হয়েছিলেন। দেশ তখন পরাধীন। এক নামী নেতার ভাষণে শুনেছিলেন তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বলছেন 'দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি অপরাধী।'

সমবেত জনতা বিরাট করতালি দিয়ে সেই ভাষণটি গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন কিংবা তার পরদিনই অপরেশদা ওই গানটি রচনা করালেন এক গীতিকারকে দিয়ে। সেই সময় অপরেশদার প্রতিটি গানই জনপ্রিয় হত। যতদূর স্মরণে আসছে অনুপম ঘটক সুরারোপিত 'তুলসীদাস' ছবিতেও অপরেশদার একটি ব্যতিক্রমী গান ছিল। নিউ থিয়েটার্সের রাঁইচাদ বড়ালের খুবই কাছের লোক ছিলেন উনি। কিন্তু শুধু নিজেকে নিয়েই মত্ত থাকেননি কোনও দিনই। অন্যেরও উপকার করে গেছেন। রাইচাঁদ বড়ালের

কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে। প্রথম জীবনে উনি যোগ দেন মেগাফোন রেকর্ডে। মেগাফোনের কর্ণধার মেগা ঘোষ অর্থাৎ আজকের কমল ঘোষের জ্যাঠামশাই অন্ধ জে. এন. ঘোষের খুবই প্রিয় পাত্র ছিলেন অপরেশদা। জে. এন. ঘোষের মেগাফোন রেকর্ডে প্রতিটি রেকর্ডে নাম্বার থাকত জে এন জি দিয়ে। যেমন জে এন জি ফাইভ সিকস্, জে এন জি থ্রি জিরো ওয়ান এই রকম। অপরেশদা ওখানেও অনেক নতুন শিল্পীকে দিয়ে গান করাতে রাজি করিয়েছিলেন মেগা ঘোষকে দিয়ে। ওখানেই অপরেশদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বাঁশরী চক্রবর্তীর। উনিও তখন মেগাফোনেরই শিল্পী।

৬২

বাঁশরীদির কণ্ঠের ভিন্নতা সহজেই আকৃষ্ট করে অপরেশদাকে। ক্রমশ দুজনে দুজনকে ভালবেসে ফেলেন। শুনেছি অপরেশ লাহিড়ি আর বাঁশরী চক্রবর্তীর শুভ বিবাহ জে. এন. ঘোষ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেন। হ্যারিসন রোডের দিলখুশা কেবিনের উল্টো দিকের ওই মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানিতে যাঁরাই যেতেন তাঁদের কাউকে কিন্তু দিলখুশার খাবার খাইয়ে দিলখুশ না করে, ওখান থেকে বার হতে দিতেন না মেগা ঘোষ।

ওই বাড়িতেই বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন মেগাফোনের সব থেকে সেরা শিল্পী কাননদেবী। এখন মুম্বই-এর জুহু ভিলে পার্লে স্কিমের বাড়ির অলিন্দে কবে কখন একবার দেখা দেবেন অমিতাভ বচ্চন তার জন্য যেমন প্রতিদিনই অমিতাভ ভক্তরা রাস্তায় হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকেন, ঠিক তেমনি তখন হ্যারিসন রোডে দাঁড়িয়ে থাকতেন কানন ভক্তরা। কবে কখন উনি বারান্দায় আসবেন, কখন গাড়িতে উঠে স্টুডিয়োতে যাবেন, ওঁরা চোখ ভরে দেখবেন।

যাই হোক, অপরেশ লাহিড়ি শঙ্কর জয়কিষেণের 'বাদশাহ' ছবিতে হিন্দি গান গেয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন মুম্বই। তখন মুম্বই-তে সায়গল কণ্ঠের ভীষণ কদর। গান গেয়ে মুম্বই-তে জনপ্রিয়তা পেলেও, মুম্বই-তে বেশি দিন থাকতে না পেরে ফিরে এলেন কলকাতাতে। এখানে এসে এরপর শুরু হয় অপরেশদার নতুন ভূমিকা। গায়ক অপরেশ লাহিড়ি হয়ে যান সুরকার অপরেশ লাহিড়ি। ইতিমধ্যে বাঁশরী বউদি যেমন রাগাশ্রয়ী গানেই ক্রমশ বেশি সার্থক হয়ে উঠতে লাগলেন, তেমনি অপরেশদা ফোক গানে বেশি পারদর্শিতা প্রমাণ করতে লাগলেন।

ভূপেন হাজারিকা যে সময় পরিচালক হয়ে অহমিয়া ভাষায় 'এরাবটের সুর' ছবি করেন। প্রায় সেই সময়েই অপরেশদাও ছবি করেন 'ও আমার দেশের মাটি'। দুটি ছবিরই বিষয়বস্তু ছিল ফোক সঙ। একটি অহমিয়া অন্যটি বাংলা। 'ও আমার দেশের মাটি'-তেই লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে অপরেশদা গাওয়ান 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'।

বাংলা মাটির এই গানটির অভিব্যক্তি লতা মঙ্গেশকর সারা পৃথিবীর মাটির কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

অপরেশদাই পীযূষ বসুর 'সুভাষচন্দ্র' ছবিতে, লতাজিকে দিয়ে গাওয়ান বাংলার সেই

বিখ্যাত গান 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। লতাজির কণ্ঠের এই গান শুনে অনেকেরই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। এই গানটি রেকর্ডে প্রকাশিত হওয়ার আগে স্বয়ং লতাজি এক সন্ধ্যায় নিজের ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে আমায় কথায় কথায় বলেছিলেন, অপরেশদা কা গানা বহুত চলে গা।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী জন্য আপনার এই ধারণা হল?

লতাজি বললেন, গানটিতে একমাত্র একটা তারের যন্ত্রের বাজনা ছাড়া কোনও বাদ্যযন্ত্রই নেই।

আমি বুঝলাম অগুন্তি বাজনাদারের বাজনার সঙ্গে প্রতিদিন গান গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত লতাজি একটা নতুনত্বের আস্বাদ পেয়ে একথাটা বললেন। কিন্তু উনি তৎক্ষণাৎ আমার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন. না না। আসলে গানই যে সব, বাজনা নিমিত্ত মাত্র, এটা অপরেশদা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

লতাজির গাওয়া অপরেশদার সংগীত পরিচালনায় এই 'একবার বিদায় দে মা' গানটি শুনে আজকের অনেক নামী দামি মিউজিক অ্যারেঞ্জাররা মুখে না হলেও মনে মনে নিশ্চয়ই মানবেন লতাজির এই উক্তির যথার্থতা। অপরেশদার অনেক আধুনিক গানই আমি লিখেছি মেগাফোন ছেড়ে এইচ. এম. ভি.-তে যোগ দেওয়ার পরে। এবং আবার পরবর্তীকালে এইচ.এম. ভি. ছেড়ে মেগাফোনে যোগ দেওয়ার পর। তার মধ্যে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে 'এই পৃথিবী/ভরা সাহেব বিবি' এবং ভূপেন হাজারিকার সুরে 'জলের জাহাজ জল কেটে যায়...' ও 'থাক থাক পিছু ডাক...' আমার খুবই প্রিয়।

অপরেশদার সুরে সিনেমায় যতদূর মনে পড়ছে প্রথম গান লিখি 'অজানা কাহিনী'-তে। এইভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে, যে বাপির জন্মদিনে প্রতি বছরই অপরেশদার টালিগঞ্জের বাড়িতে আমি, উত্তম এবং আরও অনেকে খুব হই হল্লা করতাম, যে ছোট্ট বেলাতেই নামী তবলিয়া শান্তা প্রসাদের কাছে নাড়া বেঁধেছিল যে, ছোট ছোট দুটো হাতে লহরার বোলতরঙ্গ ফুটিয়ে আসরের পর আসর মাত করে দিত, সেই বাপি বড় হয়ে উঠল।

একদিন অপরেশদার ফোন পেলাম, পুলক একটা ছবির গান লিখতে হবে। এসো।

স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করলাম, কার ছবি অপরেশদা? পরিচালকই বা কে?

উত্তরে শুনলাম, সে সব এখানে এসে শুনো। এখন শুধু শুনে নাও, অপরেশ লাহিড়ি মিউজিক ডিরেক্টর নয়। এই ছবির মিউজিক ডিরেক্টর তোমার লেখার মুগ্ধ ভক্ত বাপি, বাপি লাহিড়ি।

যথাসময়ে হাজির হলাম অপরেশদার বাড়িতে।

দেখি বাপি সুর করে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। ওই সুরের উপর লিখতে হবে আমায় গান।

অপরেশদা ছবির গল্পটি শোনালেন। খুবই নতুনত্ব লাগল গল্পটি। ছবির কী নাম ঠিক ছিল আজ আর মনে আসছে না। তবে এই গল্পটিরই হিন্দি ভার্সান করেছিলেন আর. ডি. বনশল তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি 'ঝুক গয়া আসমান' নামে। সিচুয়েশন বুঝে সুর শুনলাম বাপির। বাপি হারমোনিয়াম বাজিয়ে শোনাল। চমকে উঠলাম! যে সব সুরকারের

অসাধারণ হারমোনিয়াম বাজনা আমি শুনেছি, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে সুধীন দাশগুপ্ত ও সলিল চৌধুরীর নাম। আর একজন জাদু জানা বাদ্যযন্ত্রীর আঙুলের ছোঁয়ায় হারমোনিয়াম যে কীভাবে বাজতে পারে তা উপলব্ধি করেছি ভি. বালসারার হারমোনিয়াম বাজনা শুনে। অবশ্য বারকতক সৌভাগ্য হয়েছিল ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মনমাতানো হারমোনিয়াম শোনার। কিন্তু বাপির হারমোনিয়াম শুনলাম একেবারে ভিন্ন ধর্মী। ওর গলার গানের সুরকে অপরূপ সৌন্দর্যে সাজিয়ে দিয়েছিল ওর সেদিনের হারমোনিয়াম বাজানো।

আমি গান রচনা করলাম। বাপি তো আত্মহারা। অপরেশদা বাঁশরী বউদি প্রত্যেকেই দারুণ খুশি। সেদিনই ওখানে ভূরিভোজ সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে স্থির সিদ্ধান্তে এসে গেলাম। আজ যাকে অঙ্কুর দেখে এলাম, আগামী দিনে সে যে এক বিশাল বনস্পতি হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বাপির সে গান রেকর্ডিং হয়নি। হয়নি সেই বাংলা ছবিটিও। পরবর্তীকালে বাপি সংগীত পরিচালনার সুযোগ পেল 'দাদু' ছবিতে। অবশ্য বাপি এককভাবে ওই ছবির সংগীত পরিচালনা করেনি। সঙ্গে ছিল আরও কেউ কেউ। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা, তখনকার কলকাতার বাসিন্দা বাপি সুদূর মুম্বই গিয়ে লতাজিকে অনুরোধ উপরোধ করে অল্প পারিশ্রমিকে রেকর্ড করে আনে লতাজির গাওয়া গান 'আমি প্রদীপের নিচে পড়ে থাকা/এক অন্ধকার'। এই গানটি প্রযোজক রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া এবং পরিচালক অজিত গঙ্গোপাধ্যায় দুজনেই শুনে তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দেন। গানটির কথা ঠিক রেখে, নতুন করে সুর করানো হয় কালীপদ সেনকে দিয়ে। আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গানটি কলকাতায় রেকর্ড করা হয়। কালীপদ সেনের সুরটিই ছিল 'দাদু' ছবির অভিনেত্রীর ঠোঁটে। অনেকেরই ধারণা ছবির জগতের পথগুলো ফুল দিয়ে ছাওয়া। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সে পথ ভঙ্গুর। অজস্র কাঁটার জ্বালায় ভরা। অনেকের মতো বাপির জীবনে তার উজ্জ্বল প্রমাণ আছে। তবু নিষ্ঠা, যোগ্যতা, একাগ্রতা আর সৌভাগ্য বাপির জীবনের লড়াইকে থামতে দেয়নি। বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সব বাধা তুচ্ছ করে সে তো সাফল্যের স্বর্ণ তোরণেই পৌঁছে গেল। ইতিহাস তো এদের কথাই মনে রাখবে। এই বোধ এবং বিশ্বাস আমার মর্মে ছিল বলেই বোধহয় মান্নাদার একটি গানে লিখতে পেরেছিলাম—'পথের কাঁটায় পায়ে/রক্ত না ঝরালে/কী করে এখানে তুমি আসবে?' এরপর 'জনতার আদালত' ছবি করতে করতে অপরেশদা সপরিবারে চলে গেলেন মুম্বই। এবার মুম্বই-তে অপরেশদার ভিন্ন ভূমিকা। সুরকার নয়, নেপথ্য গায়কও নয়, শুধু বাপির প্রোমোটার। চিত্র জগতে অনেকেরই কেউ কেউ 'গড ফাদার' থাকেন। কিন্তু অপরেশ লাহিড়ি, বাপি লাহিড়ির প্রকৃত অর্থেই শুধু 'ফাদার' নন—'গড ফাদার' ঈশ্বরতুল্য জনক। মুম্বই-এর সেই স্ট্রাগলিংয়ের দিনগুলোতে বাপিকে দুহাতে আগলে ঘুরেছেন উনি প্রযোজকদের দরজায় দরজায়। কিন্তু খুব অল্প আয়াসেই সুদিন পেয়ে গেছেন উনি। শুনেছি ফিল্মালয়ের শশধর মুখোপাধ্যায়, বাপির ওই হারমোনিয়াম বাজনা শুনেই ছবিতে সুযোগ দিয়েছেন। নাম হয়েছে বাপির। তারপরেই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এসে গেছে সেই গানটি 'বোম্বাইসে আয়া মেরা দোস্ত, দোস্তকো সালাম করো।' এই গানটার জন্য বাপি কেবল সুরকারই নয়, গায়ক হিসাবে রাতারাতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।

তারপর খুব দ্রুত পট বদলে গেছে। সান্তাক্রুজের লাভলি গেস্ট হাউসে সেই ছোট ঘর ছেড়ে বাপি চলে গেছে সান্তাক্রুজেরই অন্য একটা ফ্ল্যাটে। তারপর জুহুর সমুদ্র তীরে ট্রিটোনে। আর এখন জুহু ভিলে পার্লে মার্বেল মোড়া বিরাট লাহিড়ি হাউস।

মুম্বই-পুনে রোডের কারজাতে সুন্দর ফার্ম হাউসের মালিকানাও পেয়েছে বাপি। পেয়ে গেছে সাফল্যের আরও অনেক ফসল। কিন্তু বাপির সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হয়, কোনও দিন মা-বাবা পরিবারকে এড়িয়ে কোথাও সরে যায়নি।

পারিবারিক জীবনে বাপি তাই বেশ খুশি। পর্যাপ্ত সাফল্য এবং অর্থে অনেক মানুষই ভেসে যায়, বাপি কিন্তু ভাসেনি, নিজেকে স্থির রেখেছে। হয়তো সুন্দরী মন্দাকিনী অথবা গায়িকা নায়িকা সলমা আগাকে, বাপির সঙ্গে জড়িয়ে কখনও কিছু গুঞ্জন উঠেছে কিন্তু তা শুধু ওই গুঞ্জনই থেকে গিয়েছে। তাতে সত্যের ভাগ খুবই কম।

বাপি, তার কাজ, তার বাবা মা স্ত্রী সন্তানদের এড়িয়ে থাকার অবকাশই পায়নি জীবনে। চায়ওনি কখনও। বিদেশে বেড়াতে যাবার সময় মা-বাবা স্ত্রী পুত্র কন্যাকে নিয়ে গেছে। তেমনি জলসার অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছে সপরিবারে। এমন দৃষ্টান্ত চিত্র জগতে খুব বেশি নেই।

বাপি বিয়ে করেছে হাওড়ার লবণ গোলার এক কর্ণধার শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, অল্প বয়সি নাম করা গায়িকা চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের বোন চিত্রাণীকে। হাওড়ার প্রখ্যাত সেন্ট অ্যাগনেস কনভেন্ট স্কুলের কৃতী ছাত্রী রূপবতী চিত্রাণী বাংলা ছবিতে অভিনয়ও করেছে। চিত্রাণীকে ভালবেসে বিয়ে করে সুখী জীবনযাপন করছে বাপি।

বাপির শ্বশুর, ওঁর গায়িকা কন্যা চন্দ্রাণী মুখ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে এইচ. এম. ভি.-তে রেকর্ড করিয়েছেন সলিল চৌধুরীর সুরে। চন্দ্রাণীর গান আমি প্রথম লিখি ডি. এস. সুলতানিয়ার 'এই করেছো ভাল' ছবিতে অধীর বাগচির সুরে। ছবিটিতে একাধিক গান ছিল চন্দ্রাণীর। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কত দিন এমনি চলে যাবে'। তারপর লিখলাম হেমন্তদার সুরে ওর রেকর্ডের দুটো গান তার মধ্যে 'সেই শান্ত ছায়ায় ঘেরা...'। এরপর চন্দ্রাণীর বাবা বদলি হয়ে চলে গেলেন মুম্বই-এর লবণ গোলায়। ওখানে ওদের বাড়িতে থেকে লিখেছিলাম চন্দ্রাণীর জন্য উষা খান্নার সুরে দুটি গান। তারপর বাপি যখন ওদের আত্মীয় হয়ে গেল তখন চন্দ্রাণীর বাবা আমায় মুম্বই-তে ডাকলেন, বাপি আর চন্দ্রাণীর গান লিখতে। তখন ই. পি. রেকর্ডের যুগ। বাপির সুরে চারটি গান লিখেছিলেন সেবার। দুটি বাপির দুটি চন্দ্রাণীর। বাপির একটি উল্লেখযোগ্য গান ছিল 'স্বপ্ন মহলে' আর চন্দ্রাণীর উল্লেখ্য গানটি হল 'চুরি করে আমার মন'। এই গান চারটি আমার লেখা বাপির সুরে প্রথম রেকর্ড।

৬৩

সুখেন দাশের সহকারী তপন ভট্টাচার্য আমাকে হঠাৎ ধরে নিয়ে এল মুম্বই-তে। মুম্বই-তে এসে জানলাম ওর ছবির সংগীত পরিচালক বাপি লাহিড়ি। মুম্বই-তে নামের ইংরাজি অক্ষর গুণে একরকম ভাগ্য পরীক্ষা চালু রয়েছে। সেই অক্ষরের গুনতিকে একটু

বাড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষায় দুর্দান্ত সাফল্যে উত্তীর্ণ বাপি লাহিড়ি তখন বাপ্পি লাহিড়ি হয়ে পরপর ছবির গান হিট করাচ্ছে। সেই বাপ্পির সঙ্গে গান লিখতে বসে দেখলাম, অত হিট হলেও বাপির সেই আগের বাঙালি মেজাজ আর কৌলিন্যের ঘরানা একটুও পাল্টায়নি। আশাজি ও কিশোরদাকে দিয়ে রেকর্ড করা হল সেই ছবির কয়েকটি গান। তার মধ্যে কিশোরদার গাওয়া একটি গানের মুখড়া আমায় দিয়েছিল বাপি। সেটি ছিল 'আমি শালা আজ রাতে..।' অনিবার্য কারণে ছবিটি বন্ধ হয়ে গেলেও কিশোরদার এই গানের মুখড়াটি মনে রেখেছিলেন বেশ কিছুদিন। আমায় দেখলেই আমার গানটির কথাগুলো একটু অদল বদল করে গেয়ে উঠতেন 'আমি শালা আজ রাতে/গৌরাঙ্গের ভজনা করিব হে।'

এরপর বাপি আর আমার যোগাযোগ সুজিত গুহ পরিচালিত দিলীপ পালের 'অমরসঙ্গী' ছবিতে। ওই ছবির প্রতিটি গান বিশেষ করে বাপি আর আশাজির গাওয়া 'আমার ইচ্ছে করছে ভালবাসতে' এবং কিশোরদা আর আশাজির গাওয়া 'চিরদিনই তুমি যে আমার' দারুণ হিট করে। ওয়ার্ল্ড কাপের উদ্বোধনে ইডেন গার্ডেনে সারা পৃথিবীকে সে গান গেয়ে শুনিয়ে দিয়ে আশাজি আমাদের দারুণ সম্মানিত করেছেন। এরপর বাপি আর আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেল। পর পর গান জনপ্রিয় হতে লাগল আমাদের।

এর পর যে উল্লেখ্য গান দু'টির কথা মনে আসছে সে-দুটি শচীন অধিকারীর 'চোখের আলোয়' ছবির—তার একটি ছিল আশাজির গাওয়া 'আর কত রাত একা থাকব' এবং অন্যটি বাপি ও আশাজির গাওয়া 'ওই শোনো/পাখিও বলছে কথা।'। রিতা তরফদারের, প্রভাত রায় পরিচালিত 'অনুতাপ' ছবির গানগুলোও খুব জমেছিল—শানুর গাওয়া—'দুষ্মন্ত রাজা যদি হতাম আমি' খুবই জনপ্রিয় গান। বাপির সুরে আমার সব গান উল্লেখ করতে গেলে অনেক পাতা ভরে যাবে সে লেখায়। তবে আমরা বহু ধরনের সার্থক গান করেছি এটা নিশ্চয়ই জোর গলায় বলতে পারি। যেমন করেছি 'আমার তুমি' ছবিতে লতাজির গাওয়া 'বলছি তোমায় কানে কানে/আমার তুমি'। 'মন্দিরা' ছবিতে লতাজির—'সব লাল পাথর-ই তো চুনি হতে পারে।' 'অন্তরের ভালবাসা' ছবির লতাজির 'তোমার আমার ভালবাসা' 'আশা ও ভালবাসা' ছবির কিশোরদার 'আমায় ফুলের বাগান দিয়ে নিয়ে যেও না।' 'নয়ন মণি' ছবির আশাজি ও বাপির 'তুমি আমার নয়ন গো' ইত্যাদি অনেক ছবির গভীর ভাবের গান আবার ছবির সিচুয়েশন অনুযায়ী হাল্কা গানও করেছি অনেক। তার মধ্যে উল্লেখ্য—'বলিদান' ছবির ঊষা উত্থুপের 'প্রেম জেগেছে আমার মনে—উরি উরি বাবা/'কী দারুণ', 'বদনাম' ছবির অলকা ইয়াগনিকের 'ঝাল লেগেছে ঝাল লেগেছে/ঝালে মরে যাই'। 'রক্তলেখা' ছবির কবিতা কৃষ্ণমূর্তির কণ্ঠে—মেয়ে পকেটমারের গান—'কারও পকেট বড়/কারও পকেট ছোট/ কেউ লম্বা বেশি/কেউ একটু খাটো/ আমি বলি সবাই সাবধান/ আমি কোলকাতার রসগোল্লা' ইত্যাদি।

তবু কেন জানি না, সব গান ছাপিয়ে আমার কানে বাজে বাপির সুরে আমার লেখা প্রভাত রায়ের 'লাঠি' ছবিতে শানুর গাওয়া গানটি 'সুখের সে দেশে/কবে কোন দিনে/কে কখন যাব কে জানে।'

আমার কথায় বাপির সুরে বাপির নিজের গাওয়া প্রচুর আধুনিক গানও আছে। তার

মধ্যেও আমরা দুটি দিকই বজায় রেখেছি। যেমন করেছি 'কখনও দেখেছি খোলা জানলায়...', অথবা 'কেউ গায়ক হয়ে যায়...', আবার করেছি 'আজকের প্রেম ওয়ান ডে ক্রিকেট'। আবার লিখেছি 'আমে দুধে মিশে গেল'।

তরুণ মজুমদারের 'কথা ছিল' ছবির শেষ গানটি রেকর্ডিং করে বাপি আমায় বলল, পুলকদা, এবার আপনারা আমায় ধুতি পরিয়ে ছাড়লেন।

উত্তরে বলেছিলাম, তুমি তো বাঙালি। ধুতি তো বাঙালির জাতীয় পরিধান। তুমি যে কত খাঁটি বাঙালি তা তোমার সুর দেওয়া 'কথা ছিল' ছবির কয়েকটি গানই প্রমাণ করবে। তরুণ মজুমদার যখন বহুদিনের সঙ্গী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে অনিবার্য কারণে ছেড়ে রাহুল দেববর্মণকে দিয়ে 'আপন আমার আপন' ছবির সুর করালেন এবং আরও ছবিতে ভি. বালসারা প্রমুখ সুরশিল্পীকে নিলেন 'সজনি গো সজনি' ছবিতে। সেই সময় ওই সব ছবির গান লিখতে লিখতে তরুণ মজুমদারকে অনুরোধ করেছিলাম, ওঁর পরের কোনও একটা ছবিতে বাপিকে নিতে। তনুবাবু জানতে চাইলেন, হঠাৎ বাপিকে কেন নিতে বলছেন?

উত্তরে বলেছিলাম, আমার ধারণা আপনার ছবিতে বাপির একটা সুন্দর ব্রেক হবে। তখন বাপির 'ব্রেক ডান্সার' সুপার হিট। তনুবাবু সম্ভবত সেই দিকটা ইঙ্গিত করেই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বাপির আর কী ব্রেকের প্রয়োজন?

তবুও ব্যাপারটা নিশ্চয় তনুবাবুর ভাবনাতে ছিল। তাই 'কথা ছিল' ছবিতে বাপিকে নিয়ে নিলেন। উনি জানতেন বাপিকে দিয়ে কী ধরনের বাংলা গান করলে তা ভাল গান হবে। বাঙালি বাপি যে বিরাট বাঙালি প্রেমিক তার পরিচয়ও অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে প্রকৃত গুণী অথচ দৃকভ্রান্ত কিছু বাঙালি তরুণ প্রতিভাধর বাদ্যযন্ত্রীকে কলকাতা থেকে মুম্বই-তে নিয়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে, ওর অর্কেস্ট্রায় দিনের পর দিন সুযোগ দিয়ে ওদের অনেককেই সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এর জন্য ওকে বাহবা দিতেই হয়। আজকের মুম্বই-এ অনেক প্রতিষ্ঠিত বাঙালি বাজনদারকে বাপিই সুযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠার পথ করে দিয়েছে। এদের মধ্যে টাবুন সূত্রধর, সমীর, পিণ্টু, মধু ইত্যাদির নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। বাপির সাজপোশাক, গায়ের গয়নাগাটি দেখে যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা কিন্তু বাপির এদিকটা দেখেন না, এটাই দুঃখের।

বাংলা ছবির বাণিজ্যিক গান বানানোর বাপির ক্ষমতা যে কতটা, বাঙালি শ্রোতামাত্রই তা জানেন। 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবির গানগুলোর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

কিছুদিন আগে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী যখন সল্ট লেক স্টেডিয়ামে গণনাট্য সংঘের উৎসবের জন্য বাপির সুরে একটি উদ্বোধনী গান রচনা করার জন্য আমায় মুম্বই যেতে অনুরোধ করলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সুভাষবাবুর কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। তবুও একটা কথা আমি একান্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সাধারণ বাঙালিরা বাপির এই বিরাট সাফল্যকে যেভাবে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন, বাঙালি সংগীতমহল কিন্তু সেই সাফল্যকে তেমনভাবে গ্রহণ করেননি। এর কারণ বিশ্লেষণ করে আমি অবশ্য ঈর্ষাকাতরতা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাইনি।

অপরেশদার সুরে গান লিখেছি অনেক, বাপির সুরে গান লিখেছি অজস্র। এখন

বাপির ছেলে বাপ্পা লাহিড়ি দুর্দান্ত রিদিম বাজাচ্ছে দারুণ সুরও করছে। মুম্বই-এর অনেক নামী শিল্পীই সেই সব হিন্দি গান রেকর্ড করেছেন। আমি শুধু অপেক্ষা করছি কবে বাপ্পার সুরে গান লিখে, তিন প্রজন্মের সঙ্গী হয়ে থাকতে পারব।

আমার ভগ্নিপতি প্রযোজক সরোজ মুখোপাধ্যায়ের কথা আমি এর আগেও বলেছি। আমার শেষ কৈশোরেই চিত্র জগতের প্রতি আমার অতিরিক্ত আকর্ষণ দেখে এবং আমার বিভিন্ন গান ও গল্প পড়ে হয়তো মনে প্রাণে চাইতেন আমিও চিত্রজগতে আসি। পড়াশোনা শেষ করে ওঁর কাজে সহায়তা করি। সেইজন্যেই আমার স্কুল ছুটি থাকলেই হাজির হয়ে যেতে পারতাম ওঁর অফিসে, ওঁর নিজস্ব চেম্বারে। ওই বয়সেই অনেক বার স্টুডিয়োতে গেছি। প্রজেকশন দেখেছি। ওঁরই সঙ্গে ডি. কে. অর্থাৎ দেবকীকুমার বসুর বাড়িতে প্রথম যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন উনি সরোজদার প্রযোজনায় 'অলকানন্দা' ছবির চিত্রনাট্য লিখছেন।

মনে হল আমার সঙ্গে কথা বলে দেবকীবাবু বেশ খুশি হলেন। ওই অল্প বয়সে আমাকে স্টুডিয়োতে দেখে অনেকেই খুব সঙ্গত কারণেই, আমার পড়াশোনার ক্ষতি হবে এই আশঙ্কায় মনে মনে অখুশি হলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলতেন হ্যাঁ, একেবারে শিকড় থেকে জেনে নাও ফিল্ম লাইনটা কেমন?

আমি তখন মনের কথা আর মুখের কথার পার্থক্যটা বুঝতে পারতাম না। তাই ওঁদের কথাতে প্রচুর উৎসাহ পেতাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একবার রাধা ফিল্ম স্টুডিয়োতে সরোজদা বিখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় করাতেই আমি ওঁকে প্রণাম করেছিলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, সরোজ, এই বয়সে ওকে স্টুডিয়োতে নিয়ে আসছ কেন? ওকে ভাল করে পড়াশোনা করতে দাও।

কথাটা শুনে মনে মনে আহত হলেও নতুন করে বুঝেছিলাম পড়াশোনার কতটা প্রয়োজন। তবুও কলেজ জীবনে যখন গীতিকার হয়ে গেছি এবং মাঝে মাঝে রাত করে বাড়ি ফিরছি তখন আত্মীয়স্বজন মহলেও এ ব্যাপারটা নিয়ে স্বাভাবিক কারণে সমালোচনা শুরু হল। আমার বাবা, আগেই বলেছি নির্বাক যুগের 'শ্রীকান্ত' সহ বহু ছবির নায়ক এবং শান্তিনিকেতনের শিল্পগুরু অসিত হালদারের শিষ্য, আমার পড়াশোনার ব্যাপারে কোনও খোঁজ-খবরই রাখতেন না। কলেজের মাইনে বা অন্যান্য খরচ চাইলেই দিয়ে দিতেন। এবং মাঝে মাঝে বলতেন, সুশীলকে (পরিচালক সুশীল মজুমদার) আর হীরেনবাবুকে (হীরেন বসু) শান্তিনিকেতনে গেলে, শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে দেখা হলে তোমরা আমার কথা বোলো। তারপরে রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকার জন্য মগ্ন হয়ে যেতেন। কিন্তু আমার উপর কড়া নজর রাখতেন সিস্টোফোন সাউন্ড স্টুডিয়োর মালিক এবং বিখ্যাত শব্দযন্ত্রবিদ, বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, আমহার্স্ট স্ট্রিটের বামাদাস চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী বেলমতীদেবী। মা আমার ঘরে লেখার সময়, লেখাপড়া করার সময় মাঝে মাঝে আসতেন। বলতেন, অমুকদি আমায় বলেছেন, হ্যাঁরে, তোর ছেলে সকাল দশটায় কলেজ করতে গিয়ে রাত্রি দশটায় নাকি মাঝে মাঝে বাড়ি আসে? আজকাল অতক্ষণ ধরে কলেজ হয় নাকি?

প্রায়ই আমাকে মায়ের পা ছুঁয়ে বলতে হত, মা, আমি যা কিছুই করি না কেন তুমি

বাধা দিয়ো না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি পরীক্ষার ফল ভাল হবেই। ভগবানের কৃপায় আর আমার মা-বাবার আশীর্বাদে পরীক্ষার ফল ভালই হত। নিজেই চমকে যেতাম ফল দেখে।

কলেজের মাস্টারমশাইরা বলতেন, তুমি নোটগুলো মুখস্থ লেখ না, নিজের ভাষায় লেখ। সে জন্যই নম্বর পাও। আসল কথা কী জানো আমরা নম্বর দিতে চাই কিন্তু নম্বর দেওয়ার অবকাশ পাই না।

যাক এ প্রসঙ্গ ছেড়ে আগের কথাতেই ফিরে আসি।

সরোজদার সঙ্গে গিয়েছিলাম ওঁর 'অলকানন্দা' ছবির মিউজিক ডিরেক্টর ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের উত্তর কলকাতার বাড়িতে ওই ছবির গান শুনতে। ধীরেনবাবু তখন নজরুলের 'শাওন আসিল ফিরে', 'ভোরের ঝিলের জলে' ইত্যাদি গানে পাগল করে দিয়েছেন সংগীত জগৎকে। উনি তখন সুরকারের নতুন ভূমিকায় উপস্থিত। কাননদেবীর নতুন ছবিতেও সুর দিচ্ছেন।

হাওড়া নিবাসী দেবকীবাবুর সহকারী পরিচালক রতন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'অলকানন্দা' ছবির চিত্রপরিচালক। এটিই স্বাধীনভাবে ওঁর প্রথম চিত্রপরিচালনা। দেবকীবাবুর অনুরোধেই সরোজদা এই মানুষটিকে পরিচালক হিসাবে নিয়েছিলেন। ধীরেনবাবুর বাড়িতে সেদিন রতনবাবুও হাজির ছিলেন। ধীরেনবাবু শোনালেন ওঁর সুর করা 'অলকানন্দা' ছবির একটি গান 'সব হারানোর অতল দরিয়ায়/ভাসিয়ে দে রে তরী এবার।'

সরোজদা শুনেই আমার দিকে ফিরে বললেন, পুলক, তুমি তো খুব গান বোঝো। গানটা দারুণ সুর হয়েছে না?

সেই সময় ধীরেনবাবুর গাওয়া নজরুলগীতি আমার মনে সবসময় বিরাজ করছে। তাই চট করে বলে ফেললাম, গানটা যদি ধীরেনবাবু নিজে গান তা হলে আরও ভাল হবে।

কে একজন বললেন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গাইলে চমৎকার হবে। রতনদা আমতা আমতা করে বললেন, আমাদের হাওড়ার বাড়ির কাছেই লক্ষ্মণ দাশ লেনের একটি ছেলে আমায় খুব ধরেছে। তার গান একবার শুনে দেখুন না। ছেলেটির নাম তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে হয় ধীরেনবাবুর গানের কোনও অমর্যাদা করবে না তরুণ।

সরোজদা কিন্তু যতদিন ছবি করেছেন, ছবির গানের ব্যাপারে আমার কথাতে সায় দিয়ে এসেছেন। আমি ধীরেনবাবুর নাম বলেছি শুনেই হয়তো উনি বললেন, তরুণবাবুকে বলবেন ওঁকে অন্য ছবিতে গাওয়াব। কিন্তু এই গানটি গাইবেন ধীরেন মিত্র। অন্য কেউ নয়। এটাই চূড়ান্ত। এবার মেয়েদের গানগুলো শুনি।

এই ঘটনার দু-চার দিন বাদেই একদিন একজন বিনয়ী মানুষ আমার বাড়িতে এলেন। আমাদের বৈঠকখানায় বাবার আঁকা তেল রঙের সাজানো ছবিগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, আপনিও আঁকেন?

কাজের লোককে চা দিতে বলে আমি বললাম, আঁকতাম। এখন আর আঁকি না। এই বয়সে একটা ব্যাপার মনে গেঁথে গেছে, জ্যাক অফ অল ট্রেডস হয়ে গেলে কোনও বিষয়ে মাস্টার হওয়া খুবই কষ্টকর। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা আর কজনের আছে বলুন? ভদ্রলোক আমার কথা মেনে নিলেন। বললেন, আমিও তাই চাকরিবাকরি ছেড়ে শুধু গান নিয়েই থাকতে চাই। আপনি একটু সরোজদাকে বলুন না, যাতে ওঁর 'অলকানন্দা' ছবির গানটি আমায় দেন।

মুহূর্তে বুঝে নিলাম এই সেই রতনদার তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললাম, আপনিই তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়?

উনি বললেন, হ্যাঁ। শুনুন না আমার গান। কথাটা শেষ করে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সামনে রাখা বাবার বিরাট অর্গানটার ডালা খুলে পায়ে বেলো করতে করতে গান শোনাতে শুরু করলেন। পর পর চার-পাঁচটি গান গেয়ে থামলেন।

ততক্ষণে চা এসে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে তরুণবাবু বললেন, আপনিও গানটান করেন নাকি?

বললাম, না তবে নিভৃতে গান লেখার সাধনা করে যাচ্ছি। ব্যাপারটা কেউ জানে না একমাত্র সরোজদা ছাড়া।

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ আমার হাতটা ধরে বললেন, ব্যস, আমরা তা হলে একই গোত্রের, অবশ্যই শাণ্ডিল্য। আপনিও বন্দ্যোপাধ্যায় আমিও বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি গায়ক আপনি গীতিকার। বয়সে হয়তো আমি আপনার থেকে বেশ কিছু বড় হব। তাতে কী। আসুন আমরা বন্ধু হয়ে যাই। আপনি আজ্ঞে তুলে দিয়ে আমরা দুই হাওড়াবাসী এক হয়ে যাই।

এই হল তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের ঘটনা। বন্ধুত্ব পাতালে কী হবে, তরুণ কিন্তু তখনও ছাড়েনি তার প্রথম প্লে-ব্যাক গাওয়ার আবেদন। বুঝিয়ে বললাম, ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। ও গানটা ধীরেনবাবুই গান। সরোজদা যখন কথা দিয়েছেন তখন ভবিষ্যতে ওঁর ছবিতে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান থাকবে। তবে যোগাযোগটা যেন বজায় থাকে।

আমার কথাটা লুফে নিয়ে সেদিন তরুণ বলেছিল, অবশ্যই। আউট অফ সাইট আউট অভ মাইন্ড এ-কথাটা আমি জানি। যোগাযোগ রেখেছিল তরুণ। 'অলকানন্দা'র ওই গানটা ছিল এক বিরাট নাটকীয় মুহূর্তের গান। রতনদা বললেন, প্রচুর পড়াশোনা করে অনেকেই একটু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের একটি মানুষ সাজিয়ে ছবিতে তরুণের ঠোঁটে গানটা দেব। ধীরেন মিত্রের গাওয়া ওই গানটি পর্দায় ঠোঁট নেড়ে অভিনয় করে পরবর্তীকালে জনপ্রিয় গায়ক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রবেশ করল

গানের জগতে। তারপর তরুণ এইচ. এম. ভি-তে যোগদান করল। রেকর্ডে শুনলাম ওর গান 'তুমি শোন না কি আজও আমি ডাকি তোমারে'। তারপর বহু আধুনিক গান হিট হল ওর।

আমি তখন কলেজের ছাত্র। ফিল্মে আমার গান তো হিট হয়ে গিয়েছিল। মনে তাই একটু ভরসা এসে গেল। সেই সময় একটু আধটু সুর করার বাসনাও মনে বোধহয় হয়েছিল। আমার সুর করা সেই সব গান নিয়মিত গাইত রেডিয়োতে। আমাদের স্কটিশচার্চ কলেজের সব অনুষ্ঠানেই তরুণ বাঁধাধরা শিল্পী ছিল। আমার সহপাঠী ছাত্রছাত্রীদের দাবিতে শুধু গাড়ি ভাড়া নিয়ে গান শোনাত।

এরপর এল তরুণের জীবনে আসল ব্রেক। সরোজদা ওঁর কথা রেখেছিলেন। রামচন্দ্র পাল সুর সংযোজিত ওঁর 'মর্যাদা' ছবিতে তরুণকে গান গাইয়েছিলেন। উত্তমকুমারের ঠোঁটে আমার লেখা গান সবাইকে শোনাল তরুণ। উত্তমকুমারের প্রথম প্লে-ব্যাক শিল্পী হল এই তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরে এসেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ভূপেন হাজারিকা, মান্না দে এবং কিশোরকুমার। এই ছবিতেই সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ও জীবনে প্রথম প্লে-ব্যাক করেন। এই তরুণই আমায় হঠাৎ ধরে নিয়ে গেল অনুপম ঘটকের বাড়ি। তখন ও গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য গান তুলছিল অনুপমদার কাছে। গানটি ছিল 'কবে বসন্ত আসিবে'। অনুপমদাকে তরুণ অনুরোধ করল আমার গান নিতে। অনুপমদা ওঁর সেই দরাজ কণ্ঠে আমায় বলেছিলেন, লাফ দিয়ে যখন পড়েছেন, জায়গা একটা পাবেনই।

সরোজদার 'অনুরাগ' ছবিতে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম সংগীত পরিচালক হন। এই ছবিতে আমার লেখা গান গাইয়েছিল সেই তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে।

দেবনারায়ণ গুপ্ত অর্থাৎ দেবুদা আমায় খুবই স্নেহ করতেন। সেই দেবুদা আমায় হঠাৎ একদিন বললেন, পুলক, আমরা এবার শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' গল্পটি মঞ্চস্থ করছি। কিন্তু ভাবছি বাউলের ভূমিকাটি তোমার বন্ধু তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেব। ওর বেশ নাম হয়েছে। গানটা জমাবেও ভাল।

আমি কথাটা লুফে নিয়ে বললাম, বাউলের শুধু তো গান নয়, কিছু সংলাপ কিছু অভিনয় তো থাকবে? তরুণ কিন্তু ভাল অভিনেতা, দারুণ করবে।

আমার কথায় দেবুদা খুশি হয়ে বললেন, তুমি ওকে খবর দাও। আমার সঙ্গে যেন খুব তাড়াতাড়ি দেখা করে। এই স্টার থিয়েটারে!

এ-বার আমি হঠাৎ মুষড়ে পড়লাম। বৃহস্পতিবারটা না হয় হল। কিন্তু শনি, রবিবার? শনি, রবিবারই তো ওর ফাংশন। ওখানেই তো ওর আসল রোজগার।

দেবুদা হাসলেন। আমায়, বললেন, আমি কি ওদিকটা ভাবিনি। ফাংশন তো রাতে হয়। ওর ভূমিকা সাড়ে সাতটা থেকে পৌনে আটটাতেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর ও যত খুশি ফাংশন করুক। 'সারারাত্রিব্যাপী বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান' থেকে ওকে সরিয়ে আনছে কে?

তরুণ 'পরিণীতা' নাটকে নিয়মিত অভিনয় করে গান গেয়ে নাট্য মোদীদের মন ভরাতে পেরেছিল ওর যোগ্যতা দিয়ে। এরপর আর একটি ঘটনার কথা মনে আসছে। তারু মুখোপাধ্যায়ের 'রামধাক্কা' ছবিতে মান্না দে-কে প্রথম বাংলা ছবির সুরকার হিসাবে আমি রাজি করিয়েছিলাম। মান্না দে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু একটাই শর্ত

রেখেছিলেন গান রেকর্ডিং হবে মুম্বই-তে। এবং হিন্দি ছবির যে নামী শিল্পী ওই ছবির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন তাঁর গান গাইবেন লতা মঙ্গেশকর। তারুবাবু এককথায় রাজি হয়েছিলেন। হঠাৎ তরুণ একদিন আমাদের কাছে এসে হাজির। সোজাসুজি বলল, আমি একটা গান গাইব।

বললাম নায়কের গান গাইছেন ছবির সুরকার মান্না দে। নায়িকার গান গাইছেন লতাজি। আর গানের সিচুয়েশন কোথায়?

নাছোড় তরুণকে শান্ত করলেন তারুবাবু। বললেন, বেশ, একটা বাউল অঙ্গের গানের নতুন সিচুয়েশন তৈরি করছি। সেখানে আপনি গাইবেন। কিন্তু গান রেকর্ডিং হবে মুম্বই-তে। ওখানে প্রোডিউসর কেন আপনাকে নিয়ে যাবেন? কেনই বা হোটেলে থাকার খরচা দেবেন?

তরুণ বলল, আমি নিজের খরচায় মুম্বই যাব! আর পুলক তো যাবেই। পুলকের সঙ্গে এক হোটেলে একই রুমে থাকব। তা হলে আর আপত্তি কীসে?

সত্যি আর আপত্তি রইল না। আমরা সদলে মুম্বই মেলে উঠে বসলাম। তরুণ আমার সঙ্গে দাদারের সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে রইল।

আমাদের সঙ্গে তরুণকে দেখে মান্নাদা অবাক। তারুবাবু বললেন, আর একটা সিচুয়েশন বার করতে হল। পুলক গানও লিখে এনেছে। আপনার সুর করতে লাগবে তিন মিনিট।

মান্নাদা বললেন, আমার কিন্তু চটজলদি সুর আসে না। অনেক ভেবেচিন্তে তারপর সুর করি। বলছেন যখন তখন দেখি চেষ্টা করে।

অনিচ্ছুকভাবেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন মান্নাদা। এবং অবাক কাণ্ড চটজলদি চমৎকার সুরও করে ফেললেন। তরুণ বম্বে ল্যাবরেটরিতে জীবনে প্রথম শর্মাজির রেকর্ডিং-এ গাইল আমার লেখা গান 'হার জিতের এই খেলাতে/জীবনটারে মেলাতে'।

'রামধাক্কা'-য় লতাজির দুটো গান ছিল। আর ছিল মান্না দে-র দুটো গান। ছবিটি বেশ কিছুদিন বন্ধ হয়ে পড়ে থেকে হঠাৎ মুক্তিলাভের সুযোগ পেল। তরুণ তখন ভবানীপুরে চলে গেছে; হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে এসে বলল, চল, দমদমে এ সি সেনের কাছে আমরা যাই।

সেই সময় এইচ. এম. ভি-র এ. আর ম্যানেজার গায়ক সন্তোষ সেনগুপ্ত 'আর সময় নেই' বলে এই ছবির গান এইচ. এম. ভি-তে নিতে চাইছেন না। তরুণ বলল, এ সি সেন তোমার কথা শোনেন, তুমি বললে কাজ হবে।

অগত্যা দমদমে গেলাম। এবং আমার কথায় কাজও হল। কিন্তু পুরোপুরি নয়, খানিকটা। মি. সেন বললেন, আমরা এই লাস্ট মোমেন্টে একটি রেকর্ড অর্থাৎ দুটি গান বার করতে পারি। তার বেশি নয়।

আমার সঙ্গে পাঁচটি গানের স্পুল। সুযোগ মাত্র দুটি গানের। কাকে রেখে কাকে ফেলি। বললাম, আপনি বাছুন।

মি. সেন বললেন, অত সময় নেই। আপনি বেছে নিন। তরুণ সঙ্গে রয়েছে। অবশ্যই এটা বিরাট একটা অবলিগেশন। অগত্যা তরুণের গানটি রেখে ও পিঠের জন্য রাখলাম

লতাজির 'দেখ না আমায় আয়না'। বাদ দিতে হল লতাজির গাওয়া আর একটি চমৎকার গান। 'আকাশে বাতাসে আমার ছুটি' আমাদের দুর্ভাগ্য ওই গান রেকর্ডে শুনতে পেল না সত্যিকারের সংগীতপ্রেমী মানুষ, শুনতে পেল না মান্নাদার দুখানা দারুণ গান। অকপটে বলছি, সেদিন তরুণ সঙ্গে না থাকলে আমি রাখতাম লতাজিরই দুটি গান।

'রামধাক্কা' ছবিটি ফ্লপ করল। ছবিটির দুটি মাত্র গান একটি রেকর্ডে প্রকাশিত হল। রেকর্ডের মাধ্যমে দুটি গানই সুপারহিট। সেদিন দমদমে আমার সঙ্গে তরুণের থাকাটাই তরুণের ভাগ্য।

এই তরুণই পরবর্তীকালে আমায় বললে—যাত্রায় বড় প্রশান্ত খুব ভাল সুর করছে— ওকে দিয়ে এবার পুজোর গান করব। সুপারহিট হল ওর সে-বারের একটি গান— 'আলতা পায়ের আলতো ছোঁয়া পড়েছে/আল দিয়ে কে গেছে কোথায় জানি না'।

৬৫

একবার পুজোর গানের জন্য তরুণ হঠাৎ এসে বলল, চলো, বোম্বাই যাই। রাহুল দেববর্মণের সুরে পুজোর গান গাইব।

আমি বললাম, পঞ্চম এখন খুবই ব্যস্ত। বাংলা গান নিয়ে বসতেই পারবে না। ও শুনল না। বলল, তুমি আমি দুজনে ধরলেই কাজ হবে। তুমি যাবে কি না বলো?

বাধ্য হয়ে যেতে হল। তরুণ একেবারে নিশ্চিন্ত ছিল ওর গান হবেই। তখন মহারাষ্ট্রের রেভিনিউ স্ট্যাম্প আলাদা ছিল। ওখানে গিয়ে পেমেন্টের রশিদের জন্য প্রথমেই কিনে ফেলল অনেকগুলো রেভিনিউ স্ট্যাম্প। গেলাম পঞ্চমের বাড়িতে। পঞ্চমকে আড়াল করে রাখতেন ওর এক বন্ধু বাংলা গানের গীতিকার স্বপন চক্রবর্তী। স্বপনবাবুকে ডিঙিয়ে তখন পঞ্চমের কাছে পৌঁছনো সত্যিই দুঃসাধ্য। আমার লেখা এবং লতাজির গাওয়া 'আমার মালতী লতা' এবং 'আমি বলি তোমায়' এই দুটি গানের মাধ্যমেই তো পঞ্চমের বাংলা গানের জগতে প্রথম পদক্ষেপ। তাই হয়তো সেবার পঞ্চমের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলাম।

পঞ্চম তরুণকে বুঝিয়ে বলল, আমি আপনার গানের ফ্যান। কিন্তু এখন তো আমার হাতে সময় নেই। দু-তিন মাস আগে থেকে না বললে আমার সময় বার করা অসম্ভব।

তরুণ বলল, আমি এক মাস অপেক্ষা করব। দু-তিন মাস বাদে হলে তো পুজো পেরিয়ে যাবে।

স্বপনবাবু পঞ্চমের ডায়েরি খুলে দেখালেন দু-তিন মাস পর্যন্ত কোনও ডেট নেই।

কলকাতায় ফিরে এসেই তরুণ বলল, আমি এবার তা হলে নিজের সুরে গান করব। তুমি আমার বাড়িতে সিটিং করো। আজকের মুম্বই-এর ব্যস্ত অ্যারেঞ্জার খোকন চৌধুরীকে নিয়ে আমি, তরুণ আর তরুণের স্ত্রী বসলাম সিটিং-এ। তৈরি হল 'ও সোলেমান সোলেমান'। তরুণের গানের সিটিং-এ কী কথা কী সুর তার চূড়ান্ত অনুমোদনের কাজটি করতেন তরুণের পত্নী মীরাদেবী। এমনও হয়েছে রাতের অধিবেশনে কথা সুর সবার ভাল লাগলেও পরদিন সকালে মীরাদেবী একবার ভুল

করেও যদি বলতেন, না তেমন হয়নি তা হলে আবার নতুন করে আমাদের অধিবেশন করতে হত। কেবলমাত্র দুবার এর ব্যতিক্রম দেখেছিলাম।

একবার মান্না দে'র সুরে তরুণের পুজোর গান 'আমার মনকে নিয়ে...' এবং সুধীন দাশগুপ্তের সুরে 'জঙ্গলে ঝড় এল...'। গানগুলো আমারই লেখা ছিল। এই দুবার দেখেছিলাম মীরাদেবী কোনও মতামত প্রকাশ্যে দেননি। সোজাসুজি অনুমোদন করেছিলেন। একবার মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে তরুণের পুজোর গান লিখেছিলাম। এক পিঠে ছিল 'এক দিন তো আমরা সবাই চলে যাব' অন্য পিঠে ছিল 'প্রেম তো কথার কথা নয়'। গানটা নিয়ে মৃণাল আর আমি যখন হিমশিম খাচ্ছি, কিছুতেই ওকে ভাল লাগাতে পারছি না, তখন মীরাদেবীর একটা বেফাঁস উক্তিতে ওঁর এই মানসিকতাটির আসল কারণ যে এক ধরনের কমপ্লেক্স, তা মুহূর্তে আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উনি কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলেছিলেন, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার যত পুরনো বন্ধুই হোক, মান্না দে-কে আপনি যে গান লিখে দেন তরুণকে তা লিখে দেন না। কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলাম আমি। বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি, মান্না দে'র গলায় যে গান ভাল লাগবে তরুণের গলায় তা ভাল লাগতে পারে না। একই সময়ে আমি মান্না দে-কে লিখে দিয়েছি, 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে', আর হেমন্তদার জন্য লিখেছি 'কতদিন পরে এলে একটু বসো'। দুটো গানই সুপারহিট। কিন্তু হেমন্তদাকে যদি দিতাম 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে' এবং মান্নাদাকে 'কত দিন পরে এলে' তবে দুটো গানই তো মার খেত। আমার এই যুক্তি তখনকার মতো মেনে নিলেও কোনওদিনই এই কথাটা আন্তরিকভাবে মেনে নেননি উনি।

তরুণ আবার সব কাজেই স্ত্রীর পরামর্শ নিত। ব্যাপার দেখে এক এক সময় আমার রাগও হত, আবার এক এক সময় মুগ্ধও হয়ে যেতাম।

তরুণ হঠাৎ একদিন আমায় নিয়ে গেল ওর ভবানীপুরের বাড়ির ছাদের ওপর। বেশ খোশ মেজাজেই বলল, দেখ, আমার বউ এখন রীতিমতো ব্যবসা করছে। তোর ভাইয়ের মতো। অ্যালসেশিয়ান কুকুরের বাচ্চার ব্যবসা।

তারপর হাসতে হাসতে আরও বলল, শ্যামল মিত্ররা দিনকতক জুতোর ব্যবসা করেছিল। দেখা যাক আমাদের ব্যবসা কতদিন থাকে।

তরুণের শাশুড়ি হঠাৎ এক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ওঁকে আর ফিরে পাওয়া যায়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার তরুণের ভাগ্যেও তাই হল। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় হঠাৎ এক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন তরুণের প্রিয়তমা মীরাদেবী। ওঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এই আঘাতটা সহ্য করতে পারেনি তরুণ। আমি লক্ষ করতাম মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত তরুণ।

কবি শৈলেন রায় যে তরুণের জন্য 'কত কথা প্রাণে জাগে' এই গান লেখার পর আমার সামনে ওকে বলেছিলেন, তরুণ তোর কী সুন্দর নাম রে। কোনও দিনও তুই বৃদ্ধ হবি না। চিরকাল তরুণ থাকবি। তোর নাতিও তোকে ডাকবে 'তরুণ দাদু' বলে।

এ হেন চিরতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি বার্ধক্যের হতাশায় দিন কাটাতে দেখেছি। স্ত্রীর বিরহে তরুণ এভাবেই মুখের হাসির অন্তরালে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে

ফেলতে এক দিন আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আমার কানে বাজতে লাগল আমারই লেখা ওর গান 'একদিন তো আমরা সবাই চলে যাব'। তরুণের একটি কন্যা। দারুণ হাত দেখে। খুবই নাম যশ।

তরুণের ছেলে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। আগে তরুণের সঙ্গে গিটার বাজাত। তরুণের পুত্র সন্তান এই একটি। এখন ও গান গাইছে। বেশ ভালই গাইছে। আমি চাই ওর বাবার মতো বড় হয়ে উঠুক। তরুণের নাম রাখুক।

আগেই বলেছি গীতিকার স্বপন চক্রবর্তী পঞ্চমকে প্রায় আগলে রাখতেন। ক্রমশ সেই স্বপন চক্রবর্তী গীতিকার থেকে সুরকার হয়ে গেলেন। আমায় একদিন নিজের কথা শোনাতে শোনাতে স্বপনবাবু বলেছিলেন, জানেন একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া গানপাগল এই আমি মুম্বই-তে এসে দেখা পেলাম পঞ্চমের। ব্যস, দুজনের দারুণ জমে গেল। রয়ে গেলাম এখানেই। আমি জানি অনেকেই বলেন, আমি নাকি অন্য গীতিকারদের পঞ্চমের কাছে আসতে দিই না। কথাটা যে সত্য নয় তার প্রমাণ হল গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মুকুল দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তা হলে পঞ্চমের গান লিখলেন কী করে? আসলে আমি পঞ্চমের হঠাৎ আসা সুরগুলো কথা দিয়ে ধরে রাখি। সেগুলো যাতে হারিয়ে না যায়। এর বাইরে আর কিছু নয়। যাতে সত্যিকারের গীতিকারদের আমার এই এলোমেলো কথাগুলোর ওপর নতুন ভাল গান লেখার সুবিধা হয়। এটাই আসল কারণ। জানেনই তো পঞ্চম কেমন ব্যস্ত। হঠাৎ বাংলা গানের দরকার হলে তৎক্ষণাৎ আপনাদের কোথায় পাব? তাই পঞ্চম আমার লেখা গানগুলোই মাঝে মাঝে রেকর্ড করে দেয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, পঞ্চমের দারুণ সুরে আর আশাজির অসাধারণ গাওয়ার গুণে সেই গানগুলো সুপারহিট হয়ে যায়। আমি তো সেখানে নগণ্য।

আমি বললাম, নগণ্য কী বলছেন? আপনার 'এনে দে রেশমি চুড়ি' গানটার মধ্যে একটা চমৎকার ছবি আছে। আমি দারুণ পছন্দ করি।

স্বপনবাবু বললেন, ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমায় পছন্দ করেন বলে হয়তো এ-কথাটা বললেন। কিন্তু আমি জানি কলকাতার অনেক গীতিকারই আমায় পছন্দ করেন না।

বিনয়ী স্বপন চক্রবর্তী আমায় আরও বললেন, এইবার তাই আমি সুরকার হব মনস্থ করেছি। সুরকার ও গীতিকার স্বপন চক্রবর্তীর যে সুপারহিট গানটির কথা মনে আসছে সেটি হল 'মোহনার দিকে' ছবিতে আশাজির গাওয়া 'আছে গৌর নিতাই নদিয়াতে'।

সুরকার হওয়ার জন্য সম্ভবত পঞ্চমের সঙ্গে একটু অমিল হল স্বপনবাবুর। দুজনের সম্পর্কের মধ্যে একটা ফাটলও ধরল। সেই কারণে স্বপনবাবু মুম্বই-এর সান্তাক্রুজের ফ্ল্যাট বিক্রি করে চলে এলেন কলকাতায়। সল্টলেকে কিনলেন ফ্ল্যাট।

কলকাতায় এসে কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন উনি। সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন পানীয়। পঞ্চম সারা জীবনে যেটা পারল না। উনি দুর্দান্ত মনের জোরে অনায়াসে সেটা করে ফেললেন। আমি যখন কলকাতায় ওঁকে প্রথম দেখলাম, দেখেই চমকে উঠেছিলাম। ধারণাই করতে পারিনি এমনটি স্বপন চক্রবর্তী কোনওদিন হবেন।

রামকৃষ্ণের অভিনয় করার পর থেকে যেমন মিঠুন চক্রবর্তী আজ পর্যন্ত সুরা স্পর্শ করছে না। সম্পূর্ণ বর্জন করেছে। এবং শাকাহারী হয়ে গেছে। স্বপন চক্রবর্তীও কেন জানি না কোনও কারণে তেমন হয়ে গেলেন।

হঠাৎ একদিন এই স্বপনবাবুর টেলিফোন পেলাম। উনি বললেন, আমি সুকান্ত রায়ের (অভিনেতা দিলীপ রায়ের ভাইপো) নতুন ছবি 'সর্বজয়া'-তে সংগীত পরিচালনা করছি। আমি কিন্তু একটা গানও লিখছি না। সব গান লিখতে হবে আপনাকে।

সুঅভিনেত্রী কল্যাণী মণ্ডলের স্বামী তরুণ সুদর্শন চিত্র পরিচালক সুকান্তর আগের ছবিতেও আমি গান লিখেছিলাম। স্বপনবাবুর কাছেই জানলাম, আমার নাম বলাতে উনি সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। টেলিফোনেই স্বপনবাবুকে বললাম, ধন্যবাদ। আমি খুব খুশি। কিন্তু আপনি লিখছেন না কেন?

উত্তরে সেই পুরনো কথাটা উনি বললেন, মুম্বই-তে আপনাকে চাইলে কোথায় পাব? কিন্তু এখন সে সমস্যা নেই। এখন তো কলকাতায় আছি। এবার থেকে আমার সব ছবিতে আপনাকে গান লিখতে হবে। এ কথা যেন কোনও দিনও নড়চড় না হয়।

'সর্বজয়া' ছবিতে স্বপনবাবুর সঙ্গে গান লিখতে লিখতে বুঝেছিলাম স্বপনবাবুরও সুরের ওপর এবং স্ক্যানিং-এর ওপর অর্থাৎ গান বিভাজনের ওপর দারুণ দখল। মনে হচ্ছে, সত্যিই আমি সৌভাগ্যবান। গীতিকার সুরকার সলিল চৌধুরীর গান (কবিতায় গান নয়) যেমন আমি ছাড়া অন্য কোনও গীতিকার কখনও লেখেননি। তেমনি গীতিকার সুরকার স্বপন চক্রবর্তীর গানও আমি ছাড়া অন্য কোনও গীতিকার লিখতে পারেননি। আমি যখন স্বপনবাবুর পরবর্তী আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করছি তখনই খবর পেলাম হঠাৎ চলে গেলেন এই চিরকুমার মানুষটি পৃথিবীর সব বন্ধন কাটিয়ে।

সেদিন নামী চিত্রপরিচালক বীরেশ চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্যকার অনিমেষের সঙ্গে ওঁর ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। স্বপনবাবু অনিমেষের আপন মামা। অনিমেষ সখেদেই বলছিল, মামার জন্য কেউ কিছু করল না। আপনি অন্তত কিছু করুন। স্বপন চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া আমি আর কী করতে পারি। কত প্রতিভা তো এমন করে ধীরে ধীরে স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।

বাংলা গানের শিল্পীদের সর্বকালের সেরা তালিকায় যাঁরা থাকবেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারির শিল্পী হলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। আমার জীবনের প্রথম গানটি 'অভিমান' ছবিতে গেয়েছিলেন এই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সেই জন্য কিনা জানি না ওঁর গান শুধু আমার নয় আমার মায়েরও খুব প্রিয় ছিল। ওঁর গাওয়া আমার লেখা, 'হরেকৃষ্ণ নাম দিল/প্রিয় বলরাম' গানটি আমার মা যখন তখন গ্রামোফোনে শুনতে চাইতেন। যখন থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ তখন থেকেই দেখেছি ওঁর সঙ্গে আছেন ওঁর বড়দা রবীন মুখোপাধ্যায়। গানের ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ ওঁরা কোনওদিনই করেননি। যতদূর স্মরণে আসছে সন্ধ্যা আমার লেখা প্রথম ননফিল্মি আধুনিক গান করেন নচিকেতা ঘোষের সুরে। গান দুটি ছিল 'দিন নেই ক্ষণ নেই' এবং 'নেব না সোনার চাঁপা'। কোনও রকম ভণিতা ছাড়াই উনি আমায় বলেছিলেন দারুণ দুটি গান লিখেছেন। এমন আরও লিখুন গাইব। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে গেলে বলে শেষ করা যাবে না।

সন্ধ্যা অনেক বড় মাপের শিল্পী। সেই 'অঞ্জনগড়' ছবিতে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'গুন গুন গুন গুন মোর গান' এবং বেসিক আধুনিক গান 'তোমার আকাশে জাগে চাঁদের আলো'— থেকে পরপর শুধু জয়ের ইতিহাস। এ সব কথা অনেকেই জানেন তাই সেই সব কথা এখানে না বলে যে সব ঘটনার সাক্ষী আমি ছাড়া খুব কম মানুষই আছেন সেই সব ঘটনার কথাই বলব।

এইচ. এম. ভি-র তখন গান নির্বাচন করতেন পি কে সেন। উনি শিল্পীদের তালিকা দেখে ঠিক করতেন কোন সুরকার কার গান সুর করবেন, কোন গীতিকার কার গান লিখবেন। শিল্পীরা জানতেনই না কারা তাঁর গান তৈরি করছেন। গান তৈরি হলে মি. সেন রিহার্সাল রুমে এসে শুনতেন। শুনে পবিত্র মিত্রের সঙ্গে আলোচনা করে অনুমোদন করতেন সে গান। তাঁর অনুমোদিত গানই প্রায় সব শিল্পীরা গাইতে বাধ্য থাকতেন। ওঁদের গান সম্পর্কে কিছু বলার কোনও অধিকারই থাকত না। এইচ. এম. ভি-র চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেক শিল্পীকেই এই নির্দেশ মানতে হত। তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ড বছরে তিনবার হত। উনিও হাসিমুখে সেই নির্দেশ মানতেন, তবে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে। অর্থাৎ একবার ওঁদের কথা মতো গান রেকর্ড করতেন, পরের-বার নিজের ইচ্ছে মতো। কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি করতেন না। আমি তখন পবিত্র মিত্রের ইচ্ছের তালিকায় ছিলাম না। ছিলাম হেমন্তদার আন্তরিক ইচ্ছার তালিকায়। সেই ভাবেই হেমন্তদা পি কে সেনের আমলে রেকর্ড করেছেন আমার লেখা একাধিক গান। আমার লেখা 'কোনও দিন বলাকারা' এবং 'জানি না কখন তুমি/আমার চোখে' গান দুটি রেকর্ডিং করার সময় হেমন্তদার ইচ্ছে আর পবিত্র মিত্রের নির্দেশ এই দুয়ের মধ্যে দারুণ সংঘাত হয়েছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আবার যখন বলব তখন সেই কাহিনী শোনাব।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ও এইভাবে এইচ. এম. ভি-র সঙ্গে মানিয়ে চলতে চাইতেন। কিন্তু সবসময়ে তা পারতেন না। পবিত্র মিত্রের কাছের যে সব শিল্পীরা ছিলেন তাঁরা এটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। সব সময় পি কে সেন আর পবিত্রদাকে বলতেন। ওঁরা বলতেন, তা কেন হবে? ওঁরা এইচ. এম. ভি-র চুক্তিবদ্ধ শিল্পী। এইচ. এম. ভি যা বলবে তাই ওঁদের করতে হবে। ক্রমাগত এইভাবে বলাতে স্বাভাবিকভাবে ওঁরা একটু কঠোর হয়ে পড়েছিলেন। গোলমাল বাধল এই সময়েই সন্ধ্যার গান নিয়ে। সেবার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় চাইলেন এবার ওঁর গান লিখবেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর করবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, আর রেকর্ডে তবলা সংগত করবেন এইচ. এম. ভি-র মাইনে করা তবলিয়া নয়, বাইরের ফ্রিল্যান্স তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দী। এইচ. এম. ভি. এই প্রস্তাব মানলেন না। আগেই বলেছি গানের ব্যাপারে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কোনও কম্প্রোমাইজ কখনও করেননি। উনিও তাই জোর দিয়ে বললেন, আপনারা যে সুরকার এবং গীতিকারের নাম বলছেন অস্বীকার করছি না, তাঁরা সবাই গুণী, কিন্তু আমি যাদের বেছে নিয়েছি তাঁরা আমার কাছে বেশি পছন্দের। ওঁদের গান না হলে আমি রেকর্ড করব না। রেকর্ডিং বন্ধ

রাখলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কেউই ওঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারলেন না। তখনই আর একটা ঘটনা ঘটল। এম. পি. প্রোডাকসনসের উত্তম-সুপ্রিয়া অভিনীত 'উত্তরায়ণ' ছবিতে নায়িকা সুপ্রিয়ার ঠোঁটে শৈলেন রায়ের লেখা 'মহুয়া বুঝি বা ডাকে' গানটি ছিল। তখনকার পবিত্র মিত্র এবং পি কে সেনের খুবই কাছের এক মহিলা কণ্ঠশিল্পীকে দিয়ে ওই ছবির সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় তিন-চার দিন ধরে ওই গানটির রিহার্সাল করিয়ে স্টুডিয়োতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গানটি উনি আশানুরূপভাবে গাইতে পারলেন না। কারও পছন্দ হল না গানটি। শিল্পীকে ওঁরা যথাযথ পারিশ্রমিক দিয়ে বাধ্য হয়ে ফিরিয়ে দিলেন। তখনই আহ্বান জানানো হল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়কে দারুণভাবে বুঝতেন। অনায়াসে গানটি তুলে নিয়ে চমৎকারভাবে গেয়ে দিলেন।

এইবার গ্রামোফোন রেকর্ড বার করার জন্য যখন এইচ. এম. ভি 'উত্তরায়ণ'-এর এই গানটি শুনলেন, তখন ওই আগের ঘটনার কথা মনে রেখে অম্লানবদনে বললেন, গানটির সুর ভাল হয়নি। আমরা রেকর্ড করতে পারব না। তখন এখনকার মতো নিয়ম ছিল না। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী যে শিল্পী যে কোম্পানির সেই কোম্পানি ছাড়া অন্য কোথাও সেই শিল্পীর সিনেমার গানও প্রকাশিত হতে পারত না। তাই অগ্রদূতের হিট ছবি 'উত্তরায়ণ'-এর গান গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হল না। তখনকার মনোপলি প্রতিষ্ঠান এইচ. এম. ভি-র কিছু কর্তাব্যক্তির এ হেন আচরণে।

এই ব্যবহারটি কিন্তু সহ্য করতে পারেননি রবিদা। যাই হোক সুদীর্ঘ দিন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এইচ. এম. ভি-তে রেকর্ডিং বন্ধ রাখার পর স্বভাবতই ডিলারদের চাপে একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন পি কে সেন। এদিকে অনুরাগীদের অনুরোধে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ব্যাপারটা মেনে নিলেন। সহজে মানেননি। তখনকার এক নামকরা মন্ত্রীকে এসে মধ্যস্থতা করতে হয়েছিল। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে এইচ. এম. ভি-তে রেকর্ড করতে রাজি করালেন ওই মন্ত্রী। শর্ত রইল একটাই। প্রথম রেকর্ডটার গান অবশ্যই লিখবেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর দেবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। আর এইচ. এম. ভি-র যন্ত্রর সঙ্গে আমন্ত্রিত সংগতকার হিসাবে থাকবেন রাধাকান্ত নন্দী। রাধাকান্ত নন্দীর পারিশ্রমিক এইচ. এম. ভি দেবেন না, দেবেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নিজেই। ওই রেকর্ডটি থেকে শুরু হল এইচ. এম. ভি-র বাঁধা মাইনের এবং বাদ্যযন্ত্রের বাজেটের বাইরে যে কোনও বাদ্যযন্ত্রীকে রেকর্ডিং-এ নেওয়া যেতে পারে যদি সেই সেই বাদ্যযন্ত্রীর পারিশ্রমিক শিল্পী নিজে দিয়ে দেন। এখন বহু রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠান হয়েছে, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই সেই রেওয়াজটি এখনও চলছে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব থেকেই এদেশে এই জিনিসটির সূত্রপাত।

যথাসময়ে রবিদার সঙ্গে আমি সন্ধ্যার নতুন গান লিখতে বসলাম। আমরা সিটিং করলাম মেগাফোনের কমল ঘোষের বালিগঞ্জের টেমপোরারি স্টুডিয়োতে। শুনেছিলাম কমল ওখানে ভাল একটা স্টুডিয়ো বানাবে। কিন্তু সেটা আর কমল বানায়নি। যাই হোক সেদিন রবিদা সিটিং-এ বসার সময় বললেন, শেষটায় আমরাই জিতলাম। আয় পুলক, তোকে একটা দারুণ সুর দিচ্ছি। দারুণ একটা রোমান্টিক গান লেখ।

কথাটা বলেই রবিদা সেই 'উত্তরায়ণ' ছবিতে সন্ধ্যার গাওয়া এবং রেকর্ড না হওয়া 'মহুয়া বুঝি বা ডাকে' গানটি হারমোনিয়ামে বাজিয়ে শোনাতে লাগলেন। আর রাধাকান্ত নন্দী তাঁর অপূর্ব হাতের ছোঁয়ায় তবলায় ঠেকা বাজাতে লাগলেন। ব্যাপারটা সবই আমি জানতাম। বুঝলাম, রবিদা এইচ. এম. ভি-র সেই গান প্রত্যাখানের যে জ্বালা তারই প্রতিশোধ নিতে চলেছেন। আমার আর কী করার আছে। আমিও রবিদার সুরের উপর লিখতে লাগলাম 'মানসী সেজেছি আমি/মরমিয়া তুমি সাজবে'। আমার এখনও স্মরণে আছে ওই গানটি লেখার সময়ে কী প্রয়োজনে রবিদাকে খুঁজতে প্রণব রায় সেখানে হঠাৎ এসেছিলেন। রবিদা বললেন, পুলক থামিস না। প্রণববাবু এসে গেছেন। তোকে উৎসাহ দেবেন । লিখে যা।

সেদিনটা আমার ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন ছিল। প্রণবদার সামনেই আমি সমস্ত গানটা লিখলাম। শুনে খুবই তারিফ করলেন প্রণবদা। ওঁকে প্রণাম করতেই উনি আমার মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করলেন।

'সেই মানসী সেজেছি আমি' প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন এইচ. এম. ভি-র কর্তাব্যক্তিরা। তখনকার অধিকর্তারা বলতে পারলেন না গানের সুর ভাল হয়নি। এর সমস্ত কৃতিত্বই কিন্তু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের।

'উত্তর ফাল্গুনী' ছবিটি উত্তমকুমারের প্রতিষ্ঠানের পতাকাতেই হয়েছিল। 'উত্তর ফাল্গুনী'-তে যখন শুনলাম ওই সব অসাধারণ সিচুয়েশনে শুধু হিন্দি গানই থাকছে, তখন উত্তমকে খোলাখুলি বললাম, উত্তম, তোমার মতো মানুষ এমন একটা ভুল করছ। গানগুলো সিনেমাতে সবাই শুনবে। হয়তো ভীষণ ভালও লাগবে। কিন্তু সিনেমার বাইরে সে গান কিছুতেই হিট করবে না। আমার অভিজ্ঞতায় এবং সমীক্ষায় দেখেছি বাংলা ছবিতে কোনও দিনও হিন্দি গান তেমন হিট করেনি।

উত্তম হাসল। বলল, চিন্তা কোরো না মামা। অপূর্ব গান বানিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। গাইবেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। রেকর্ডিং-এর দিন স্টুডিয়োতে এসে শুনে যেয়ো।

উত্তম যে ছবিতে দেখত আমাকে দিয়ে গান লেখালে সুফল হবে তখনই সেখানে আমায়ে পাঠিয়ে দিত। এমনি একটা ছবিতে প্রযোজকের কাছে আমায় পাঠিয়ে দেওয়ার পর যখন আমি নিশ্চিত হয়ে আছি তখন হঠাৎ লোকমুখে শুনলাম অন্য গীতিকার নাকি ওখানে কাজ করবেন। স্বভাবতই বিচলিত হয়ে উত্তমের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। উত্তম সেই প্রযোজককে সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিল। সেই চিঠিটি এখনও আমার কাছে আছে।

যাই হোক, উত্তম নিশ্চয় মনে করেছিল আমি ওই 'উত্তর ফাল্গুনী' ছবিতে গান লিখতে চাই বলে ও সব কথা বলেছি। আমি সেটা বুঝিয়ে বললাম। বললাম, পরিবেশ বোঝাতে একটা হিন্দি গান দাও না। পরে দাও বাংলা গান, সুপারহিট করবে তোমাদের সিচুয়েশনে সুচিত্রা সেনের লিপে। উত্তম আমার সে-কথা রাখতে পারেনি। স্টুডিয়োতে গিয়েছিলাম। অপূর্ব গাইলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ব্যাপারটা বলেছিলাম ওর বড়দা রবীন মুখোপাধ্যায়কে। উনি বললেন, বললেন না কেন ওঁদের? উত্তরে একই কথা বললাম,

ওঁরা হয়তো ভাবছেন আমি গান লিখতে চাইছি বলেই এ-কথা বলছি।

'মণিহার' ছবিতে সুমন কল্যাণপুরের গাওয়া 'দূরে থেক না/এস কাছে এস' এই গানটি আমি লিখেছিলাম। কিন্তু গোড়াতে ওখানে একটা হিন্দি গান থাকার কথা ছিল। তখনও আমি আমার ভাবনার ব্যাপারটা ওঁদের বলতেই সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ আমার কথায় সায় দিয়ে তৈরি করা হিন্দি গানটা বাতিল করে দিয়ে আমাকে দিয়ে নতুন করে লিখিয়েছিলেন বাংলা গান। পরবর্তীকালে এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। কেউ আমার কথা শুনেছেন, কেউ শোনেননি। যেমন 'বিলম্বিত লয়' ছবিতে আমি বার বার বলা সত্ত্বেও একটি হিন্দি গান (হয়তো চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে) রাখা হল। কিন্তু 'বিলম্বিত লয়', ছবির সব কটি বাংলা গানই হিট করল। অথচ সরোজ দের চমৎকার চলচ্চিত্রায়ণ সত্ত্বেও গুলজারের লেখা মান্না দে ও আরতির গাওয়া হিন্দি গানটি একেবারেই চলল না। 'বিলম্বিত লয়' হিন্দি ছবি হলে গানটি সুপারহিট করত। 'উত্তর ফাল্গুনী'র হিন্দি গান সম্পর্কে এত কথা বলার একটি মাত্র কারণ, সেটি হল খুব কম লোকের বাড়িতেই হয়তো ওই গানের রেকর্ডগুলো আছে। কিন্তু অনেক লোকই আজ আর স্মরণ করতে পারছেন না সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কী অসাধারণ গেয়েছিলেন ওই গানগুলি। আমাদের দুর্ভাগ্য সেই গানগুলি যোগ্য সমাদর পেল না।

৬৭

কিছুদিন আগের একটি ঘটনার কথা বলি। একটি ছবির জন্য আমি একটি গান লিখলাম একজন উঠতি সুরকারের জন্য। যদিও সে এখন প্রচুর ছবি করছে। গান তৈরি হওয়ার পর মনে হল, এ গানটি যদি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গান তা হলে গানটিকে প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া হবে। প্রযোজক পরিচালকরা সবাই আমার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন। ওঁরা আমাকে অনুরোধ করলেন, সন্ধ্যাদি তো আজকাল খুব একটা গাইতে চান না। আপনি যদি একটু বলে দেন। আমি বললাম, ওঁর গাইবার মতো গান এখন খুব একটা তৈরি হচ্ছে কি? ওঁর দোষটা কোথায়? দেখি অনুরোধ করে যদি রাজি হন।

তখনই আমি ফোন করে ওঁকে রাজি করালাম। এবার নির্দিষ্ট দিনে ওই সংগীত পরিচালক ভদ্রলোক একবুক আনন্দ নিয়ে এখনকার নিয়মমতো গান তোলাতে গেলেন। এখনকার নিয়ম মানে একটা ক্যাসেটে গানটি গেয়ে ওঁকে দেবেন। আর ওই ক্যাসেট বাজিয়ে গান তোলানো হবে।

সন্ধ্যাদেবী যেই শুনলেন ক্যাসেট থেকে গান তুলতে হবে অমনি আমায় ফোন করলেন, পুলকবাবু, আপনি কি জানেন না যে, আমি ক্যাসেট থেকে গান তুলে কোনও সুরকারের সুরে গান রেকর্ড করি না। ওঁকে গেয়ে গেয়ে গান শেখাতে বলুন। আমি সন্ধ্যাদেবীকে বোঝালাম, ও আপনার সামনে গান গাইতে হয়তো ভয় পাচ্ছে।

উনি বললেন, ভয়ের কী আছে। সব মিউজিক ডিরেক্টরই কি তেমন গাইতে পারেন? ওঁরা ওঁদের গলাতেই বোঝাতে পারেন ঠিক কী ধরনের গানটি ওঁরা চাইছেন। আমি কি

আপনার লেখা গান, গাইতে না জানা রাজেন সরকারের কাছ থেকে তুলিনি? তুলিনি রতু মুখোপাধ্যায়ের গান? সুরকার যেই হোন, যাঁর গান গাইছি, আগে সম্পূর্ণভাবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মিশে যাব। তারপরে রেকর্ড করব। আপনি তো সবই জানেন। তবু এই ছেলেটিকে ক্যাসেট দিয়ে পাঠালেন কেন? আমি বললাম, বিশ্বাস করুন। আমি ভাবিনি উনি ক্যাসেট করে নিয়ে যাবেন। আজকাল তো কোনও শিল্পীই গান তুলতে সময় দেন না। উনি সেইজন্যই এমনটি করেছেন।

উত্তরে উনি বললেন, গান শেখবার সময়টাই তো গান গাইবার আগের জিনিস। গলায় পুরোপুরি গানটা বসে গেলে তবেই তো সেটা আমরা গেয়ে শোনাতে পারি। তার জন্যে সময় লাগে লাগুক না।

এবার আমি বললাম, ঠিক একই কথা বলেন মান্না দে-ও। আমার ধারণা আজকের গানের জগতে শুধু আপনারা দুজন এই ধরনের পারফেকশনালিস্ট। মিউজিক ট্র্যাক আগে তৈরি হওয়ার সুবিধায় মুম্বই-তেও দেখছি আজকাল লতাজি আর আশাজি ছাড়া অন্য সবাই দুলাইন করে গান তুলে দুলাইন গান রেকর্ড করেন। ওই দুলাইন গাওয়া হয়ে গেলে, পরে আবার দুলাইন তোলেন। তারপর আবার দুলাইন গান। এমনিভাবেই পনেরো-কুড়ি মিনিটেই একটা গান গেয়ে রেকর্ড করে দেন। সেইভাবেই পনেরো-কুড়ি মিনিট করে গেয়ে রেকর্ড করে যান সারাদিন প্রায় রোজ সাত-আটটা গান। হিসাব করলে সারা মাসে এইভাবে গাওয়া অনেকগুলো গানের মধ্যে মাঝে মাঝে দুখানা গান হিট করে। এই দুখানা হিট গানই ওঁদের অনুপ্রেরণা দেয়, হয়তো আত্মবিশ্বাস দেয়। পরের মাসে আবার রোজ পনেরো-কুড়ি মিনিটে ওইভাবে গান গেয়ে গেয়ে সাত-আটটা গান রেকর্ড করেন। এই তথাকথিত 'কমপিউটারাইজড সিংগিং'-এ হয়তো কিছু গান সুপার হিটও করে। কিন্তু সুন্দর চিরন্তন গান হয় খুবই কম। যার জন্য হিন্দি ছবিতেও যথার্থ ভাল গান খুঁজতে হলে যে কোনও শ্রোতাকেই আজ থেকে পনেরো-কুড়ি বছর পিছিয়ে যেতে হবে।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আমার মতে বাংলাতে এখনও আদর্শ। তাই উনি ওই সুরকারকে প্রায় দুঘণ্টা সময় দিয়ে ভাল করে গান তুলে, সে গান বাড়িতে রেওয়াজ করে গেয়ে গলায় বসিয়ে তবেই অন্য আর একটা নির্দিষ্ট দিনে রেকর্ড করলেন। আমার এ কথা শুনে মুচকি হেসে অনেকেই হয়তো বলবেন, আপনার কি ধারণা ওভাবে অত সময় নষ্ট করে গান তুলে গান গাইলেই কি গান হিট করবে? আমি তাঁদের সবিনয়ে বলব, হিট বা ফ্লপ সবটাই ভাগ্যের ব্যাপার। তবে একটা কথা তো ঠিকই, যে গান সৃষ্টি হল সেখানে তো কোনও ফাঁকি নেই। তা পুরোপুরি নিষ্ঠায় একাগ্রতায় জন্ম নেওয়া একটি গান। জনসাধারণ সেটা গ্রহণ করুন বা না করুন, স্রষ্টাদের ভাবে-ভাবনায় যা ছিল এ তো তারই স্বপ্নের বাস্তব প্রতিমূর্তি। এই সঙ্গে আর একটা কথা মানতে হবে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নিজেকে ধরে রাখতে জানেন। কলকাতার সন্ধ্যাদেবী আর মুম্বই-এর লতা মঙ্গেশকর ছাড়া যে কোনও শিল্পীকেই টাকার অঙ্কের হেরফেরে জলসাতে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু লতাজি বা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে পাওয়া সম্ভব নয়। অকপটে বলছি টাকার লোভে এই শিল্পী কোনও দিনও লালায়িত নন। আঙুল গোনা অনুষ্ঠান উনি সারা বছরে করেন। ইচ্ছে

করলে আজকালকার তথাকথিত শিল্পীদের মতো সপ্তাহে ছ'টি অনুষ্ঠান করে গলা খারাপ করে প্রচুর অর্থ উনি রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু উনি তা করেননি।

আমি এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। বেশ কিছুদিন আগে যখন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা সেনের স্বর্ণযুগ, তখন আমাদের সালকিয়ার পাড়ার একটি ক্লাবের হয়ে আমি একটি সংগীতানুষ্ঠান করতাম প্রতি বছর। সে বারের অনুষ্ঠানে আমি সন্ধ্যাদেবীকে গাইবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। উনি আমাকে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় আমাদের পাড়ারই আর একটি ক্লাব, তারাও একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁরাও চান সন্ধ্যাদেবীকে। প্রচুর প্রভাবশালী এক ব্যক্তিকে দিয়ে সন্ধ্যাদেবীকে অনুরোধ করান। সন্ধ্যাদেবী কিন্তু রাজি হননি। উনি বলেছিলেন দুদিনের ব্যবধানে, একই জায়গায় দুটি ক্লাবের অনুষ্ঠান উনি করতে পারবেন না। ওই ক্লাবের উদ্যোক্তারা সন্ধ্যাদেবীকে জানান, অন্য সব শিল্পীই দুটি জায়গাতেই গান গাইতে রাজি হয়েছেন। তা হলে আপনার আপত্তি কীসে?

সন্ধ্যাদেবী বলেছিলেন, আপত্তি নৈতিকতার। টাকার লোভে এ ধরনের কাজ করে কিছুতেই নিজেকে সস্তা করতে পারব না।

ওরা তখন বিশ্ববিখ্যাত বড়ে গোলাম আলিকে দিয়ে সন্ধ্যাদেবীকে ওই ক্লাবের হয়ে গাইতে অনুরোধ করেছিলেন। সন্ধ্যাদেবী ওঁকেও সবিনয়ে বুঝিয়েছিলেন ওঁর আদর্শের কথা। প্রচুর টাকা এবং প্রচুর প্রভাবে যখন কাজ হল না তখন ওই ক্লাবের আয়োজকরা আমার কাছে এসে টাকার লোভ দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সন্ধ্যাকে ছেড়ে দিন। আমি নারাজ জেনে বলেছিলেন, ধরুন সন্ধ্যার গাড়ি যদি হাওড়া ব্রিজে আপনার অনুষ্ঠানে আসার পথে ভাঙচুর হয় তা হলে আপনি দায়ি থাকবেন।

আমি এতে ভয় পাইনি। থানা পুলিশে আমার প্রভাব খাটাইনি। শুধু সন্ধ্যাদেবীকে জানিয়ে দিয়েছিলাম ব্যাপারটা। সন্ধ্যাদেবী এবং ওঁর বড়দা আমায় জানিয়েছিলেন প্রয়োজনে, আমরা পায়ে হেঁটেও আপনার অনুষ্ঠানে যাব। ও সব চোখ রাঙানিকে আমরা ভয় পাই না।

এখন সেই সব পুরনো দিনের স্মৃতিকথা লিখতে বসে ভাবছি, আজকের যুগে এমন নৈতিকতার আদর্শে জীবন কাটানো শিল্পী কি আমরা খুঁজে পাব। হয়তো এমন শিল্পী এখনও আছেন যাঁর খবর আমরা রাখি না।

এই সন্ধ্যাদেবীই ঘটনাচক্রে কোনও কারণে আঘাত পেয়ে, সেবার পুজোয় নিজেই সুরকার হয়ে গেয়েছিলেন নিজের সুরে নিজের গান। যে গান লিখেছিলেন ওঁর স্বামী শ্যামল গুপ্ত। জীবনের এক অপরূপ উপলব্ধি আমি খুঁজে পেয়েছিলাম সেই গানে 'বড় দেরিতে তুমি বুঝলে/কেউ নিজেকে ছাড়া ভাবে না।'

তবুও ক্ষমায় সহনশীলতায় এই অনন্যা শিল্পী মাথা উঁচু করে রয়ে গেছেন—নুয়ে পড়েননি।

তাই আমেরিকায় অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ওঁর কন্যা ঝিনুকের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে নতুন করে রেকর্ড করেছিলেন, আমার লেখা আমারই অতি প্রিয় একটি গান 'তুমি আমার মা/আমি তোমার মেয়ে'। কলকাতায় এসেই এ ঘটনা জানিয়েছিলেন আমাকে।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন, আপনি তো সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বহু গান লিখেছেন, তার মধ্যে আপনার সব থেকে প্রিয় প্রথম চারটি গান সাজিয়ে দিন। প্রত্যেককেই আমি বলি, ওঁর গাওয়া সব গানই আমার প্রিয়। তবু চাইছেন যখন, তখন বলছি, আমার প্রিয় প্রথম তিনটি গানই কিন্তু রাজেন সরকারের সুর দেওয়া।

এবার শুনুন, ১। 'আমি তোমারে ভালবেসেছি/চিরসাথী হয়ে এসেছি', ২। 'দরদিয়া গো/যে তোমায় এত জানায়', ৩। 'আরও কিছু রাত/ তুমি জাগতে যদি', ৪। 'আমার মনে নেই মন/কী হবে আমার'।

শেষের গানটি সুর করেছিলেন অখিলবন্ধু ঘোষ। উল্টো পিঠে ছিল 'যমুনা কিনারে'। সেবার অখিলবন্ধুর পুজোর গান একটু তাড়াতাড়ি লিখে রেকর্ড করিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটি গান 'যেন কিছু মনে কোরো না'। এই গানটি সম্বন্ধে ওঁদের বলেছিলাম, গানটি অখিলবন্ধু দারুণ সুর করে গেয়েছেন। সন্ধ্যাদেবীর বড়দা রবীনবাবু গানটা শুনে এমনই নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, মেগাফোনে রেকর্ড করা সেই গানটা কিছু লাভ দিয়ে সমস্ত খরচ দিয়ে রাইট কিনে নিতে চাইলেন। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সন্ধ্যাদেবীর সেবারের উল্লিখিত গানগুলি লিখেছিলাম। আগেই বলেছি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমি অন্তত বলে শেষ করতে পারব না। তাই এখন থামছি। পরে আবার বলব।

৬৮

অন্য সমস্ত লেখাকে থামিয়ে যে লেখা আজ আমার কলমে সবার আগে এসে পড়ছে, তা হল সেই মানুষটির কথা। যে মানুষটি দিনের আলোয় মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরোবার মুখেই একদল আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণের শিকার হলেন। আততায়ীর গুলিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

ভগবান বলে সত্যিই যদি কিছু থাকেন, নিশ্চয় তাঁর চোখে পড়েছে এই সমস্ত ঘটনা। এই জঘন্য অপরাধকে নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। দিল্লিতে যখন ফলের রস বিক্রি করতেন গুলশন কুমার, তখন তাঁকে দেখিনি, তাঁর কথাও শুনিনি। তাঁর কথা প্রথম শুনলাম এইচ. এম. ভি-র দমদমে এক অফিসারের ঘরে। কী কারণে ওঁর ঘরে ঢুকেছিলাম মনে নেই। শুধু মনে আছে অফিসার ভদ্রলোকটির টেবিলে দুটি ক্যাসেট সাজানো ছিল। কথায় কথায় উনি ক্যাসেট দুটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, বলুন তো, কোনটা আসল কোনটা নকল?

বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে আমাকে বলতে হয়েছিল, দুটোই তো এক। কী সব জামাই ঠকানো ধাঁধার প্রশ্ন করছেন? উনি দৃঢ়ভাবে বললেন, না। এটা নকল। এর 'ইনলে'-র কাগজটা একটু অন্য। এটার দাম আমাদের থেকে বাজারে অনেক কম। এটা জাল ক্যাসেট। আমি বললাম, যেভাবে ডিস্ক রেকর্ড বাজারে নকশা আঁকা জ্যাকেট কভারে বা সাদা জ্যাকেট কভার পরে দুনম্বরি হয়ে বিক্রি হত, এটা তো অনেকটা সেই গোত্রেরই।

অফিসার ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, সেটা ছিল পুকুর চুরি। আর এটা মহাসাগর লুণ্ঠন। এর প্রধান নায়ক হলেন দিল্লির এক ফলের রস ব্যবসায়ী। তিনি এখন ক্যাসেটের ব্যবসা করছেন। তাঁর নাম গুলশন কুমার। কিন্তু কোনও প্রমাণ নেই। উনি ধরাছোঁয়ার বাইরে।

অস্বীকার করছি না, ক্যাসেটের ব্যবসা অর্থাৎ গানের জগতে গুলশন কুমারের পদক্ষেপ এইভাবে হলেও অচিরেই গুলশন স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টিতে, সাংগঠনিক শক্তিতে এবং অবশ্যই অনন্য উদ্ভাবনী ক্ষমতায়। এ দেশে এইচ. এম. ভি. যাঁকে দেখে প্রথম বিব্রত হয়েছিলেন, তা হল গুলশনের এই 'টি সিরিজ' যা পরবর্তীকালে নাম পাল্টে হল 'সুপার ক্যাসেট'।

এই 'টি সিরিজ' কী এক অসাধারণ জাদুমন্ত্রে নিজের ব্যবসা ছোট্ট চারাগাছ থেকে বিরাট মহীরুহ করে তুলল। আমার সঙ্গে এ হেন গুলশন কুমারের পরিচয় কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে। শানু ভট্টাচার্যের তরঙ্গ ক্যাসেটের অ্যালবামের গানগুলি লিখে কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, এই নতুন শিল্পী যদি সত্যিকারের সুযোগ এবং মার্কেটিং পায়, কেউ একে আটকাতে পারবে না। প্রথমে একটা বড় কোম্পানিকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম ক্যাসেটটি প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু ওঁরা আমার অনুরোধ রাখেননি। বলেছিলেন—এমন নকল কিশোরকণ্ঠ কলকাতার অলিতে গলিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কী দেখলেন ওঁর মধ্যে? বলেছিলাম একটা সতেজ রস, যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—উপলব্ধির ব্যাপার। ওঁরা তখন বেয়ারাকে আমাকে আর এক কাপ কফি দিতে বললেন। ওঁদের শুনিয়ে এসেছিলাম ইতিহাস নিজেকেই বার বার একইভাবে প্রকাশ করে। আপনারাই তো এক দিন কে এল সায়গল, শচীন দেববর্মণকে গ্রহণ করেননি। আজ আবার আর একজনকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

একবুক উষ্মা নিয়ে পথে নামতেই সে দিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সাহা ইলেকট্রনিক্সের বি এম সাহার সঙ্গে। আমার খুবই পরিচিত মানুষ। উনি তখন কলকাতায় গুলশন কুমারের ডান হাত। ওঁকে ব্যাপারটা বললাম। শুনে উনিই যোগাযোগ করলেন দিল্লিতে। গুলশন কুমারের জহুরি চোখ। তৎক্ষণাৎ চিনে নিলেন শানু ভট্টাচার্যকে।

শানু ভট্টাচার্য তরঙ্গ ক্যাসেটে 'শানু ভট্টাচার্য' থাকলেও যেই উনি অ্যালবাম স্বকর্ণে শুনে বুঝলেন ওর সম্ভাবনা অপরিসীম, তখনই ওকে কুমার শানু করে নিয়ে এলেন সর্বভারতীয় গানের আসরে৷ দিলেন ওঁর অফিসের কাছেই একটা সিঙ্গল রুম ফ্ল্যাট। রয়ালটির টাকায় পরিশোধযোগ্য একটি মারুতি ৮০০। শুধু তাই নয়, তখন মুম্বই-তেও টেলিফোন সহজলভ্য ছিল না বলে ফ্ল্যাটের প্রায় লাগোয়া ওঁর একটি অফিসের টেলিফোন যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতিও দিলেন।

সুদূর নিউবম্বে এবং মুম্বই-এর অনেক অগম্য স্থানে স্বল্প ভাড়ায় থাকা, রেস্তোরাঁর মাতালদের সামনে তথাকথিত ফিল্মি গান গাওয়া শানু ভট্টাচার্য গুলশনের প্রোমোটিংয়ে হয়ে গেলেন কুমার শানু।

শুধু শানু নয়, গুলশন কুমার অনুরাধা পড়োয়ালকেও সামনের সারিতে এনে দিয়েছিলেন। সুযোগ দিয়েছিলেন অলকা ইয়াগনিককেও। টেলিফিল্ম বানানোর

ব্যাপারটা সম্ভবত ওঁর মস্তিষ্কেই প্রথম আসে। দুটি টেলিফিল্ম একসঙ্গেই শুরু করলেন। একটি 'জিনে তেরি গোলি মে' আর একটির নাম সম্ভবত 'লাল দুপাট্টা মলমল'—এই জাতীয় নাম। উনি প্রথমেই গান রেকর্ডিং করলেন এবং ক্যাসেট ছেড়ে দিলেন বাজারে। দুটিতেই সুযোগ দিলেন দুজন তরুণ সুরকারকে। প্রথমটিতে কলকাতার বাবুল বসুকে, এবং দ্বিতীয়টিতে আনন্দ-মিলিন্দকে। এই আনন্দ-মিলিন্দ তখনও বিখ্যাত হননি। বাবুলের দুর্ভাগ্য 'জিনে তেরি গোলি মে' গোল্ড ডিস্ক অর্জন করলেও গুলশন অজ্ঞাত কারণে ছবিটি বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হল। সহজেই পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পেলেন আনন্দ-মিলিন্দ।

গুলশনের সঙ্গে আমার মুখোমুখি আলাপ যখন ওঁর প্রতিষ্ঠানের হয়ে কুমার শানুর জন্য পুজোর গান রচনা করার অনুরোধ এল। তখন কিশোরকুমাব সদ্য প্রয়াত। আমার বুকের মধ্যে অহরহ একটা বিয়োগযন্ত্রণা। শানু তখন ছিল অনেকটাই কিশোরকুমারের কপি কণ্ঠ। হঠাৎ আমার মাথায় এল কিশোরদার ওপর গান লিখলে কেমন হয়! লিখেছিলাম আমাদের সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ 'অমর শিল্পী তুমি কিশোরকুমার'। আর একটি গান শানুর ব্যক্তিগত ভাবাবেগ 'তুমি যদি থাকতে'। বাবুল বসুর অপূর্ব সুরে ক্যাসেটটির প্রতিটি গানই সুপারহিট হল। এই 'অমর শিল্পী' গানের কৃতিত্বেই ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল শানুর নাম।

তার আগেই অবশ্য মুম্বই-তে আমার সঙ্গে গুলশনের আলাপ। তখন উনি দিল্লিতেই বেশির ভাগ সময় থাকতেন। বাংলা বুঝতেন না মোটেই। কার কাছে যেন গান দুটির মতলব জেনে প্রথম আলাপেই আমায় নমস্কার জানিয়ে বলেছিলেন, আমি ঠিক এই ধরনের গানই খুঁজছিলাম। আপনার আর আমার চিন্তার ওয়েভ লেম্থ একেবারেই এক। দেখবেন রেজাল্ট খুব ভাল হবে। তখনই ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, তা হলে শানুর জন্যই পুরোপুরি একটা অ্যালবাম কেন করলেন না? ক্যাসেটের এক পিঠে কেন লিখলাম ওর চারটি গান আর অন্য পিঠে লিখলাম অলকা ইয়াগনিকের চারটি গান? উত্তরে গুলশন বলেছিলেন, একই শিল্পীর কণ্ঠে আটটা নতুন গান শ্রোতাদের শুনতে ভাল লাগে না। পুরনো চেনা হিট গানের ব্যাপার আলাদা। সেজন্যে আমি প্রতিটি বাংলা ক্যাসেটেই এক পিঠে একজন পুরুষ অন্য পিঠে একজন মহিলা শিল্পীকে বেছে নিয়েছি। এবার আমি ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমি তো আপনার প্রতিষ্ঠানের হয়ে শানু, মুন্না, অলকা সবার জন্য চারটি করে গান লিখেছি। কিন্তু অনুরাধা পড়োয়ালের বেলায় আটটি গান কেন লিখলাম?

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে মুচকে হাসলেন গুলশন কুমার। বললেন, অনুরাধার আটটি গান মোটেই একটি ক্যাসেটে থাকবে না। থাকবে দুটো আলাদা ক্যাসেটে। ছিলও তাই। দুটি আলাদা ক্যাসেটেই প্রকাশিত হয়েছিল অনুরাধার চারখানি করে আটটি গান।

গুলশনের অসাধারণ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম ওঁর সঙ্গে প্রথম আলাপে। পরবর্তীকালে মুম্বই-এর প্রতিটি ক্যাসেট কোম্পানি, দুজন শিল্পীর শুধু আলাদা গান নয়, ডুয়েট গান দিয়েও বাংলা ক্যাসেট প্রকাশ করা শুরু করলেন। ঠিক সেই সময় না হলেও অধুনা এইচ. এম. ভি-কে গুলশনের দেখানো এই রাস্তাতেই পা ফেলতে দেখা গিয়েছে।

তবুও একটা ব্যাপার সবাই জানেন, অনুরাধা পড়োয়ালের ওপর ওঁর পক্ষপাতিত্ব দিনের পর দিন প্রকট হয়ে এল। যার ফলে প্রথমেই অলকা সরে এল ওখান থেকে। বেশ কিছুদিন বাদে অসহ্য হয়ে শানুও চলে গেল। শানু চলে যেতেই, গুলশন শানুর জায়গায় কলকাতার সুপ্রিয় বড়ালকে বাবুল-সুপ্রিয় নাম দিয়ে হাজির করলেন বাজারে। সেই সঙ্গে নিয়ে এলেন সনু নিগমকে।

পুরুষ শিল্পীর অন্বেষণে গুলশনের 'টি সিরিজ' বা 'সুপার ক্যাসেট' আজ পর্যন্ত কোনওদিন শ্রান্তি দেখায়নি।

মুম্বইতে আমার, শেষ দেখার দিন আমায় বলেছিলেন, এবার আমাদের তৈরি সি ডি আমি বাজারে ছাড়ছি। সবচেয়ে অল্প দামে। দেখে নেবেন পুলকবাবু তার কোয়ালিটি কী হয়। অডিওর গান পিকচারাইজ করে ভিডিও ক্যাসেটে প্রকাশ করাতেও, আমি যতদূর জানি গুলশন কুমারই প্রথম পথ প্রদর্শক।

সেবার মুম্বই-তে শুনলাম অমিতাভ বচ্চনের রুগ্ন শিল্প 'বিগ বি' উনি কিনে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে কংগ্র্যাচুলেশন জানাতে গিয়ে কথায় কথায় আন্দাজ করেছিলাম, অমিতাভকে নিয়ে ছবি বানানোরও বাসনা রয়েছে তাঁর।

ধার্মিক গুলশনের মুম্বই-এর গোল্ডেন চ্যারিয়টের সামনে দাঁড়ালেই, যে কোনও লোকেরই চোখে পড়বে প্রায় তিন তলার সমান বিরাট ঠাকুরের মূর্তি। একটা স্টুডিয়ো তার অফিসের সামনে অত বড় ঠাকুরের মূর্তি কেউ কখনও দেখেছেন কি? তা ছাড়া একতলায় মা কালীর বিগ্রহ তো আছেই।

বৈষ্ণোদেবীর মাতার মন্দিরের সামনে প্রতিদিন বহু মানুষকে যে গুলশনের পয়সায় মায়ের পূজার ভোগ আহার করানো হয়, সে খবর তো সবাই রাখেন।

চেন্নাইতে প্রসাদ স্টুডিয়োর রেকর্ডিং থিয়েটারে যে মাল্টি চ্যানেল বৃহত্তম চওড়া টেপের রেকর্ডিং মেশিন দেখে চমকে উঠেছিলাম, ঠিক সেইরকম মেশিনই দেখেছিলাম গুলশনের গোল্ডেন চ্যারিয়টে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাইরের কোনও ফিল্ম প্রতিষ্ঠানকেও তো এই স্টুডিয়ো ভাড়া দিতে পারেন? জবাব শুনতে হয়েছিল, আমাদের কাজ শেষ করারই ডেট পাচ্ছি না, অন্যদের দেব কী করে? কেন মুম্বই-এর খারেতে আমাদের সুদীপ স্টুডিয়ো রয়েছে। সেটা আমরা তো অন্য প্রতিষ্ঠানেদের ভাড়া দিই।

গুলশনের প্রতিটি নতুন দিন যেন ছিল ওঁর নতুন সাফল্যের একটি ধাপ। ভক্ত গুলশনকে হয়তো ভগবানই প্রকৃত আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। তাই এত দ্রুত এই উত্তরণ। সেদিন দুপুরেই সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে টেলিফোনে শুনতে হল গুলশন আর আমাদের মধ্যে নেই। চলে গেছে অকালে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে। তাঁর মৃতদেহের হাতে রয়েছে পূজার প্রসাদ। ভক্তের ভগবান অনেক দিয়েও কেন হঠাৎ এভাবে নিজের কাছে ডেকে নিলেন তার কারণ আমি জানি না। আমার কানে শুধু বাজছে গুলশনের আন্তরিক আমন্ত্রণ, দাদা, আমার নিউদিল্লির গেস্ট হাউসে একবারও কিন্তু আপনি এলেন না। কবে আসবেন?

৬৯

চিনতাম গায়ক ও সংগীত শিক্ষক পশুপতি ভট্টাচার্য মহাশয়কে।

চিনতাম না, জানতাম না ওঁরই এক ছেলে তপন ভট্টাচার্য ভাল গান করে, আর এক ছেলে শানু ভট্টাচার্য ভাল তবলা বাজায়। ব্যাপারটা শুনেছিলাম অনেক পরে। দেখেছিলাম এই শানু ভট্টাচার্যকেই একদিন বসুশ্রী সিনেমায়। জলসায় যে কোনও মূল্যে একটা সুযোগের জন্য বসে আছে। কে একজন বললেন, ও তো তবলা বাজায়, গান আবার শিখল কবে? আর একজন জবাব দিলে—গান তো ওর রক্তে—ওর পিতৃদেব তো পশুপতি ভট্টাচার্য।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন ফোন পেলাম দিলীপ রায়ের। আমাদের এই সিনেমার জগতে অনেক দিলীপ রায় আছেন। ওঁরা অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেকেই আমায় মাঝে মাঝে ফোন করেন। তাই বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে হল—কোন দিলীপ রায়? উত্তর পেলাম বেহালার দিলীপ রায়।

দিলীপবাবু বললেন, আপনি তো ভাল নতুন শিল্পী হলে ক্যাসেটে গান লিখবেন বলে কথা দিয়েছেন, এবার পেয়েছি একটি ছেলেকে। হুবহু কিশোরকুমার। সেই সময়টায় গানের জগতের পুরুষ বিভাগে কিশোরকুমারের কাছে আর সবাই এককথায় কুপোকাত, সুতরাং ছিটেফোঁটা সত্যিকারের কিশোরকুমার হলেও সম্ভাবনা প্রবল এটা বুঝে নিতে দেরি হল না। রাজি হয়ে গেলাম। দিলীপবাবু বললেন, কিন্তু পারিশ্রমিকটা একটু কম করতে হবে। ছেলেটি মুম্বই-তে একটা হোটেলে গান গাইত। থাকত নিউমুম্বই-তে। দারুণ স্ট্রাগলিং-এর মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে এখন। মুম্বই-তে হোটেলের কী একটা গণ্ডগোলে চলে এসেছে কলকাতায়। কিন্তু অন্য জীবিকা বলতে তো কিছু নেই। ও গান গেয়ে জীবন ধারণ করতে চায়। তাই যে করে হোক প্রকাশ করতে চায় একটা বাংলা গানের ক্যাসেট। আপনার লেখা গানের। ওর সমস্ত রেকর্ডিং-এর টাকাটা ওর বন্ধুবান্ধবরা জোগাড় করেছে। বাজেট খুবই কম।

রাজি হয়ে গেলাম গান লিখতে। সুন্দর সুর দিলেন দিলীপবাবু। ক্যাসেটের ডাবিং মিক্সিং হয়ে গেলে দিলীপবাবুকে বললাম, চারখানা গান কিন্তু দারুণ গেয়েছে শানু ভট্টাচার্য। হোক কিশোরকুমারের স্টাইল। তবে দেখবেন, ও ঠিক ওই রাস্তায় ঢুকে পরে নিজের স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েরও জীবনের গোড়ার দিকের রেকর্ডে 'তোমারই চোখের চাওয়া/মিলালো প্রাণেরই মাঝে' পুরোপুরি পঙ্কজ মল্লিকের স্টাইলে গাওয়া। কিশোরকুমারের শুরুই তো কে এল সায়গলের স্টাইলে। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন এঁরা আবার সবাই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রাস্তায় হেঁটে যে যার নিজের ঘর স্থাপন করতে পেরেছেন। দেখবেন দিলীপবাবু, শানুও তাই পারবে। সাফল্য পেলেই ও কিশোরকুমার থেকে সরে আসবে নিজস্ব কোনও ভঙ্গিমায়।

যা হোক, অন্য রেকর্ড কোম্পানি প্রত্যাখ্যাত শানু, বলছে দ্বিধা নেই, মূলত আমারই অনুরোধে বি এম সাহা মারফত, সাহা ইলেকট্রনিক্স-এর মাধ্যমে, যোগাযোগ করল দিল্লির

প্রতিষ্ঠান গুলশন কুমারের টি সিরিজ অর্থাৎ সুপার ক্যাসেটের সঙ্গে। আমিও সাহা ইলেকট্রনিক্সকে এই ক্যাসেটটির নিশ্চিত সাফল্য সম্বন্ধে জোর গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করলাম। গুলশন কুমার ক্যাসেটটি শুনেই শানুর জীবনের ওই প্রথম ক্যাসেটটি প্রকাশ করলেন। আগেই বলেছি ক্যাসেটটির নাম ছিল 'তরঙ্গ'। 'তরঙ্গ' ক্যাসেটটি সাফল্যের পরেই গুলশন শানুকে দিয়ে কিশোরকুমারের গাওয়া অনেকগুলো হিট হিন্দি ছবির গান নতুন করে গাওয়ালেন সুপার ক্যাসেটে 'ইয়াদোঁ' নাম দিয়ে। কিন্তু হিন্দি গান দিয়ে সর্বভারতীয় গানের জগতে ওকে আনতে গিয়ে প্রথমেই বললেন, ওই শানু ভট্টাচার্য নামটা ওর চলবে না। ওটা আমি করে দিলাম 'কুমার শানু', শানুও হাসি মুখে সেটা মেনে নিল। সিঁথির শানু ভট্টাচার্য রাতারাতি হয়ে গেল মুম্বই-এর কুমার শানু। ফুলপ্যাক ক্যাসেটে কিশোরকুমারের বড় ছবি আর এক কোণে নজরে না পড়া ছোট ছোট করে ইংরেজিতে লেখা 'সাঙ্ বাই কুমার শানু' লেখা ওই 'ইয়াদোঁ' ক্যাসেটগুলো প্রকাশিত হল। অদ্ভুত বাণিজ্যিক দৃষ্টি গুলশনের।

শানুর অভাবনীয় বাণিজ্যিক সাফল্য এলেও তবু তখনও কিন্তু শ্রোতারা কেউ চিনতে পারেনি শানুকে। কিশোরদার ছবি দেওয়া 'ইয়াদোঁ' ক্যাসেটটি সবাই মনে করেছিল কিশোরকুমারই গেয়েছেন। ওটা যে একটা দ্বিতীয় কণ্ঠ কারও তা বোধগম্য হয়নি। শানু তখন সংগীত পরিচালক, প্রযোজকদের দরজায় দরজায় প্লে-ব্যাকের আর্জি নিয়ে ঘুরতে লাগল। সেই সময়েই হঠাৎ মারা গেলেন কিশোরকুমার। কিশোরকুমারের অনুপস্থিতিতে শঙ্কিত বিপর্যস্ত মুম্বই চিত্রজগৎ। আমি তখন মুম্বই-তে ছিলাম। কলকাতায় আমার বাড়িতে ফোন করে ঠিকানা নিয়ে আমার মুম্বই-এর হোটেলে হাজির হল সুপার ক্যাসেটের বিভাগীয় অধিকর্তা রাজ বিনোট এবং সংগীত পরিচালক বাবুল বোস। রাজ বিনোট সরাসরি বললেন—আমরা আটটি বাংলা ক্যাসেট করছি। আপনাকে লিখতে হবে চৌষট্টিটি বাংলা গান। শিউরে উঠে বললাম, অসম্ভব। রাজ বিনোট সাহেব তখন অলকা ইয়াগনিক, অনুরাধা পড়োয়াল, দেবাশিস দাশগুপ্তকে নিয়ে তিনটি ক্যাসেট—অর্থাৎ চব্বিশটি গান রচনা করাতে আমাকে রাজি করালেন। তারপর হঠাৎ বললেন, আপনার আর্টিস্ট কুমার শানুর গানও আপনাকে করতে হবে। কুমার শানু? সে আবার কে? জবাব দিল বাবুল বোস, তরঙ্গ ক্যাসেটের শানু ভট্টাচার্য তো এখন কুমার শানু। এ খবরটা তখন আমি জানতাম না। তবু শানুর নামটা শোনামাত্রই আমার কাছে শানু আর কিশোরকুমার একটা একই সুরেলা তরঙ্গের মতো মনে হল। তৎক্ষণাৎ স্থির করলাম কিশোরকুমারের একটা শ্রদ্ধার্ঘ্য এই কিশোর-কণ্ঠকে দিয়ে গাওয়ালে দারুণ হয়। গভীর আত্মপ্রত্যয়ে রাজ বিনোট ও বাবুল বোসকে বললাম—আমি কুমার শানুর গান লিখব। এবং আমার ধারণা, ক্যাসেট সুপার হিট হবে। হলও তাই। শানুর কণ্ঠে আমার 'অমর শিল্পী তুমি কিশোরকুমার তোমাকে জানাই প্রণাম' রাতারাতি এক প্রায় অজ্ঞাত অপরিচিত শিল্পীকে তুলে দিল জনপ্রিয়তার প্রায় উচ্চতম শিখরে। বাংলা গানের একটা রেকর্ড বিক্রির দৃষ্টান্ত হল এই ক্যাসেটটি। হিন্দি গানে নয়, শানুর প্রথম প্রতিষ্ঠা কিন্তু এই বাংলা গান দিয়ে। যেখানে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা ছিল না—'সাঙ বাই কুমার শানু'—লেখা ছিল বড় বড় অক্ষরে কুমার শানুর নাম। ক্যাসেটটিতে কিশোরকুমারের ছবির সঙ্গে শানুরও ছবি ছিল।

ওই বাংলা 'অমর শিল্পী'ই কিন্তু আলোড়ন তুলল সারা দেশের সংগীত মহলে। সবাই জেনে গেল এসে গেছে কুমার শানু।

'আশিকী' মুক্তি পেল 'অমর শিল্পী'র অনেক পরে। এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য হিন্দি ভাষার সুবিধায় 'আশিকী'-ই শানুকে এনে দিল সর্বভারতীয় স্বীকৃতি। তাই শানু ওর নতুন বাড়ির নাম রাখল 'আশিকী'। আমার স্বপ্ন সফল হল। নিউমুম্বই-এর স্ট্রাগল করা শানু ভট্টাচার্য, নর্থ মুম্বই-এর 'পশ' জায়গায় কুমার শানু হয়ে পেয়ে গেল নতুন ঠিকানা। কলকাতার যে রেকর্ড কোম্পানি তখন শানুকে বাতিল করেছিল, ওরা আমায় ফোনে অনুরোধ করল শানুকে ওদের ওখানে এনে দেবার জন্যে। বলেছিলাম—গুলশন কুমার একটা 'ছোট ফ্ল্যাট' আর একটা মারুতি দিয়েছেন। আপনারা একটা 'বাংলো' আর একটা মার্সেডিজ দিন নিশ্চয়ই শানুকে এনে দেব। এর পর আজ পর্যন্ত প্রতি বছরের পুজোতেই লিখে এসেছি ওর জন্য গান। সুপার হিট হয়েছে 'সুরের রজনী গন্ধা', 'প্রিয়তমা মনে রেখো', 'সোনার মেয়ে', 'আমার ভালবাসা' ইত্যাদি ক্যাসেট। অজস্র বাংলা ছবিতেও লিখেছি ওর গান। আমার লেখা ওর ছবির গানগুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় বাপি লাহিড়ির সুর করা অনিল গাঙ্গুলির 'বলিদান ছবির'—'মানুষ যে আজ আর নেই তো মানুষ/ দুনিয়াটা শুধু স্বার্থের/পর আজ ভাই বোন/সংসার পরিজন/সবাই নিজের নিজের'।

'আশিকী'র পর থেকেই কিশোরকুমার থেকে সরে এসে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে গান গাওয়ার নিজস্ব স্টাইল, নিজস্ব সত্তা। শানু আজ একটা 'ইন্সটিটিউশান'। সারা ভারতের এই প্রজন্মের তরুণ গায়করা কপি করছে ওকে। আজ মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়—কিশোরকুমারের থেকে শানুর কপি সিঙ্গারের সংখ্যা এ দেশে অনেক অনেক বেশি। শানু আরও সফল হোক, আরও বড় হোক এই কামনাই কার।

৭০

যতদিন বাংলা ছবি বেঁচে থাকবে ততদিন যে দুজন শিল্পী অমর হয়ে থাকবেন তাঁরা হলেন উত্তম-সুচিত্রা। আগে ছবির টাইটেলে উত্তম-সুচিত্রা থাকত। পরে সেটা বদলে গিয়ে হয়েছিল সুচিত্রা-উত্তম। সে যাই হোক, দুজনেরই প্রতিভার আলোতে চিরদিনই প্রজ্জ্বল থাকবে বাংলা চিত্রজগৎ। জানি না বাংলা সিনেমাতে ওঁদের ছাড়িয়ে আর কেউ কোনওদিন আসতে পারবেন কি না।

সুচিত্রা সেনের যে ছবিতে আমি প্রথম কাজ করি, সেই ছবির পরিচালক ছিলেন নারায়ণচন্দ্র ঘোষ। যতদূর স্মরণে আসছে নারায়ণবাবুর ছবির সেটেই (ছবিটির নাম মনে আসছে না) মিসেস সেনের সঙ্গে আমার পরিচয়। বোধহয় দুদিন শুটিং-এর পরই ছবিটি অনিবার্য কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবং অনেক পরে যখন আবার শুটিং শুরু হল তখন সুচিত্রা সেন আর ও ছবিতে অভিনয় করেননি। করেছিলেন অন্য নায়িকা।

সুচিত্রা সেন অভিনীত অনেক ছবিতেই গান লেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তার মধ্যে যেসব গানের ঘটনাগুলো আমার মনে আসছে, সেইগুলো নিয়েই শুরু করি।

'ফরিয়াদ' ছবির 'নাচ আছে গান আছে' এই গানটি ওই ছবির সুরকার নচিকেতা ঘোষ ওঁকে গেয়ে শোনাবার পরই মিসেস সেন আমায় বলেছিলেন, অপূর্ব লিখেছেন পুলকবাবু।

এই অভিনন্দনটি আজও আমার স্মৃতি ভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে। গানটির মধ্যিখানে একটি দারুণ নাটকীয়তার প্রয়োজন ছিল। একটি লাইনে লেখা হয়েছিল 'আমি হাসি/শুধু হাসি'। এর পরেই থাকবে সুরের ওপরেই গায়িকার একটি মর্মান্তিক হাসি। এবং সেই হাসিটি রূপান্তরিত হয়ে যাবে কান্নায়। অর্থাৎ হাসতে হাসতে গায়িকাকে কেঁদে ফেলতে হবে গানের সুরের ওপরই। অত্যন্ত কঠিন এই কাজটি কীভাবে মুম্বই-তে আশা ভোঁসলেকে দিয়ে করানো যাবে, এটা যখন আমরা চিন্তা করছিলাম, তখন ম্যাডাম অর্থাৎ সুচিত্রা সেন বললেন, দারুণ হবে ব্যাপারটা। আসুন আমি হেল্প করছি। টেপ রেকর্ডারটা চালাতে বললেন উনি। নচিবাবু গাইতে গাইতে 'আমি হাসি/শুধু হাসি' এই পর্যন্ত গাওয়ার পরেই উনি ইশারায় নচিবাবুকে থামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে কেঁদে উঠে দেখিয়ে দিলেন এই অভিব্যক্তিটি কেমন হবে। সেই অসাধারণ অভিনয়কে টেপে রেকর্ড করে নচিবাবু মুম্বই-তে নিয়ে গেলেন। আশাজি টেপটি শুনেই বুঝলেন, কী জিনিস আমরা চাইছি। উনিও বিরাট শিল্পী। হাসতে হাসতে কেঁদে উঠে গেয়ে দিলেন সেই অংশটি। জানি না বাংলা ছবি আর কখনও সেই সুচিত্রা সেন আর সেই আশা ভোঁসলেকে ফিরে পাবে কিনা। তবে আমরা যে কিছু একটা করতে পেরেছিলাম সেটা আমরা ভুলব কেমন করে?

সুচিত্রা সেন কীভাবে চরিত্রের মধ্যে কত নিষ্ঠায় ডুবে যেতেন তার প্রমাণ পেয়েছিলাম এই গান যখন টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে পিকচারাইজড হয় সেই দিন। উনি আমার কাছে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন এই গানের শুটিং-এর দিন আমি স্টুডিয়োর ফ্লোরে থাকব। আমার যদি কোনও সাজেশন থাকে তা বিনা দ্বিধায় ওঁকে জানাব।

ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু উনি ভোলেননি। তাই শুটিং-এর সময় ঠিক হতেই ওঁর কাছ থেকে ফোন এল, আমি যাতে ফ্লোরে হাজির থাকি।

মুশকিলে পড়ে গেলাম আমি। আমার সেই দিনই অন্য আর একটি ছবির সিটিং-এর জন্য সময় দেওয়া ছিল। ওঁকে অনুরোধ করলাম। বললাম, আমি স্টুডিয়োতে যাব। তবে একটু দেরি হবে। আমার অবস্থাটা বুঝলেন ম্যাডাম। বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু ওই সময়ের একটুও দেরিতে নয়। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে বোধ হয় সে দিন টেকনিসিয়ান স্টুডিয়োতে পৌঁছেছিলাম। ফ্লোরের দরজাটা বন্ধ ছিল। কারণ খুবই স্বল্পবাসে এক ক্যাবারে নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন ম্যাডাম। নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনও লোকের সে দিন ফ্লোরে ঢোকার অনুমতি ছিল না। আমি ফ্লোরের বন্ধ দরজার কাছে আসতেই খুলে গেল দরজা। চমকে দেখি সবেগে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আসছেন উনি। চোখেমুখে উষ্মা, ক্রোধ, জ্বালা। হতচকিত আমায় দেখে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

উনি ফ্লোরের সামনের মাঠ পেরিয়ে ওঁর নিজস্ব মেক-আপ রুমের দিকে দৌড়ে চললেন। যে জায়গাটা এখন পাতাল রেলের কল্যাণে ভাঙা পড়েছে। হারিয়ে গেছে

সুচিত্রা সেনের সেই বিখ্যাত মেক-আপ রুম এবং বিশ্রাম কক্ষটি।

আমি ওঁর পিছু পিছু ছুটলাম। আমার পেছনে ছুটতে লাগল প্রোডাকশনের একটি লোক। হাতে একটা চাদর নিয়ে। দেখলাম স্বল্প-বসনা ম্যাডামের হুঁশই নেই নিজের পোশাক সম্পর্কে। ফ্লোরের বাইরের মাঠে কত লোকজন। উনি সবার চোখের সামনে দিয়ে সেই সাজেতেই ছুটে গিয়ে ঢুকলেন ওঁর মেক-আপ রুমে। ঢুকলাম আমিও। পেছনের প্রোডাকশন বয়টি চাদরটা ছুড়ে দিল ঘরের ভেতরে। মিসেস সেন দড়াম করে মেক-আপ রুমের দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। ভেতরে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে দেখলাম এক অনন্য সুচিত্রা সেনকে। তখনও বাংলা ছবিতে নাচের দৃশ্যে কোনও ক্যামেরা ও এডিটিং জানা সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল কোরিওগ্রাফার কেউ আসেনি।

আজকাল যেমন নাচের দৃশ্য গ্রহণের সময় চিত্রপরিচালকরা চেয়ারের ওপর বসে থাকেন। আর কোরিওগ্রাফার শট টেক করেন। ওঁরাই নাচের দৃশ্যটি এডিট করে দেন। বাংলা ছবিতে আগে এমন ছিল না। নৃত্যশিক্ষক অবশ্য একজন থাকতেন। তিনি নাচের কায়দাকানুন, মুদ্রা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি দেখিয়ে দিতেন। আর চিত্রপরিচালকই গ্রহণ করতেন নাচের দৃশ্যটি। এই প্রসঙ্গে মনে আসছে 'কাল তুমি আলেয়া' ছবিতে আমার লেখা এবং আশাজির গাওয়া 'একটু বেশি রাতে...' গানটি টেক করেছিলেন ওই ছবির পরিচালক নয়, ওই ছবির সুরকার ও প্রথম কোরিওগ্রাফার নায়ক, উত্তমকুমার।

যাই হোক নৃত্যশিক্ষকের শেখানো 'ফরিয়াদ' ছবির নাচ গানের দৃশ্যগুলি তখনকার রেওয়াজ মতো টেক করছিলেন ওই ছবির চিত্রপরিচালক। আমরা মনে হল যে কোনও কারণেই হোক ম্যাডামের সেদিনের টেকিংটি মনঃপূত হয়নি। উনি হাঁফাতে হাঁফাতে আমায় বললেন, জানেন ওঁরা খালি সেটের ছবি তুলছেন। কোথায় ক্লোজ শট? আপনি লিখেছেন 'চোখের এই জল শুধু চেয়োনা/একে যায় না কেনা'। আমি আমার চোখের তারায় এই গানের এই হাসি আর কান্না একসঙ্গে নিখুঁত করে দেখাব বলে কতদিন সাধনা করেছি। আর তা দেখাবার কোনও স্কোপ নেই? (আমার এই ঘটনাটা লিখতে লিখতে দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। আজকে বাংলার অভিনেত্রীরা যেমন এ ধরনের গানও পান না। আবার তেমনই এমন গান পেলেও এ ধরনের অভিব্যক্তি ফোটানোর সাধনা কতটুকু করেন তা আমার জানা নেই।) এবার ম্যাডাম উঠে দাঁড়ালেন। ফেলে রাখা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, আপনি এত সুন্দর একটা গান লিখেছেন, নচিবাবু এত ভাল সুর করেছেন, আশাজি এমন চমৎকার গেয়েছেন, এ আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। আমি চললাম। আজ প্যাক-আপ। কথা শেষ করেই মেক-আপ রুমের ভেতর থেকে বন্ধ করা দরজার ছিটকিনিটা একটানে খুলেই বেরিয়ে গেলেন ম্যাডাম।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। উনি সোজা উঠে গিয়ে বসলেন ওঁর গাড়িতে। চলে গেল গাড়ি।

ম্যাডাম, আপনি যদি এ লেখা পড়েন তা হলে নিশ্চয় মনে পড়ছে সেই দিনের ঘটনাটা। আমি তখন যেমন আপনার অপূর্ব নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম, আজ লিখতে বসে আবার নতুন করে সেই শ্রদ্ধা জানালাম।

ম্যাডাম তো চলে গেলেন। আমি পড়লাম বিপদে। ইউনিটের অনেকেই আমাকে

ঘিরে ধরে প্রশ্ন করতে লাগলেন, কী বললেন উনি? আমি কী বলব, কী উত্তর করব ভেবে না পেয়ে, আমিও ওঁদের এড়িয়ে উঠে পড়লাম আমার গাড়িতে। তাড়াতাড়ি স্টুডিয়ো ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

প্রযোজক পক্ষ ওঁর কাছে গিয়ে ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পরের দিনই নিয়ে এলেন ফ্লোরে। এবং ওঁর কথামতোই ক্লোজ শট দিয়ে ওই গানটির বিশেষ লাইনগুলো চিত্রায়িত হল। যাঁরা এই ছবিটি দেখেছেন, নিশ্চয় মনে রেখেছেন তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের কথা। এবার এই ঘটনাটি জেনে সবাই বুঝতে পারবেন কেন সুচিত্রা অবিস্মরণীয়।

ওই ছবিতে আমার আর একটি গান আশাজির গাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ডেট সমস্যা দেখা দেওয়ায় আরতি মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গাওয়ানো হয়েছিল। আরতিও দুর্দান্ত গেয়েছিল গানটি, 'সে আমার বুকভরানো ছোট্ট একটা চিঠি'। ম্যাডাম রেকর্ডিং করে আনা এই গানটি শুনেই মুখ তুলে তাকালেন। ভাবলাম হয়তো বিরূপ কিছু বলবেন। কিন্তু শুনে বললেন, চমৎকার গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। আমি গানের কথার ওপর সঠিক অ্যাকটিং চাই। গান, যিনিই গান আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি যে গানে অ্যাকটিং করব তার ব্লুপ্রিন্টটাই নিখুঁত না হলে, তবে তাকে আমার অভিনয় দিয়ে মনের মতো করে সাজিয়ে গুজিয়ে বানাব কী করে? একজন শিল্পীর এই কথাতেই বোঝা যায়, উনি কোন জাতের শিল্পী এবং কত বড় শিল্পী।

আর একটা ঘটনা মনে আসছে। প্রযোজক অজয় দত্ত যখন আমার কাহিনী 'রাগ অনুরাগ' নিয়ে ছবি করবেন ঠিক করলেন, তখন বিভিন্ন নামের মধ্যে ওঁরা পরিচালক হিসাবে বেছে নিলেন দীনেন গুপ্তের নাম। দীনেনবাবু প্রযোজক অজয় বসুর হয়ে আমার কাহিনী অবলম্বনে 'প্রান্তরেখা' ছবিটি করেছিলেন। সুতরাং আমাদের মানসিকতার মেলবন্ধন ছিলই। এই জন্য দীনেন গুপ্তকে ধরতে আমি ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি 'দেবী চৌধুরানী'-র শুটিং চলছে। সেদিনই মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে সন্ধ্যার গাওয়া এবং আমার লেখা 'চেয়োনা ও চোখে চেয়ো না' গানটির পিকচারাইজেশন করছেন সুচিত্রা সেনকে দিয়ে। শটের ব্রেকে দীনেনবাবুকে আমার আসার কারণটা বললাম। ম্যাডাম জানতে পেরে হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বললেন, কী দীনেনবাবু আমি আছি তো? উত্তরে আমি বললাম, আপনি থাকলে তো ধন্য হয়ে যাব। যাই হোক কথাবার্তার দিন ঠিক করে চা খেতে খেতে শুটিং দেখতে লাগলাম। দেখলাম ম্যাডামের সেই অপূর্ব দুটো চোখের জাদু। গানে যা লিখেছিলাম তাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়ে কীভাবে প্রাণবন্ত করে দিচ্ছেন এক একটি শট। বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। যাবার সময় ওঁকে বলে চলে আসতে যাচ্ছি আবার সেই স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা করলেন উনি। বললেন, খোকাবাবু, (দীনেনবাবুর ডাক নাম) পুলকবাবুর আমার কাছে থাকতে ভাল লাগছে না। কার কাছে যাচ্ছেন জেনে নিন তো?

তৎক্ষণাৎ ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, আপনারা কাজ করছেন। আমার শুধু শুধু থাকার কী দরকার? উত্তরে সিরিয়াসলি বললেন, বা, কেমন হচ্ছে বলবেন তো?

বললাম, একটা কথাই মনে আসছে। একসেলেন্ট! উনি বললেন, ব্যাস্। আর কোনও কথা নেই? এটা শুনে লাভ কী? বলুন কোথায় ভুল, কোথায় ত্রুটি।

এবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমি ওসব বলতে পারব না। ও সব বলবেন পত্রিকার সমালোচকরা। এ কথা শুনে সেই অপূর্ব ভঙ্গিতে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, দিলেন তো মেজাজটা খারাপ করে? আমি বিব্রত হয়ে বললাম, আমি অমনি বললাম। কিছু মনে করবেন না। ম্যাডাম বললেন, তা হলে বসুন। দেখুন আপনার গানের পিকচারাইজেশন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুচিত্রা সেন 'দেবী চৌধুরানী' হয়ে গেলেন।

৭১

সুচিত্রা সেন অর্থাৎ আমাদের ম্যাডামকে নিয়ে আরও টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে আসছে। তখন সলিল সেন তৈরি করছিলেন হার মানা হার ছবি। ওই ছবির সময় দেখা হতেই বললেন, ভাল লিখেছেন, আকাশ নতুন বাতাস নতুন/সবই তোমার জন্য । সুধীনবাবু সুরও করেছেন ভাল। বাকি সব গানই তো উতুর (উত্তমকে ওই নামেই ডাকতেন)। আমার আর গান কোথায়? কেন লেখেননি আমার জন্য আর কোনও গান?

কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম। তৎক্ষণাৎ ম্যাডাম নিজেই স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললেন, না, আমার এই চরিত্রে আর গান মানাত না। ঠিক করেছেন সলিলবাবু।

আলো আমার আলো ছবির 'এই এত আলো এত আকাশ' গানটা তৈরি হওয়ার পর ম্যাডামের সঙ্গে দেখা হতেই বলেছিলাম, পানুদা (পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়) বললেন একই গাড়িতে আপনি আর উত্তমকুমার পাশাপাশি যেতে যেতে গানটা গাইবেন। অথচ গানটা হবে শুধু পুরুষ কণ্ঠে? আমার ধারণা এটা ডুয়েট হলে গানটা আরও জমবে।

কথা শুনে হেসে উঠলেন ম্যাডাম। আমায় আশ্বস্ত করে বললেন, ওটা উত্তম একাই গাইবে। আমি পাশে থাকব। ক্যামেরার একই ফ্রেমে দু জনকে দেখা যাবে। অথচ আমি গাইব না। কিন্তু দেখবেন শুধু এক্সপ্রেশনে গানটা ডুয়েট গান করে দিতে পারি কি না।

যাঁরা এই ছবি দেখেছেন তাঁদের সবাইকেই মানতে হবে কী ধরনের অভিনয় দিয়ে একটা নতুন ধরনের গান করে দিয়েছিলেন ম্যাডাম এই 'এত আলো এত আকাশ' কে। অবশ্য গান পিকচারাইজেশন এবং শট টেকিংয়ে পরিচালক পিনাকীবাবুর অনবদ্য কর্মকুশলতার কথাও স্বীকার্য। মিসেস সেন আর পানুদার এই যোগাযোগটিও স্মরণীয়। কিন্তু এই গানেরই আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরে মান্না দের কণ্ঠে আমার এই গানটি রেকর্ডিং হওয়ার পর একদিন উত্তমের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় আলো আমার আলো ছবির প্রসঙ্গ উঠতেই উত্তম বলল, মামা, আমি গানটি শুনেছি। গানটা ভাল হয়েছে। কিন্তু আমি লিপ দেব না।

কথাটা শুনে অস্ফুট স্বরে শুধু বললাম, সে কী?

দৃঢ় কণ্ঠে উত্তম বলল, না, আমার যা চরিত্র তাতে ও গান মানায় না। কথাটা বলেই উত্তম অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

গানটা সুপারহিট হবে এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু ছবিতে যদি গানটা না-ই থাকে তবে হিট ফ্লপের প্রশ্নই তো আসে না।

একেবারে মুষড়ে পড়লাম আমি। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, কদিন বাদেই দেখা হয়ে গেল ম্যাডামের সঙ্গে। দেখা হতেই বললাম উত্তমের কথাটা। সেই ভুবনমোহিনী হাসি হেসে সুচিত্রা সেন বললেন, একটুও টেনশন করবেন না। আমি ওকে রাজি করাবই। গান পিকচারাইজেশন হয়ে গেলেই আপনাকে খবর দেব প্রোজেকশন দেখে যাবেন।

উত্তম যে রাজি হয়েছিল তার প্রমাণ তো আজও সবাই পাচ্ছেন, যারা দেখেছেন এই আলো আমার আলো ছবিটি। এই সুচিত্রা সেনের আবার বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্যও আমি দেখেছি। যেদিন উত্তম আমায় সপ্তপদী-র প্রোজেকশন দেখতে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির প্রোজেকশন রুমে ডাকল সেদিনই নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োতে ঢুকেই মুখোমুখি হয়েছিলাম ম্যাডামের সঙ্গে। শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছিল। আমরা অনেকেই প্রোজেকশন রুমে ঢুকলাম। উত্তমও ঢুকল। শুধু এলেন না ম্যাডাম। উত্তম ছবির প্রোজেকশন শুরু করতে নির্দেশ দিয়ে দিল। ফিস ফিস করে উত্তমকে বললাম, ম্যাডাম এখনও আসেননি তো? একটু দেরি করো।

উত্তম হেসে বলল, না। উনি সব্বার সঙ্গে বসে এ-ছবি দেখবেন না। উনি পরে প্রোজেকশন দেখবেন একেবারে একা। কেউই ওখানে থাকবে না। নিজেকে উপলব্ধি করবেন, কে বেশি স্বাভাবিক রিনা ব্রাউন না সুচিত্রা সেন।

মনে পড়ছে এই সপ্তপদী-র ওথেলো অংশটির কথা। আমার ধারণা কোনও বাংলা ছবিতে, শুধু বাংলা ছবি কেন কোনও ভারতীয় ছবিতেও ওথেলোর মতো এত বড় ইংরেজি সংলাপের দৃশ্য আজ পর্যন্ত সম্ভবত আসেনি। কেউই সাহস করেননি এমনধারা করতে। আজকাল যেমন হিন্দি-বাংলা বা ওড়িশি-বাংলা ছবি হামেশাই হচ্ছে। তেমনই আজ থেকে বহুদিন আগে মধু বসু করেছিলেন সাধনা বসুকে নিয়ে ইংরাজি-বাংলা ছবি কোর্ট ডান্সার ও রাজনর্তকী। ওই কোর্ট ডান্সারকে পুরোপুরি ইংরেজি ছবিই বলা যায়। এখনও মনে পড়ে সবে ইংরেজি অক্ষর চিনে বানান করে পড়তে শেখা এই আমি, কর্তাদাদুর সদ্য কেনা হামবার গাড়িতে চড়ে ইডেন গার্ডেন থেকে ফিরছিলাম। ওখানে তখন বিকালে গোরাদের ব্যান্ড বাজনা হত। সেই বাজনা শুনে ফেরবার পথে মেট্রো সিনেমার ব্যালকনিতে কোর্ট ডান্সার এই ইংরেজি কথাটি পড়ে কর্তাদাদুকে শুনিয়ে অবাক করে দিয়েছিলাম।

যাই হোক, সপ্তপদী যখন হয় তখনও প্রযোজক পরিবেশক এবং চিরাচরিত ফিল্মের একটা বাণিজ্যিক বাজার ছিল।

পরিচালক অজয় কর বা উত্তমকুমারকে কেউই কিন্তু একবারও বলেননি অত বড় ইংরেজি দৃশ্য দেবেন না। মফস্বলে বা গ্রাম বাংলায় কেউ বুঝবে না। কেটে ফেলে দিতে হবে। সেই সময় গানের ব্যাপারেও আজকের মতো কোনও তথাকথিত কর্তৃপক্ষের কাছে আমাকে বা আমাদের শুনতে হত না, দাদা, দোহাই, গানের এই অংশটি বদলে দিন। আজকাল যাঁরা সিনেমা দেখেন তাঁরা বুঝবেন না।

সত্যিই মাঝে মাঝে কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। আজকের চিত্রমোদীরা কি শিক্ষায়, কি সাংস্কৃতিক রুচিতে দু-তিন দশক আগের মানুষদের থেকে কী পিছিয়ে গেছেন। এই সপ্তপদী-র ওথেলো দৃশ্যটিকে প্রাণবন্ত করার জন্য আমি দেখেছি উত্তমের কী পরিশ্রম।

নামী-অনামী কত শেক্সপিয়ারের নাটক করা এবং পড়ানো মানুষের ইংরেজি অভিনয়, উচ্চারণের অভিব্যক্তি দিনরাত চর্চা করত উত্তম। শেষটায় হাতের কাছে উৎপল দত্তকে পেয়ে যেন নির্ভরতা খুঁজে পেল। সেই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ টিমের সময়কার ওথেলোর উৎপল দত্ত ডেসডিমোনার অভিনেত্রীটি অভিনীত টেপের ওপর উত্তমকে দিনের পর দিন যে অনুশীলন করতে আমি দেখেছি তা আজও আমার কাছে বিস্ময়! দৃশ্যটি প্রাণবন্ত হয়েছিল উত্তম-সুচিত্রার অভিনয়ের গুণে। তখনকার পরিশ্রমী উত্তমকে আমি তাই বলেছিলাম, তোমার চাল-চলন দেখে কবি সত্যেন দত্তের সবার আমি ছাত্র কবিতাটি মনে পড়ে যাচ্ছে।

উত্তরে উত্তম সেই ছোটি সি মুলাকাত ছবির নাচের দৃশ্য গ্রহণের সময় যেমন বলেছিল বৈজয়ন্তীমালা একজন নামী ডান্সার, আমি কি ডান্সার না কি? ওর সঙ্গে নাচতে হলে আমায় তো বেশি পরিশ্রম করতেই হবে। এবার ঠিক তেমন করেই বলল, শেক্সপিয়ারের ড্রামা আমি স্টেজে দেখেছি। ওদের দেশের সিনেমায় অনেক দেখেছি শেক্সপিয়ারের নাটকের ফিল্ম। কিন্তু অভিনয় তো কখনও করিনি। তাই আমাকে তো একটু বেশি করে ধ্যান দিয়ে পরিশ্রম করে লড়তে হবেই।

এখন এ সব ঘটনা ভাবলেই মনে হয় সেই অধ্যবসায়ও কি হারিয়ে গেল আমাদের?

উত্তম প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনার কথা মনে আসছে। প্রায়ই যেমন সান্ধ্য মজলিশ জমাতে উত্তমের কাছে হাজির হতাম। সেদিন ঠিক তেমনই হাজির হলাম। উত্তম তখন কোথাও যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠছে। আমি বললাম, তা হলে আজ আসি। আর একদিন আসব।

উত্তম কিন্তু আমায় ছাড়ল না। জোর করে ধরে নিয়ে গেল আমাদেরই পরিচিত একজনের বাড়িতে। সেখানে গল্প-গুজব সেরে যখন উঠলাম তখন বেশ গভীর রাত। যেহেতু আমার গাড়ি রাখা ছিল উত্তমের বাড়ির সামনেই তাই আবার আমায় উত্তমের গাড়িতে চেপে উত্তমের বাড়িতেই ফিরতে হল। ওর বাড়িতে এসে যখন আমার গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি তখন বেশ আদেশের সুরে ও আমায় বলল, মামা, আমার সঙ্গে এসো, কথা আছে।

ঘরে ঢুকে বললাম, ওরা সব গেল কোথায়?

উত্তরে বলল, ওরা আজ কেউ নেই। আমি একা। সেজন্যই তো তোমায় ডাকলাম। তোমার গাড়ি এখানে থাকুক। তুমি বাড়িতে ফোন করে দাও আজ এখানে থাকবে।

অতটা বোকা আমি নই। ওরা থাকলেও কতবার উত্তমের বাড়িতে আমি থেকেছি। উত্তম ভেবে নিয়েছে, গভীর রাতের কলকাতায় একা গাড়ি চালিয়ে বাড়ি যেতে নিশ্চয় আমার কোনও অসুবিধা হবে। তবু ওই যে বলল কথা আছে। ওই আকর্ষণেই বাড়িতে ফোন করে দিলাম, ফিরছি না। আর উত্তমের কাছে থাকছি এই কথা বললেই বাড়িতে আমার সাত খুন মাপ। এবারও তাই হল। (উত্তম এই ব্যাপারটা জানত। সেজন্য হাসতে হাসতে আমার মাকে এবং বউকে বলেছিল মামার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার সঙ্গে কথা বলে যাচাই করে নেবেন। মামা আমার কাছে থাকছে না অন্য কোথাও।)

যাই হোক, উত্তম একটা পাজামা বার করে দিয়ে বলল, মামা, এবার শুয়ে পড়া যাক।

আমি বললাম, কী কথা আছে বললে যে?

তৎক্ষণাৎ হয়তো ব্যাপারটা ওর মনে পড়ে গেল। আমরা আলোচনায় বসে গেলাম। আলোচ্য বিষয় ছিল যতদূর মনে পড়ছে লভ ইন দ্য আফটারনুন ছবিটার গল্প নিয়ে। যেটা সমরেশ বসুর জাদু কলমে হয়েছিল বিকেলে ভোরের ফুল। পরিচালক ছিলেন পীযূষ বসু। সংগীত ছিল হেমন্তদার। গীতিকার ছিলাম আমি। আলোচনা করতে করতে হঠাৎ ঘড়িতে দেখি অনেক রাত হয়ে গেছে। অতএব আর দেরি না করে তখনই শুয়ে পড়লাম আমরা। পরদিন ঘুম ভাঙল আমার সকাল এগারোটায়। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কাজের লোক এসে বলল, উঠেছেন? আপনাকে চা দি?

আমি বললাম, হ্যাঁ দাও। কিন্তু উত্তম কোথায়?

কাজের লোকটি বলল, উনি তো সকালে উঠে ময়দানে হেঁটে এসে স্নান করে ব্রেকফাস্ট সেরে স্টুডিয়োতে চলে গেছেন। বেশ রাগ করেই বললাম, আমায় ডাকলে না।

উত্তরে কাজের লোকটি বিনীতভাবে বলল, আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। সাহেব যে আপনার ঘুম ভাঙাতে বারণ করে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ নিজের প্রতি ধিক্কার এল। সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি আমরা একসঙ্গে ছিলাম। একই শ্রান্তি আমাদের দু জনেরই ছিল। অথচ আমি একা পড়ে পড়ে ঘুমোলাম। আর উত্তম ঠিক সময় উঠে, সব কাজ সেরে চলে গেল শুটিং করতে। ও উত্তমকুমার হবে না তো আমি উত্তমকুমার হব?

৭২

উত্তম ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চলে যেত ময়দানে হাঁটতে। এর ফলে ওর শরীর এবং মন তরতাজা থাকত। এইভাবে প্রাতঃভ্রমণ করার সময় একবার দারুণ বিপদের মধ্যে পড়ে যায় উত্তম। সেই সময় সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছিল দারুণ রাজনৈতিক অস্থিরতা। একদিন সকালে ময়দানে হাঁটার সময় উত্তমের চোখে পড়ে গেল সেই মর্মান্তিক দৃশ্য। ওই দৃশ্যটি দেখে হাত পা ঠাণ্ডা হওয়ার উপক্রম হল উত্তমের। দুষ্কৃতীরা উত্তমকে চিনতে পেরেছিল কি না জানি না, তারা কিন্তু উত্তমের সামনে এসে নির্বিকারভাবে বলেছিল, আমরা কোনওদিন আমাদের কাজের সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখি না। সব ঝেড়ে মুছে সাফ করে দিই। আপনি বলেই ছেড়ে দিলাম। তবে একটা কথা, যদি আমাদের কোনও বিপদ হয়, তা হলে কিন্তু আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব না। কথাটা মনে রাখবেন।

রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল উত্তম। ওর মনে হয়েছিল, কলকাতায় থাকা ঠিক হবে না। অন্য কোনও সূত্রে খবর পেয়েও যদি ওদের কারও কিছু ঘটে যায় তার জন্যও ওরা তাকেই দায়ী করবে। অতএব রিস্ক নিয়ে কলকাতায় না থেকে কোথাও পালিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে উত্তম ঠিক করে। কালবিলম্ব না করে সেইদিনই উত্তম চলে গিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদে।

উত্তমের এলাহাবাদে চলে যাওয়াটা কলকাতায় সবার কাছে অজ্ঞাত থাকলেও

এলাহাবাদে কিন্তু অচিরেই জানাজানি হয়ে গেল। ওকে চিনে ফেলেছিল ওর কিছু অনুরাগী। তারপর যা হয়। লোকমুখে ক্রমশ সেই বার্তা রটে গেল। এ খবর এসে পৌঁছে গেল কলকাতায়। ডেট না পাওয়া পরিচালক জগন্নাথ বসু, রেডি স্ক্রিপ্ট নিয়ে হাজির হলেন এলাহাবাদে। প্রযোজক অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন উত্তমকে। তাঁরা বোঝালেন, যতদিন এলাহাবাদে থাকবেন ততদিনই শুটিং হবে। আবার অন্য কোথাও গিয়েও যদি শুটিং করতে চান তাতেও তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু উত্তম মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়ায় মনস্থির করে উঠতে পারল না। হতাশ হয়ে ফিরে আসেন তাঁরা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আর একটি ডেট না পাওয়ার ঘটনা। পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য উত্তমকে নিয়ে একটি ছবি করার পরিকল্পনা করে উড়ে আসেন সেই মুম্বই থেকে কলকাতায়। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সোজা চলে আসেন উত্তমের বাড়ি। আমার সামনেই উনি উত্তমকে একটা অদ্ভুত ধরনের প্রস্তাব দেন। বাসুবাবু উত্তমকে বললেন, ডেট বলতে যা বোঝায় সে-সব আমার লাগবে না। আপনি আপনার সময়মতো যেদিন খুশি কাজ করবেন। কোনও ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে আপনাকে যেতে হবে না।

উত্তম বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাসুবাবুর কথা শুনে। বাসুবাবু বলে চললেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। আমার গল্পটি একটি বাড়ির মধ্যেকার ঘটনা। সবটাই ইনডোরে শুটিং হবে। আমি একটা বাড়ি ভাড়া করে ইউনিটের সবাইকে নিয়ে অন্যান্য শিল্পীদের শুটিং সেরে আপনার প্রতীক্ষায় থাকব। যেদিন আপনার সিডিউলড ছবির শুটিং একটু তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, অন্য কোথাও যাবার থাকবে না, সেদিন আপনি আমাদের কাছে চলে আসবেন। কয়েক ঘণ্টা আপনার শট টেক করব।

উত্তম বলল, কিছুই বুঝছি না। একটু খুলে বলুন।

বাসুবাবু বললেন, আমার গল্পের সবটাই আপনাকে ঘিরে। ছবির সবটুকু জুড়েই থাকবে আপনার অভিনয়। ছবিতে থাকবে হাতে গোনা কয়েকটি চরিত্র। আপনার সঙ্গে কো-আর্টিস্ট থাকছে না বললেই চলে। প্রয়োজন হলে আমাদের মধ্য থেকে কেউ তা সেরে নিতে পারবেন। এমনকী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য অনামী হলেও প্রতিভাসম্পন্না এক অভিনেত্রীও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আপনি কেবল সিডিউলড ছবির শুটিং করতে করতে যখন বুঝবেন তখনই একটা খবর পাঠাবেন, আমি আসছি বলে। আমরা রেডি থাকব।

সমস্ত পরিকল্পনাটা শুনে উত্তম খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আমার দিকে একচোখ বুজে আর একটি চোখকে লক্ষ্মীট্যারা করে মায়ামৃগ ছবির সেই উক্তিটি করে উঠল হরিবোল।

বাসুবাবুর উত্তমকে নিয়ে এই ছবিটি না হলেও বাসুবাবুর ভাবনাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। দুঃখ হয় একটা ভিন্ন স্বাদের বাংলা ছবি দর্শকরা দেখতে পেলেন না।

একক অভিনয়ের প্রসঙ্গে আমার একজনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর নাম বাণী মুখোপাধ্যায়।

ছোটবেলায় আমার মামার বাড়ির উঠোনে তাঁর একক অভিনয় দেখেছিলাম সীতা নাটকে। কখনও রাম, কখনও সীতা কখনও অন্য কোনও ভূমিকায় তিনি একাই অভিনয়

করে যাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, রিলিফ দেবার জন্য হনুমানের ভূমিকাতেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। একা এতগুলো ভূমিকায় অভিনয় করা ছাড়াও মেক-আপ, ড্রেস সবই তিনি নিজেই করেছিলেন। কী অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি! যাঁরা পুরনো দিনের যাত্রা থিয়েটারের খবর রাখেন, তাঁরা নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন, বাণীবাবুই প্রথম একক অভিনয়ের মাধ্যমে একটা বড় নাটককে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

বাণীবাবুর সীতা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাও সম্ভবত আমার সঙ্গে একমত হবেন। উত্তমের প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। আমার খুবই কাছের মানুষ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই আমাকে একজন সুরকারের কথা বলত। তাঁকে কিছু গান দিতে প্রায়ই অনুরোধ করত। তরুণের সঙ্গে দেখা হলেই অনুরোধ-উপরোধ করত ওই সুরকারের জন্য। একদিন বিরক্ত হয়েই বললাম, ঠিক আছে, একদিন তাঁকে আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো, দেখব।

এর কিছুদিন পরে একটি ছেলে সকালে এসে হাজির আমার বাড়িতে। নমস্কার করে বললেন, আমার নাম মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণদা নিশ্চয় আমার কথা বলেছেন? তরুণদা একটা চিঠিও দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্য—বলেই চিঠিটি আমায় দিলেন। এরপর ওর সঙ্গে সম্পর্কটা তুমি হয়ে গেল। বললাম, দুটি গান দিচ্ছি, সুর করে শুনিয়ে যেয়ো। ভাল লাগলে পরে আরও গান দেব।

এর কিছুদিন পর এসে গান দুটি গেয়ে শোনাল। খুব ভাল সুর। মনকে দোলা দেবার মতো সুর। বললাম, মৃণাল তোমার যখনই প্রয়োজন হবে, আমার কাছে আসবে। আমি তোমায় গান দেব। কোনওরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব রাখবে না।

এই গান দুটি বেশ কয়েকজন শিল্পী আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে গাইলেন। শ্রোতাদের ভাল লাগতে লাগল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। মৃণালই এর পর হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে গেল।

আমার লেখা ঝাউকুটির উপন্যাসটি একটি সিনেমা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবার পর পরিচালক স্বদেশ সরকার ওই উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে মনস্থ করেন। একদিন স্বদেশবাবু এক প্রযোজককে নিয়ে আমার সঙ্গে বসলেন। কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেল। ঝাউকুটির নামটি পরিবর্তন করে রাখা হল হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ। গান লেখার দায়িত্বও দেওয়া হল আমাকে। বললাম, গান তো লিখব। কিন্তু সুর করবেন কে?

স্বদেশবাবুই বললেন, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় হলে কেমন হয়? কে একজন বললেন, আলো আঁধারে ছবিতে মৃণাল ভাল সুর করেছেন। স্বদেশবাবু আবার বললেন, মৃণাল খুব ভাল সুর করেছে। কিছু গান শুনেছি, আমার তো ভাল লেগেছে। দেখুন না চেষ্টা করে।

সিটিং-এ বসে বুঝতে পারলাম মৃণাল কত পরিণত হয়েছে।

গানগুলোর সুর করল খুবই ভাল। তবে ছবি না চললেও মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রমুখর গাওয়া গান কিন্তু হিট করে গেল। মৃণাল আর আমি এর পর করি সৌমিত্র-আরতি ভট্টাচার্য অভিনীত নন্দিতা ছবি। নন্দিতা ছবির একটি গান সন্ধ্যা মুখার্জির গাওয়া, যেদিনের সূর্য এসে/তোমার চোখে/নতুন আলো ধরে/আমায় রাখো সেদিন করে। অবশ্যই উল্লেখ্য।

নন্দিতা ছবিতে সুরারোপ করার পর মৃণাল সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব পেল সলিল

দত্তের হিরে মানিক ছবিটির। ওই ছবিটির সংগীত নিয়ে সিটিং করার সময় আমার একটা প্রস্তাব শুনে মৃণাল চমকে উঠল। আমার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমার প্রস্তাব ছিল একটা সিচুয়েশনের গান নিয়ে। আমি বলেছিলাম, মৃণাল এই সিচুয়েশনে যে গানটা লিখব, সেই গানে তোমার একটা কাজ কমে যাবে। তোমাকে ওই গানের জন্য সুর করতে হবে না।

মৃণাল ঘাবড়ে গিয়ে বলল, তা কী করে হয়? আপনি কি আবৃত্তি করাতে চান?

ওর অবস্থা দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। হেসেই বললাম, ঘাবড়াচ্ছো কেন? আগে সবটা শোন।

বলুন।

টিভিতে একটা নাটকে তোমার গান শুনলাম। গানটার কথায় কোনও অ্যাপিল না থাকলেও সুর কিন্তু খুবই ভাল হয়েছে। ভাবছি ওই সুরের ওপর কথা লিখে দেব। আমার ধারণা গানটি হিট করবেই। হলও তাই। শুধু হিট নয়, সুপারহিট। গানটি ছিল—এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক/পৌঁছে যাবো।

৭৩

এবার অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। একদিন আমার বাড়িতে ফোন করলেন পরিচালক মনোজ ঘোষ। ফোনে আমাকে পেয়েই অসহায়ের মতো বললেন, দাদা, আমি দারুণ বিপদে পড়েছি। আপনি ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

বললাম, বিপদটা কী? সেটা আগে বলো।

মনোজবাবু বললেন, হেমন্তদা অসুস্থ। বলেছেন এক মাস কোনও ছবিতে কাজ করতে পারবেন না। আমি যে ছবিটা করছি সেটা মিউজিক্যাল ছবি। শুধু তাই নয়, শিল্পীদের ডেট নেওয়া হয়ে গিয়েছে। শুটিং ডেটও পাকা। অথচ গানের... ।

মনোজবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, কী ছবি করছেন?

তুমি কত সুন্দর ।

গল্পের জিস্টটা একটু বলবেন?

মনোজবাবু সংক্ষেপে গল্পের বিষয়টা বলার পর বললাম, অল্প নামী কোনও সুরকার হলে চলবে?

উনি বললেন, দাদা, আপনি যাকে ভাল বুঝবেন তাকেই নেব।

মৃণালের নাম করতে উনি রাজি হয়ে গেলেন।

মনোজবাবুকে নিয়ে যখন মৃণালের বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন মৃণাল গানের ক্লাস করতে ব্যস্ত। তখন ও শেখাচ্ছে 'তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে/আমার মরণ-যাত্রা যেদিন যাবে' গানটি। আমাদের দেখেই গান গাওয়া থামিয়ে দিতে মনোজবাবু বললেন, থামলেন কেন চালিয়ে যান। ভাল লাগছে।

মৃণাল হাসতে হাসতে বলল, পড়ে থাকা গান। এদের শিখিয়ে দিচ্ছি। পুলকদারই লেখা।

পড়ে থাকা গান মানে? সেটা আবার কী ধরনের গান? মনোজ জানতে চাইল।

তখন আমিই বললাম, গানটা একবার পুজোর জন্য মান্না দে-র জন্য তৈরি হয়। মান্নাদার খুবই পছন্দ হয়। কিন্তু রেকর্ড করার সময় গানটা বাদ দিয়ে দেন। তিনি মরণ যাত্রার গান করবেন না। সেই গানটি রিজেক্ট হয়ে পড়ে রয়েছে।

মনোজবাবু গানটি পুরো শোনার পর বললেন, আমার ছবিতে এই গানটি লাগাব:

তুমি কত সুন্দর ছবিতে মৃণালের অসাধারণ সুরে সৃষ্ট গানগুলি শুধু সুপারহিটই হয়নি, এখনও শুনলে মনে দোলা দেয়। সুরের এমনই বৈশিষ্ট্য। গানগুলো যদিও আমারই লেখা। তবে এই ছবিটি আর একবার প্রমাণ করে দিল ছবি না চললেও গান জনপ্রিয় হতে পারে।

জগজিৎ সিংহ-চিত্রা সিংহ জুটির চিত্রার প্রথম বাংলা ছবিতে গানের জগতে প্রবেশ ঘটে 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' ছবিতে।

চিত্রা আসলে কলকাতারই মেয়ে। টালিগঞ্জে থাকতেন চিত্রা সোম। আমার স্ত্রীর স্কুলের সহপাঠিনী উনি।

যথাসময়ে বিবাহ হয়। কন্যা সন্তানের জননীও হন। কিন্তু সেই বিবাহ বিচ্ছেদ করে বিবাহ করেন জগজিৎকে। জগজিতের জন্যই ওর হিন্দি গজল জগতে প্রতিষ্ঠা। এইচ. এম. ভি. থেকে চিত্রার প্রথম বাংলা আধুনিক গানের এল পি প্রকাশিত হয় সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং জগজিৎ সিংহের সুরে। ওখানেও গীতিকার ছিলাম আমি।

সন্ধ্যা প্রদীপ ছবিতে মৃণালের সুরে আমার লেখা আমি তোমার চিরদিনের গান দিয়ে বাংলা ছবির গানের জগতে আত্মপ্রকাশ করা চিত্রা গানটি রেকর্ড করেই আমাকে ঝাঁঝের সঙ্গেই শুনিয়ে দিল, বাংলা ছবিতে মারাঠি ফিমেল সিঙ্গার ছেড়ে আবার বাঙালি সিঙ্গারদের দিকে নজর দেওয়ার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

এই চিত্রাই একদিন মুম্বই-তে আমাকে ফোন করল। বলল, কলকাতায় ফোন করেছিলাম। শুনলাম, আপনি মুম্বই-তে। আমার নেকস্ট এল পি র সব গান আপনি যদি লিখে দেন।

বললাম, জগজিৎ গাইবে তো?

চিত্রা বলল, নিশ্চয়। ওকে আমি বাংলা উচ্চারণ শিখিয়ে নেব। খুশি তো আপনি?

খুশি হলেও কম মেহনত করতে হল না জগজিৎকে নিয়ে।

অবাঙালি জগজিৎকে পাখি পড়ানোর মতো করে বাংলা শিখিয়ে গান গাওয়াল চিত্রা।

বেশ কিছুদিন বাদে এইচ এম. ভি. আমাকে ডেকে পাঠাল মুম্বই-তে। ওদের প্রস্তাব শুনে আমি চমকে উঠলাম:

জগজিৎকে দিয়ে এইচ এম ভি বাংলা গানের রেকর্ড করাতে চায় আমার লেখা কথায়।

চমকে ওঠার কারণও ছিল। জগজিৎ-চিত্রা কিছুদিন ধরেই গান ছেড়ে নিজেদের গৃহবন্দি করে রেখেছে। পথ দুর্ঘটনায় সন্তানের মৃত্যুর পর এরা শোকে ভেঙে পড়েছে। এরা আবার রেকর্ড করবে তো?

মুম্বই-তে এদের গানের ঘরে ঢুকতে জগজিৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে রইলেন বেশ কিছু সময়। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, দাদা, যে গেছে তাকে তো আর ফিরে পাব

না। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে। জানি কোনওদিনই ওকে ভোলা যাবে না। তবুও কাজের মধ্যে দিয়ে ওকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

বলেই কেঁদে ফেলেন। পরে জগজিতের গাওয়া তৃষ্ণা ক্যাসেটটি প্রকাশিত হয়েছিল। যার বহু গান এখন জনে জনে রিমেক করছেন। ওই ক্যাসেট এবং সি. ডি.র একটি গান ছিল—'নদীতে তুফান এলে/কূল ভেঙে যায়/সহজেই তা দ্যাখা যায়'। মুম্বই-তে যখন জগজিতের সঙ্গে তৃষ্ণা-র গান লিখছি তখন কলকাতার অন্য এক রেকর্ড কোম্পানির এক অধিকর্তা এসে জগজিৎকে বললেন—তালাত মামুদের গাওয়া বাংলা গানগুলো রিমেক করে দিন। জগজিৎ রাগ এবং বিরক্তির সঙ্গে বললেন—আপনারা মানুষ! যে-শিল্পী এখনও জীবিত, আমি তার গান রিমেক করব? কেন পুলকদা আছেন. আমি আছি, নতুন গান করুন।

এমন কথা আমি আর কোনও শিল্পীর মুখে শুনিনি। আমার অতি প্রিয় এবং অনেক কাছের মান্না দে-ও জীবিত জগন্ময় মিত্রের মেনেছি গো হার মেনেছি গেয়ে যে একটা অনৈতিক কাজ করেছেন—এটা আমি ওঁকে স্পষ্ট জানিয়েছিলাম।

জবাবে মান্নাদা বলেছিলেন—আমি দুঃখিত। আমি এ দিকটা ভাবিনি।

লতা মঙ্গেশকর হেমন্তদার রানার রিমেক করেছিলেন হেমন্তদার অনুমতি নিয়ে। হেমন্তদাও পঙ্কজ মল্লিকের সুরে রবীন্দ্রনাথের দিনের শেষে ঘুমের দেশে রিমেক করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিকের অনুমোদন পাওয়ার পর। লতাজি সেবার সলিল চৌধুরীর আর যেসব গান করেছিলেন সেগুলো যে শচীন গুপ্ত ইত্যাদির গাওয়া রিমেক গান তা ওঁর অজ্ঞাত ছিল। লতাজি নিজে আমাকে বলেছিলেন—এমন জানলে এ গানগুলো আমি কিছুতেই গাইতাম না। বিশেষ করে তাঁদের গান—যাঁরা এখনও জীবিত!

এই ঘটনার পর একরকম অভিমান করেই লতাজি আর সলিল চৌধুরীর কোনও গান রেকর্ড করেননি।

'রিমেক' নিয়ে আজকাল কথা উঠছে—রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলের গান, অতুলপ্রসাদ ইত্যাদির গান তো রিমেক হচ্ছে সেখানে আপত্তি উঠছে না। আধুনিক গানের বেলায় আপত্তির কারণ কী?

আমার মতে আপত্তির এটাই কারণ—রবীন্দ্র-নজরুলের গান সবটাই ওঁদের নিজস্ব। ওই রিমেকে ওঁরাই সর্বস্ব। কিন্তু রেকর্ডের আধুনিক গান—গীতিকার, সুরকার ও সেই প্রথম কণ্ঠদান করা শিল্পীর যোগফলের সৃষ্টি। তাই প্রথম শিল্পীকে সরিয়ে অন্য শিল্পী যখন সে গান রেকর্ড করেন শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের ধান্দায়—বর্জন করে ফেলেন নতুন গান গাওয়ার শেষ ইচ্ছেটুকুও। তখনই মনে হয় বাংলা গান আর নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন কী। তাই সত্যই থেমে যাচ্ছে ভালো বাংলা গান সৃষ্টির আগ্রহ। অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে বিভিন্ন কোম্পানির নামী দামি ম্যানেজারদের আজকাল আর ওই পরের ধনে পোদ্দারি করা ছাড়া কোনও কাজ আছে কি? ওঁরা অনুমাত্র ভাবছেন না—সিন্দুকে জমানো টাকা নিয়মিত খরচে শূন্য হয়ে যেতে বাধ্য। তা ছাড়া কোনও রিমেক শিল্পী নিজস্ব কোনও আইডেণ্টিফিকেশান আনতে পেরেছেন কি—যাতে আগেকার মতো এককথায় চেনা যায়। এই বিশেষ গানটি একমাত্র ওঁর। এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই রিমেক শিল্পী ইন্দ্রনীল

সেনের নাম করব। যে গত ১৯৯৮ সালের পুজোয় আমার লেখা 'বৃষ্টির দিনে' অ্যালবামটি নিজের সুরে গেয়ে শোনাবার সাহস দেখিয়েছে। ইন্দ্রনীলের মা মীরা সেন আমার কলেজের সহপাঠিনী। কিন্তু ইন্দ্রনীল-আমি দারুণ বন্ধু। ওই ক্যাসেটের 'ছোট্ট খুকু পায়ে পায়ে সারা ঘুরে ঘুরে চলে যে' আমার নাতনি ম্যাডামকে নিয়ে লেখা আমার এই গানটি আমার চোখে জল আনে।

আবার মৃণালের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। একদিন রমেশপ্রসাদজি দুঃখ করে বললেন, আপনার গান আর সংলাপ নিয়ে আমার নাগপঞ্চমী ছবি এত হিট করল। অথচ দেখুন গান কীভাবে সুপার ফ্লপ করে গেল। এর কারণ কী মশাই?

বললাম, যেহেতু সংগীত পরিচালক ছিলেন একজন অবাঙালি। মনে হয়, বাঙালি সেন্টিমেন্টটা তিনি ঠিক ধরতে পারেননি। রমেশজি পরের ছবি সন্ধ্যাতারা -তে তাই নিলেন দুই বাঙালিকে। একজন পরিচালক প্রভাত রায় অন্যজন সংগীত পরিচালক মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মৃণালকে ডেকে প্রভাত তাঁর ছবিতে কী ধরনের গান চান, সে সম্পর্কে ধারণা দিতে রোজা-র ক্যাসেট একটা দিলেন মৃণালের হাতে।

মৃণাল করল কী রোজা-র সুরটাই বসিয়ে দিল সন্ধ্যাতারা'র গানে। গান শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, কী করেছ মৃণাল! প্রভাত তো রোজা-র সুর চায়নি। চেয়েছে স্টাইলটা। তুমি কম্প্রোমাইজ না করে যদি প্রভাতকে বুঝিয়ে বলো তাতে তোমারই লাভ হবে। কিন্তু মৃণাল সে পথে না যাওয়াতে নিজেরই ক্ষতি করে ফেলল।

সুখেন দাশ অভিনেতা হিসাবে পরিচিতি পাওয়ায়, ওর একটা প্রতিভা কিন্তু ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। সুখেন গানও গাইত দারুণ।

স্টারে অভিনীত নাটকে নিজের চরিত্রের আমার লেখা গানগুলি ও নিজেই গাইত। সব থেকে মজার ব্যাপার, ছবিতে সুখেনকে লিপ দিতে হত অন্যের কণ্ঠের গানে। এই সুখেন একদিন পরিচালক হয়ে গেল।

একদিন সুখেনের সঙ্গে দেখা হতেই বলল, পুলকদা, আপনাকেই আমার খুবই দরকার। কালকে একবার আমাদের বাড়িতে আসুন না। ছোড়দার সঙ্গে আলাপ হবে এবং কাজের কথাও হবে।

পরের দিন ওদের বাড়ি গেলাম। পরিচয় হল ওর ছোড়দা সংগীত পরিচালক অজয় দাশের সঙ্গে। কথা হল পরবর্তী ছবি অচেনা অতিথি নিয়ে। সিচুয়েশন বোঝানোর পর অজয় বসল হারমোনিয়াম নিয়ে সুর শোনাতে। বুঝলাম আমাকে এই সুরের ওপরই কথা বসাতে হবে। সুর শোনাতে শোনাতে এক সময় হারমোনিয়াম থামিয়ে অজয় বলে উঠল, এখানটায় বড্ড বেশি সলিল চৌধুরী হয়ে যাচ্ছে না? দাঁড়ান, বদলে দি। এই একটি ঘটনা অজয়ের সম্পর্কে আমায় একটা ভাল ধারণা গড়ে দিল। এই অচেনা অতিথি ছবি থেকেই আমার আর অজয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার একটা ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। অচেনা অতিথির দুটি উল্লেখ্য গান মান্নাদের কণ্ঠে ছিল (১) অনেক দিন তো কেটে গেলো ভেবে ভেবে (২) তুমি আমার দস্যি মনের।

অজয় সুরের ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে ছিল। সুর যতক্ষণ না পছন্দ হচ্ছে ততক্ষণ পাল্টে পাল্টে যেত। সিংহদুয়ার ছবিতে আরতির গাওয়া 'বেঁধেছি প্রাণের ডোরে' গানটির

সুর অজয়ের মনঃপূত না হওয়ায় বার বার পাল্টাতে চেয়েছিল। শেষে সুর পাল্টানো সম্ভব না হওয়ায়, যন্ত্রানুষঙ্গে অন্য ধারা এনে কিছু একটা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সিচুয়েশনের সঙ্গে বেমানান হয়ে যাচ্ছে এই বলে সুখেন তা নাকচ করে দেয়। অজয় মোটেই খুশি হয়নি। বলল, গান হয়তো হিট করবে। কিন্তু আমি স্যাটিসফায়েড হতে পারলাম না।

এই সিংহদুয়ার ছবি প্রসঙ্গে আরও একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ছবির গান তৈরির জন্য আমাকে এবং অজয়কে রিজ্ কন্টিনেন্টাল হোটেলে নিয়ে গিয়ে গানের সিচুয়েশন বুঝিয়ে দিয়ে সুখেন চলে গেল। বলে গেল, আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না। সময় মতো খেয়ে নেবেন।

সুখেন যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। বললাম, এত রাত করলে? সুখেন বলল, সব বলব। আগে গানগুলো শুনি। গান শোনার পর খুব খুশি। বলল, এবার শুনুন আমার রাত হওয়ার কারণটা। আপনাদের যখন এই হোটেলে নিয়ে এলাম তখন আমার পকেটে রয়েছে মাত্র পঞ্চান্ন টাকা। বিল মেটাতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন। পরিবেশকদের পাড়ায় ঘুরে ঘুরে এই টাকা জোগাড় করতে হল বলেই রাত হয়ে গেল।

৭৪

অজয় আর আমার পরবর্তী ছবি 'টুসি'। ও ছবির 'কেউ জানে না চাঁদের কণা/আছে কোথায়' গানটি বেশ জনপ্রিয় হল। এই সময়েই আমাদের 'সুনয়নী' ছবিতে অজয়, রাজকুমার চক্রবর্তী নামে একটি নতুন ছেলেকে দিয়ে প্লে-ব্যাক করাল। সবাই চমকে উঠল তার গান শুনে। গানটি ছিল, 'সুন্দর কাকে বলে পৃথিবী কি গেছে ভুলে।' কিন্তু আশ্চর্য দুঃখের ব্যাপার, সুরেলা কণ্ঠের এই ছেলেটি কিছুদিন চিত্রজগতে গায়ক ও অভিনেতা হিসেবে আনাগোনা করে কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ জানে না। এরপর আমাদের স্মরণীয় ছবি 'রাজনন্দিনী' ও 'পারাবত প্রিয়া'। 'পারাবত প্রিয়া' ছবিটির প্রযোজকের পক্ষে দিলীপ পাল রোজই বিভিন্ন সুরশিল্পীর নাম করতেন আমাকে। কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারতেন না কাকে নেবেন। একদিন সকালে ওঁর ফোন আসতেই আমি বললাম, আপনি বাড়ি থাকুন আমি আসছি। ওঁকে নিয়ে আর কোনও কথা না-বাড়িয়ে সোজা হাজির হলাম অজয়ের বৌবাজারের বাড়িতে। সেদিনই ফাইনাল হল অজয়। তার পরদিনই আমরা বানালাম—আশাজির জন্য 'বৃষ্টি থামার শেষে', কিশোরদার জন্য 'অনেক জমানো ব্যথা বেদনা' ইত্যাদি গান।

'মিলন তিথি' ছবিতে আমার গানে অজয় ওর সুরের সুযোগ দিল আর একটি নতুন কণ্ঠশিল্পী পরিমল ভট্টাচার্যকে। অজয় আমাদের 'আহুতি' ছবিতে সুযোগ দিল শিবাজী চট্টোপাধ্যায়কে। অজয় সে সময় বহু নতুন কণ্ঠশিল্পীকে সুযোগ দিয়েছিল ছবির গানে। কিন্তু সময় বদলে যেতে লাগল। অজয়ের সুরে আমার কথায় পরপর হিট হতে লাগল কিশোরদার গাওয়া গান। 'প্রতিশোধ'-এর—'আজ মিলন তিথির পূর্ণিমা চাঁদ', 'হয়তো আমাকে কারও মনে নেই।' 'জীবন-মরণ'-এর—'ওপারে থাকবো আমি তুমি রইবে

এপারে'। 'দাদামণি'র—'এইতো এসেছি আমি/তোমার দাদামণি'। 'মিলন তিথি'র 'সুখেও কেঁদে ওঠে মন'। পাপপুণ্যের 'ভালোবাসা ছাড়া আর আছে কী?' এবং 'অভিমান', 'দেনা পাওনা' ইত্যাদি ছবির গানগুলো নিশ্চয়ই সব সংগীতপ্রিয়দেরই বহুদিন স্মরণে থাকবে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে—এ সব গানগুলির পরপর সাফল্যের পর আমাদের সামনে এমন একটা সময় এসে গেল যে, নতুন শিল্পীকে গান দিতে আমরা সাহস দেখালেও প্রযোজক-পরিচালক তাতে আপত্তি করতে লাগলেন। সবাই চাইতে লাগলেন কিশোরদাকে—না পেলে মুম্বই-এর অন্য যে কোনও কণ্ঠ। অবশ্য এর পেছনে অনেক যথার্থ সত্যও লুকিয়ে আছে। 'আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে নাও' গানটি 'অনুরাগের ছোঁয়া' ছবির আগে হুবহু একই সুরে, একটি একটি করে দুটি রেকর্ড দুজন পরিচিত কণ্ঠশিল্পীই অন্য কথায় রেকর্ড করেছিলেন। দুটি রেকর্ডই সুপার ফ্লপ হল। কিন্তু কিশোরদা যেই গাইলেন ওই গানটি অমনি সেটি সুপারহিট হয়ে গেল। আজকাল যে সব রিমেক শিল্পীরা বলেন—আমরা ভাল গান পাই না, তাই পুরনো গানই গাই। তাঁদের মধ্যেই দুজন শিল্পীই তো গেয়েছিলেন ওই দুটি তথাকথিত 'ভাল গান', তা হলে ওঁদের গাওয়া সে গান চলল না কেন? অথচ কিশোরদা গাইতেই যে সেটি হিট হয়ে গেল এটা তো ঐতিহাসিক সত্য। এখন যে শিল্পীরা আগে ওই গানটি গেয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন, তাঁরা যদি 'আমি যে কে তোমার' রিমেক করেন, তখন সেটা জনপ্রিয় হলে তাঁদের বলতে আটকাবে কি, আমরা ভাল সুর পাই না বলেই রিমেক করি? আসলে রিমেকের মধ্যেই যে পুরনো শিল্পীর গাওয়া গানগুলিই শ্রোতারা শোনেন, এটাই বা ওঁদের বোঝাবে কে?

আমি সংগীত জগতে আসার পর প্রথম দিকে গানও লিখতাম সুরও করতাম। বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে মোট দশটি গান গ্রামোফোন রেকর্ডও হয়েছিল আমার সুরে। পরে সেটা পুরোপুরি ছেড়ে দিই। রয়ে যাই শুধুই গীতিকার। শ্যামল গুপ্তও কণ্ঠশিল্পী হয়ে গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত করেছিলেন, কিন্তু উনিও গান গাওয়া ছেড়ে শুধু গীতিকারই রয়ে গেলেন। এ দিকে সলিল রায়চৌধুরীর দেখাদেখি এখানে প্রায় সব সুরকারই—লিখতে পারুন আর না পারুন—যখন তখন গান লিখতে শুরু করলেন। যেহেতু নিজের সুরে যে কোনও কথাই নিজে 'অ্যাডজাস্ট' করে নেওয়া সম্ভব, তাই তাঁদের কিছু 'আবাল-তাবোল' কথাও হিট হয়ে গেল। কিন্তু তাঁরা যে আদৌ গীতিকার নন তার প্রমাণ, তাঁরা নিজের সুরে ছাড়া আলাদা কোনও সুরকারের সুরে কোনও গান লিখে সার্থকতা দেখাতে পেরেছেন কি? যাক, এটা তো হল যুক্তিতর্কের কথা। ঘটনার কথা এই, মাঝে মাঝে আমার এই সব ভাল সুরকারদের অপটু রচনা, শুধু সুরের গুণে বেশ জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে দেখে ভারী রাগ হত এবং হিংসাও হত। মনে হত কবে গীতিকাররাও সুরকার হয়ে এর বদলা নেবেন? বোধ হয় মনে মনে দিন গুনছিলাম। হঠাৎ এসে গেলেন আনন্দ মুখোপাধ্যায়। গীতিকার থেকে হয়ে গেলেন সুরকার। অনেক গান রেকর্ড করল। খুব আনন্দ হল আমার ওর এই আগমনটায়। মনে মনে ওকে সুস্বাগতমও জানিয়ে ফেললাম। তার কিছুদিনের মধ্যেই আনন্দর সুরে লিখলাম অনেকগুলি ছবির গান। যে সব গান মূলত গীতিকার আনন্দ অনায়াসে নিজেই লিখতে পারত। কিন্তু লিখল না শুধু নিজেকে আরও ছড়িয়ে দেবার মনস্কতায়।

আমার গান লেখায় ওর সুর দেওয়া ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখ্য 'স্বামী-স্ত্রী', 'অভি', 'লাল পাহাড়ী' ইত্যাদি। আর একজন সংগীত পরিচালকের কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসছে—সে হল অধীর বাগচি। অনিল বাগচির পুত্র এই অধীর বাগচিকে আমিই এইচ. এম. ভি.-র এ. সি. সেন সাহেবকে রাজি করিয়ে ছিলাম ওদের ওখানে কণ্ঠশিল্পী করে নিতে। মান্নাদার সুরে আমার লেখা দুটি গান গেয়ে সংগীত জগতে প্রবেশ করেছিল অধীর। (১) 'চাঁদ বিনা সারা রাত', (২) 'যখন গানের মুখ মনে আসে না।' অধীর বাগচিকে সুরকার হিসেবে প্রথম পেলাম, যতদূর স্মরণে আসছে ডি এস সুলতনিয়ার 'এই করেছো ভালো' ছবিতে। পরের যোগাযোগ চিত্র পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায় মারফত। ছবিটির নাম সম্ভবত ছিল 'বড়ো ভাই'। তারপরই সুশীলবাবু করলেন তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ'। ওই ছবিতে মান্না দে গাইলেন আমার কথায় আর অধীরের সুরে (১) 'আমি সুখী কতো সুখী কেউ জানে না' (২) 'বেহাগ যদি না হয় রাজি'। ভীষণ আদৃত হয়েছিল গান দুটি।

আর একজন গায়িকা, যার নাম জয়ন্তী সেন—সে কিন্তু জীবনে আমার বহু গান গেয়েছে। হেমন্তদার সুরে গেয়েছে 'রজনী' ইত্যাদি অনেক হিট ছবিতে। হেমন্তদার সুরেই তার গাওয়া আমার কথার হিট আধুনিক গান 'আকাশ রামধনু রঙ মেখে।' আজও গেয়ে চলেছে সে নিরলস অধ্যাবসায়ে। তার সাফল্য কামনা করি।

৭৫

নতুন নতুন সুরশিল্পী আমার জীবনে অনেক এসেছে। তাদের নাম বলে শেষ করা যাবে না। অরূপ-প্রণয়ের পর নতুন যারা আমায় বিশেষ নাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে মনে আসছে শুভ নন্দী আর আবীর মুখার্জির নাম। শুভ নন্দীর সুরে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ আমায় খুবই আকৃষ্ট করে। মনে আসছে দেবজিৎ আর দেবজিৎ মিশ্রের নাম। অশোক ভদ্র, গৌতম বসু, অনুপম দত্তের সঙ্গেও আমি বেশ কিছু ছবির গান লিখেছি। জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সুরেও আমি অনেক ভাল গান লেখার সুযোগ পেয়েছি ও তার সদ্ব্যবহার করেছি। এখনই আর একজনের নাম মনে আসছে তিনি নবীন চট্টোপাধ্যায়। আমার লেখা কবিতা কৃষ্ণমূর্তির 'পূজারিণী' অ্যালবামে তিনি দারুণ সুর করেছেন। আমি বারবার শুনি—'আমার মনটা শুধুই ভরে থাকুক/আঁচল থাকুক শূন্য ফাঁকা/আমি পূজারিণী সাজবো না মা'র/প্রণামীতে লুটতে টাকা!' পরে যাদের নাম মনে আসবে আবার জানাব।

বেতারের বিজ্ঞাপনের 'জিংগিল' গানে যে-কণ্ঠটি তখন খুব শোনা যেত তার নাম শ্রাবন্তী মজুমদার। শ্রাবন্তী ওই কর্নেল বোসের 'লিভিং সাউন্ডে' আমায় ধরে নিয়ে যায়। তখন বিবিধ ভারতীতে দুপুরের 'আলিবাবা' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। লিখতাম আমি। বলত কাজী সব্যসাচী আর শ্রাবন্তী। ওখানের বিজ্ঞাপনে আমার সুপার হিট নাম্বারটি 'সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম/বোরোলিন' সুর ভি বালসারার। আর তারপরই উল্লেখ্য 'মাথার ঘনচুল যখন মরুভূমি হয়ে যায়', সুর সুধীন দাশগুপ্তের।

শ্রাবন্তীর জীবনের পঁচানব্বই ভাগ বাংলা গান আমার লেখা। বালসারার সুরে 'না

এখন নয়', 'মধুপুরে পাশের বাড়িতে', 'আমার চার বছরের বড়ো দিদি', 'একুশটা মুরগিতে মিঠুদের গোঁয়ালে'। নচিকেতা ঘোষের সুরে 'কপালে আগুন জ্বলে না', 'আমি একটা ছোট্ট বাগান করেছি' ইত্যাদি বহু গান আছে যা নিয়ে অভিনন্দনও পেয়েছি, আবার পেয়েছি বহু বিরূপ সমালোচনাও।

শ্রাবন্তী কিন্তু সব সময়েই নতুন নতুন বিষয়বস্তুর গান করতে চাইত। এমনকী বিশ্ববন্দিতা গায়িকা 'ম্যাডোনা'র গাওয়া অনেক গানও বাংলা ভাষান্তর করে 'হ্যালো মাই লাভ' নামের বাংলা অ্যালবামে আমি এইচ. এম. ভি.-তে লিখেছি ওর জন্য। এখন ও লন্ডনে থাকে। মাঝে মাঝে হঠাৎ উড়ে আসে। এখনও আমাকে নিয়মিত লিখতে হয় ওর জন্য বহু পরীক্ষামূলক গান। বিখ্যাত অনু মালিকের সুরে আমি ওর জন্য বাংলা গান লিখেছি, আবার মহেন্দ্র কাপুর আর ওর কণ্ঠের দ্বৈত গানও লিখেছি। সত্যিকারের এক ব্যতিক্রমী শিল্পী শ্রাবন্তী।

তরুণ মজুমদারের 'স্মৃতিটুকু থাক' আমার দারুণ ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল এঁরা ক্রমশ অনেক বড় হবেন। তখন ওঁদের নাম ছিল এক গোষ্ঠীবদ্ধ পরিচালকের নাম— 'যাত্রিক'। ছবিটি দেখেই মনে হয়েছিল—বাংলায় আর একজন সত্যিকারের কৃতী পরিচালক এলেন। কতকগুলি ভাল ছবির পর তরুণবাবু আলাদা হয়ে নিজের নামেই করলেন 'পলাতক'। মুগ্ধ হয়ে ছিলাম ছবিটি দেখে। হেমন্তদার কাছে জানলাম, তরুণবাবুও সত্যজিৎ রায়, রাজেন তরফদারের মতো প্রথমে বিজ্ঞাপনে কাজ করতেন।

পরবর্তীকালে জেনেছিলাম, দেবকী বসুর 'পথিক' ছবির সংবাদপত্রে ওই বিখ্যাত চলমান বিজ্ঞাপনটি ওঁরই করা। প্রথম দিন, চার দিকের বর্ডারের মধ্যে কিছুই লেখা আঁকা নেই, শুধুই সাদা কাগজ। পরদিন একটি পায়ের সামনের আঙুলের ছাপের একটু ছবি। পরদিন আর একটু। এমনি করে কয়েকটা দিন ধরে একটি পদচিহ্নের ছবি সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে আবার সামনের দিকে দিনে দিনে এগিয়ে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া। সিনেমার এত অভিনব বিজ্ঞাপন আমি এজীবনে খুবই কম দেখেছি। পরিচালক হয়ে কত নতুন শিল্পীকে তিনি এনেছেন। অনুপকুমারকে বানিয়েছেন 'সিঙ্গিং হিরো', মৌসুমিকে এনেছেন। মহুয়াকে এনেছেন, তাপস পালকে এনেছেন, দেবশ্রীকে পূর্ণতা দিয়েছেন— এগুলো তো সবাই জানে। কে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন মনে নেই।

আমি ওঁর 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিটি দেখে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। একদিন স্টুডিয়োতে বলেই ফেললাম—এবার আপনার ছবিতে গান লিখব। হঠাৎ আমার একথা শুনে তরুণবাবু গলা নামিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আপনি কেন বলবেন? সময় হলে আমিই আপনাকে বলব। এমন উত্তর শুনলে স্বাভাবিক ভাবেই কারও আর কিছু করার থাকে না। ব্যাপারটা সময়ের ওপরই ছেড়ে দিলাম এবং ভুলেও গেলাম। হঠাৎ একদিন হেমন্তদার ফোন পেলাম, 'পুলক' তনুবাবু (তরুণবাবুর ডাক নাম) তোমায় খুঁজছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করো। কাল বিলম্ব না করে দেখা করলাম। পেলাম 'ফুলেশ্বরী'র গানের সিচুয়েশন।

প্রথমেই বললেন, ঝুমুর দলের মেয়ের গানটি লিখতে এবং আর একটি ছেলের গানে তার জবাব লিখতে।

হেমন্তদা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, বুঝেছি, তুমি কী বলবে? না, তনুবাবু সুরের ওপর গান লেখা চান না। তুমি ওঁকে লেখা গান দেবে। তারপর আমি তাতে সুর বসাব। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে লিখে ফেললাম—'শুনুন শুনুন বাবুমশাই/আজকে আমি গল্প শোনাই' এবং 'যেও না দাঁড়াও বন্ধু/আরো বল কুকথা।'

হেমন্তদা অপূর্ব সুর করে যেদিন গান দুটি শোনালেন, বিশেষ করে ওঁর অমৃত কণ্ঠের জন্য নির্দিষ্ট 'যেওনা দাঁড়াও বন্ধু'—শুনে আমি চুপচাপ স্থাণুবৎ বেশ কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। তারপর দিনের পর দিন চলল তনুবাবুর সঙ্গে 'ফুলেশ্বরী'র অন্যান্য গান লেখা এবং তা কীভাবে কতটা ভাল হয় তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা।

একদিন তনুবাবু বললেন, 'ফুলেশ্বরী, ফুলেশ্বরী ফুলের মতো নাম' গানটি আমাকে লিখতে। বলেই বললেন—গানটি মুকুলবাবু লিখেছেন। গানটি ভাল লেখা। কিন্তু আমার ছবির সিচুয়েশনের সঙ্গে ঠিক যাচ্ছে না। আপনি নতুন করে লিখুন। স্বভাবতই আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। তনুবাবু আশ্বাস দিলেন,—না, না, আপনি দ্বিধা করবেন না। মুকুলবাবু খুবই উদারচেতা মানুষ। ওঁকে আমি বলে নেব।

তনুবাবুর মনের যা ভাবনা ছিল—এই গানে কী কী ছবি উনি দেখাবেন—সেই সব 'শট' অনুযায়ী আমি লিখতে লাগলাম গান। স্বভাবতই মুকুলবাবুর কথা বদলে গেল। কিন্তু ওঁর লেখা একটা অপূর্ব গানের পঙ্ক্তি আমার বুকের মধ্যে কী যেন আলোড়ন তুলতে লাগল। কিছুতেই ও কথাটির কোনও বিকল্প আমি লিখতে পারলাম না। পঙ্ক্তিটি ছিল—'অনেক সুখে আজকে আমার চোখে এল জল'। সোজাসুজি তনুবাবুকে বললাম, ওঁর লেখার কিছু অংশ আমি রেখে দিচ্ছি। আপনি এটা মেনে নিন। তনুবাবু হাসলেন—বেশ তাই হবে। আমি আবার বললাম, আমার আর একটি শর্ত আছে, গানটিতে দুজন গীতিকারের নাম দিতে হবে। আর আমায় দেবেন গোটা গানের অর্ধেক পারিশ্রমিক। আজকে যাঁরা ডুয়েট গান করেন, তাঁরা সবাই কিন্তু গোটা গানেরই পারিশ্রমিক নেন, কেউই অর্ধেক নেন না। আমার এই শর্তকে নিশ্চয়ই তাঁরা পাগলামি বলবেন।

'সংসার সীমান্তে' ছবিতে তনুবাবু আমায় সিচুয়েশন দিলেন—নদীর ওপর গান। কিন্তু গানটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় করতে হবে। তা হলেই নৌকার গান তৎক্ষণাৎ 'আইডেন্টিফাইড' হবে। ও ছবিতে একটি গান ছিল, চোর জামাইকে নিয়ে পতিতাপল্লীর উৎসব। পতিতারা স্থানীয় এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভাষায় গাইবেন। সেটা আমি প্রচলিত মুখড়া দিয়ে 'ও সাধের জামাইগো/তুমি কেন নাগর হইলে না' লিখলাম। রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে গানটির রিহার্সাল শুনতে শুনতে তনুবাবু শুধু আমার কাছ থেকে গানের কাগজটা চেয়ে নিয়ে, আমার গানেরই 'নাগর' শব্দটি কেটে নিঃশব্দে লিখে দিলেন 'ভাতার'। আমিও কাগজটি নিঃশব্দেই হেমন্তদাকে দিলাম। হেমন্তদা পড়ে শুধু একটু মুচকি হাসলেন। যাক, ওটা তো ম্যানেজ হল, অন্য গান নিয়ে কী করি? বিশেষ করে ওই নৌকার—'সুজন কাণ্ডারী?' আমি যে পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষা মোটেই জানি না। সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে সকাল হতেই বুদ্ধি এল। আরে, এ আর বেশি শক্ত কাজ কী? কলকাতার কথ্যভাষাতেই গানটা লিখি, তারপর তথাকথিত বাঙাল ভাষা জানা কাউকে দিয়ে সেটা সাজিয়ে নিলেই

তো হবে। চলে গেলাম লোকগীতি গায়ক দীনেন চৌধুরীর ডেরায়। দীনেন হাসিমুখে সাহায্য করতে লাগল। লিখে ফেললাম—'সুজন কাণ্ডারী/আমার এ নি নিয়া দিবা সাত সাগরে পাড়ি?' হেমন্তদা তাঁর সেই মায়াভরা কণ্ঠে আর সুরে গেয়ে দিলেন গানটি।

তরুণবাবুর ছবির গানের সময় হেমন্তদা বলতেন,—পুলক, এই কটাদিন অন্য কোনও কাজ নিয়ো না। আমিও অন্য কারও কাজ কখনও নিই না। হেমন্তদা তনুবাবুর ছবিতে সবচেয়ে বেশি মনোনিবেশ করতেন যেহেতু তনুবাবু ওঁর ছবিতে গানকে একটা অন্যতম বিষয় বলে মনে করেন। তরুণ মজুমদারের ছবির গান ভাল হওয়ার প্রধান কারণ উনি গানের সিচুয়েশনের ওপর ভীষণ নজর দেন এবং কী ধরনের গানের সুর হবে তাও মনে মনে চিন্তা করে রাখেন। আমরা যখন কাজ করতাম, উনি মাঝে মাঝে গেয়ে উঠে ওঁর মনের চাহিদাটি আমাদের জানিয়ে দিতেন।

ঠিক এইভাবে গান গেয়ে গান বোঝানো আরও কিছু পরিচালককে আমি পেয়েছি। তাঁদের আর একজন আর এক অসাধারণ কৃতী মানুষ—তপন সিংহ। কে এল সায়গলের মতো দরাজ 'বেস ভয়েসে' ওঁকেও দেখেছি, যতদিন উনি নিজেকে সংগীত পরিচালক হিসেবে প্রকাশ করেননি ততদিন গানের সিটিঙে সংগীত পরিচালকের সঙ্গে গান গাইতে। বেশ সুরেলা কণ্ঠস্বরই তখন ছিল তাঁর।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। ওঁর সংগীতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বলাই সেনের 'কেদার রাজা' ছবিতে আমার লেখা হেমন্তদার গাওয়া—'দিয়ে গেছি সবি/তবু দিলে ফাঁকি' গানটি সায়গল সাহেবের ঢঙে ওঁর কণ্ঠে শুনে আমি ওঁকে অনুরোধ করে ফেলেছিলাম, আপনিই গেয়ে দিন। কিন্তু উনি হেসে উঠেছিলেন, আমার অনুরোধ রাখেননি।

একদিন কথায় কথায় তপনবাবু আমায় বলে ছিলেন— জানেন পুলকবাবু, প্রথম জীবনে আমি তো শব্দযন্ত্রী ছিলাম। তাই, শুধু গান নয় গানের যন্ত্রানুষঙ্গও আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে শিখেছিলাম। আজও নিউ থিয়েটার্সের প্রচুর গানের যন্ত্রানুষঙ্গও আমার কণ্ঠস্থ।

আগেই বলেছি তনুবাবুর ছবিতে আগে কথা পরে সুর এটাই সর্বদা প্রযোজ্য হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। 'ভালবাসা ভালবাসা' ছবিটিতে 'খোঁপার ওই গোলাপ দিয়ে', 'এই ছন্দ, এই আনন্দ' ইত্যাদি গানগুলো এমনকী ইংরেজি গানটিও আমার লেখার ওপরই সুর করেছিলেন হেমন্তদা, কিন্তু 'যতো ভাবনা ছিলো/যতো স্বপ্ন ছিলো' গানটি আমি সুরের ওপর লিখেছিলাম। ওই সিচুয়েশনে যে গানই লিখছিলাম তনুবাবুর পছন্দ হচ্ছিল না। বুঝলাম—উনি যে কোনও কারণেই হোক, আমার কথার ভেতরকার সুরটা অনুধাবন করতে পারছেন না। আমি ওঁর, অনুমতি নিয়ে এই একটা গান সুরের ওপর লিখেছিলাম। বলেছিলাম—যদি অপছন্দ হয় আবার নতুন করে লিখব। হেমন্তদার সুরের ওপর লেখা ওই গানটি হেমন্তদার গলায় শুনেই তনুবাবু খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠেছিলেন, আমি ঠিক এটাই চাইছিলাম। একেই বলে 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং'। একজন পরিচালক ও সুরকার গীতিকারের মানসিক মেলবন্ধন না থাকলে আমার ধারণা, ভাল গান জন্মলাভ করতে পারে না।

তনুবাবু আমাকে গানের সিচুয়েশন দিতেন সমস্ত খুঁটিনাটি লিখে। প্রায় ছবি এঁকে

এঁকে। 'পরশমণি' ছবিতে সেইমতোই আমি লিখেছিলাম—'যায় যে বেলা যায় এবার আমি যাই/জীবন মরণ দিয়ে আঁকা এই ছবিটি ছাড়া/আমার নেবার কিছুই নাই।' গানটি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর।

হেমন্তদার সুরে এটাই ওঁর জীবনের শেষ গান। তরুণ মজুমদারের ছবি মানেই হেমন্তদার সুর। হেমন্তদার অবর্তমানে 'সজনী গো সজনী' ছবির গানের কাজের সময় দিশাহারা হয়ে তনুবাবু হাসতে হাসতে বলে ফেলেছিলেন—চলুন, আমি আপনি ওপরে গিয়ে হেমন্তবাবুকে দিয়ে গানগুলো করে নিয়ে আসি। যদিও ওটা হাসিরই কথা, কিন্তু আমি ওই হাসির আড়ালে অন্য কিছু দেখেছিলাম।

তনুবাবু যখনই চিত্রনাট্য শোনান ইউনিটের প্রত্যেককেই ডাকেন। 'দাদার কীর্তি'-র সময়ও যথারীতি তাই হয়েছিল। চিত্রনাট্য শোনার পর সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু আমি বসে রইলাম। তনুবাবু হঠাৎ আমাকে লক্ষ করে বললেন—কী ব্যাপার, পুলকবাবু কিছু বলবেন? বললাম, হ্যাঁ। উনি একটু সময় নিয়ে বাইরে ঘুরে এসে আবার ঘরে ঢুকে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—বলুন! বললাম—দাদার কীর্তির গানের সিচুয়েশন সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু সবচেয়ে ভাল সিচুয়েশন রবীন্দ্রসংগীতের। তনুবাবু হেসে বললেন—বেশ তো। অন্যান্য সব গানগুলোই তো আপনি লিখছেন। ব্রহ্মসংগীতটাও লিখুন। সবাই জানেন আমি লিখেছিলাম—'এসো প্রাণ ভরণ দৈন্য হরণ হে/মহা বিশ্বভূপ পরম শরণ হে।' যে গানটি এক প্রাচীনা 'সেলিব্রিটি' টি ভি-র এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অনুরুদ্ধ হয়ে, রবীন্দ্রসংগীত বলে গলা কাঁপিয়ে দু লাইন ভুল করে গেয়েছিলেন।

যা হোক, যেখানটায় 'চরণ ধরিতে দিওগো আমারে' গানটি ছিল, সেই অসাধারণ সিচুয়েশনটির ব্যাপারে কথা তুলতেই উনি বললেন—ওখানটায় রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েছি জেনারেশান বোঝাতে। অর্থাৎ মা যে গানটা গাইতেন, ছেলেও সে গানটা গাইবে। আপনার গানে জেনারেশান বোঝা যাবে কী করে? বলেছিলাম—ছেলে চরণ ধরিতে দিওগো আমারে গাইলেই এটা যে ওর মা-ও গাইত, প্রমাণ হবে কী করে? প্রকৃত শিল্প-স্রষ্টা তরুণ মজুমদার আমার এ-কথায় কিছুক্ষণ নীরব থেকে কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বললেন—পিয়ানোটা একটু বাজিয়ে নিয়ে ছেলে যদি বলে—'আমার মা গাইতেন, তা হলে কেমন হয়? আমার মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে গেল—অপূর্ব।

'ভালোবাসা ভালোবাসা' ছবির রেকর্ডিং-এর সময় আর একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। ও ছবির পুরুষ কণ্ঠের সব কটি গান-ই হেমন্তদা স্বকণ্ঠে রেকর্ড করেছিলেন। শেষ রেকর্ডিং-এর পর হেমন্তদার সঙ্গে আমি যখন চলে যাচ্ছি—তনুবাবু পিছু ডাকলেন—পুলকবাবু, খুব তাড়া আছে কি? আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

হেমন্তদা চলে গেলেন। অগত্যা আমি রয়ে গেলাম। তনুবাবু আমায় নিরিবিলিতে বললেন—হেমন্তবাবু যদিও অসাধারণ গেয়েছেন, তবু আমার অল্পবয়সি নায়কের কণ্ঠে এ গলা ঠিক মানাবে না। আজকাল তো অনেক হেমন্ত কণ্ঠ বেরিয়েছে, এদের মধ্যে তরুণ কণ্ঠের কাউকে গাওয়ালে কেমন হয়? ধন্দে পড়লাম। হেমন্তদার গাওয়া গান অন্য কেউ ডাবিং করবেন, ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। তনুবাবু বললেন—জানি ব্যাপারটা খুবই ডেলিকেট,

কিন্তু ছবির স্বার্থে আপনার অভিমত বলুন? বললাম—এই মুহূর্তে দুজনের নাম মনে আসছে। হাওড়ার নির্মল আর বিরাটির শিবাজী চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই শিবাজী একটি ছবিতে আমার গান গেয়েছে, ভালই গেয়েছে। তনুবাবু বললেন—আপনার কথা মতো ও যদি ভালই গেয়ে থাকে, তা হলে যদি কিছু মনে না করেন, হেমন্তবাবুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে শিবাজীকে ওঁর কাছে গান তোলাতে পাঠিয়ে দিন। হেমন্তবাবু কিছুদিন ধরে ওঁকে রিহার্সাল করিয়ে ঠিক ওঁরই মতো করে তৈরি করুন, তারপর আমরা 'ডাবিং' করব। মনে আছে, সব শুনে আমি শুধু বলেছিলাম—মাফ করবেন। আমি হেমন্তদাকে বলতে পারব না। আপনাকে আমি শিবাজীর টেলিফোন নম্বর দিয়ে দিচ্ছি—তৎক্ষণাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে তনুবাবু বলেছিলেন—সরি। আমার ভুল হয়েছিল। আমিই ওঁকে বলব। মহৎ শিল্পের স্বার্থে প্রকৃত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হাসিমুখে নিজের গাওয়া গানগুলোকে আবার অতি যত্নে অনেক অধ্যবসায়ে শিবাজি চট্টোপাধ্যায়কে শিখিয়ে পড়িয়ে গাইয়ে ছিলেন। গানের জগতে এমন প্রাণ অনুদানের দৃষ্টান্ত একমাত্র মান্না দে-র—তাঁর নিজের গাওয়ার জন্য তৈরি করা রেকর্ডিং ডেট নেওয়া আমার লেখা গান—'আমার বলার কিছু ছিলো না' আমারই অনুরোধে হৈমন্তী শুক্লাকে, নিঃস্বার্থে অনুদান দেওয়ার ঘটনাটি ছাড়া, বোধ হয় আর কেউ কোথাও খুঁজে পাবেন না। এভাবেই শিবাজীর অনুপ্রবেশ 'ভালোবাসা ভালোবাসা'য়। এই আগমনটি হেমন্তদার বহুকথিত—সবার উপরে ভাগ্য—এই সত্যটাই প্রমাণ করে। আমার এও মনে হয়, হেমন্তদার মতো গান শেখানোর যত্ন অন্য কোনও সুরকারের কাছ থেকে আর কখনও পায়নি বলেই শিবাজীও উত্তর জীবনে বহু ছবিতে গান গেয়েও, কোনও গানই 'ভালোবাসা ভালোবাসা'র পর্যায়ে আনতে পারেনি।

যাতে ওঁর ছবির গানের মর্মে প্রবেশ করতে পারি সেইজন্য প্রতিটি ছবিরই পুরো চিত্রনাট্য আমাকে আর হেমন্তদাকে আবার আলাদা করে শুনিয়েছেন তনুবাবু। বিশেষ করে 'গণদেবতা' ছবির হেমন্তদা ও আরতির গাওয়া 'ওলো সই দেখে যারে দেখে যা' মান্নাদা'র গাওয়া 'লাথি খেয়ে আর কতো কাল মরবি তোরা?' এবং শিপ্রা বসুর গাওয়া — 'ভাল ছিল শিশুবেলা/যৈবন ক্যানে আনিলে' গানগুলির সময়। অক্লান্তভাবে বারবার সিচুয়েশন বুঝিয়েছেন তনুবাবু। 'শহর থেকে দূরে', 'কথা ছিল', 'খেলার পুতুল' অভিমানে অনুরাগে' (মুক্তিলাভ করেনি) এমনকী আমার মাত্র দুখানি গান আর বাকি সব রবীন্দ্রসংগীতের ছবি 'পথ ভোলা'তেও তাই। এঁদের মতো আরও কিছু পরিচালককে যদি পরবর্তীকালে বাংলা ছবি পেত, তা হলে তার গান দিন দিনে আরও উন্নততর হতে পারত।

এখন হেমন্তদা নেই। 'সজনী গো সজনী'র চিত্রনাট্য আমায় আলাদা ভাবে শুনিয়ে তনুবাবু হঠাৎ বললেন—আমি ভাবছি এ ছবিতে পাঁচজন সংগীতপরিচালক নেব—কেমন হয় ব্যাপারটা? বললাম, হিট ছবি 'অসমাপ্ত' এবং পরিচালক অজিত গাঙ্গুলির কয়েকটি ছবিতে এর নজির আছে। আপত্তি কীসের?

পাঁচজন সুরকারের একজন হল কানু ভট্টাচার্য। ওর সুরে অনেক ছবিতে আমি গান লিখেছি। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল 'বন্দিনী' 'মনে মনে' 'পুনর্মিলন', 'দোলনচাঁপা' ও

'কুচবরণ কন্যা'। 'দোলনচাঁপা' ছবির কিশোরদার গাওয়া 'আমারও তো সাধ ছিলো' ও অনুপ জালোটার গাওয়া 'গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস নে'' খুবই জনপ্রিয়।

একদিন আমার পাড়ার (সালকিয়ার) বাঁধাঘাট থেকে ওপারে আহিরিটোলা যাবার জন্য গঙ্গার বুকে ফেরি স্টিমারে যাচ্ছি—স্টিমার ছাড়তেই একজন ভিখারি গান ধরল— 'গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস নে', গান শেষে সবাইয়ের কাছে পয়সা নিয়ে সে আমার কাছে আমার লেখা গানের জন্যও পয়সা চাইল। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে অনেক আত্মতৃপ্তিতেই আমিও ওকে পয়সা দিলাম। যা হোক, বেশ কিছু ছবিতে কাজ করে হঠাৎ মুম্বইবাসী হয়ে গেল কানু ভট্টাচার্য।

এখন অবধি আমাদের শেষ কাজ ডি.এস. সুলতানিয়ার সদ্য সমাপ্ত ছবিটি। কানু ভট্টাচার্য বাংলা ছবি ছেড়ে আজও মুম্বই-তে। ওখানে আমি ওর সাফল্য কামনা করি।

বাবুল বসু ছিল এখানে বাদ্যযন্ত্রী। হঠাৎ ও-ও একদিন চলে গেল মুম্বই-তে। কাজ নিল গানের সুর করা। কারণ অকারণের আলো-আঁধারের জীবন বাবুলের। তবুও হার মানেনি। আজও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। ওরই সুরে আমি লিখেছিলাম কুমার শানুর 'অমরশিল্পী তুমি কিশোর কুমার'। 'আশিকী' ছবির অনেক আগেই সে গান মুক্তিলাভ করে। প্রথম জন্ম হয় কুমার শানুর। বাবুলের সুরে আমি বহু বাংলা গান লিখেছি, আজও লিখে চলেছি। শানু, অলকা, দেবাশীষ, উদিত নারায়ণ, দীপা নারায়ণ, অভিজিৎ, কল্লোল ব্যানার্জী ইত্যাদি অনেকেরই গাওয়া আমাদের বাংলা গান খুবই লোকপ্রিয়।

মিঠুন চক্রবর্তীর বাংলা আধুনিক গানের ক্যাসেটের সব গানই বাবুল বসুর সুর করা। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য 'কলকাতার রকে আড্ডা মেরেছি' এবং 'শুধু একটি শহীদ ক্ষুদিরাম' ও 'বাঙালির গড়া এই বাংলা/আজ কেন হয়ে গেল কাংলা?'

'অমর শিল্পী তুমি কিশোরকুমার'-এর মতো বাবুল আর আমার 'মন মানে না' ছবির গানও গোল্ড ডিস্ক জয় করেছে। বাবুল আর আমার বেশ কিছু বাংলা ছবি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য চিরঞ্জিৎ পরিচালিত 'মায়ের দুধের দাম'। স্বপন সাহার পরিচালনায় 'সত্যম শিবম সুন্দরম'। তুষার মজুমদারের 'মধুর মিলন' ও অমিতাভ (গুণ) পরিচালিত দেবশ্রী রায়ের ছবি 'দেবাঞ্জলি', আমার চিত্রনাট্যের, হরনাথ চক্রবর্তীর পরিচালনায় দু-বাংলার যৌথ প্রযোজনায় 'রাজা-রাণী-বাদশা'। সুখের বিষয়, বাবুল এখন মুম্বই-এর নামী প্রযোজক সেলিমের (রাণী অভিনীত) হিন্দি ছবিতে সুর করছে।

দিল্লির অরূপ আর মুম্বইয়ের প্রণয় দুজনেই এখন মুম্বই-তে। শানু ওদের আবিষ্কার করে, টি সিরিজে প্রথম আমার গান অনুরাধা পড়োয়ালের সঙ্গে পুজোয় রেকর্ড করে। শচীন দেববর্মণের মুম্বই-এর খুবই প্রিয় তবলিয়া সুদর্শন অধিকারীর পুত্র প্রণয়। অরূপ-প্রণয় গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি বেশ কিছু আধুনিক গান এবং প্রভাত রায়ের 'দুরন্তপ্রেম' ছবির গান করেছি। তবে ওদের সঙ্গে আমার সবচেয়ে সফল কাজ কুমার শানুর তিনটি ক্যাসেট 'সুরের রজনীগন্ধা', 'প্রিয়তমা মনে রেখো' ও 'সোনার মেয়ে'।

ওরা সুরের ওপর গান লেখানোরই পক্ষপাতী। শানুর গানে প্রতিবারই শানু নিজেই সিটিং করেছে। ও-ই গেয়ে গেছে আমি লিখে গেছি। সেইজন্য আমার লিখতে খুবই

সুবিধা হয়েছে। প্রিয়তমা মনে রেখো'ও এইভাবে লিখেছি।

দেশ বিদেশের গান শোনা আমার একটা হবি। একটা বিদেশি গান শুনেছিলাম 'কালিফোর্নিয়া ও মাই ডার্লিং'। গানটি ভীষণ ভাল লেগেছিল কী ভাবে ওই গানের বিষয়টা অবচেতন মনে রয়ে গিয়েছিল জানি না। আবেগের জোয়ারে অরূপ-প্রণয়ের-দেওয়া সুরের ওপর লিখে ফেলেছিলাম 'অনেক দেখেছি তবু/এ-সবুজ বাংলাকে/সাধ হয় দেখি যে আবার/তোমার মতন এতো/অপরূপ সুন্দর/কাউকে তো দেখিনিগো আর/প্রিয়তমা মনে রেখো/অনুপমা মনে রেখো।' শানুর বাড়িতে ওর স্ত্রী কালী এবং অরূপ-প্রণয় সবাই উচ্ছ্বসিত হল গান শুনে। আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। মুম্বই থেকে ফোন এল দারুণ রেকর্ডিং হয়েছে মনটা খুবই খুশি-খুশি। মান্নাদার একটা গান লিখেছিলাম—'মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায়/মনে হয়।' সত্যিই একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। আর মনে হল—দেশকে সবাই 'মা' বলেছেন। বাংলাকে নিয়ে যত গান শুনেছি সবই 'ও আমার বাংলা মাগো' ইত্যাদি। কিন্তু আমি আমার অবচেতন মনের 'কালিফোর্নিয়া/ও মাই ডার্লিং'-এর প্রভাবে লিখে ফেললাম—'প্রিয়তমা মনে রেখো'। জানি না এ গানের কী হাল হবে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই, এইচ.এম.ভি-তে আমার সই সাবুদ হয়ে গেছে। গান প্রকাশিত হতে মাত্র কদিন দেরি। ওই মাত্র কদিন কীভাবে আমি কাটিয়েছিলাম বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু জানি না, আমার রাশিচক্রে কোন গ্রহ কোথায় ছিল—কোন নক্ষত্রের কী আলোকপাত হয়েছিল। ক্যাসেট রিলিজ হওয়ার পর দেখলাম যে ব্যাপারটায় আমি ভয় পাচ্ছিলাম, সেটাই ও গানটার প্রকৃত 'প্লাস-পয়েন্ট' হয়ে গেল। সুপার-ডুপার হিট হয়ে গেল আমার বাংলাদেশকে নিয়ে লেখা—'প্রিয়তমা মনে রেখো'। ক্যাসেটটি আমায় উপহার দিল এইচ. এম. ভি.-র সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অনেক না-ঘুমানো রাত কাটাবার পর পেলাম গভীর ঘুমের সুন্দর প্রশান্তি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর মান্না দে আমার গানের জীবনের দুটি স্তম্ভ। আমার বয়সে বড় ভাগ্নে ভবানীপুরের সুশীল চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছোটবেলায় মনে আছে হঠাৎ হঠাৎ দু বন্ধু আমাদের বাড়িতে আসতেন। হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গান গাইতেন। সেই কবে শোনা পঙ্কজ মল্লিকের প্রভাব-লাগা হেমন্তদার কণ্ঠের সেই 'তোমার চোখের চাওয়া' এখনও আমার কানে বাজছে। আমার হাফ প্যান্ট পরা বয়সে আমাদের সালকিয়ার বাড়িতে ওঁর গাওয়া 'পরদেশী কোথা যাও/থামোগো হেথায়' আর শেষ কৈশোরে শোনা 'মোর সুন্দরের অভিসারে' এখনও আমি শুনতে পাই। তখন উনিই বলেছিলেন, দ্যাখ সুশীল, শৈলেশ দা (শৈলেশ দত্তগুপ্ত) কী সুন্দর সুর করেছেন।

আমার থেকে বয়সে বড় ভাগ্নে সুশীলকে আমিই মামা বলতাম মনে পড়ছে। সুশীল মামার বিয়ের দু-চারদিন পরেই বড়দির বাড়িতে ওর কিছু শিল্পী বন্ধুকে নিয়ে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে হেমন্তদা গান গাইলেন আর ভাগ্নে বাজালেন তবলা। আমরা শুনছি গান। দরজার এক কোণে বসে আছে নব্য যুবক উত্তম। ও তখন শুধু পাড়ায় শখের যাত্রা করে। সিনেমার হিরো তখন ওর কাছে দুঃস্বপ্ন। কয়েকটি গানের পর বললেন—এবার শোন

একটা রবীন্দ্রসংগীত। শুনেই ভাগ্নে বলল—তা হলে কি আর তবলা বাজাব। হেমন্তদা ভ্রু কুঁচকে বললেন—বাজা দেখি এই গানটার সঙ্গে। বলেই গান ধরলেন—'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'—প্রায় পুরো 'অ্যাড্‌লিফে'র পর যেই এল 'কালো? তা সে যতোই কালো হোক' মেতে উঠল ঘরভর্তি সমস্ত শ্রোতা। হেমন্তদা বুঝিয়ে দিলেন, তিনি আধুনিক আর রবীন্দ্র সংগীতের দু নৌকায় পা দিয়ে নদী কেন, সমুদ্র পাড়ি দেবার ক্ষমতা রাখেন। অনুষ্ঠানে এক-একজন শিল্পীরা আজকাল যেমন পুরো একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা গান গেয়ে শোনান, তখন সে রেওয়াজ ছিল না। সংগীতানুষ্ঠানে এক-একজন গাইতেন পাঁচটি কি ছটি গান। আর সঙ্গে থাকত শুধু তবলা। কেবলমাত্র মুম্বই-এর শিল্পীরা কলকাতায় কোনও অনুষ্ঠান করতে এলে, বিভিন্ন বাজনা নিয়ে রেকর্ডের মতো গান পরিবেশন করতেন। তখনকার শ্রোতারা কিন্তু এ সব গানে খুব সন্তুষ্টি পেতেন না। মনে আছে আগেকার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটা অনুষ্ঠানে লতা মঙ্গেশকর আর সন্ধ্যা মুখার্জি দুজনেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। লতাজি যথারীতি অর্কেস্ট্রা নিয়ে গাইলেন। সন্ধ্যা মুখার্জি গাইলেন শুধু রাধাকান্ত নন্দীকে নিয়ে নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে। ইতিহাস সাক্ষী, ওঁর বাদ্যযন্ত্রহীন অনুষ্ঠানে শুধু কণ্ঠমাধুর্যের পরিবেশনায়—'গানে মোর ইন্দ্রধনু' সেদিন মুম্বই-এর সমস্ত শিল্পীর সংগীতানুষ্ঠানকে ম্লান করে দিয়েছিল। মান্না দে কলকাতার হলেও মূলত মুম্বই-এর শিল্পী। মুম্বই-তে নাম করার পর উনি প্রথম প্রথম যখন কলকাতায় আসতেন, শুধু হারমোনিয়াম আর তবলা নিয়েই কলকাতার শিল্পীদের স্টাইলেই অনুষ্ঠান করতেন। এরপর যখন নিয়মিত আসা শুরু করলেন তখন তবলার সঙ্গে একটা অ্যাকোর্ডিয়ান, একটা স্প্যানিশ গিটার, একটা পারকারশান, আর একটা স্পেশাল রিদম নিয়ে নিলেন—অনুষ্ঠানের শ্রোতারা এতে হয়তো একটু ভিন্ন আস্বাদ পেলেন যেহেতু উনি বাংলার সঙ্গে হিন্দি গানও গাইতেন। এইভাবেই কলকাতার সংগীতানুষ্ঠানে প্রবেশ করল গানের সঙ্গে বাজনা। পরবর্তীকালে যা অনেক ক্ষেত্রেই 'গান-বাজনা' না হয়ে 'বাজনা-গান' হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

তবু মান্নাদা, হেমন্তদার অনুষ্ঠানে বাজনার পরিমিতিটা যে কোনও শ্রোতারই চোখ-কান এড়াল না।

হেমন্তদাকে আমি আমাদের স্কটিশ চার্চ কলেজের সরস্বতী পুজোর পর (যে পুজো কলেজের বাইরে হত) একটা অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। উনি রাজি হলেন, বললেন আমি পঞ্চাশ টাকা করে নিই তুমি চল্লিশ দিয়ো। আমি ওটা পঁয়ত্রিশ টাকায় নামিয়ে ছিলাম। উনি বললেন—আমার ওই দিন মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠান আছে। ওখানে এসো। ওখান থেকে তোমার সঙ্গে যাব। অনুষ্ঠানের দিন আমায় খবর পাঠালেন, আমার প্রেসিডেন্সি কলেজেও অনুষ্ঠান হচ্ছে। তুমি অমুক সময়ে সেখানে এসো। মনে আছে, গিয়েছিলাম মেডিকেল কলেজেই। দু জায়গাতেই উনি শুধু তবলার সঙ্গে ছ-সাতটি গান গাইলেন। আমাদের কলেজেও তাই। 'কোনও এক গাঁয়ের বধূ' তখন সদ্য প্রকাশিত। কত সহজে তিন জায়গার ছাত্র মহলে প্রচার হয়ে গেল সেই গান। আর পারিশ্রমিকের কথাই যদি ওঠে তা হলে বলি, যেহেতু আমি ফাংশন করাতাম, আমি জানি তখন সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নিতেন দুজন শিল্পী, একজন পঙ্কজ মল্লিক আর একজন

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ওঁদের রেট ছিল একশো টাকা!

হেমন্তদা আমার প্রথম গান করেন, মুম্বই-এর রামচন্দ্র পালের সুরে প্রদীপকুমারের ঠোঁটে 'অপবাদ' ছবিতে। আমি তখন কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্র। তারপর হেমন্তদা চলে গেলেন মুম্বই-তে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সুপারহিট হল 'নাগিন'। কলকাতায় এলেই দেখা করতে যেতাম। মুম্বইতে গেলেও দেখতাম, সবসময় পরে আছেন ওই হাত গোটানো সাদা শার্ট, ধুতি আর চপ্পল।

পরে কলকাতারও আরও ছবিতে আমার আরও গান গাইলেন, কিন্তু আধুনিক গানের যোগাযোগ হচ্ছিল না। শেষকালে এসে গেল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ভবানীপুরে সান্তুদার বাড়িতে অনেক কিন্তু কিন্তু করে হেমন্তদাকে বললাম—এবার আপনি আমার দুটো আধুনিক গান আপনার সুরে রেকর্ড করুন। হেমন্তদা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বললেন—আরে, তুমি তো কোনও দিন বলোনি? গান আছে সঙ্গে? পকেটে নতুন লেখা চার-পাঁচটা গান ছিল। প্রথমেই শোনালাম—'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না/ও বাতাস আঁখি মেলো না/আমার প্রিয় লজ্জা পেতে পারে/আহা কাছে এসেও ফিরে যেতে পারে'। এইটুকু শুনেই হেমন্তদা আমায় থামিয়ে দিলেন। ব্যাস, ব্যাস, আর শোনাতে হবে না। আমি এখনই অমুক জায়গায় যাব। একটুও সময় নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তা হলে কি হেমন্তদার গানটা পছন্দ হয়নি? বোধ হয় তাই! উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—এই গানটা আর এর উল্টো পিঠে তোমার পছন্দমতো যে কোনও একটা গান আমায় মুম্বই-তে পাঠিয়ে দাও। আমি পরের বার এখানে এসে রেকর্ড করব। আমি যেন সেই প্রচলিত উপমা—আকাশের চাঁদ পেলাম। উল্টো পিঠের জন্য লিখেছিলাম—'কতো রাগিণীর ভুল ভাঙাতে/বাঁশি ভরে গেছে আঘাতে'। দুটো গান-ই হেমন্তদার পরশমণির ছোঁয়ায় খাঁটি সোনা হয়ে গেল।

এর বছর কতক পরে ঠিক পুজোর পরেই মুম্বই গিয়েছিলাম। এখানকার এইচ.এম.ভি. ওখানের দুজন শিল্পীর গান করার জন্য আমায় চিঠি দিয়েছিলেন। সেবার পুজোর আগেই হেমন্তদা প্রথম বিদেশ গিয়েছিলেন। পুজোয় এইচ. এম. ভি. প্রকাশ করতে পারেননি তাঁর নতুন কোনও গান। শুনলাম এইচ. এম. ভি. ঠিক করেছেন হেমন্তদা কলকাতায় এলেই রেকর্ড করবেন। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা 'সাগর থেকে ফেরা'। মুম্বই-তে ক্রশ ময়দানে সেবার বাংলার বন্যাত্রাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য সলিল চৌধুরী একটা চ্যারিটি অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায়, সব শিল্পীদের সঙ্গে ওখানে দেখা হবে জেনে আমিও হাজির হয়েছিলাম। মুম্বই-এর খোলা অনুষ্ঠান মানে মোটেই সারারাত্রিব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান নয়। সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে শুরু—আর বড় জোর রাত এগারোটায় শেষ। পরদিন অনেক শ্রোতারই অফিস, কাছারি আছে। কলকাতার মতো কেউ অফিস কামাই করবেন না—বা অফিসে বসে ঢুলবেন না। এ ব্যাপারে মুম্বই খুবই আদর্শ।

রাত বাড়ছে, আমি উশখুশ করছি—ঘোষণামতো কখন লতাজি আসবেন। সম্ভবত মুকেশজি গাইছিলেন, ওঁর গান শেষ হতেই সলিলদা স্টেজে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—লতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছে। তাই আজ আর এখানে গাইতে

পারবে না। আমাদের শেষ শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বুকটা ধ্বক করে উঠল। এখনই হয়তো কাদা ছোড়াছুড়ি হবে—নইলে চেয়ার ভাঙাভাঙি। কিন্তু কিছুই হল না। অবাক বিস্ময়ে শুধু দেখলাম—বেশ কিছু লোক হেমন্তদার দুটি তিনটি গান শুনেই অনুষ্ঠান মণ্ডপ থেকে চলে যেতে লাগলেন। হেমন্তদাও বেশি গান গাননি। ওঁর অনুষ্ঠান শেষ হতে ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম। খুশি হয়ে বললেন—আরে পুলক? কবে এলে? কোথায় আছ? কাল সকালে কী করছ? আমার ঠিকানা পেয়ে বললেন—সকালে গাড়ি পাঠিয়ে দেব, চলে এসো—আমার রেকর্ডের গান লিখতে হবে।

এইচ. এম. ভি-র বোম্বাই স্টুডিয়োতে এখনই রেকর্ড করব। পুজোয় গান হয়নি। জানুয়ারিতে নতুন গান চাই-ই। পরদিন সকালে ওঁর গাড়িতে ওঁর গীতাঞ্জলিতে যেতে যেতে আমায় কিন্তু দুটি দুশ্চিন্তা প্রবল পীড়া দিতে লাগল। প্রথমটি—গৌরীপ্রসন্ন তখন মুম্বইতে। শুনেছিলাম উনি নাকি সেবার হেমন্তদার বাড়িতেই সস্ত্রীক উঠেছেন। উনি হাতের এত কাছে থাকতে হেমন্তদা আমায় ডাকছেন কেন? দ্বিতীয়টি হল—এইচ. এম. ভি. 'সাগর থেকে ফেরা'র রেকর্ডিং করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার গান হয়তো অনেক অনেক পরে প্রকাশ করবেন। হেমন্তদার গানের পুজোর যে-গ্যাপটা রয়েছে—সেটা হয়তো আমার বরাতে জুটবে না। এ সব ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেলাম হেমন্তদার গীতাঞ্জলির পেছন দিকের গ্রাউন্ড ফ্লোরের মিউজিক রুমে। ওঁকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম—গৌরীবাবু তো এখানেই আছেন। উনি কোথায়? হেমন্তদা বললেন—ও গেছে সুবীর সেনের বাড়িতে।

হেমন্তদার বরাবরের অভ্যাস, তবলার তাল ছাড়া কোনও গান সুর কবতে পারেন না। সেদিন ওঁর তবলিয়া অনুপস্থিত থাকাতে কিশোরপুত্র বাবু (জয়ন্ত)কে ডাকলেন। ও ঢোল বাজাতে লাগল। উনি সুর দিলেন। আমি লিখলাম—'জানি না কখন তুমি আমার চোখে স্বপ্নের মায়া দিলে/পলকেই হৃদয় নিলে'। লেখা শুনে হেমন্তদা খুশি হলেন। পরের লাইনটা লিখতে যাব এমন সময় ঘরে ঢুকল ওঁর পোষা অ্যালসেশিয়ান কুকুরটি। বাবু বললে—ইউ, গেট আউট। ও ভ্রূক্ষেপ না করে আমাদের মধ্যে পরিষ্কার কার্পেটে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ল। হেমন্তদা আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে হারমোনিয়ামের রিডে যত রকম বেসুরো ডিসকর্ড পর্দা আছে বাজাতে লাগলেন। এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল কুকুরটি। বেসুর ওই বাজনা শুনে শুনে শেষমেশ তিতিবিরক্ত হয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাড়ির সুর শুনে দিন কাটানো কুকুরটি। আমি এইচ. এম. ভি-র কুকুরের মতো এই কুকুরটিরও দুটি খাড়া কানের তারিফ না করে পারলাম না। যা হোক, পরের গানটি ছিল আমার সঙ্গে থাকা একটি লেখা গান। হেমন্তদা গানটি বার তিনেক পড়ে নিয়ে বাবুকে (জয়ন্ত) 'টু-ফোর' রিদম্ বাজাতে বলে সুর দিয়ে গাইতে লাগলেন—'কোনওদিন বলাকারা অতো দূরে যেতো কি/ওই আকাশ না-ডাকলে?' গান দুটি তৈরি হয়ে গেলে আমি, আমার দ্বিতীয় আশঙ্কার কথাটি হেমন্তদাকে জানালাম। উনি বললেন—আমি দু-তিনদিনের মধ্যেই রেকর্ড করছি। আর 'সাগর থেকে ফেরা' আমি অবশ্যই কলকাতা গিয়েই রেকর্ড করব—কিন্তু তোমার গান দুটোই আগে বেরোবে। হেমন্তদা তাঁর কথা রেখেছিলেন। ওই গান দুটিই আগে প্রকাশিত

হল। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। গৌরীবাবু সেবার ওঁর হাতের কাছে থাকতেও, উনি নিজে থেকে কেন আমাকে ডেকে সেবার ওই দুটি গান লেখালেন?

৭৬

হেমন্তদার সম্বন্ধে আমার কথা বলা বোধহয় কোনও দিনই ফুরোবে না। যেটা হঠাৎ মনে আসছে —এখন সেটাই বলি। 'মণিহার' ছবির গান নিয়ে আমরা টেপাদার (অমর দত্তর) বাড়ি সিটিং করছি। রয়েছেন পরিচালক প্রযোজক অনেকেই।

গানের সিচুয়েশন হল—নায়ক-নায়িকা দার্জিলিং চলেছেন পাহাড়ি পথে, হঠাৎ গাড়ির টায়ার ফেটে গেল। চাকা বদলাতে একটু সময় তো লাগবেই। নায়িকার পিতা বললেন—মা, আমরা চুপচাপ বসে কী করব? তুই একটা গান শোনা। নায়িকার এই গানেই নায়কের মনে প্রথম অনুরাগের ছোঁয়া লাগবে। এক্ষেত্রে নায়িকা নিশ্চয়ই আজকালকার তথাকথিত ছবির মতো কোনও 'ডাইরেক্ট' প্রেমের গান গাইতে পারবেন না। তাই ঠিক হল প্রকৃতির ওপর গান লিখতে হবে।

তখন বিখ্যাত বেহালাবাদক ভি. জি. যোগের বেহালা বাদনে অনেক 'সিগনেচার টিউন' রেডিয়োতে খুবই জনপ্রিয় ছিল। রেডিয়োর অধিবেশন শুরু হবার আগের বেহালার সেই সব সুর নিশ্চয়ই এখনও অনেকেরই মনে আছে!

হেমন্তদা আর আমার আগেই আলোচনা হয়েছিল, ভি. জি. সাহেবের তখনকার রেডিয়োর 'সংবাদ বিচিত্রা'র 'সিগনেচার টিউন'-এর সেই অপূর্ব বেহালা বাদনের সুরের স্টাইলে এই গানটা সৃষ্টি করা হবে।

হেমন্তদা সেই স্টাইলেই সুর দিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার। তৎক্ষণাৎ সেই সুরের ওপর আমি লিখে ফেললাম—'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থপাখিরা/বুঝিবা পথ ভুলে যায়।' পরের পঙ্‌ক্তিটাও একই সুরে ভিন্ন কথা লিখলাম।

ঘরভর্তি সবাই খুশি হলেন। হেমন্তদা এবার 'অন্তরা' দিলেন। আমি লিখতে যাচ্ছিলাম, উনি বললেন—না। ' ডামি বোলে' অর্থাৎ 'আবোল তাবোল' কথায় গানের সুরের মিটারটা নিয়ে নাও। তারপর দু-দুটো দিন বাড়িতে বসে মন দিয়ে লিখে অমুক তারিখে এই সময়ে এখানে এসো। এঁরাও আসবেন, শুনে নেবেন। এঁদের পছন্দ হলে রেকর্ড করব। তাই করলাম। ধরে নিলাম সুরটা 'ডামি বোলে'। চা-টা খেয়ে ওঁরা সবাই উঠে পড়লেন। আমিও উঠতে যাচ্ছি। হেমন্তদা বললেন, তুমি যেয়ো না, আমি তোমাদের ওদিকেই যাব। একসঙ্গে বের হব। ওঁরা চলে যেতেই হেমন্তদা আবার হারমোনিয়াম নিয়ে বললেন—পুলক, আজকে তোমার দারুণ মুড। আমিও খুব মুডে আছি। লেখো। এখনই গান শেষ হয়ে যাবে। সত্যই তাই হল।

কী যেন একটা ভাব ও কথার জোয়ারে আমি ভেসে গেলাম। লিখে ফেললাম—'দূর আকাশের উদাস মেঘের দেশে/ওই গোধূলির রঙিন সোহাগ মেশে' ইত্যাদি। গোটা গানটা বানাতে আমাদের সর্বসাকুল্যে সময় লেগেছিল বোধহয় পনেরো মিনিট। গানের

কাগজটা ওঁকে এগিয়ে দিতে গেলাম। হেসে বললেন—না, তোমার কাছে থাক। সুরটা আমি টেপ করে রেখেছি। তুমি অমুক তারিখে প্রডিউসারদের সামনে এটা দেবে। আমি এ লেখাটা প্রথম পেলাম—এই অ্যাকটিং করে যাব। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। হেমন্তদা আবার হেসে বললেন—আমি এক্ষুনি সুর করলাম, তুমি এক্ষুনি লিখলে। এ গানে কেউ সন্তুষ্ট হয় নাকি? ওঁরা চাইবেন—আমরা দু-তিন ধরে গলদঘর্ম পরিশ্রম না-করে যদি কোনও গান বানাই সেটা একেবারে ফাঁকিবাজি।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা হেমন্তদার চিত্রনাট্য অনুযায়ীই অ্যাকটিং করলাম এবং সুপারহিট হল 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থপাখিরা'।

পরবর্তী জীবনেও দেখেছি হেমন্তদা কখনও কোনও গান নিয়ে অহেতুক রগড়া-রগড়ি করেননি। ওঁর মতে প্রাণের আবেগে যেটা সৃষ্টি, সেটাই আসল গান—কোনও কেরামতিতে নয়। এটাই দেখেছিলাম 'বাঘিনী' ছবিতে, হেমন্তদার সুরে আমার লেখা মান্নাদার কণ্ঠের 'ও কোকিলা তোরে শুধাই রে' গান রেকর্ডিং-এর সময়। দ্বিতীয় 'টেক'টি শুনেই হেমন্তদা বললেন—মান্নাবাবু 'ও-কে'! চমৎকার। আর গাইতে হবে না। মান্নাদা বলে উঠলেন—'ও-কে' কী মশাই? আমার এখনও গলাই গরম হল না। রেকর্ডিং চেম্বার থেকে হেমন্তদা বললেন—'তা হলে আবার টেক করুন। সম্ভবত পর পর দশটি টেক হয়েছিল গানটির। হেমন্তদা আমায় পাশ থেকে বলেছিলেন, দেখো পুলক, সব ক'টা টেক আলাদা করে শোনার পর মান্নাবাবুই বলবেন সেকেন্ড-টেকটাই রাখুন। অবাক হলাম। মান্নাদা ঠিক তাই বলেছিলেন। সেকেন্ড টেকটাই প্রিন্ট হয়েছিল।

এত নিষ্ঠা, এত অধ্যবসায়, এত ধৈর্য, সময় জ্ঞান, আমি খুব কম শিল্পীরই দেখেছি। সুভাষদা (কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়) আমায় বলেছিলেন—তখন ওঁর বন্ধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটা হারমোনিয়ামও ছিল না। সুভাষদার ছিল। হেমন্তদা মুখ্যত ওই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইবার জন্য ওঁদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন। ওঁর প্রথম রেডিয়ো প্রোগ্রামে, তখনকার একটা জানা গানের সুরের ওপরই কথা লিখে দেন সুভাষদা।

হেমন্তদা একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন, জানো পুলক! যখন ফিল্মালয়ে মাস-মাহিনায় কাজ করছি তখন শশধর মুখার্জির 'নাগিন' ছবির 'ও জিন্দেগিকে দেনে ওয়ালে/জিন্দেগিকে লেনে ওয়ালে' গানটি পেয়েই আমি সুর করে শোনালাম মুখার্জি সাহেবকে। আমার ধারণা ছিল সুরটা লুফে নেবেন উনি। কিন্তু শুনে বললেন—কিচ্ছু হয়নি। তোমাকে কলকাতার টিকিট কিনে দিচ্ছি। ফিরে যাও। কিন্তু ফিরে যাব বলে তো বম্বেতে আসিনি। তাই হাসি মুখে আবার নতুন করে সুর করলাম। আবার অপছন্দ হল। আবার করলাম, আবার অপছন্দ। এভাবে উনিশটি সুর শোনানোর পর মুখার্জি সাহেব বললেন—হেমন্ত তোমার প্রথম সুরটাই নাগিনে থাকবে। আমার ওটা ভাল লেগেছিল—আমি এতদিন দেখছিলাম—তুমি এর চেয়ে ভাল কিছু করতে পারো কি না। হেমন্তদার এই অধ্যবসায় তো যে কোনও মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত।

হেমন্তদার অসাধারণ নাট্যবোধ আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি। মনে আছে, প্রথম শীতের এক ডিসেম্বরের বিকেলে মাসখানেক পরে হেমন্তদার কলকাতার বাড়ির পাশ দিয়ে

যাচ্ছিলাম। ইচ্ছে হল, একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাই।

ওঁর ঘরে ঢুকেই দেখলাম, সন্ধ্যায় বোধহয় কোনও জলসায় উনি যাবেন, তাই ওঁর প্রিয় তবলিয়া মান্তান (গায়িকা ডক্টর অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের ভাই) ওখানে বসে আছে। আমাকে দেখেই হেমন্তদা বললেন—কী ব্যাপার পুলক, অনেক দিন পাত্তা নেই? আজকেই ভাবছিলাম তোমায় খবর দেব। আগামী পুজোর গানগুলো তৈরি করে দেবে তো। অবাক হলাম। এই তো সবে ডিসেম্বর। আগামী বছরের পুজোর সেপ্টেম্বরের গান এখনই তৈরি করে রাখবেন?

হেসে বললেন—নতুন বছর পড়লেই সবাই আমার কাছ থেকে ও বছরের পুজোর গানের 'প্রতিশ্রুতি' আদায় করে রাখতে চাইবেন। আমি কোন গীতিকার, কোন সুরকারকে ফেরাব বলো তো? সবাই তো আমার চেনাজানা। তাই আমার গান তৈরি থাকলে ওঁদের সোজা সত্যি কথায় বলতে পারব, আমার গান রেডি হয়ে গেছে, আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।

এবার মান্তানকে বললেন—মান্তান ঠেকা বাজাও।

আমাকে অগ্রজের আদেশের ভঙ্গিমাতেই বললেন—পুলক, নাও লেখো। মাঝে মাঝে তুমি যে কোথায় ডুব মারো? ওঃ, কতদিন পরে তুমি আজ এলে বলো তো? 'কতোদিন পরে এলে/একটু বোসো/তোমায় অনেক কথা বলার ছিলো/যদি শোনো!' গানটি সেই মুহূর্তে আমি লিখতে পেরেছিলাম। আর একটি গানের বেলায়, সেদিন বিকেলে ওঁর লেকের দিকের বারান্দায় বসে দুজনে চা খাচ্ছি। বললেন, কী ধরনের গান বানানো যায় বলো তো? বলেই নিজেই আবার বলে উঠলেন—ওই যে লেক থেকে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে জল ঝরাতে-ঝরাতে যে মেয়েটি গাছগাছালির ছায়া মাড়িয়ে তার বাসায় ফিরে যাচ্ছে—ওকে নিয়ে লিখতে পারো? হেমন্তদা প্রথম জীবনে অনেক গল্প লিখেছেন। কিছু 'দেশ' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। ওঁর সাহিত্য বোধ দারুণ। সুতরাং ভাবতে বসে গেলাম। হেমন্তদা হারমোনিয়াম ধরলেন। পেলাম সকালের সুর। কিন্তু তখন বিকেল। তাই লিখে ফেললাম—'সেদিন তোমায় দেখেছিলাম ভোরবেলায়/তুমি ভোরের বেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিলে/কৃষ্ণচূড়ার ওই ফুলভরা গাছটার নীচে/আমি কৃষ্ণচূড়ার ওই স্বপ্নকে/আহা দু চোখ ভরে দেখে গেলাম।'

এমন অজস্র ঘটনা আছে। কিছু শোনাই।

আমার কাহিনীর 'রাগ-অনুরাগ' ছবির সুরকার ছিলেন হেমন্তদাই। আমিই প্রযোজক-পরিচালককে নিয়ে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। মুখে মুখে আমার গল্পটি শুনিয়ে ছিলাম। বললাম ছবিতে আটখানি গান। সাতটা গান আপনার, আর একটা গান লতা মঙ্গেশকরের। সেই হাসি দিয়ে উত্তর করলেন—তোমার তো লতা না হলে মন ভরবে না। ওঁকে বোঝালাম—গল্পের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে গায়ক-নায়ক জানত না নায়িকার অসাধারণ গানের গলা। আচমকা সেই গান শুনেই প্রথম নায়িকার প্রেমে পড়বে নায়ক। সুতরাং নায়কের থেকে বেশি ভালো সিংগার আমার প্রয়োজন। শিশুর মতো সরল হাসিতে হেসে উঠলেন হেমন্তদা। দেখছ? পুলক আজ আমার সামনেই বলে ফেলল লতা আমার থেকে ভাল গায়। আমি কি তা জানি না। বেশ লতাই হবে।

অনিবার্য কারণে ছবিটির প্রোগ্রাম দু মাসের জন্য পেছিয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমরা আরও অনেক গান নিয়ে বসেছি। একদিন কোনও এক মহিলা শিল্পীর রেকর্ডের গান লিখছি। সবে 'মুখড়া'টা হয়েছে—এবার অন্তরা হবে—হেমন্তদা বললেন—থাক, পুলক। অন্য সুর দিচ্ছি, অন্য গান লেখো। স্বভাবতই মনটা ভেঙে গেল! আপনার পছন্দ হল না, হেমন্তদা? উনি হাসলেন। না, না, তোমার ছবির গল্পের ওই সিচুয়েশনে এটা সঠিক হবে। এটা নন-ফিল্ম রেকর্ডে নয়—ওখানে লাগাব। চমকে উঠলাম আমি। আমার কাহিনী আমার তৈরি সিচুয়েশন। এই নিয়ে কতবার ভেবেছি আমি। অথচ আমার মাথায় ব্যাপারটা আসেনি? হেমন্তদা 'স্ক্রিপ্ট'টাও শোনেননি। শুধু আমার মুখে গল্পের ছোট 'জিস্ট' শুনেছেন। তাতেই বলে দিলেন এ গান ওখানে লাগিও? এত অসাধারণ চিন্তাশক্তি, নাট্যবোধ হেমন্তদার? তৎক্ষণাৎ খাতা কলম ছুড়ে ফেলে ওঁকে প্রণাম করেছিলাম।

'রাগ-অনুরাগ'-এর সেই সুপারহিট গানটি হল—'ওই গাছের পাতায়/রোদের ঝিকিমিকি/আমায় চমকে দাও/চমকে দাও।'

ওই ছবিরই আর একটি গানের সময় বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন সকালে হেমন্তদার 'সিটিং'-এ গেছি। যেতেই উনি যথারীতি বললেন—কী ধরনের গান করা যায় বলো তো? আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—পটদীপ করলে কেমন হয়?

—'পটদীপ?'

হেমন্তদা আবার সেই হাসিটি হেসে উঠলেন। অপ্রস্তুত আমাকে প্রশ্ন করলেন—কাল সন্ধ্যাটা বুঝি মান্নাবাবুর সঙ্গে কাটিয়েছ?

মান্নাদা তখন কলকাতায় ছিলেন। সত্যিই কাল সন্ধ্যায় ওঁর বাড়িতে উনি পটদীপ রাগের বিভিন্ন গান আমায় শুনিয়েছিলেন। আমার মাথায় তাই পটদীপ ঘুরছিল। হেমন্তদা এবার ওঁর পাশে বসা সহকারী ও আজীবনের বন্ধু সমরেশ রায়কে বললেন—নাও পুলকের কথাই রাখো। একটু পটদীপ আমায় শোনাও।

সমরেশদা শোনাতে শুরু করলেন। একটু শুনেই ওঁকে থামিয়ে দিয়ে হেমন্তদা সুর দিলেন। লিখে ফেললাম—'সেই দুটি চোখ/আছে কোথায়/কে বলে দেবে আমায়?'

আর একটা ঘটনা বলি—ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর খবর শুনেই আমি তখনকার ই. পি. রেকর্ডের যুগের প্রথামতো চারখানা শ্রদ্ধাঞ্জলির গান লিখে হেমন্তদার কাছে হাজির হয়েছিলাম। হেমন্তদা গানগুলি মন দিয়ে পড়ে বললেন—চমৎকার লিখেছ পুলক। কিন্তু এগুলো অন্য কাউকে দাও। আমি রেকর্ড করতে পারব না। কারও মৃত্যু নিয়ে ব্যবসা করাটা আমি চিরদিন অপছন্দ করি। ভাবতাম, গান্ধীজির মৃত্যুর পর ধনঞ্জয়বাবুর 'কে বলে গান্ধী নাই', শচীন দেববর্মণের 'শুণ ধাম আমাদের গান্ধীজি' ইত্যাদি বহু শিল্পীর বহু গান আমরা শুনে থাকলেও কেন হেমন্তদার কণ্ঠে এ-ধরনের কোনও গান শুনিনি? মুহূর্তে কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ইন্দিরা গান্ধীজির মৃত্যুকে নিয়ে লেখা সে গান বহু শিল্পী আমার কাছে চেয়েছেন, আমি কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশ করা ছাড়া কাউকেই রেকর্ড করতে দিইনি। হেমন্তদার প্রয়াণের সময় আমি ছিলাম মুম্বই-তে। ওখানকার অনেক কোম্পানি

আমাকে দিয়ে ওঁর ওপর শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখতে বলেছিলেন। আমি লিখিনি। একটি বড় কোম্পানি আমায় বলেছিলেন, ওঁরা হেমন্ত কন্যা রানুকে দিয়ে বাবার ওপর গান গাওয়াবেন—আমি যেন লিখি। আমায় অভাবিত অর্থের প্রলোভনও ওঁরা দেখিয়েছিলেন—আমি রাজি হইনি। উপরন্তু রানুকেও বলেছিলাম, হেমন্তদার ওই মনোভাবটা। রানু জানত না। শুনে রানুও মোটা অর্থপ্রাপ্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আর একটা ঘটনা মনে আসছে। হেমন্তদার মতো ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলতে আমি গানের জগতে কাউকে দেখিনি। যখন 'শঙ্খবেলা'য় 'কে প্রথম কাছে এসেছি' গানটা প্রকাশ হল। তখন আমার একজন মহিলা ফ্যান বা অনুরাগীর আবেগ-ভেজা কণ্ঠের ফোন পেলাম। এমন রোমান্টিক গান নাকি উনি কখনও শোনেননি। বললাম, নাম কী? কত নম্বর থেকে বলছেন?

খুব সপ্রতিভ সম্ভ্রম জড়ানো তরুণী কণ্ঠ সেটা এড়িয়ে গেলেন। বললেন, এরকম আরও লিখুন। আবার ফোন করব। কেটে দিলেন উনি লাইনটা। এরপর আমার আর একটা কী রোমান্টিক গান হিট হতেই সত্যিই আবার তাঁর ফোন পেলাম। একই অভিনন্দন দিলেন, কিন্তু বললেন না নাম ঠিকানা-টেলিফোন নম্বর। এমনই ভাবে চলতে লাগল মাঝে মাঝে টেলিফোন আসা। যখন আমার 'বিলম্বিত লয়' ছবির 'এক বৈশাখে দেখা হল দুজনায়/জষ্ঠিতে হলো পরিচয়' গানটি প্রকাশিত হল, তখন উনি ফোনে বললেন আজ বিকেলে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমি এলগিন রোডের এই জায়গায়, এত নম্বর বাড়ির সামনে এই রঙের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকব, আপনি আসুন। আপনাকে দেব আমার লাগানো গোলাপ গাছের প্রথম ফোটা গোলাপ। আমিও উৎসাহের গলায় বেশ খানিকটা 'বেস' দিয়ে বললাম—আমরা কিন্তু কোথাও চা খাব, না বললে চলবে না।

ফোনের লাইনের ওধার থেকে শুনলাম শুধু এক অপূর্ব কাচভাঙা হাসি। আচ্ছা আসুন তো। আনন্দে আত্মহারা আমি নিজেই আমার গাড়িটা সযত্নে ধোয়া মোছা করে ঝকঝকে করে তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ফোন বাজল। হেমন্তদার গলা। পুলক, আজ বিকেলে কী করছ? নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললাম—বলুন। বললেন—ঠিক পাঁচটায় আমার কাছে আসতে পারবে? প্রতিমার (বন্দ্যোপাধ্যায়ের) পুজোর গান দুটো তৈরি করে ফেলব। ঢোক গিলে বললাম—সাড়ে সাতটা নাগাদ হয় না? বললেন—না, ওই সময়ে আমার অন্য কাজ আছে। তোমায় আমি ঠিক সাড়ে সাতটায় ঘড়ি মিলিয়ে ছেড়ে দেব। এবার মরিয়া হয়ে বললাম—কাল হয় না? বললেন, কাল যে আমি বোম্বে চলে যাব। ফিরে এসেই রেকর্ডিং করব। ডেট নেওয়া হয়ে গেছে। তুমি কি আজ খুব ব্যস্ত? তা হলে অন্য কাউকে ডেকে নেব? তাড়াতাড়ি বললাম, না, না, ঠিক পাঁচটায় আপনার কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। সারা রাস্তা গাড়ি চালাতে চালাতে গানের মুখড়া ভেবে হেমন্তদার বাড়িতে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় হাজির হয়ে লিখেছিলাম—বড়ো সাধ জাগে/একবার তোমায় দেখি/কত দিন দেখিনি তোমায়।' আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার অনুরাগী মহিলাটি আর জীবনে আমায় ফোন করবেন না। করেনও নি। আজ আমার লেখা পড়ে যদি আমার সেদিনের সময় না-রাখার আসল কারণ জেনে রাগ-অভিমান ভাঙতে পারেন, সেই আশাতেই নিজেই মনে মনে গাইছি 'বড় সাধ জাগে/একবার তোমায় দেখি।'

মান্নাদে-র জন্মদিন ১ মে। আমার জন্মদিন ২ মে। আগে সুর, পরে কথা। মান্না দে-কে নিয়ে আমার বলা কোনওদিনই শেষ হবে না। যতটুকু না-বললে নয়, এখন ততটুকুই বলি।

গান লেখার ঘটনা কিন্তু মান্নাদে-র সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি। যেদিন আমার পোস্টে পাঠানো দুটি গান 'জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই' এবং 'আমার না-যদি থাকে সুর/তোমার আছে...এরই নাম প্রেম' উনি রেকর্ড করলেন সেদিনই আমি ওঁর প্রেমে পড়ে গেলাম। নামে বা চিঠির মাধ্যম ছাড়া তখনও আমরা কেউ কারও পরিচিত নই।

গান রেকর্ড হবার কিছুদিন বাদেই আমি সেবার মুম্বই গিয়ে, সোজা হাজির হয়ে গেলাম ওঁর তখনকার ভিলে পার্লের ফ্ল্যাটে। উনি অপরিচিত আমাকে দেখে বেশ উষ্মার সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন—আপনি কে? কী চান? নাম বললাম। জড়িয়ে ধরে আমায় ভেতরে নিয়ে গেলেন। এই বন্ধনডোর আমাদের চিরকালের অমরবন্ধন হয়ে গেল।

ওঁর গানের যে ঘটনাটি সবচেয়ে আগে মনে আসছে, সেটা দিয়েই শুরু করি। সেবার ওঁকে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আনতে গেছি। আমার গাড়িতে ওঁর বাড়িতে আসার পথে, উনি আমার পাশে বসে বাঁ হাতে গাড়ির ছাদে ঠেকা দিতে দিতে গান ধরলেন—'বিন্দিয়া লাগে মোরি ছোড়দে' গোছের একটা হিন্দি সংগীত। (হিন্দি ভুল হলে ক্ষমা করবেন) বললেন, একেবারে কাকার (কৃষ্ণচন্দ্র দে) ঠুংরি ঘরানায় গানটা বানিয়ে কালই রেকর্ড করেছি। কেমন লাগছে? বললাম—দারুণ!

উনি গেয়ে চলেছেন আপন মনে। আমি কিন্তু ভাবছি এই সুরে একটা বাংলা গান বানাব। মনে মনে তাই ওই সুরে কথা বসাচ্ছি। শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসেই বললাম—গান তো 'ললিতা গো/ওকে আজ চলে যেতে বল না/ও ঘাটে জল আনিতে যাবো না যাবো না/ও সখি অন্য ঘাটে চল না।' মান্নাদা গেয়ে উঠলেন। শুনলাম চমৎকার বসে গেছে গানের কথাগুলো।

আমাদের আর তর সইল না। এক্ষুনি গানটা শেষ করা চাই। আমার পরিচিত শ্যামবাজারের মোড়ের 'বাণীচক্রে' এসে ওঁদের অনুরোধ করলাম, একটা হারমোনিয়ামওয়ালা ঘর চাই। পেয়ে গেলাম ঘর। শেষ হয়ে গেল গান। মান্নাদা ওঁর মদন ঘোষ লেনের বাড়িতে ঢুকলেন একটা সুপারহিট বাংলা গান সঙ্গে নিয়ে।

আর একবার ওঁর বান্দ্রার ফ্ল্যাটে গেছি। সেদিন ওখানে কেউ নেই। উনি একা। বললেন—আমি রান্না করছি। খেয়ে যাবেন। জিজ্ঞেস করলেন—কী রাঁধছেন? বললেন—হয়ে গেলে বলব। ঝাল রাঁধতে গিয়ে যদি অম্বল রেঁধে ফেলি—শুধু শুধু আমার বদনাম হবে। উনি চলে গেলেন কিচেনে, আমি ওঁর ড্রয়িংরুমে বসে লিখে ফেললাম—'আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না/ইস্তাম্বুল গিয়ে/প্যারিস কাবুল গিয়ে/শিখেছি দারুণ এই রান্না।'

সেবার ইভনিং ফ্লাইটে মুম্বই যাচ্ছি। সেদিন ঝলমলে পূর্ণ চাঁদের রাত। জানালা দিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছি। এমন সময় এক অপরূপা তন্বী তরুণী বিমানসেবিকা আমার খাবার নিয়ে এলেন। মেয়েটিকে দেখলাম আর সদ্য ওঠা চাঁদটাকে দেখলাম। খাবারের

ন্যাপকিনেই লিখেছিলাম—'ও চাঁদ সামলে রাখো জ্যোছনাকে/কারও নজর লাগতে পারে।' আর একবার মান্নাদার সঙ্গে বউদির হঠাৎ একটু মান-অভিমানের পালা শুরু হয়। তারপর কাজী নজরুলের গানের আদলে 'বউ মান করেছে চলে গেছে/বাপের বাড়ি/আড়ি/আড়ি/আড়ি/হয়ে গেলো দুজনের'।

কিন্তু আজীবন 'সিঙ্গল-ওম্যান ম্যান' মান্নাদা, স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের দিকে আড়চোখেও তাকাননি কোনও দিন। যেই ওদিক থেকে ঝড়ের একটু পূর্বাভাস পেয়েছেন—অমনি সে বয়সে ছোট হলেও তাকে দিদি বলে সম্বোধন করতে শুরু করে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই উনি বউদির বিরহে জগৎকে অন্ধকার দেখলেন। লিখে ফেললাম সেই ঘটনায় 'তুমি অনেক যত্ন করে/আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছো/দিতে পারোনি।'

শুনেছি কবিরা নাকি ক্রান্তদর্শী হন। আমি ওঁদের জীবনে এমন ঘটনা ঘটবে, এই বিরহের অন্ধকার ফুরিয়ে যাবে, সোনালি সুখের দিন আসবে হয়তো আগেই ক্রান্তদর্শনে বুঝেছিলাম। তাই লিখেছিলাম 'সেই তো আবার কাছে এলে/এতো দিন দূরে থেকে/বলো না কী সুখ তুমি পেলে?'

আর একবার আমরা দুজনে আসছি বিহারের সিন্ধি থেকে। ধানবাদে আমার এক আত্মীয় (শ্যালিকা-পতি) তখন কয়লাখনির ম্যানেজার। ওঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হল। মান্নাদা বললেন—আপনার আত্মীয় যখন নিশ্চয়ই আমার ওখানে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু এবারই আপনার কাছ থেকে পুজোর গান নিয়ে আমি বম্বে যাব। ভাবুন। গান ভাবুন।

যাই হোক, ধানবাদে ওই বাড়ির দরজায় এসে আমরা দাঁড়ালাম। মান্নাদা গাড়িতে রইলেন। ফটকের কাছের 'কলিংবেল'টা আমি বাজালাম। একটি সদ্যস্নাতা তরুণী বেরিয়ে এসে বলল—আপনি বাড়ি ভুল করেছেন। মুখার্জি সাহেবের বাংলো ওইটা। মেয়েটি কমলকলি আঙুলের তর্জনীটি তুলে বাড়িটা দেখাল।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে এসেই বলেছিলাম, মান্নাদা, আপনার পুজোর গান লিখে ফেলেছি, শুনুন। 'ও কেন এত সুন্দরী হলো/অমনি করে ফিরে তাকালো/দেখেতো আমি মুগ্ধ হবোই/আমি তো মানুষ!'

একটা পার্টিতে হঠাৎ দেখলাম, মেঝেতে পড়ে আছে একটা জড়োয়ার ঝুমকো। কুড়িয়ে নিয়ে বললাম—মেয়েরা সবাই কানে হাত দিন। কার ঝুমকো খুলে পড়ে গেছে। এক সুন্দরী কানে হাত দিয়ে এগিয়ে এসে চাইলেন। দিয়ে দিলাম। মনে মনে তখনই লিখলাম—'জড়োয়ার ঝুমকো থেকে/একটা মোতি খসে পড়েছে।'

মান্নাদার গানে আছে এমন ধারা অজস্র ঘটনা। সবাই বললেন, অনেককে নিয়ে তো গান লিখলেন। এবার লিখুন নিজের সহধর্মিণীকে নিয়ে। তাও লিখেছিলাম। 'এ নদী এমন নদী/জল চাই একটু যদি/দু হাত ভরে উষ্ণ বালুই দেয় আমাকে।' মান্নাদা সে গানটাও সুপারহিট করে দিলেন।

একদিন পার্ক সার্কাস-এর ক্রিমেটোরিয়ামের সামনে দিয়ে যাচ্ছি—হঠাৎ মনে হল প্রণাম রেখে যাই মাইকেল মধুসূদনের ওই 'দাঁড়াও পথিকবর'-এ। ওখানে অন্যান্য

সমাধিও চোখে পড়ল। কারও কারও মাথায় বহুদিনের শুকনো ফুল। হঠাৎ একটি সমাধিবেদির ওপরে দেখলাম একটি গাছের ডাল এমনভাবে রয়েছে—ওখানের ফুল আপনিই ঝরে পড়বে ওই বেদিতে। ওই বিষয় নিয়েই লিখলাম—যে সমাধি বেদিটার ঠিক ওপরে/ফুলন্ত গাছটা পড়েছে নুয়ে/ওখানে যে রয়েছে শুয়ে/তার ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি।'

বিষয়টা শুনেই মান্নাদা আগ্রহী হয়ে গেলেন। রেকর্ড করলেন মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে। এবং হিট করল গানটি।

আর একদিন মান্নাদার গানের ঘরে বসে আছি। রবীন্দ্রভক্ত উনি শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীত। শুনতে শুনতেই মাথায় এল প্রকৃতিকে চালচিত্র করে প্রিয়াকে সামনে রেখে ছয় ঋতুর ছয়টি গান লিখব। বোধহয় পরদিনই লিখে ফেললাম 'সারা বছরের গান'।

গ্রীষ্ম—'প্রখর দারুণ অতি দীর্ঘ দগ্ধদিন!' বর্ষা—'গহন মেঘের ছায়া ঘনায়।' শরৎ—'স্বপনে বাজে গো বাঁশি!' হেমন্ত—'জ্বালাও আকাশ প্রদীপ।' শীত—না না যেও না/ও শেষ পাতাগো শাখায় তুমি থাকো।' বসন্ত—'কে তুমি তন্দ্রা হরণী?'

মান্নাদা নিজের সুরে রেকর্ড করলেন গানগুলো। দুঃখের বিষয়, সুরকার মান্নাদার মূল্যায়ন আজও হয়নি। উনিও নিজের সুর করা অনেক গান অনিবার্য কারণে ওঁর অনুজ ভ্রাতার নাম দিয়েছেন। এইচ. এম. ভি-তে গাওয়া সুরকার অনুজ ভ্রাতার নাম বসানো অনেক গান ওঁর জামাতা জ্ঞানবাবাজীবনের প্যারামাউন্ট ক্যাসেটে আবার সুরকার হিসাবে নিজেরই নাম বসিয়েছেন। পরবর্তী কালে যে কোনও সংগীত গবেষকই এ-ব্যাপারে বিভ্রমে পড়বেন, এ তো অবশ্যম্ভাবী।

মান্নাদা কিন্তু বাংলা ছবিতেও সংগীত পরিচালনা করেছেন। যেমন 'রামধাক্কা'। লতাজির গাওয়া 'দেখো না আমায় ওগো আয়না' (যেটা লতাজি এখনও আমাকে মাঝে মাঝে বলেন 'আয়নাওয়ালা গানা') তা ছাড়া 'ললিতা', 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন', 'বাবুমশাই' ইত্যাদি।

মান্নাদার অনেক গান লিখে আমায় বহু মানুষের বহু প্রশ্ন শুনতে হয়েছে। 'সে-আমার ছোটবোন' লেখার পর শুনতে হয়েছে। কার ছোট বোন ক্যান্সারে মারা গেছেন, মান্নাদার না আমার?

'সারাজীবনের গান'-এর অ্যালবামের মৃত্যু বিষয়ক গানটি—'আমায় চিনতে কেন পারছ না মা/সবই গেলে ভুলে?' শুনে আমার মা আমাকে বলেছিলেন, আমি বেঁচে থাকতে এ গান কেন তুই লিখলি? আমায় মিথ্যে বলতে হয়েছে, বিষয়টা মান্নাদা দিয়েছেন আমি শুধু লিখে গেছি। মান্নাদে-ও ওঁর মায়ের একই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, পুলকবাবু লিখে দিয়েছেন—আমি গেয়ে গেছি মাত্র।

একবার মান্নাদাকে বম্বেতে ফোন করার জরুরি দরকার। তখন এস. টি. ডি. ছিল না। ছিল শুধু ট্রাঙ্ককল। কিছুতেই লাইন পাচ্ছি না। শেষকালে মহিলা অপরারেটরকে বিনীতভাবে বললাম, এটা মান্নাদে-র নাম্বার, খুব দরকার। দয়া করে দিয়ে দিন। ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন—কোন মান্নাদে, যিনি বিখ্যাত গায়ক?